নাই। "তিনি কালী মন্দিরে গেছেন, আমি তাঁকে ডেকে আনি, আপনারা এখানে বসুন," এই বলিয়া রাখাল দ্রুতপদে কালী মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। কিছু পরেই রাখাল তাঁহাকে ধরিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিলেন। রামকৃষ্ণদেব ভাবে বিভোর, ঘোর মাতালের মত টলিতে টলিতে আসিতেছেন, রাখাল তাই তাঁহাকে ধরিয়া 'এখান উঁচু, এখান নিচু' বলিয়া সাবধানে আনিতেছেন। ক্রমে ঘরে আসিয়া রামকৃষ্ণদেব তাঁহার ছোট খাটটীর উপর বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে সহজ অবস্থা হইলে নবাগত ভক্তকে দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রামদয়াল তাঁহার পরিচয় দিলেন। রামকৃষ্ণদেব পরিচয় পাইয়া প্রফুল্ল চিত্তে কহিলেন, "বটে, অমুকের কুটুম্ব, তবে ত আমাদেরও কুটুম্ব। তা বেশ বেশ, তোমাদের বাড়ী কোথায় ?"

ভক্ত। "আজ্ঞে, তড়া আঁটপুর।"

রামকৃষ্ণদেব। "বটে ? তবে ত তোমাদের দেশেও একবার গেছি। আচ্ছা ঝামাপুকুরের কালী ভুলুর বাড়ীও সেই খানে না ?"

ভক্ত। "হ্যাঁ, আপনি তাঁদের কেমন কোরে জান্‌লেন ?"

রামকৃষ্ণদেব। "তারা যে রামপ্রসাদ মিত্রের ছেলে। যখন ঝামাপুকুরে ছিলুম, তখন দিগম্বর মিত্রের বাড়ী আর ওদের বাড়ী যখন তখন যেতুম।" এই কথা বলিয়া ভক্তের হস্ত ধরিয়া, "এস, আলোয় এস, তোমার মুখখানি দেখি" বলিয়া রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে লইয়া—একটু দূরে একটী প্রদীপ মিট্ মিট্ করিতেছিল—তাহার নিকট গেলেন। দীপালোকে মুখখানি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "হুঁ হুঁ," তৎপরে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিলেন। পরে, "আচ্ছা, তোমার হাত দেখি," বলিয়া তাঁহার হাত খানি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাহা আপন হস্তের উপর রাখিয়া তাহার ভার অনুভব করিতে করিতে প্রফুল্ল বদনে আবার বলিতে লাগিলেন, "হুঁ, হুঁ, তা বেশ বেশ।" এইবার ভক্তকে ছাড়িয়া রামদয়ালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরেন কেমন আছে জান ? শুনেছিলুম তার একটু অসুখ কোরেছিল।"

রামদয়াল। "তিনি ভাল আছেন, শুনেছি।"

রামকৃষ্ণদেব। "দেখ, সে অনেকদিন আসেনি। তাকে দেখবার বড় ইচ্ছে হয়েছে, একবার তাকে এখানে আসতে বোল, মনে থাকবে ত ?"

রামদয়াল। আজ্ঞে অবিশ্যি মনে থাকবে, বোলবো, ভুলব না।"

কথায় বার্ত্তায় প্রায় দশটা বাজিল। রামদয়াল যে সমস্ত ভোজ্য রামকৃষ্ণদেবের জন্য লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার যৎসামান্য কিঞ্চিৎ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া তৎসমুদয় রামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের তিনজনকেই ভোজন করাইলেন। ভোজন শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথায় শোবে, ঘরের ভেতর না বারাণ্ডায় ?"

রাখাল বলিলেন, "আমি ঘরে শোব।"

রামদয়াল। "মশাই, আমি বাইরে বারাণ্ডায় শোব।"

ভক্তও কহিলেন, "আমিও বাইরে শোব।"

রামকৃষ্ণদেব। "বারাণ্ডায় শুলে কষ্ট হবে যে।"

ভক্ত। "আজ্ঞে না, কোন কষ্ট হবে না।" ভক্ত ভাবিলেন, সাধু মানুষ, রাত্রে হয়ত সাধন ভজন করেন। ঘরের ভিতর শয়ন করিলে হয়ত তাঁহার সাধনায় কোনও ব্যাঘাত হইতে পারে। রামকৃষ্ণদেব পুনরায় কহিলেন, "দেখ, তোমরাও ঘরে শোও, বারাণ্ডায় কষ্ট হতে পারে।" তাঁহারা পুনরায় অস্বীকার করায় অতঃপর রাখাল ঘরের মধ্যেই শয়ন করিলেন, ভক্তটী রামদয়ালের সঙ্গে পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডায় শয়ন করিলেন। চৈত্রমাস, শীততো নাইই, সেদিন তেমন গ্রীষ্মও ছিল না, একটু তন্দ্রা আসিতেছে, এমন সময় বাগানের চৌকিদারেরা হাঁক দিল। এক দিক হইতে হাঁকিল, এ হৈ-ই-ই-ই, অমনি আর এক জন অপর দিক হইতে উত্তর করিল এ হৈ-ই-ই-ই। বিকট চীৎকারে ভক্তের তন্দ্রা ভাঙ্গিল। শয়নের পর প্রায় এক ঘণ্টা অতীত হইয়াছে, রামকৃষ্ণদেব শয্যা ত্যাগ করিলেন, পরিধেয় বস্ত্রখানি বগলে করিয়া মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে রামদয়ালকে ডাকিয়া কহিলেন, "হ্যাঁগা, ঘুমুলে ?"

রামদয়াল। "আজ্ঞে না।"

রামকৃষ্ণদেব অতীব ব্যগ্রভাব স্বরে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, তাকে একবার আসতে বোল। তার জন্যে আমার বুকের ভেতরটা (বগল হইতে কাপড় লইয়া মোড়া দিয়া) এইরকম মোড়া দিচ্ছে, যেন কাপড় নিংড়ুচ্ছে। তুমি একবার তাকে আসতে বোল। তাঁহার প্রত্যেক কথায় তাঁহার অন্তরের কাতরতা প্রত্যেক মুখ ভঙ্গিতে নরেন্দ্রের জন্য প্রাণের আকর্ষণ, অভিব্যক্ত হইতে লাগিল।

রামদয়াল। "আজ্ঞে আমি কালই তার সঙ্গে দেখা কোরে বোলবো আপনার সঙ্গে দেখা করতে। বোলব যে, তিনি আপনার জন্যে অস্থির হয়েছেন, একবার গিয়ে দেখা কোরে আসুন।"

রামকৃষ্ণদেব। "হ্যাঁ! তার জন্যে মনটা বড় চঞ্চল হইয়াছে—একটীবার দেখা করে যেতে বোল।"

রামদয়াল। "আমি রাতটা পোহালেই তাঁর কাছে যাব। আপনি চিন্তা করবেন না, তিনি ভাল আছেন। আর আপনি অস্থির হয়েছেন শুনলেই তিনি তখনি আসবেন।"

ভক্ত ভাবিতেছেন—"এ কি ভালবাসা, এত অস্থির। এঁর এত ভালবাসা আর সে লোকটা কেমন? একবার আসে না!"

রামকৃষ্ণদেব পশ্চাৎ ফিরিয়া আপনার ঘরের দিকে গমন করিলেন। কয়েকপদ যাইযাই আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তবে বোল, একবার তাকে আসতে বোল" এইরূপে ঐ কথা বার বার বলিয়া টলিতে টলিতে ঘরে গিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে আবার শয্যা ত্যাগ করিয়া কাপড় বগলে লইয়া যেন দশ বোতল মদ খাইয়া মাতালের মত উন্মত্তভাবে টলমল করিতে করিতে রামদয়ালের নিকট আসিয়া বসিলেন এবং পূর্ব্ববৎ উন্মাদের ন্যায় সেই একই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, "দেখ, নরেন বড় শুদ্ধ সত্ত্ব, সাক্ষাৎ নারায়ণ। তাকে না দেখলে থাকতে পারিনি। বুকের ভেতরটা যেন কাপড় মোড়া দেয়, এমনি কোরে মোড়া দিচ্ছে।" নিজ হস্তে কাপড়খানি মোড়া দিয়া দেখাইতে লাগিলেন আর মহা কাতর ভাবে বলিতে লাগিলেন, "তার জন্যে প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ করছে। সে একবার যেন আসে।"

নিশাবসান হইল। নবাগত ভক্তটি প্রাতঃকালে তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার রাত্রের ন্যায় ভাব এখন আর নাই। যেন সে লোকই নন্। ভক্তকে পঞ্চবটীর উত্তরের জঙ্গলে শৌচে গমন করিতে কহিলেন ও পঞ্চবটী দেখিয়া আসিতে কহিলেন।

ভক্তের বয়স প্রায় বিংশতি বৎসর, কিন্তু দেখিলে মনে হয়, পনর ষোলর অধিক নহে। তিনি অতি সুশ্রী ও সুপুরুষ। অতি শৈশবাবস্থায় যদি কেহ তাঁহাকে আদর করিয়া বলিত, "তোর বিয়ে হবে;" তিনি কাঁদিয়া অস্থির হইতেন, আর আধ আধ কথায় বলিতেন, "আমি মোয়ে যাব, আমি মোয়ে যাব।" যখন

তাঁহার বয়ক্রম মাত্র আট বৎসর, তাহার মনে হইত, "বেশ একজন সাধু সঙ্গি পাই ত গঙ্গার ধারে গাছ পালার মধ্যে নির্জ্জনে একটী কুঁড়ে ঘরে সাধু হয়ে থাকি, সন্নিসি হই।" যখনি এই কথা ভাবিতেন, তখনই এই ভাবের একটী ছবি তাঁহার মনে উদয় হইত। পঞ্চবটীর কাছে যাইয়া তাহার নিকট কুটীরখানি ও তাহার চতুর্দ্দিকের স্থান দেখিয়া তিনি অবাক্ হইলেন। কি আশ্চর্য্য, বাল্যে যখন সাধু হইবেন মনে করিয়াছিলেন, তখন এই স্থানটীর ছবিই কি মনোমধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন। কি আশ্চর্য্য, একেবারে ঠিক সেই স্থান। যাহা হউক মনোভাব গোপন করিয়া শৌচাদি ক্রিয়াস্তে আবার রামকৃষ্ণদেবের নিকট আগমন করিলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "কেমন পঞ্চবটী দেখলে, বল ?" ভক্ত অন্তরের কথা চাপিয়া কেবল কহিলেন, "বেশ মশাই।'

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "এইবার যাও, মাকে দর্শন কোরে এস, মার ঘরে যাও।" ভক্ত কালীদর্শন করিয়া, রামকৃষ্ণদেবের পদধূলি লইয়া প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে রামকৃষ্ণদেব কহিলেন "আবার আসবে ত ?" ভক্ত বলিলেন, "আজ্ঞে হঁ্যা, আসব।" রাখাল সেইখানেই রহিলেন, ভক্ত চলিয়া গেলেন।

রামদয়াল যাইয়া নরেন্দ্রকে সংবাদ দিলেন। ভক্ত চলিয়া গেলেন কিন্তু সাধুটীর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, "লোকটী বড় ভাল, নরেনকে কতই ভাল বাসেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য সে লোকটা কেমন, একবার আসে না।" পর রবিবারে তিনি আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকটে উপস্থিত। বেলা আট টা, দেখিলেন সেখানে আরও দুই চারিজন লোক রহিয়াছেন। শুনিলেন নরেন আসিয়াছেন, রাখাল আসিয়াছেন, ভবনাথ হরিশ ও লাটু প্রভৃতি উপস্থিত আছেন। পঞ্চবটীতে আজ রামকৃষ্ণদেবের বালক ভক্তবৃন্দ স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিবেন। সকলের বড়ই আনন্দ। ভক্তকে দেখিয়া রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তুমি এসেছ ? বেশ হয়েছে, যাও, পঞ্চবটীতে আজ ওরা সকলে চড়িভাতি করবে। নরেন এসেছে তার সঙ্গে আলাপ করগে।"

ভক্ত পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইলে, রাখাল সকলের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। নরেনকে দেখিয়া ভক্ত বিস্মিত—কি চক্ষুদ্বয়, যেন তাহা হইতে জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে। কি মুখশ্রী, দেখিলেই যেন ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। নরেন কথায় কথায় হাসিতেছেন—ভক্ত মনে করিলেন, এমন হাঁসি তিনি পূর্ব্বে কোথাও দেখেন নাই। নরেন পঞ্চবটীতে সর্দ্দার পাচকের মত রন্ধনের বিধান

বলিয়া দিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে গল্প করিতেছেন। এবার নরেন একটী গান ধরিলেন। সে মধুর স্বরলহরী পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত যেন ছাইয়া ফেলিল। ভক্ত অবাক হইয়া উহা শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইলেন এবং ভাবিলেন, "এঁর এত গুণ।"

এইরূপে সেদিন মহানন্দে কাটিয়া গেল এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার ভক্তগণকে তাঁহার বড়ই মিষ্ট বোধ হইল।

ক্রমশঃ।

আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষ।

কয়েকটী স্থূল কথা।

(স্বামী বিজ্ঞানানন্দ লিখিত।)

জ্যোতিষ শাস্ত্র কাহাকে কহে?—যে গ্রন্থে নভোমণ্ডলের সমস্ত জ্যোতিষ্মান্ পদার্থের স্থিতি, গতি, আকৃতি, প্রকৃতি, গুরুত্ব (পরিমাণ—mass) এবং দৈনন্দিন অথবা অন্যপ্রকার বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়, তাদৃশ গ্রন্থকেই জ্যোতিষ শাস্ত্র কহে।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিভাগ।—পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই শাস্ত্রকে পাঁচ ভাগে বিভাগ করেন। যথা—(১) বর্ণনাত্মক (Descriptive) জ্যোতিষ, (২) প্রক্রিয়াত্মক (Practical) জ্যোতিষ, (৩) অনুমানাত্মক (Theoretical) জ্যোতিষ, (৪) জ্যোতিষ্কি কলা শাস্ত্র (Celestial mechanics) এবং (৫) জ্যোতিষ্কি পদার্থবিজ্ঞান (Astro-physics)। হিন্দুদিগের ফলিত জ্যোতিষ ইহাদের অন্তর্গত নহে। উপরোক্ত পঞ্চ বিভাগের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তর-বিভাগ সমূহ আছে। এতদ্ব্যতীত যন্ত্র নির্ম্মাণ ও বেধার্থ (অর্থাৎ সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রাদির স্থান দর্শনার্থ) যন্ত্রাদির যথাযথ স্থাপন করাকেও জ্যোতিষের আর একটী পৃথক্ বিভাগ ধরা হয়।

উপরোক্ত কোন এক বিভাগে পারদর্শী হইতে হইলে সেই বিভাগটী যেমন বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিতে হয়, তদ্রূপ অন্যান্যবিভাগের সমুদয় সিদ্ধান্তগুলির সহিতও সুপরিচিত থাকা আবশ্যক। বিশেষতঃ, আজ কাল

জ্যোতিষ সম্বন্ধে এত নূতন নূতন আবিষ্কার ও উন্নতি হইতেছে যে, পূর্ব্বে একপ আর কখনও হয় নাই। সেই কারণে সমস্ত বিভাগের মূল ব্যাপার গুলি যদি অবগত না হওয়া যায়, তাহা হইলে কোনও এক বিশেষ বিভাগে সম্পূর্ণরূপে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারা যায় না। মাধ্যাকর্ষণের স্থায় মহতী আবিষ্ক্রিয়াসমূহ প্রতিনিয়ত হইতেছে না বটে, তত্রাচ যে সকল সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাই আশ্চর্য্যজনক। সহস্র সহস্র বৎসরের পরিশ্রম এবং গভীর গবেষণার ফলস্বরূপ মাধ্যাকর্ষণের স্থায় নিয়ম সকল আবিষ্কৃত হয়; এবং ইহাও সত্য যে, আধুনিক আবিষ্কার সমূহের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণই সর্ব্বপ্রধান।

বর্ণনাত্মক জ্যোতিষ শাস্ত্র।—এই বিভাগে সমস্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রের মূল কথা ও সিদ্ধান্তগুলি এমনভাবে সন্নিবেশিত করা হয়, যাহাতে উহা সাধারণ লোকের বোধগম্য হয়। ইহাতে জটিল গণিত বা কোন কঠিন বিষয় আলোচিত হয় না। পত্রিকাতে, ও বক্তৃতাদিতে যে জ্যোতিষের প্রসঙ্গ দেখা যায়, তাহা এই বর্ণনাত্মক জ্যোতিষ। এতদ্বারা সাধারণ কৃতবিদ্য লোকেরা নভোমণ্ডলের আশ্চর্য্যজনক তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া পরমানন্দ লাভ করেন। জ্যোতিষীদের কঠিন পরিশ্রমলব্ধ জ্ঞান এইরূপে কতিপয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া, সর্ব্বসাধারণে ছড়াইয়া পড়িয়া সাধারণ পাঠকের মানসিক সম্পত্তির দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছে।

প্রক্রিয়াত্মক জ্যোতিষ শাস্ত্র।—বেধার্থ (অর্থাৎ সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রাদি দর্শনার্থ) জ্যোতিষিক যন্ত্রাদি কি প্রকারে ঠিক ঠিক স্থাপন করিতে হয়, উহাদিগকে কিরূপে ব্যবহার করিতে হয় এবং কি কি প্রক্রিয়া দ্বারা উক্ত দর্শনাদি হইতে জ্যোতিষিক সমস্যা সমূহের সমাধান হয়, এই সমস্ত প্রক্রিয়াত্মক জ্যোতিষের অন্তর্গত। (ক) নক্ষত্রগুলির স্থাননির্ণয়, (খ) চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহাদির পরিমাণ এবং তদঙ্গে যে সব চিহ্নাদি (markings) আমরা দেখিতে পাই তাহার অনুধ্যান ও তত্ত্বনির্ণয়, (গ) ধূমকেতু এবং নীহারিকার (nebula) তত্ত্বানুসন্ধান, (ঘ) যমক নক্ষত্র বা নক্ষত্রযুগ্মের (double stars) স্বরূপানুসন্ধান এবং তাহাদিগের পরিমাণ নির্ণয়, (ঙ) নক্ষত্রের উজ্জলতার পরিমাণ নির্ণয় এবং (চ) উহাদের ছায়াচিত্রাদি (Photograph) কি প্রকারে গ্রহণ করিতে হয়, এই সকল প্রক্রিয়াত্মক জ্যোতিষের অন্তর্গত।

(ক) জ্যোতিষ্ক পদার্থদিগের স্থান নিরূপণ, অর্থাৎ উহারা কখন কোথায় অবস্থিতি করিতেছে তন্নিরূপণ, প্রথমেই আবশ্যক, কারণ, উহা হইতেই তাহাদিগের গতিবিধি কি ভাবে, কত দ্রুত হইতেছে তাহা জানিতে পারা যায়। গতি হইতেই আবার উহাদিগের গুরুত্ব বা ওজন গণনায় সিদ্ধ হইয়া মাধ্যাকর্ষণের স্বরূপাদি অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়।

নক্ষত্রেরা পরস্পরের সম্বন্ধে অচল, ইহা পুরাকাল হইতে বিদিত আছে। সুতরাং উহাদের স্থানকেই জ্যোতিষ্‌ শাস্ত্রে মূল স্থান (basis of reference of position) ধরা হয়, অর্থাৎ উহাদিগের অবস্থানের সহিত তুলনা করিয়া, যে সব জ্যোতিষ্ক পদার্থের গতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের স্থান নিরূপণ করা হয়। কোন গ্রহের (রাশিচক্রে গমনশীল নভঃ পদার্থের) কোন এক বিশেষ সময়ে কোথায় স্থিতি জানিতে হইলে, কোন এক নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্র হইতে উহা কতদূরে ও ঐ নক্ষত্রের কোন্ দিকে আছে দেখিতে হয়; তাহা হইলেই ঐ গ্রহের স্থিতির নির্দ্দেশ করা হইল। অতএব নক্ষত্রগুলির স্থান নিরূপণ সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। মাধ্যাহ্নিক সমতলে (Plane of meridian) ঘুরিতে পারে এমন একটী ছোট দূরবীক্ষণ যন্ত্র ঠিক করিয়া বসাইতে পারিলে, উহা দ্বারাই নক্ষত্রসমূহের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। এইরূপে সমগ্র নক্ষত্রের বেধ (দর্শন) সামান্য পরিশ্রমসাপেক্ষ নহে। এক ব্যক্তি উত্তর গোলে (Northern Hemisphere) ৩২৪,১৯৮ সংখ্যক নক্ষত্রের নিরূপণ করিয়া, উহাদিগকে তালিকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐ তালিকাকে আরজিলাণ্ডরের তালিকা কহে (Argelander's Catalogue)। ছায়াচিত্র দ্বারা (photographic process) সমস্ত নভঃ পদার্থের স্থান নির্ণয় করিতে পারা যায়, এমন উপায় সকল বিগত ১৫ বৎসর হইতে ক্রমশঃ উদ্ভাবিত হইতেছে।

জর্ম্মান্ জ্যোতির্ব্বিদ্ বেসেল্ (Bessel) সাহেব (১৭৮৪ খৃঃ অব্দ—১৮৪৬ খৃঃ অব্দ) নক্ষত্রসমূহের বেধ ও উহাদের স্পষ্টীকরণ (অর্থাৎ যেখানে বা যে সময়ে চর্ম্মচক্ষু দ্বারা উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, তন্নির্ণয়) করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তই এখনও সকল জ্যোতির্ব্বিদেরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাকেই প্রক্রিয়াত্মক জ্যোতির্ব্বিদের অগ্রগণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

(খ) আকাশের যে কোন দিকেই হউক সহজে ঘুরাইতে পারা যায়, এমন একটী বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা চন্দ্র, সূর্য্য এবং গ্রহাদির বিষয় অবগত হওয়া যায়। চন্দ্র এবং গ্রহাদির বিষয়ে আমাদের বর্ত্তমান যে সমস্ত জ্ঞান, তাহা এইরূপ দর্শন দ্বারা জানা গিয়াছে। সূর্য্যের বিষয় সূক্ষ্মরূপে অবগত হইবার জন্য এখন স্পেক্ট্রসকোপ (Spectroscope) যন্ত্রের বিশেষ ব্যবহার হয়।

(গ) ধূমকেতু নিরীক্ষণ করিতে হইলে, ছোট একটী দূরবীণ এমন হওয়া চাই, যাহাতে লক্ষ্য পদার্থ বেশী বড় না দেখায়। ঐ দূরবীণকে আবার এমন করিয়া বসান চাই, যেন উহাকে প্রয়োজনমত যে কোন দিকে ঘুরাইতে পারা যায়। সমস্ত বৎসরের তন্ন তন্ন অনুসন্ধানের ফলে, চারটী কিম্বা পাঁচটী ধূমকেতু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। স্বল্পমাত্র বিষয় জানিতে হইলেও মানুষকে কত পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাই এই ব্যাপারে মনে হয়।

(ঘ) যমক নক্ষত্র বা নক্ষত্র-যুগ্মের (Double Stars) অনুসন্ধান ও উহাদের পরিমাণ নির্ণয়। লক্ষ পদার্থ অত্যন্ত বৃহৎ দেখায়, এমন একটী বড় দূরবীণের সাহায্যে, এই কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। এই কার্য্য কিছু সময়সাপেক্ষ। নিরূপিত হইবার পর, সেইগুলির সম্বন্ধ আলোচনা করিলে, অনেক অপূর্ব্ব তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। ইহাদিগের গতি বিধি দেখিলে স্থির প্রমাণিত হয় যে, মাধ্যাকর্ষণ আমাদের দৃশ্য-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই একভাবে কার্য্য করিতেছে। নক্ষত্র-যুগ্ম বা যমক সঙ্ঘের পরিমাণ, সূর্য্যের পরিমাণের ন্যায় নির্ণয় করিতে পারা যায়, আর ইহা হইতেই জানা গিয়াছে যে, নক্ষত্র সমূহের মধ্যে এমন এমন নক্ষত্র আছে, যাহারা আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা অনেক বড়।

(ঙ) নক্ষত্রাদির উজ্জলতার ন্যূনাধিক্য দেখিয়া, রূপ-পরিবর্ত্তক বা অস্থিরজ্যোতি নক্ষত্র সমূহের (Variable stars) অনুসন্ধান করা হইয়াছে। এই অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে অনেক স্থলে একটী জ্যোতিঃসম্পর্কহীন সূর্য্য (Dark Sun) এবং একটী উজ্জ্বল সূর্য্য (Bright Sun), পরস্পরের গুরুত্ব-কেন্দ্রের (Centre of gravity) চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে বলিয়াই, ঐরূপ প্রতীয়মান হয়।

(চ) ড্রাই প্লেটের (Dry plate) সাহায্যে নভোমণ্ডলের ছায়াচিত্র গ্রহণ প্রক্রিয়ার অনেক উন্নতি করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা কত শত অল্প জ্যোতিষ্মান্ ধূমকেতু, ক্ষীণজ্যোতি নীহারিকা ও নক্ষত্রনিচয়ের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে।

অনুমানাত্মক জ্যোতিষ।—কতকগুলি প্রধান গ্রহ নক্ষত্রাদির বেধ দ্বারা গ্রহাদির কক্ষ গণনা, উহাদের স্ফুটগণনা এবং যে শক্তি বা পদার্থের দ্বারা প্রতিহত হইয়া গ্রহাদির গণনালব্ধ স্থানের কখন কখন পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার অনুসন্ধান, গ্রহকক্ষের শোধন ইত্যাদি এই বিভাগের অন্তর্গত। ইহার আলোচনায় গণিত শাস্ত্রের বিশেষ জ্ঞান থাকা চাই এবং গণনা-পদ্ধতির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। গণনাগুলিও অতি দীর্ঘ ও পরিশ্রম-সাপেক্ষ। এই সমস্ত গুরুতর গণনকার্য্য বড় বড় শাসনকর্তাদিগের আজ্ঞাতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহাদির স্থান এবং গ্রহণ ইত্যাদির গণনা ও পঞ্চাঙ্গ নির্ণয় (পঞ্জিকা করা), এই বিভাগের অন্তর্গত।

জ্যোতিষ্কি-কলা-শাস্ত্র।—যখন কোন বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধিক উন্নতি হয়, তখন উহার অন্তর্গত ঘটনাগুলির মধ্যে এমন নিয়ম সকল পরি-লক্ষিত হয়, যদ্দ্বারা কোন সময়ের ঘটনা দেখিয়া, ভবিষ্যতে উক্ত প্রকার ঘটনা কখন হইবে বা অতীতকালে সেইরূপ ঘটনা কখন হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ—কোন একটী জিনিষ অত্যুচ্চ স্থান হইতে নীচে পড়িতেছে। পতন কালে ঐ পদার্থ কোন এক সময়ে জমী হইতে কত উচ্চে রহিয়াছে ও কত দ্রুত জমীর দিকে আসিতেছে তাহা জানিতে পারিলে, পতন কার্য্য সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে কোন বিশেষ সময়ে উহার সংস্থান ও গতি কি হইবে, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি কেননা পদার্থ সমূহের পতন যে নিয়মে সংঘটিত হয়, তাহা আমাদের জানা আছে।

কিন্তু ধর, যদি কোন অজ্ঞাত ফুলের বীজ দেওয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার বর্ণ কি হইবে—যদি আমাদের বলিতে হয়, তাহা আমরা বলিতে পারিব না; কেননা এ বিষয়ের স্বাভাবিক নিয়মগুলি আমরা বিদিত নহি।

যাবতীয় ভৌতিক পদার্থের গতি কি ভাবে হয়, তাহার নিয়ম নিউটন সাহেব (Newton) দুই শতাব্দী পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই নিয়মের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে, কেবল পার্থিব পদার্থ নহে, আকাশস্থ চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহাদিরা মাধ্যাকর্ষণের বশীভূত হইয়াই পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। সুতরাং এই সমস্ত পদার্থের (কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য) স্থান, গতি, আকৃতি, পরিমাণ যদি জ্ঞাত হওয়া যায়, ভবিষ্যতে

উহাদের পরিমাণ ইত্যাদি কত হইবে, গণিতের দ্বারা তাহা অনায়াসে নির্ণীত হইতে পারে। এই সমস্ত বিষয় জ্যোতিষ্কি-কলা-শাস্ত্রের অন্তর্গত। ইহা দ্বারা প্রথমতঃ, বিমানচারী জ্যোতিষ্ক সকলের ভবিষ্যৎ অবস্থা ও পরিবর্ত্তনাদি বলিতে পারা যায় এবং দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ মূল সূত্রগুলির সত্যাসত্যও নির্ণীত হয়। সাধারণ মূল সূত্রগুলি জানিয়া তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে গিয়াই নেপচুণ (Neptune) আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইয়ুরেণস্ গ্রহের গতির গণনাপ্রাপ্ত স্থান হইতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখিয়াই আডাম্‌স এবং লেভেরিয়ার (Adams and Leverier) সাহেবদ্বয় একই সময়ে কঠোর গণিত প্রক্রিয়া দ্বারা বুঝিয়াছিলেন যে, আকাশের এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে কোন এক অজ্ঞাত গ্রহ থাকার জন্যই, ইউরেনস্ গ্রহের গতির উক্ত প্রকার পার্থক্য হইতেছে। তাঁহাদের এই অনুমানের সাহায্যে আকাশমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে ইহার অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই গেল সাহেব নেপচুণ গ্রহ দেখিতে পান। আরও এই জ্যোতিষ্কি-কলা-শাস্ত্রের সহায়ে আমরা এমন সকল বিষয় জানিতে পারিয়াছি, যাহা প্রত্যক্ষ দর্শনাদি দ্বারা কখনও জানিতে পারি নাই। পৃথিবীর অভ্যন্তর যে অতি কঠিন এবং ঘন ইহা প্রত্যক্ষতঃ জানা যায় না। উক্ত কলা-শাস্ত্রের অন্তর্গত জোয়ার ভাটার নিয়ম, অয়নের পুরোগমনের নিয়ম (precession of equinoxes) এবং পৃথিবীর স্বীয় অক্ষের চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণনের নিয়ম হইতে উক্ত বিষয় যে ঠিক, তাহা জানা যাইতে পারে।

জ্যোতিষ্কি-পদার্থ-বিজ্ঞান।—স্পেক্‌ট্রস্কোপ (Spectroscope) যন্ত্র দ্বারা জ্যোতিষান্তর্গত এই বিভাগের আবিষ্কারে অত্যাশ্চর্য্য ফললাভ হইয়াছে। কোন্ কোন্ দ্রব্যের রাসায়নিক সংযোগে সূর্য্যমণ্ডল নক্ষত্রমণ্ডলাদি গঠিত, নক্ষত্রালোক ভূতলে আসিতে কত বৎসর লাগে, নভস্থ জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ সমূহের মধ্যে কোন্‌গুলি বাষ্পীয় ও কোন্‌গুলি কঠিন, উহাদের উত্তাপ কত, এই সব উক্ত পদার্থ-বিজ্ঞান হইতে জানা যায়। আরও নভস্থ জ্যোতিষ্মান নক্ষত্রবিশেষের দিকে আমাদিগের সূর্য্য কত দ্রুত গতিতে ধাবিত বা অপসৃত হইতেছে (পিছাইয়া পড়িতেছে), তাহাও এই জ্যোতিষ্কি-পদার্থ-বিজ্ঞান হইতে জানা যায়।

জ্যোতির্ব্বিদ্ গণের অশেষ পরিশ্রমের ফলে যে সকল জ্যোতিষ্কি তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত রত্ন পাওয়া গিয়াছে তাহার কতকগুলি সংক্ষেপতঃ নিম্নে লিখিত হইল :—

১। গ্রহাদির গতি।—আমাদের এই পৃথিবী প্রায় গোলাকার; ইহা স্বীয় অক্ষের চতুর্দ্দিকে এক অহোরাত্রে একবার মাত্র পরিভ্রমণ করে এবং সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে এক বৎসরে একবার পরিক্রমণ করে। দীর্ঘবৃত্ত-কক্ষে (Ellipse) ইহা পরিভ্রমণ করে; এই কক্ষের এক নাভিতে (Focus) সূর্য্য অবস্থান করে। সূর্য্যকেন্দ্র আর ভূকেন্দ্র যোগ করিলে যে রেখা হয়, উহা সমান সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল অঙ্কিত করে। অর্থাৎ অদ্য বেলা ৯টা হইতে ১০টার ভিতর সূর্য্যকেন্দ্র ও ভূকেন্দ্র যোগলব্ধ রেখা দ্বারা যে ক্ষেত্রফল লাভ হয়, অন্য কোন দিনেও ঐ এক ঘণ্টার মধ্যে ঐ রূপ করিলে ঠিক সেই ক্ষেত্রফল লাভ হইবে। অন্যান্য গ্রহের যে গতি, তাহা পৃথিবীর ন্যায়ই জানিবে; তবে উহাদের ভগন কাল (এক নক্ষত্র হইতে যাত্রা করিয়া পুনরায় সেই নক্ষত্রে আসিতে যে সময় লাগে) ভিন্নভিন্ন। এই তত্ত্বগুলি হইতেই নিউটন্ মাধ্যাকর্ষণ বাহির করিয়া গিয়াছেন।

মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম এই যে, প্রত্যেক পরমাণু অন্য পরমাণুকে উভয়ের পরিমাণের বা ওজনের (mass) গুণফল অনুযায়ী এবং উভয়ের মধ্যের দূরত্বের বর্গফলের উৎক্রমানুযায়ী (inversely) আকর্ষণ করে। সূর্য্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে (Solar System) এই নিয়মের সত্যতার যত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, এত প্রমাণ আর কোন নিয়মের পাওয়া যায় নাই। শুধু সূর্য্য সম্প্রদায়েই যে এই নিয়মের কার্য্য দৃষ্ট হইতেছে তাহা নহে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও এই নিয়ম সমভাবে কার্য্য করিতেছে, এবিষয়ে অনেক যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যেখানে কোন পদার্থ আছে, আর উহার গতি আছে, সেইখানেই এই নিয়মের কার্য্য হইয়া থাকে। যদি কেহ কখন কোথাও এই নিয়মের বিপর্য্যয় প্রমাণ করিতে সক্ষম হয়েন, সেই দণ্ডেই তিনি আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষের ভিত্তি পর্য্যন্ত চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতে পারিবেন।

২। সূর্য্য।—সূর্য্য একটী অতি বৃহৎ, অত্যুষ্ণ, গোলাকার পদার্থ। ইহার অন্তর্দ্দেশে তরল বা তদপেক্ষা ঘন বা সম্ভবতঃ কঠিন পদার্থ থাকিলেও, বহির্দ্দেশ গ্যাস পদার্থের আবরণে আবৃত। গ্রহেরা স্বীয় স্বীয় কক্ষে যে দিকে পরিক্রমণ করে, সূর্য্যও সেই দিকে স্বীয় অক্ষের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। স্পেক্‌ট্রসকোপ যন্ত্রের সাহায্যে জানা গিয়াছে যে, সূর্য্যের

নিম্নমণ্ডলে (Lower atmosphere) লৌহবাষ্প, ক্যালসিয়ম্ (Calcium), সোডিয়ম্ (Sodium) এবং অন্যান্য ত্রিশটী পার্থিব মূলধাতুর (elements) বাষ্প আছে। এই সৌর পদার্থ এবং উহার পরিবারবর্গ-স্বরূপ গ্রহাদিতে যে সব মূলধাতু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে তুলনা করিয়া দেখিলে খুব অনুমিত হয় যে, সূর্য্য ও সূর্য্যের পরিবারবর্গ এক বস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রতিদিন সূর্য্য হইতে যে প্রকার আলো এবং উত্তাপ নির্গত হইতেছে, তাহাতে সূর্য্যের শক্তির হ্রাস দিন দিন হইয়া আসিতেছে। যতই শক্তি সূর্য্যেতে সঞ্চিত থাকুক না কেন, কালে ঐ শক্তির যে সমস্ত নিঃশেষ হইবেই হইবে, তাহা বুঝিতে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের বাকী নাই। আভ্যন্তরিক পরমাণু সমূহের সঙ্কোচে, এবং সূর্য্যে যে অসংখ্য উল্কাপাত হয়, তাহাদের সংঘর্ষে ঐ ক্ষতির কিয়ৎপরিমাণে পূরণ হইলেও, হ্রাসের তুলনায় এই বৃদ্ধির পরিমাণ অতি অল্প। এই সমস্ত ব্যাপার হইতে অনুমান করা যায় যে পূর্ব্বকালে সূর্য্যের পরিমাণ আরও অধিক ছিল।

৩। **নক্ষত্র।**—এক একটী নক্ষত্র এক একটী সূর্য্য। উহারা এত দূরে অবস্থিত যে, ছোট ছোট হীরক খণ্ডের ন্যায় দেখায়। আরও উহাদের বাস্তবিক গতিও আমাদের নিকট এতই সামান্য প্রতীত হয় যে, উহাদিগকে যেন অচল বলিয়া বোধ হয়। নক্ষত্রগুলি যে আমাদের নিকট হইতে কত অধিক দূরবর্ত্তী, তাহা এই একটী কথা হইতেই বুঝা যাইবে যে, যে নক্ষত্রটী আমাদের অতি নিকটবর্ত্তী, উহা পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব অপেক্ষা ২৭৫,০০০ গুণ অধিক দূরবর্ত্তী। অন্যান্য নক্ষত্র আরও অধিক দূরে স্থিত। এমন কি, কোন কোন নক্ষত্রের আলোক পৃথিবীতে আসিতে শত বৎসর অতিবাহিত হয়।

আকাশ পথে যে অসংখ্য নক্ষত্র-পুঞ্জ একত্রিত দেখা যায়, উহাকে আকাশ-গঙ্গা বা মন্দাকিনী (Milky way) কহে। তাহারা নানা দিকে ভ্রমণ করিতেছে এবং এক সেকেণ্ডে তাহাদিগের গতি একশত মাইলেরও অধিক। স্পেক্‌ট্রস্‌কোপ দ্বারা জানা গিয়াছে, যে, সূর্য্যের মধ্যে যে সকল মূলধাতু (element) আছে, নক্ষত্র সকলের মধ্যেও তাহার অনেক গুলি বর্ত্তমান। নক্ষত্র-গুলি আমাদের সূর্য্যের ন্যায় পৃথক্ অবস্থিত নহে! প্রায়ই যুগ্মভাবে কিম্বা

আরও অধিক সংখ্যাতে একত্রিত থাকে, কিম্বা যে সব নক্ষত্রের পরিমাণ নির্ণীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সূর্য্য অপেক্ষা অনেক বড় আর কতকগুলি সূর্য্য অপেক্ষা ছোট। সূর্য্য হইতে যত আলোকের উদ্গম হয়, তদপেক্ষা শত গুণ অধিক আলো অনেক নক্ষত্র হইতে উদ্গত হইতেছে।

৪। নীহারিকা।—ইহারা গ্যাসাত্মক পদার্থ। আকাশের চতুর্দ্দিকে ইহারা বিক্ষিপ্ত আছে। ইহাদের আয়তন, নক্ষত্রের আয়তন অপেক্ষা কোটী কোটী গুণ অধিক। ইহাদের আকার অনেক প্রকার হয়। ইহাদের কতকগুলি কোন কোন নক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে বায়ুমণ্ডলের ন্যায় অবস্থিত, কতক-গুলি বৃহৎ বৃহৎ সর্পিলের (Spiral) ন্যায় জড়ান জড়ান। কতকগুলি অতি ক্ষীণ ও ছিন্ন ভিন্ন এবং কতকগুলি লম্বা লম্বা, কৃষ্ণ দাগের ন্যায় প্রতীত হয়।

৫। জ্যোতিষ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ বা অভিবৃদ্ধি মত।—আজকাল অনেকের বিশ্বাস যে, একটি নীহারিকা, সম্ভবতঃ একটি সর্পিল নীহারিকা হইতে, সূর্য্য সম্প্রদায়ের বিকাশ হইয়াছে। এই মত এখনও সাব্যস্ত হয় নাই, তবে বুদ্ধি এবং কল্পনা, এই মত পোষণার্থে, সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হইতেছে। এই মত স্থাপনার্থ এমন অনেক অদ্ভুত ঘটনার অনুমান ও কল্পনা করা হইয়াছে যে, তাহাদের তুলনায়, একটি মহাদ্বীপের (Continent) সৃষ্টি একটী সামান্য ঘটনা মাত্র। তত্ত্বান্বেষিগণ দেশকালের বাধা একেবারে না মানিয়া, অতি সাহসের সহিত অনুমান পক্ষ সহায়ে, জগতের মূল তত্ত্বের অন্বেষণে ধাবমান হইয়াছেন। নীহারিকা হইতে যে সূর্য্য সম্প্রদায়ই কেবল মাত্র হইয়াছে, তাহা নহে; যাবতীয় নভঃ পদার্থ এই নীহারিকা হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারও প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইতেছে। বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইতেছে যে, কেমন করিয়া নীহারিকাবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থার বিকাশ হইয়াছে এবং কোটী বৎসর পরে কি অবস্থা দাঁড়াইবে, তাহারও নিশ্চয় করিয়া বলিবার প্রয়াস হইতেছে।

অবশ্য এই বিষয় অতি জটিল এবং গুরুতর, কিন্তু আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, একবার যদি কোনরূপে ঐ মত প্রমাণিত হয়,

তবে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তির মীমাংসা সরল হইয়া যাইবে। কারণ, তখন বুঝা যাইবে যে, একই আকার এবং একই পদার্থ হইতে দৃষ্টিগোচর যাবতীয় আকার ও পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। যাবতীয় পদার্থের বিশেষ আলোচনা দ্বারা উক্ত মতের সত্যতা যতই স্থিরীকৃত হইবে, ততই সূর্য্যমণ্ডল, সূর্য্যসম্প্রদায়, নক্ষত্রমণ্ডল, এবং নীহারিকা সমস্তই এক পদার্থের বিকাশ বলিয়া প্রমাণিত হইয়া, 'একমেবাদ্বিতীয়মেব' প্রতিধ্বনি করিতে থাকিবে।

৬। জ্যোতিষ শাস্ত্র আমাদের কি কাজে লাগে ?—বর্ত্তমান সময়ে অনেকের ধারণা যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্যোতিষ শাস্ত্র আমাদের কোন কাজেই লাগে না। এই ধারণা বিষম ভুল, প্রতি দিন যে আমাদের সময় নিরূপিত হয়, তাহা এই জ্যোতিষ শাস্ত্রের ফলে। এই সময়ের নিরূপণ না হইলে রেলগাড়ী নিরাপদে চালান যায় না; সমুদ্রে জাহাজ নিরাপদে যাইতে পারে না। প্রদেশের সীমা ঠিক ঠিক চিহ্নিত করিতে পারা যায় না; এমন কি, ইহার সাহায্য ব্যতীত গতিবিজ্ঞান (Dynamics) শাস্ত্রের মূল নিয়ম গুলিও উদ্ভাবিত হইত না। জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানের বৃদ্ধি ইহার আর একটী সুফল। পূর্ব্বে লোকের জ্ঞান যে অতিশয় সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা এই জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনায়ই, বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীনদিগের মতে পৃথিবী একটা সমতল চেপ্‌টা জিনিষ, এবং সূর্য্যসম্প্রদায়ের কেন্দ্রে এই পৃথিবী অচল ভাবে অবস্থিত; সূর্য্য যেন একটী চক্‌চকে ধাতু পাত্র। বর্ত্তমান ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। হিপার্কস্, টালেমি, টাইকোব্রাহী, কোপার্ণিকস্ কেপ্‌লার এবং নিউটন ইত্যাদি মহাত্মাদিগের অধ্যবসায়ে, আমাদের ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধী জ্ঞান এতদূর পরিবর্ত্তিত ও বৃদ্ধি হইয়াছে।

শান্তি।

[শ্রীগিরীশ চন্দ্র ঘোষ।]

যিনি যত বড় নাস্তিকতা প্রকাশ করুন, যতই তর্ক করিয়া ঈশ্বর উড়াইয়া দেন, রোগ, শোক, বিপদ, মৃত্যুভয় পরিপূর্ণ সংসারে, তাঁহার একবার না একবার একটা ঈশ্বরের প্রয়োজন হয়। যখন কোন বলবান্ শত্রুর তাড়নায় ব্যাকুল

হন, তখন তাঁহার একটা শত্রুদমনকারী ঈশ্বর থাকিলে ভাল হয়। নিজের বা স্ত্রীপুত্রের অথবা আত্মীয়ের অতি সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সময় বৈদ্য ঈশ্বর খোঁজেন। ঈশ্বর থাকিলে ভাল হইত, একথা অতি দুষ্কর্ম্মান্বিত নাস্তিককেও একবার না একবার বলিতে হয়। ঈশ্বর নাই অথবা যদি থাকেন, তাঁহাকে জানা যায় না, তিনি দুর্জ্ঞেয়—এ সকল তর্ক বিতর্ক বিদ্যাভিমানে দার্শনিক পুস্তক লিখিবার সময় বা দার্শনিক তর্ক বিতর্ক সভায় একরকম চলে, কিন্তু সাংসারিক একটা কঠিন ফাঁকে পড়িয়া, যে সকল কথা মুখে বা পুস্তকে তর্ক পাঁতি রূপে শোভা পাইয়াছিল, সে সকল তাঁহার শান্তিহীন হৃদয়ে ততটা শোভা বিকাশ করে না, সে সময় তাঁহার ঈশ্বর বিরোধী তর্কের তত জোর থাকে না। সংসার-পাকে ঘূর্ণায়মান হইয়া তাঁহার নিজের বুদ্ধিমত্তার তত প্রশংসা নিজে করেন না।

মহাকৌশলী পরপীড়ক একবার না একবার বুঝিতে পারে যে, তাহার কৌশল বিফল করিবার জন্য একটা শক্তি কার্য্য-কারণ-প্রবাহে চলিয়া আসিতেছে, যাহাতে তাহার অতি সুকৌশলও বিফল হয়। যিনি আপনাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনে করেন, যিনি ভাবেন,—চেষ্টার দ্বারা সকল কার্য্য সফল করিব এবং অনেক কার্য্যই সফল করিয়া আসিয়াছেন, তিনিও অনেকবার দেখিতে পান যে, তাঁহার চেষ্টার অতিরিক্ত অপর কোনও শক্তির দ্বারা তাঁহার অধিকাংশ কার্য্যই সুসম্পন্ন হইয়াছে। যদি কখনও গুরুতর বাধা প্রাপ্ত হন, তখন দেখেন যে, তাঁহার গণনা-তীত কোন বিঘ্নকারী শক্তি তাঁহার চিরসফল চেষ্টা বিফল করিয়া পূর্ব্ব চেষ্টার্জ্জিত ফল সকলকেও বিনষ্ট করিয়াছে। ইষ্ট বা অনিষ্ট শক্তি নিয়তই সংসারে প্রবাহিত হইতেছে, ইহা যিনি দেখিতে না পান, তিনি সংসার ক্ষেত্রে নিদ্রাবস্থায় চলিতেছেন। এ অদৃষ্ট শক্তি কোথা হইতে আসে, তাহা তিনি স্থির করিতে অসমর্থ; কিন্তু এ শক্তি রহিয়াছে, সর্ব্বত্র বিরাজমান, ইহা অস্বীকার করিবার তর্ক আজিও সৃষ্টি হয় নাই।

এই ইষ্টানিষ্ট শক্তির দ্বারা প্রতি জীবনই চালিত। এ শক্তি রোধ করিবার উপায় নাই। সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ না হইলে রোধ করা অসম্ভব,—এটা কি? যখন সে শক্তি অনিষ্টরূপে সন্মুখে উপস্থিত হয়, তখন বোধ হয়, যেন নর অহিতকর কোন দানবীয় শক্তি, আবার যখন হিতকারী হইয়া সেই শক্তি উদয় হয়, তখন তাহা দেবশক্তি বলিয়া বোধ হইতে থাকে। প্রতি জীবনে এই দেব-দানবীয় দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এই দেব-দানবীয় শক্তির প্রতি দৃষ্টি পড়িলে,

আপনাকে অতি দুর্ব্বল বলিয়া প্রতীতি হয়। এই টানাটানিতে কোনরূপে নিস্তার নাই, নিশ্চিন্ত হওয়া অসম্ভব। চারিদিক আঁটা আঁটী করিয়া অনেক সময় দেখা যায়, বজ্র আঁটুনিতে ফস্‌কা গেরো পড়িয়াছে।

তবে উপায় কি? চিরদিন কি চিন্তায় যাইবে? এই চিন্তার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অনেক প্রকার উপায় নির্দ্ধারণের চেষ্টা হইয়াছে। এক মতে যখন উপায় নাই, আজ ত আমোদ করি, কাল যা হয় হইবে। এ কথা সু সময়ে সহজ। 'হাঁ বাবা এই ঠিক!" সু সময়ে এই কথা বলিয়া অনেকেই দম্ভ করিবেন, কিন্তু একটু কুবাতাসে তাঁহাকেই চঞ্চল করিয়া তুলিবে। কেহ বলেন, "এ পাগলের মত, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া না চলিলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী ও কথাই নয়, বুদ্ধি আছে, বিদ্যা আছে, হিতাহিত জ্ঞান আছে, এমন করিয়া চলো যাহাতে ভবিষ্যতে দুঃখ পাইতে না হয়।"—এও সুসময়ের কথা।—তেমন ঝড় ঝাপ্‌টা লাগে নাই, তেমন বুদ্ধিবিদ্যা ওলট পালট করে নাই, তেমন হিতাহিত জ্ঞান বিঘূর্ণিত হয় নাই। কি করিব, কি হইবে, এমন অবস্থা নয়, এ বিজ্ঞতা এই সময়েই শোভনীয়। বিঘ্নকারী শক্তির সম্মুখে এ বিজ্ঞতা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। আর একটী পরকে উপদেশ দিবার মত ভাসা ভাসা মত এই, 'আরে ভাই, ভেবে আর কি করিবে, সংসারে সুখ দুঃখের হাত কে এড়াইবে?" কিন্তু এই সকল উপদেশ বাক্য যাহার উপর প্রয়োগ হয়, তিনি মুখ ফুটিয়া কিছু না বলুন, অন্ততঃ মনে মনে করেন,—ও সব কথা জানি বাবা। আমিও অনেক ঝেড়েছি, বহু চেষ্টায় অর্থ সংগ্রহ করিয়া ব্যাঙ্কে রাখিয়াছিলাম, ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে। বহুযত্নে পুত্রটীকে মানুষ করিয়াছিলাম, যথেষ্ট দুপয়সা রোজগারও করিতেছিল, ঘোড়ায় চড়িয়া কোন একটা তদারকে যাইতে যাইতে, ঘোড়াটা হঠাৎ হোঁচট খাওয়ায়, সেই ছেলেটী পড়িয়া মরিয়াছে। আজীবন স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়া আসিতেছি, এখন বয়স হইয়াছে, একটা না একটা অসুখ ছাড়ে না, দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছি, বোধ হয় এবার সে পুরাতন পীড়া বল করিবে, কেহ দেখিবার লোক না থাকায় বিঘোরে মারা যাইব। তুমি তো বলিলে, সংসারে সুখ দুঃখের হাত এড়ান যায় না, তুমি তো বলিলে ভাবিয়া কি করিব, ভাবনাটা তাড়াইয়া দাও। কত দিন না ভাবিয়া তোমার কাটিতেছে জানি না।

মানব জীবনে এই শোচনীয় অবস্থা নিবারণের উপায় আর এক সম্প্রদায় করে। তাহাদের মীমাংসা নিতান্ত অযৌক্তিক। প্রমাণ নাই, কিছু নাই, একটা ঈশ্বর

ধরিতে বলে। ওটা দুর্ব্বলতা মাত্র, আর কিছু না। ওটা বালকের শান্তিপ্রদ বা বয়ঃজনিত নিস্তেজমস্তিষ্ক মৃত্যুভয়াকুল বৃদ্ধের তৃপ্তি। আমিও যে কখন কখন অমন একটা কথা বলিয়াছি, তাহা দুঃসময়জনিত দুর্ব্বলতা হেতু। বিচারশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানবান মনুষ্য এরূপ যুক্তিশূন্য কথার উপর নির্ভর করিয়া কদাচ নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। কি বালাই—বাতুল কি বলে। "মশায়, এ দুঃখ-সাগরে কি ঈশ্বর ব্যতীত উপায় আছে ?" বটে ? বাপু, তোমার ঈশ্বরটা কে ? কোথায় ? দেখাতে পারো—সে কিরূপ ?

হয়ত এই হীনবুদ্ধি সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন উত্তর করে,—"মহাশয়, ঈশ্বর কিরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? কিরূপ ঈশ্বর হইলে আপনার সুবিধা হয় বলুন ?" বিজ্ঞ উত্তর করেন,—"বাপুহে, বাঁচালে, বলো নি যে, তিনি মঙ্গলময়, নির্ব্বিকার, নিরাকার, শুদ্ধাত্মা, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান, কিম্বা একটা নুড়ি দেখাইয়া—যাহা অনায়াসে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া যায়,—ঐ সকল কথা যে বলো নাই, এ আমার ভাগ্য। যাও বাপু, তোমার অযৌক্তিক ঈশ্বর লইয়া তুমি ঘর করো, ওরূপ বাতুলতা আমার চলিবে না।"

বাতুলতা হইলে হইতে পারে, কিন্তু কথাটা বড় মধুর, কবি-কল্পনা ইহাঁ ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। কল্পনার সীমার কথা। যেরূপ ঈশ্বর আমার সুবিধা হয়, ঈশ্বর সেইরূপই, মজার কথা বটে। এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিলে, একটা বাতুলের তৃপ্তিলাভ করা যায়। তর্কবিতর্ক শেষ হইল, বাতুল বলিয়া অগ্রাহ্য করিলাম। নির্জ্জনে ঘরে বসিয়া আছি, এই বাতুলের কথাটা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি নাই। কথাটা বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হইবার ত কথা নয়। বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করিয়া থাকেন সত্য যে, অজানিত, অজ্ঞেয় একটা কিছু থাকিলে থাকিতে পারে। কিন্তু যেরূপ ঈশ্বর হইলে, আমার সুবিধা হয়, যেরূপ মনোহর, হৃদয়-তৃপ্তিকর ঈশ্বর হইলে আমার সকল জ্বালা নিবৃত্তি হয়, এমন যদি কেহ থাকে, তাহাকে পূজা করি। পূজা করি কি, সে পূজা টানিয়া লয়। এমন সখা ঈশ্বর পাইলে, আর চিন্তার কারণ কি ? কথাটা মিথ্যা, কিন্তু চিন্তায়ও সুখ আছে। বোধ হয়, সংসার-তাড়নায় ব্যাকুল হইয়া এইরূপ একটা শান্তিপ্রদ ভাব আনিয়াছে।

ভাল, যদি আমার মনের মত ঈশ্বর হয়, সে কি করে ? কেন, যাহাতে আমার দুঃখ হয়, তাহা নিকটে আসিতে দেয় না। আচ্ছা, কি আসিতে দেয় না ? কিসে কিসে দুঃখ পাইয়াছি ? কেন, দুঃখের কারণ সবই পড়িয়া

রহিয়াছে। কোন্‌টা দুঃখের কারণ নয়? তবে যদি এমন হয়, আমি অমর হই, আমার ধন-জনের অভাব না থাকে, আত্মীয় পরিবার সকলে থাকে, আমি যাহা মনে করি, তাহাই করিতে পারি, আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়,—কি মূর্খতা, এ কথা লইয়াও আন্দোলন করিতেছি!

আবার আহাম্মকেরা বলে, "ঈশ্বর লাভ—পরম লাভ। ইহা অপেক্ষা লাভ নাই।" ভাল, লাভটা কি, তাহা বুঝিলাম না। ঈশ্বর পাইলাম, তাহাতে কি হইল? এখানটা একরকম যুক্তি কবে মন্দ নয়। বলে, অনিত্য বস্তু চান্, অনিত্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন, ইহাতে দুঃখ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? আচ্ছা বাবা, যে সমস্ত অনিত্য জিনিস চাই, তুমি ত ঈশ্বর, সে সকল নিত্য ক'রে দাও না? মূর্খেরা বলে, কি জানো? তিনি ধন, তিনি জন, তিনি পুত্র, তিনি কলত্র, তিনি জীবন, তিনি শান্তি—সর্ব্বস্ব তিনি। হোক বাবা, যা হবার হোক, বড় যন্ত্রণা। চতুর্দ্দিকে তাড়না, এবার ওলাউঠা-মারীভয় বড্ড, সদাই মন ধুক্‌পুক্ কচ্ছে। এ সময়ে "ভয় কি্ বল্‌নেওয়ালা" থাকে, তবে তো বুঝি। বলে, 'তাইতো আছে।" ওরে নির্ব্বোধ, বল্‌ছিস্—ঈশ্বর, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা, একবার রাত্রে ছাদে উঠে দেখেছিস্ কি? ঐ যে অগণ্য তারা দেখ্‌তে পাচ্ছিস্, ও এক একটা পৃথিবী, এক একটা সূর্য্য। যে পৃথিবীতে বাস করিস্, ও পৃথিবীর তুলনায় একটী বালিকণা। যে সূর্য্য দেখিস্, ও সূর্য্য তা অপেক্ষা সহস্রগুণে বৃহৎ ও প্রভাময়—এই অনন্ত ব্যাপার। যদি ঈশ্বর বলিস্—এই সকলের ঈশ্বর। সে তোর কথায় তোর মনের মত হ'যে আস্‌বে? ঝুট্, পাগ্‌লা গারদে যা!

কিন্তু কথার একটা ভাব আছে। যদি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, আমার কথায় আমার মনের মত হইযা আইসে, সে একটা কি হয়! অনন্ত দয়া! বাবা, একটা বড়মানুষ—আমি কাকুতিমিনিতি কর্‌লেও ফিরে চায় না, কিন্তু ঈশ্বর আসে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা আসে, আমার মনের মত হ'য়ে আসে, আমার মন যোগাবার জন্য আসে!

পাগ্‌লামো কর্‌তে কর্‌তে একটা অনন্তের ভাব এনে ফেলেছে বটে! ভাব্‌তে ভাব্‌তে একরকম হ'যে যেতে হয়। এই যে কতকটা দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছে! ওঃ একটা জবর ভাব এনে ফেলেছে বটে! বলে, আমার মত মানুষ হয়, আমার কাছে আসে। তার আস্‌বার গরজ কি? না, আমি সুখী হব, আমি অনন্তকাল সুখে থাক্‌বো। ঈশ্বর থাকে আর এমনটা ঠিক হয়,

তাহা হইলে আর দুঃখ থাকে না। তবে কি একটা মিছা ভ্রান্তি নিয়ে থাক্‌বো বল, এ তো নয়! তবে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লে একটা সুখ বটে। ভাল, সুখই তো খুঁজি, টাকা, স্ত্রী পুত্র, যশ-মান—এ সব খুঁজেছি কেন, সুখের জন্ম নয়? একে তো পাওযাই কষ্ট, আবার পেয়ে সুখী নয়, কি জানি কখন এ সব যায়! কিন্তু এ বিশ্বাসে সুখ, এ বিশ্বাস রাখ্‌তে পার্‌লে সুখ, এ বিশ্বাস কেন আমার হৃদয়ে স্থির হ'যে বসুক না। তাহা হইলেই তো যাহা খুঁজি, তাহা পাইযাছি! তবে আয় বিশ্বাস আয! আমার হৃদয়ে দৃঢ় হ'য়ে ব'স। আমি সকল যন্ত্রণায় পরিত্রাণ পাই। আমি আজীবন সুখের অনুসন্ধান করেছি, শত যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছি, বিশ্বাস তোমায় ধর্‌তে পরি নাই—তাই যন্ত্রণা! এসো শান্তিময়, আমার হৃদয়ে ব'সো।

অধ্যাত্মবিদ্যা।

—:০:—

[স্বামীজির জৈনিক সেবক।]

মুণ্ডক উপনিষদেব আরম্ভেই ঋষি বলিতেছেন, ঋগ্বেদাদি সমুদয়ই অপরা-বিদ্যা; তাহাই পবা-বিদ্যা, যাহার দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়। ছান্দোগ্যে নারদ নানাবিদ্যাভ্যাসেও পরমজ্ঞান ও শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া সনৎকুমারের নিকট গিযা জিজ্ঞাসা কবিতেছেন, কিসে পরম শান্তি লাভ হয। গীতা, উপনিষৎসমূহেব প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন, 'অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং।' অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেব গ্রন্থকার গেটেও তাঁহার ফাউষ্টের (Faust) মুখে সকল বিদ্যার অপর্য্যাপ্ততা কীর্ত্তন করিয়া সেই পরা বিদ্যারই ইঙ্গিত করিযাছেন।

আমরা আজকাল পাশ্চাত্য জগতে বিদ্যাচর্চ্চার প্রবল আগ্রহ দেখিতে পাই-তেছি। সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস, দর্শনাদির চর্চ্চার ত কথাই নাই—এ সকল ত অনেকদিন হইতেই হইতেছে, কিন্তু কিছুদিন হইতে যে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নামক প্রণালীদ্বয়ের সহাযতায় সমগ্র জগতের তত্ত্ব জানিবার প্রাণপণ চেষ্টা হইতেছে, তাহাকেই আমরা এখানে লক্ষ্য করিতেছি। ইহার নাম Science—বাঙ্গলায় ইহার প্রতিশব্দ বিজ্ঞান করা হইয়াছে। যে নামই হউক, এই বিদ্যা দিন দিন যেরূপ

বিস্তৃত হইতেছে এবং ইহার সহায়তায় যে সকল অদ্ভুত অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাতে অনেকেই আশান্বিত হইয়াছেন যে, কালে ইহার উন্নতি-সহকারে সমুদয় জগৎসমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে।

বিজ্ঞানের সামান্য উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহা তথাকথিত ধর্ম্মসকলের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধর্ম্ম কতকগুলি বিশ্বাসসমষ্টিমাত্র—বিশ্বাসের আবার কোন প্রকার স্থিরতর ভিত্তি নাই। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাস্ত্রসহায় বিজ্ঞান দৃপ্ত হইয়া ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া বলিতেছে, কেন বালির ভিত্তির উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণের বৃথা চেষ্টা করিতেছ? উহা যে সামান্য বায়ুর আঘাতেই ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। নিবৃত্ত হও, অনিশ্চিতের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া বৃথা সময় নষ্ট করিও না—যাহা প্রত্যক্ষ, যাহার ফলাফল, যাহার নিয়মাদি সকলেই বুঝিতে পারে, তাহারই জন্য চেষ্টা কর। তাহাতেই কল্যাণ হইবে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানে এতদূর বিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহারা ধর্ম্মবাদীকে বলিতেছেন, তুমি যে সকল বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া কর,—বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিতে করিতে সেগুলি আবিষ্কৃত হইয়া যাইবে। অতএব যাহাতে বিজ্ঞানের উন্নতি হয়, তাহারই জন্য প্রাণপণ কর।

আজকাল বিজ্ঞানের এরূপ প্রবল প্রতাপ যে, যে সকল ধর্ম্মবাদী পূর্ব্বে শাস্ত্র-সঙ্গত বলিয়া নানাবিধ বিষয় একভাবে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা বাধ্য হইয়া সেই সকল বিশ্বাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করিতেছেন, কেহ কেহ বা বিজ্ঞানের প্রবল মুদ্গরাঘাতে ক্রমাগত হটিতে হটিতে আর দাঁড়াইবার স্থান না পাইয়া অস্থির হইয়া পড়িতেছেন, কেহ কেহ বা আবার জোর করিয়া প্রাচীন বিশ্বাসকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। কেহ শুধু নীতিবাদী হইয়াই ক্ষান্ত হইতেছেন, কেহ বা বলিতেছেন—জগতের যথাসাধ্য কল্যাণ কর—ইহাই পরম ধর্ম্ম।

এই ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধ ভঞ্জনের কেহ কেহ চেষ্টা না করিয়াছেন, এমন নয়, কিন্তু তাহাতে কতদূর সুফল হইয়াছে, তাহা অনিশ্চিত। আমরা এই প্রবন্ধে মোটামুটী ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের দাবি বিচার করিবার চেষ্টা করিব এবং কাহার কতদূর সীমা বা দৌড়, তাহাও বুঝিবার প্রয়াস পাইব।

বৈজ্ঞানিক কোথাও তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র বাকি রাখেন নাই। তিনি অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণাদির সহায়ে অনেক চর্ম্মচক্ষের অগোচর পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং আরো করিবেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায়। এতদ্ব্যতীত উহা দ্বারা যে

সকল নিয়ম আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার সহায়তায় অনেক অজ্ঞাততথ্যও আবিষ্কৃত হইবে নিশ্চয়। সেইগুলি দ্বারা আমাদের লৌকিক সুখবৃদ্ধি ও দুঃখহ্রাস এখনকার অপেক্ষা কোটীগুণে বৃদ্ধি হওযাও খুব সম্ভব। আর আমরা—অবৈজ্ঞানিক জাতি —যদি জাতীয় সংঘর্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে উন্নতি ত দূরের কথা, আত্মরক্ষাও যদি করিতে চাই, তবে আমাদিগকে বিশেষভাবে বিজ্ঞানচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতে হইবে, ইহাও নিশ্চিত।

কিন্তু আমাদের মনে এই এক গুরুতর প্রশ্নের উদয় হয় যে, ইহার দ্বারা আমরা কি চরম তত্ত্ব (ultimate truth) অতি সুদূরবর্ত্তী কালেও জানিবার আশা করিতে পারি? বিজ্ঞান কি একদিন আমাদিগকে মৃত্যুর পর পারের অবস্থায়, আত্মার স্বরূপাবস্থায়, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির উপায়ের সুনিশ্চিত সংবাদ দিবে? আমাদের নিশ্চিত ধারণা—বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হউক, কোটী কোটী বর্ষ পরেও উহা আমাদিগকে ও সকল বিষয়ে কোন আলোক দিতে পারিবে না—

এ ধারণার মূল কি?

দেখিতেছি, বিজ্ঞানের বিষয় ও যন্ত্র উভয়ই জড়। উহা মস্তিষ্ককে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিশ্লেষণ করিতে পারে, কিন্তু উহার মধ্যে সে আত্মা নামক বস্তুর কখনই সন্ধান পাইবে না—কারণ, আত্মা বলিয়া আমরা যে পদার্থের অনুমান করিতেছি, তাহা জড় নহে, জড়াতীত। বিজ্ঞানের জড়যন্ত্রসমূহ অনন্তকালই আত্মার সাক্ষাৎ না পাইয়া নিরস্ত হইবে—চিরকালই উহা জড়নিয়মাবলির মধ্যেই বৃত্ত অঙ্কিত করিবে। চলিত কথায় যেমন বলে,—থোড়বড়ি খাড়া ও খাড়াবড়ি থোড়—তদ্রূপ চিরকালই উহা জড় জগতেরই সংবাদ বহন করিবে—জড়েরই বিভিন্ন প্রকার সংহতি ও সন্নিবেশ, জড়েরই নূতন নূতন সংযোগের বিষয় আমাদের দৃষ্টির সমক্ষে উপস্থাপিত করিবে।

মানুষ যতই সুখলাভ করুক না কেন, কিছুতেই তাহার তৃপ্তি বা শান্তি হয় না —এই সামান্য তত্ত্বটী একটু সামান্য চিন্তাতেই বুঝা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটী সামান্য নহে, বড়ই গুরুতর তত্ত্ব। আমরা যতই অধিক চিন্তা করি, ততই এই বিষয়টী স্পষ্ট বুঝা যায়—আর ক্রমাগত ঠেকিয়া ত শিখিতেছিই। আর ইহাও দেখিতেছি যে, যদিও আমরা এই বিষয়টী প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছি, তথাপি যে কোন কারণেই হউক, আমরা এই তত্ত্বের আলোকে কার্য্য করিতে সকলেই কমবেশী অকৃতকার্য্য হইয়া থাকি। প্রত্যেক সুখ যে দুঃখপ্রসবকারী, ইহাও অতি স্পষ্ট—তথাপি আমাদের চৈতন্য হয় না কেন?

যাহা হউক, যদি এই সত্যটী অখণ্ডনীয় বলিয়া বুঝা যায়, তবে ইহাও স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হউক, উহা আমাদের চরম সুখ কখন দিতে পারিবে না। দেখিতেছিও যে, যতই সুখের নূতন নূতন উপাদান আবিষ্কৃত হইতেছে, ততই নূতন নূতন দুঃখও সৃষ্ট হইতেছে। আরও মানবমনের ধর্ম্মই এই যে, একটী সুখ পাইলে মানবমন তাহাতেই নিবৃত্ত হইয়া থাকিতে চায় না, আরও চায—কিন্তু যতই চায়, ততই আরো সুখস্পৃহা বাড়িতে থাকে। মানুষ সান্ত—সে অনন্তকে ধরিতে চায—কিন্তু ever approaching, but never nearing—(ক্রমাগত অগ্রসর—কিন্তু কাছে পঁহুছিতে অক্ষম) ইহাই তাহার অবস্থা দেখা যাইতেছে। যতই সে উন্নতি করুক, সে সেই অনন্ত হইতে ততই দূরে পড়িয়া থাকে।

এই ত মানুষের অবস্থা। এইরূপে অগ্রসর হইতে হইতে একদিন মানবের হৃদয়ে পূর্ব্বোক্ত সামান্য সত্যটী প্রবল বেগে আঘাত করে। মানুষ তখন অনুভব করিতে থাকে, এ পথে যতই অগ্রসর হইব, কিছুতেই ইহার শেষ পাইব না—এ পথে আমার উদ্দিষ্ট বস্তু মিলিবে না—অন্য পথ ধরিতে হইবে—বহির্দ্দেশে অন্বেষণের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্ম্মুখ হইতে হইবে—আত্মার দ্বারা আত্মার জ্ঞান লাভের চেষ্টা করিতে হইবে। এই অবস্থাকে সচরাচর বৈরাগ্য বলে—আর আমি ইহাকেই প্রকৃত ধর্ম্ম বা অধ্যাত্মবিদ্যালাভের আরম্ভাবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাই।

যাহাকে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা বলিতেছি, তাহার আলোচনায় বিজ্ঞানের পরিচিত পর্য্যবেক্ষণ ও পরিক্ষাপ্রণালীদ্বয়কে পরিত্যাগ করিতে হয় না—উহারাই উহারও একমাত্র সাধন—তবে উহার বিষয় ও যন্ত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অণুবীক্ষণাদি যন্ত্র দ্বারা মস্তিষ্ক দর্শনে আত্মদর্শনের কখনই সম্ভাবনা নাই—আত্মা দ্বারা আত্মার পর্য্যবেক্ষণ ও পরিক্ষা করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক আলোচনায় যেমন বহু বহু শতাব্দীব্যাপী অধ্যবসায়সহকৃত গবেষণার প্রয়োজন, এ অধ্যাত্মবিদ্যায়ও তাহাই। বৈজ্ঞানিকগণ যেমন সত্য আবিষ্কার করিয়া গেলে পরবর্ত্তিগণের তাহার উপর নির্ভর করিয়া সহজেই পরীক্ষা চলে, ইহাতেও তদ্রূপ; তবে বৈজ্ঞানিকের সহিত কতকগুলি বিশেষ প্রভেদ এই যে, প্রাচীন বৈজ্ঞানিক যে আবিষ্ক্রিয়াগুলি করিয়া গিয়াছেন, সে গুলি আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনায়াসে গ্রহণ করিয়া নূতন আবিষ্কারের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন—ধর্ম্মরাজ্যে কিন্তু নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইবার সম্ভাবনা নাই—যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, প্রত্যেককেই

সেইটী আবার পরীক্ষা করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। শুধু বিশ্বাস করিয়া বসিয়া থাকিলে তাহাতে ধর্ম্ম কিছুই হইবে না।

বিজ্ঞান সম্মার্জ্জনীর দ্বারা তথাকথিত ধর্ম্মসকলের আবর্জ্জনাভাগ বা গৌণ বিষয় সমূহ পুনঃ পুনঃ সম্মার্জ্জিত হউক—প্রকৃত ধার্ম্মিক তাহার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন। প্রকৃত ধার্ম্মিকের নিকট সকল ধর্ম্মমত খণ্ড খণ্ড করিতে পার, তিনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইবেন না—তিনি জানেন—যতই ঐগুলি প্রকৃত ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে, ততই উহা উজ্জ্বলতররূপে মহত্তররূপে নিজের মহিমায় প্রকাশিত হইবে। তিনি জানেন, ধর্ম্মের গৌণাঙ্গগুলিকে যতই নাশ করিবে, ততই নূতন নূতন আকারে উহাদের পুনরুত্থান হইবে কারণ, যে মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহারই রসে যেন সেইগুলি শাখা প্রশাখারূপে সঞ্জীবিত—ডালপালা কাটিয়া ফেল না কেন নূতন—নূতন ডাল পালা বাহির হইবে—কিন্তু মূলতত্ত্বে আঘাতের সাধ্য কাহারও নাই।

'অচ্ছেদ্যোঽয়ম দাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽ শোষ্য এব চ।'

এই অধ্যাত্মবিদ্যার স্বরূপ সম্বন্ধে যতটা আভাস দেওয়া গেল, তাহাতে বেশ বুঝা যাইবে ইহাতে লেখাপড়ার অপেক্ষা বড় নাই। অবশ্য অধ্যাত্ম-বিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠে ইহার কিছু সহায়তা হইতে পারে, কিন্তু ইহার প্রকৃত উপায় কেবল মনন—নিজে চিন্তা করা—আপনাকে আপনি জানিবার চেষ্টা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বাহ্যবিষয়জ্ঞান হইতে বিরত হইয়া আত্মাভিমুখী গতি না হইলে ঐ বিদ্যালাভের ইচ্ছাই হয় না। যদি কাহারো সৌভাগ্যক্রমে এই দিকে গতি হয়, তবে তাহার কি কি উপায়ে উহার সহায়তা হইবে, তাহা আর কাহাকেও বড় বলিয়া দিতে হয় না—তাহার ভিতর হইতেই সে ক্রমশঃ সমুদয়ই বুঝিতে পারে।

পূর্ব্বে যে অন্তর্ম্মুখী গতির কথা বলিয়াছি, তাহা কখন কাহার কিরূপে হয়, বলা যায় না। এই জন্যই শাস্ত্রাদিতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানাবিধ বিধান ও উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু এইটী বুঝিতে হইবে যে, যাহা যাহা এই মূলতত্ত্ব-স্বরূপ আত্মজ্ঞানলাভের সহায়তা করে, তাহাকেই ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে; যদি কিছু উহার বিরোধী হয়, তবে তাহা অধর্ম্ম বলিয়া পরিত্যজ্য। ধর্ম্মের এই কষ্টিপাথর। যাহা আত্মজ্ঞানের সহায়ক, তাহাই ধর্ম্ম। যে সকল কার্য্য করিলে এই চৈতন্যলাভের সহজে সম্ভাবনা, তাহাই ধর্ম্ম।

উপসংহারে উপনিষদের সেই মহতী বাণী—

'তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ'

'সেই একমাত্র আত্মাকে জান, অন্য অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর—ইহাই অমৃতত্ব লাভের একমাত্র সেতু'—উচ্চারণ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

পিট্সবর্গে বেদান্ত।

—(০ঃ)—

স্বামী বোধানন্দের বক্তৃতা।

(পিট্সবর্গ গেজেট টাইম্‌স, মার্চ্চ ৮, ১৯০৮ হইতে অনূদিত।)

খ্রীষ্টিয় মিশনারিরা যেমন প্রাণপণে ভারতের তথাকথিত 'হিদেন'দিগকে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার [illegible] পাইতেছেন, সেই সুদূর দেশের কয়েকটী ধর্ম্ম সম্প্রদায়ও তদ্রূপ উ[illegible] পা[illegible]য়া মার্কিনগণকে তাহাদের ভাব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া উহার প্রতিশোধ দিতেছেন—এটী একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

হিন্দুধর্ম্মের আপাতঃ [illegible] জটিলতা [illegible] বুঝিবার জন্য যেরূপ প্রবল বিশ্বাসের [illegible] (কেহ কেহ বলেন) উহার একটী রহস্যময় ভাব—এ[illegible] বা অতীব [illegible] স্বরূপ। হিন্দুধর্ম্ম-সম্প্রদায় [illegible] চরম সীমা বলিয়া দাবী করা [illegible] পরিচিত ধর্ম্মে যাহা কিছু [illegible] আছে বলিয়া কথিত হয়। বেদান্ত বলিলেই যদিও উচ্চতম দর্শন ও উচ্চতম কল্পনার আভাস মনে উদয় হয়, তথাপি কথিত হইয়া থাকে যে, ইহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য এবং সকলেরই তৃপ্তিপ্রদ।

খ্রীষ্টিয় মিশনরিগণকে ভারতবর্ষে যাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হয়, হিন্দু আচার্য্যগণ এখানে ঠিক তাহাই শিক্ষা দিতেছেন। যদিও পিট্সবর্গে পেন এভিনিউর নিকট ৭ম ষ্ট্রীটে সেঞ্চুরি বিল্ডিংএর একাদশতলে কিছুদিন হইতে

একটী বেদান্ত সমিতি রহিয়াছে বলিয়া অনেকেই জানে, কিন্তু এখানে কিরূপ দর্শন শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা বড় লোকে জানে না। আচার্য্যের নাম স্বামী বোধানন্দ—তাঁহাকে নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি হইতে এখানে পাঠান হইয়াছে। এখানকার স্থানীয় সমিতির মেম্বর সংখ্যা প্রায় ৪০। স্বামী বোধানন্দকে বেদান্ত সমিতির অর্থ এবং উদ্দেশ্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহা নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত করিলেন। যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'বেদান্ত হিদেনদের ধর্ম্ম কি না', তখন তিনি কোন উত্তর না দিয়া অল্প হাস্য করিলেন মাত্র।

বেদান্ত প্রাচীনত্বে, জ্ঞানের গভীরতায় ও সার্ব্বভৌমিকতায় অন্যান্য সকল ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়াছে। বেদান্ত দর্শন ও ধর্ম্ম উভয়ই। দার্শনিক বিচারে উহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা করে এবং ধর্ম্ম হিসাবে উহা ঈশ্বর উপলব্ধির কার্য্যকরী উপায়সমূহ প্রদর্শন করে। বেদান্ত দর্শন বেদান্ত ধর্ম্মের তাত্ত্বিক ভাগ এবং বেদান্ত ধর্ম্ম ঐ দর্শনের কার্য্যকারী [illegible]। উহা ভক্ত সাধক টমাস আ কেম্পিসকেও যেমন তৃপ্ত করিতে সমর্থ [illegible] উভয় তদ্রূপ আদৃত হইবার যোগ্য। মানুষ বিচারের দ্বারা যত [illegible] হইতে পারে, বেদান্তে তাহার চূড়ান্ত করা হইয়াছে।

বেদান্ত অর্থে বেদ অর্থাৎ জ্ঞানের অন্ত বা শেষ সীমা। বেদ হিন্দুর শাস্ত্র। প্রাচীনকালের ঋষিগণের নিকট মধ্যে মধ্যে যে সত্য ও জ্ঞানের প্রকাশ হইয়াছিল উহা তাহারই বিবরণ। সত্য একমাত্র ও সনাতন—বেদান্ত সেই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং উহা অনাদি অনন্ত। সুতরাং অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় বেদান্ত কোন অবতার বা অপর কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনের উপর বা মতমতান্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। উহা বিচার ও সত্যরূপ সনাতন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ব্যক্তি বিশেষের জীবনের উপর যে সকল ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, সেগুলি ঐ সকল ব্যক্তিবিশেষের জীবনী সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে আর টিকিতে পারে না, বেদান্ত ধর্ম্ম কিন্তু তদ্রূপ নহে। উহা সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মকেই আংশিক সত্য-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং কোন ধর্ম্মের সহিত উহার বিবাদ নাই। পূর্ণ যে, তাহার অংশের সহিত কোন বিবাদ থাকিতে পারে না।

এইস্থানে স্বামী বোধানন্দ স্বামীজির বক্তৃতা হইতে সুদীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন যে, অন্যান্য ধর্ম্মসমূহ বিজ্ঞানের প্রবল মুদ্গরাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ

হইয়া যাইতেছে, কেবল প্রাচ্যধর্ম্মগুলি বিজ্ঞানের অবিরোধী বলিয়া উহাদেরই পুনরুত্থান হইতেছে।

স্বামী পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"বেদান্তধর্ম্ম সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদী, সুতরাং উহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসঙ্গত। বিজ্ঞানের লক্ষ্য—বহুর মধ্যে এককে আবিষ্কার করা অথবা এমন একটী বস্তু বা শক্তির আবিষ্কার করা, অন্যান্য সমুদয়ই যাহার প্রকাশ মাত্র। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ জড় ও চৈতন্য উভয় রাজ্যেই একত্ব আবিষ্কার করিয়া জগতের সার্ব্বজনীন সমস্যা চিরকালের জন্য পূরণ করিয়া গিয়াছেন! প্রাচীনতম বেদে আমরা এই সমগ্র জগতের একত্ববাদ দৃঢ়রূপে সমর্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই। প্রাচীন হিন্দু ঋষিগণ যোগবলে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লাভ করিয়া যে সকল সত্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়াসমূহ তাহারই প্রতিধ্বনিমাত্র।

বেদান্তমতে জগৎ দুইটী—এক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বা ব্যবহারিক জগৎ আর এক পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল, আজ যে জগৎ দেখিতেছি, কাল আর সে জগৎ নাই। বৈদান্তিকগণ জগৎকে সেই অপরিণামী ব্রহ্মের মায়াময় বিকাশ বলিয়া থাকেন। যেমন মরীচিকায় জলভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম বা রজ্জুতে সর্পভ্রম, তদ্রূপ ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম। কেহ কেহ আবার এই নানাবিচিত্র চেষ্টাপূর্ণ জগৎকে স্বপ্নমাত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়া মহা সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন।

এই জগৎস্বপ্ন ও সাধারণ স্বপ্নের মধ্যে বাস্তবিক কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল স্থায়িত্বের তারতম্যে। জাগিলেই যেমন সাধারণ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেই তদ্রূপ এই জগৎস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। বিশ্লেষণ ও বিচারের দ্বারা এই স্বপ্ন দূর করিয়া অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মজ্ঞানলাভই বেদান্ত ধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি।

মানবের বিভিন্নপ্রকার প্রবৃত্তি অনুসারে এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়ও নানাবিধ, তন্মধ্যে চারিটী উপায়ই প্রধান। কেহ কেহ নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা, কেহ বা ভক্তি দ্বারা, কেহ একাগ্রতা ও যোগাভ্যাসের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া, কেহ বা কেবল বিচার ও বিশ্লেষণ বলে উক্ত অবস্থা উপলব্ধির পথে অগ্রসর হন।

সাংখ্যদর্শন জগৎসমস্যার আর এক প্রকার মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতকে পরিণামবাদ বলা যাইতে পারে। তাঁহারা বলেন, জগৎ মিথ্যা নহে, সত্য।

ইঁহারা কার্য্য ও কারণের অভিন্নতায় বিশ্বাসী। কার্য্যের সূক্ষ্মভাব কারণ, কারণের স্থূলভাব কার্য্য। জগত দুইভাবে অবস্থান করে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত। জগৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ নামক গুণাখ্য দ্রব্যের সংমিশ্রণ স্বরূপ। এই সকল গুণের বৈষম্যে জগতের ব্যক্তাবস্থা হয়। উহাকে কল্প বলে। উহাদের সাম্যাবস্থা হইলে অব্যক্ত বা প্রলযাবস্থা আসে। উভয় অবস্থাতেই জগতের সমুদয় বস্তু ও শক্তির সমষ্টি সমান থাকে। ইঁহারা নিরীশ্বরবাদী—ইঁহারা প্রকৃতি ও পুরুষ বা আত্মা—এই দুইটীকেই নিত্য তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন—একটী উপাদান, অপরটী নিমিত্ত কারণ।

কোন কোন বৈদান্তিকের মতে জগৎ সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে ইহার অস্তিত্ব না থাকিতে পারে, কিন্তু ব্যবহারিক বা আপেক্ষিকভাবে ইহার সত্তা আছে। ইহারা সৃষ্টিকর্ত্তা ও স্রষ্টাকে প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন বলিয়া থাকেন। এই মতের সহিত পাশ্চাত্য Pantheism মতের কোন সাদৃশ্য নাই। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ—তাঁহারই সত্তায় জগৎ সত্তাবান্।

এতএব দেখা গেল, বেদান্তের ঈশ্বর জগতের বাহিরে কোথাও নাই। জগতের বাহিরে ঈশ্বর আছেন এবং শূন্য হইতে জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, এ মত ভ্রমাত্মক। এইরূপ ঈশ্বর কখন অনন্ত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, যদি ঈশ্বর এইরূপই হন, তবে জগতে এত দুঃখ, বৈষম্য আদি রহিয়াছে কেন? ইচ্ছাশক্তি হইতে বা ঈশ্বর বহির্ভূত নিত্য জড় হইতে জগৎসৃষ্টিবাদও এইরূপ ভ্রমাত্মক।

বেদান্তধর্ম্মের মর্ম্ম—আমাদের মধ্যে যে ব্রহ্মত্ব রহিয়াছে, তাহার প্রকাশ। প্রত্যেক আত্মাই অব্যক্ত ব্রহ্ম। ক্ষুদ্রতম জীবাণু হইতে বুদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই সেই এক মহিমাময় আত্মা রহিয়াছেন। আত্মায় আত্মায় স্বরূপতঃ ভেদ কিছু নাই, কেবল প্রকাশের তারতম্য। জীবাণু অব্যক্ত বুদ্ধ আর বুদ্ধ ব্যক্ত জীবাণু স্বরূপ। এই আত্মাকে যেন প্রত্যেক জীবে স্প্রিংএর মত জড়াইয়া রাখা হইয়াছে আর সে নানাবিধ কার্য্য ও চিন্তাদ্বারা উহাকে খুলিবার চেষ্টা করিতেছে। আত্মার অনন্তশক্তি প্রকাশের চেষ্টারূপ অদম্য প্রবৃত্তি হইতে একদিকে সাধু ধ্যান ধারণাদি করিতেছেন, অপরদিকে চোর চুরি করিতেছে।

বৈদান্তিক কাহাকেও পাপী বলেন না, তিনি মানবের মধ্যে ঈশ্বরত্ব রহিয়াছে, বুঝিয়াছেন। যদি পাপ ও বদ্ধভাব আত্মার স্বভাব হয়, তবে তিনি চিরকালই ত পাপী ও বদ্ধ থাকিবেন। জগতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা তাঁহাকে উহা হইতে

উদ্ধার করিতে পারে। মানুষ স্বরূপতঃ মুক্তস্বভাব—এই জন্যই তাঁহার পক্ষে পূর্ণত্ব ও মুক্তিলাভ সম্ভব। বাহির হইতে কিছু আসিতে পারে না। বৈদান্তিকের মত—আত্মার উন্নতি বাহির হইতে হয় না, ভিতর হইতেই হইয়া থাকে। তিনি মানবকে অমৃতের সন্তান বলিয়া থাকেন। আত্মা অমর, আর শীঘ্র বা বিলম্বে তিনি নিজ অমরত্ব উপলব্ধি করিয়া অনন্তকালের জন্য মুক্ত হইয়া যাইবেন।

ধর্ম্ম মন্দিরে নাই, চর্চ্চে নাই, পুস্তকে নাই, তর্কে নাই, লেখায় নাই, বলায় নাই, শোনায় নাই বা বিশ্বাসেও নাই। ধর্ম্ম মানে হওয়া—সকল কল্যাণ আনন্দ ও জ্ঞানের যিনি জনক, তাঁহার সহিত একত্ববোধই ধর্ম্ম। বৈদান্তিক শুদ্ধ বিশ্বাসেই সন্তুষ্ট নহেন, কিন্তু তিনি অনুভব করিতে চান, প্রত্যক্ষ করিতে চান, তাহাই হইয়া যাইতে চান। বৈদান্তিক প্রত্যক্ষবাদী, হাতে হেতেড়ে না দেখিলে তাঁহার মনঃপূত হয় না। তিনি কুটিলতর ধার ধরেন না, ঘোরফের, মারপেঁচ বুঝেন না। তিনি অপর কাহারও ঘাড়ে নিজ দায়িত্ব নিক্ষেপ করিতে চান না, তিনি সাহসের সহিত নিজের ঘাড়ে সব দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া উহার ভালমন্দ সব ফল-ভোগ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তিনি বিশ্বাস করেন না যে, অপরে যতক্ষণ না মুক্তির উপযুক্ত হইতেছে, ততক্ষণ কেহ তাহাকে মুক্তি দিতে পারে। আত্মোন্নতি ও চরিত্র বলেই প্রকৃত মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। প্রত্যেককেই নিজের নিজের চেষ্টায় উহা লাভ করিতে হইবে। তিনি কাহারও ধর্ম্মবিশ্বাস, দুর্ব্বলতা বা অসম্পূর্ণতার জন্য কাহাকেও ঘৃণা করেন না। অনন্ত প্রেম, সহানুভূতি ও উদারতা তাঁহার নৈতিক আদর্শ। তিনি এক ঈশ্বরকে সকল ধর্ম্মে ও এক আত্মাকে সকল প্রাণীতে দর্শন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

বেদান্ত শুধু যে উদার তাহা নহে, কিন্তু বেদান্ত মতে প্রত্যেক ধর্ম্মই সম্পূর্ণ-রূপে সত্য। তুষ যদিও অনাবশ্যকীয়, তথাপি শুধু চালে গাছ হয় না, তুষশুদ্ধ ধান পুঁতিতে হয়। এইরূপই ধর্ম্ম পূর্ণাঙ্গ ও কার্য্যকরী হইতে গেলে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানাদি প্রতিমাদির প্রয়োজন। ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য, গঠন—বিনাশ নহে। উহা গড়িতে চায়, ভাঙ্গিতে চায় না। বেদান্ত এক ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তরে আনয়নে প্রয়াসী নহে, উহার উদ্দেশ্য—খ্রীষ্টিয়ানকে ভাল খ্রীষ্টিয়ান, বৌদ্ধকে ভাল বৌদ্ধ, মুসলমানকে ভাল মুসলমান, ইহুদীকে ভাল ইহুদী করা—উহা দেখাইয়া দেয় যে, সকল ধর্ম্মই প্রকৃত পক্ষে সত্য, সকল ধর্ম্মেরই প্রকৃত লক্ষ্য এক। উহা উদারভাবে বাহু প্রসারিত করিয়া দ্বৈতবাদী, একেশ্বরবাদী, বহুদেববাদী, জড়বাদী, নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী সকলকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

যেমন করুণাময়ী জননী তাঁহার নানা সন্তানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সর্ব্বলোকহিতৈষী বেদান্ত মানবের বিভিন্ন প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিক অধিকার অনুসারে ঈশ্বর উপলব্ধির উপায় স্বরূপ বিভিন্ন মার্গ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

বেদান্ত দুঃখবাদও নহে, সুখবাদও নহে, বা প্যানথিইজ্‌ম্ বা কোন প্রকার বাদই নহে, উহা জগতের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনামাত্র, জগতের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা স্বরূপ। উহা সকল ধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিতে উপদেশ দিয়া থাকে আর বলে—মানুষ মিথ্যা হইতে সত্যে অগ্রসর হয় না, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে অগ্রসর হইয়া থাকে। বেদান্তের ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয় ও অখণ্ড। তাঁহাকে স্বর্গস্থ পিতা বা জিহোবা, অহুরমজ্‌দা, আল্লা, বুদ্ধ, ব্রহ্ম যে নামই দেওয়া হউক না, তিনি সর্ব্বদাই এক। জলকে কেহ বারি, কেহ পানি, কেহ একোয়া, কেহ ওয়াটার, কেহ বা ইউ বলিয়া থাকে, কিন্তু জল বস্তুটী চিরকালই এক, উহা চিরকালই আমাদের তৃষ্ণা দূর করিয়া থাকে।

কুসংস্কার, গোঁড়ামী ও অজ্ঞতা বশতঃ লোকে অপরাপর ধর্ম্মের নিকৃষ্টতা ও মিথ্যাত্ব ও নিজধর্ম্মের সত্যতা ও উৎকৃষ্টতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে। তাহারা প্রমাণ করিতে চায় যে, অপর সকল ধর্ম্মই কুসংস্কারপূর্ণ আর তদনুবর্ত্তিগণের জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করে। বেদান্ত কিন্তু বলেন, সকল ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ও মহৎ ও উহারা এই একই লক্ষ্যে পঁহুছিয়া দেয়। কোন বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ সমূহ যেমন পরিধির বিভিন্ন বিন্দু হইতে আরম্ভ হইয়া শেষে কিন্তু এক কেন্দ্রে সম্মিলিত হয়, তদ্রূপ সকল ধর্ম্মের সাধন ও উপাসনা প্রণালী বিভিন্ন হইলেও উহারা একই ঈশ্বরে পঁহুছিয়া দেয়। এক রোমে যাইবার বহু রাস্তা আছে—সকল গুলিই রোমে গিয়া পঁহুছিয়াছে।

ঈশ্বর সগুন নির্গুন উভয়ই। অদ্বৈতবাদীর নিকট তিনি এক নিরপেক্ষ অখণ্ড আনন্দময় শুদ্ধসত্তা। দ্বৈতবাদীর তিনিই স্বর্গস্থ পিতা, অজ্ঞেয়বাদীর তিনিই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বস্তু আর প্যান্থিইষ্টের—মূল বস্তু (Substantial) ও তিনি। যেমন মৃৎপিণ্ড হইতে নানাবিধ গঠন প্রস্তুত হয়, আবার সে গুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তাহারা সেই এক মৃৎপিণ্ডে পরিণত হয়, তদ্রূপ সেই অনন্ত ব্রহ্ম প্রয়োজনমত নানা নামরূপে প্রকাশ হন আর সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই সেই নামরূপ নিজের মধ্যে টানিয়া লন।

গ্যাসের আলো যেমন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে, কিন্তু সকলগুলিই সেই এক স্থান হইতে আসিতেছে, তদ্রূপ সকল দেশের ও সকল কালের আচার্য্যগণের উপদেশরূপ আলোক সেই এক সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে আসিতেছে।

ভগবানও সেইরূপ। যে ভক্ত তাঁহার একটী মাত্র ভাব দেখিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে সেই একভাবেই জানেন। কিন্তু যিনি তাঁহার সকলরূপ দেখিয়াছেন, তিনিই কেবল বলিতে পারেন, "এই সকলই এক ঈশ্বরের রূপভেদ মাত্র, তিনি বহুরূপ।" তিনি নিরাকার আবার সাকার, তিনি অনাম, আবার তাঁহার অনন্ত নাম, আবার তাঁহার এত নামরূপ আছে যে, কেহই তাহা জানে না।"

ভারতীয় জীবন সমস্যা।*

—(ঃ০ঃ)—

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।]

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, অধিকাংশ লোকে সাধারণের প্রতি দয়া বা সহানুভূতি প্রদর্শন করা ত দূরের কথা, অতি নিকট আত্মীয়ের প্রতিও অবশ্য কর্ত্তব্য সহানুভূতি প্রভৃতি প্রকাশ করিতে পারে না; সকলেই নিজ নিজ স্ত্রী পুত্রাদির এমন কি, কোন কোন স্থলে, কেবল নিজের ভরণপোষণের চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকে। অপরের বিষয় ভাবিবার তাহাদের অবসর নাই, অন্যের সহিত সহানুভূতি করিবার তাহাদের সামর্থ নাই। এইরূপে তাহারা দিন দিন ক্রমশঃ অধিকতর স্বার্থপর হইয়া পড়িতেছে। 'Struggle for existence'—আমাদের দেশে 'অন্নচিন্তা চমৎকারা' বলিয়া যাহাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—আমাদিগকে সর্ব্বদা তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। আজকাল

* এই প্রবন্ধটী কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির এক সাধারণ অধিবেশনে উক্ত সমিতির জনৈক সভ্য কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

আমাদের সমাজে যেরূপ স্বার্থপরতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, অন্য কোন সময়ে এরূপ ছিল বলিয়া শোনা যায় না। ভিখারী ভিক্ষা পায় না—অভ্যাগতের অতিথি-সংকার হয় না,—বর্ত্তমান সময়ের স্বার্থপরতার আর অন্য প্রমাণের কি আবশ্যক? উহার কারণ যিনি যাহাই নির্দ্দেশ করুন না কেন, লোকে যে দিন দিন অধিকতর স্বার্থপর হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, স্বার্থের পূজা করিয়া আমরা কি আমাদের অভিলষিত সুখলাভে সমর্থ হইতেছি? দীন দরিদ্র ভিক্ষুকের, অভ্যাগত অতিথির ও সহায়হীন আত্মীয়ের প্রাপ্য হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া, এই যে আমরা আমাদের যাহা কিছু আছে নিজের ও নিজ স্ত্রী পুত্রাদির সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত ব্যয় করিতেছি, এমন কি, আবশ্যক হইলে পরস্বাপহরণ করিয়া, অথবা বিধবা ও পিতৃমাতৃহীনের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াও, স্বার্থসেবা করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না, ইহাদ্বারা কি আমরা সুখলাভে সক্ষম হইতেছি? অর্থবাহুল্যে ও সচ্ছন্দতার বৃদ্ধিতে সুখী হইতে পারিব, এই আশায় সকলকে বঞ্চিত করিয়া শুধু স্বার্থকে লইয়াই আছি; কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর—man proposes, but God disposes—স্বার্থ লইয়া থাকিয়াও সুখী হইতে পারা যাইতেছে না। মহামারী ও দুর্ভিক্ষরূপী ভগবানের দ্বিধার তরবারি আমাদের গৃহদ্বারে উপস্থিত—'the two-handed engine is at the door'। ইহারা আমাদের সুখ কল্পনার মূল ছেদন করিয়া আমাদিগকে দুর্ব্বিসহ দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিতেছে। এই যে ভারতব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, ইহা কি অর্থহীন? ইহাই কি সত্য নহে যে, জগজ্জননী, সন্তানের স্বার্থপরতা নষ্ট করিবার জন্য, নানাবিধ ভীষণ দুঃখ প্রেরণ করিতেছেন, এবং আবশ্যক হইলে, সন্তানের কল্যাণ কামনায় ইহা অপেক্ষাও দুঃসহ কষ্টের ব্যবস্থা করিবেন?

স্বার্থের সেবায় সুখ পাওয়া যায় না, স্বার্থত্যাগই সুখলাভের উপায়। যে ব্যক্তি সুখ অন্বেষণ করে, সে সুখ পায় না, যিনি সুখ চান না, যিনি পরের মঙ্গলোদ্দেশে নিজ স্বার্থে জলাঞ্জলি দেন, তিনিই সুখ লাভ করিয়া থাকেন। প্রকৃত সুখ কোথায় মানুষ না বুঝিয়াই, সুখের ছায়াকে সুখ ভাবিয়া, তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া পদে পদে লাঞ্ছিত হয়। ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা, ধনলাভ, বিদ্যাযশোপার্জ্জন প্রভৃতির পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া মানুষ যখন বিফলমনোরথ হয়, যখন সুখলাভে অকৃতকার্য্য হইয়া অবসন্ন হৃদয়ে তদনুসরণে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তখনই প্রকৃত সুখের পথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে। শাস্ত্রে ইহাকেই নিবৃত্তি মার্গ বলা হইয়াছে। মহাভারতে উল্লিখিত যযাতির আখ্যান হইতে

আমরা অবগত হই যে, রাজা যযাতি নিজ কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর যৌবন গ্রহণ পূর্ব্বক সহস্র বৎসর ইন্দ্রিয় সেবা করিয়া যখন দেখিলেন যে, ভোগ দ্বারা কাম পিপাসা চরিতার্থ না হইয়া, অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় উহা উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিতই হইতেছে, তখন নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া প্রকৃত সুখশান্তির পথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করেন। স্ত্রী পুত্র অর্থাদি যাহা বর্ত্তমানে সুখদায়ক, পরিণামে তাহারাই আবার মহা দুঃখের কারণ হয়। যে পুত্রের জন্মগ্রহণ, বয়োবৃদ্ধি, বিদ্যালাভ ও উপার্জ্জন ক্ষমতা দেখিয়া পিতা আনন্দিত হন, তাহারই মৃত্যু আবার পিতার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করে। যে অর্থের উপার্জ্জন ও রক্ষণে এত আনন্দ, দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে, তাহাই মহা দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তাই গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥"

প্রকৃত সুখলাভের উপায়—দুঃখকে প্রীতি করিতে শিক্ষা করা। যেমন আলোকের পূর্ব্বে অন্ধকার, ও জীবনের পূর্ব্বে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ সুখের পূর্ব্বে দুঃখ অপরিহার্য্য। চলিত কথায় বলে, 'কষ্ট না পেলে কেষ্ট মেলে না'। ভক্ত কবি রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন, 'তারা, সুখের বড়াই করে সবাই, দুঃখের বড়াই করি আমি' এবং দুঃখ মাতৃদত্ত দান বুঝিয়া উহা মাথায় পাতিয়া লইয়াছেন। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ দুঃখ সম্বন্ধে জগৎকে এক অভিনব শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি বলেন, 'Love misery for its own sake' অর্থাৎ দুঃখকে দুঃখের জন্য ভালবাস। সুখের আশায় দুঃখ সহ্য করা মানুষের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ও স্বাভাবিক, কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখকে দুঃখের জন্য ভাল বাসিতে পারেন তিনিই সুখদুঃখের অতীত শান্তির অবস্থা লাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। 'দুঃখকে দুঃখের জন্য ভালবাস' স্বামীজির এই কয়েকটী কথার মধ্যে কি কার্য্যকরী শক্তি নিহিত আছে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন। দুঃখে প্রীতি জন্মিলে পৃথিবীর প্রলোভন পরাজিত, দুর্দ্দমনীয় বাসনা বশীভূত ও পরার্থে আত্মত্যাগ সহজসাধ্য হইয়া উঠে। সুখকামনা মানুষকে দিবারাত্র ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়, একটু স্থির হইতে দেয় না, কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখকে প্রীতি করিতে চান, তিনি যে অনর্থ অর্থাদির চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকেন, ইহা সহজেই অনুমেয়।

স্বার্থত্যাগ ভিন্ন কখন প্রকৃত সুখশান্তি লাভের অধিকারী হইতে পারা যায় না। বেদ বলিয়াছেন, 'ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ' অর্থাৎ একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়। গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন, 'ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরং' অর্থাৎ ত্যাগের পরই শান্তিলাভ হইয়া থাকে। স্বার্থত্যাগ না করিয়া প্রকৃত সুখশান্তির কামনা বিড়ম্বনা মাত্র।

স্বামীজি একস্থানে বলিয়াছেন,—

'জীবনের অর্থ উন্নতি, উন্নতি অর্থে হৃদয়ের বিস্তার, আর হৃদয়ের বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই একমাত্র জীবন, উহাই একমাত্র জীবন-গতি নিয়ামক। আর স্বার্থপরতাই মৃত্যু, জীবন থাকিতেও ইহা মৃত্যু এবং দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যু'।

—পত্রাবলী।

আহার নিদ্রাদি জনিত আনন্দ পশুজীবনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু মানবমন উহা দ্বারা প্রকৃত সুখলাভে সমর্থ হয় না। মানবমন ভিন্ন উপাদানে গঠিত, তাই উহা কেবল আহার বিহারাদিতে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া স্বভাবতঃ প্রকৃতির নানাবিধ রহস্য উদ্‌ঘাটনে ও সৌন্দর্য্যাবলোকনে আকৃষ্ট হয়, মানুষের এই সকল গবেষণার ফলে পৃথিবীতে বিজ্ঞান দর্শন ও কাব্যের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞানাদিও মানবমনের পক্ষে যথেষ্ট সুখ বিধান করিতে পারে না। মানবমন কি এক অবিমিশ্র ও শাশ্বত সুখ চায়, যাহা বহির্জগতে কুত্রাপি লাভ করা যায় না। যখন মানবচিত্ত এইরূপে 'প্রকৃত সুখ কোথায়' অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়া সচ্চিদানন্দান্বেষণে ব্রতী হয়, তখনই তাহার ধর্ম্ম জীবন আরম্ভ হইয়া থাকে। অভাববোধে ইহার জন্ম। যে ব্যক্তি সংসারের কামিনীকাঞ্চন দ্বারা বদ্ধ থাকিয়া আপনাকে সুখী মনে করে, তাহার এ অভাব বোধ হয় নাই, সুতরাং তাহার ধর্ম্ম জীবনও আরম্ভ হয় নাই বলিতে হইবে।

এই যে প্রকৃত সুখের অভাব বোধ, ইহার শিক্ষা দুঃখ হইতেই লাভ করা যায়, সুতরাং দুঃখই ধর্ম্ম পথের প্রথম সহায় সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে স্বামীজি কি বলিয়াছেন, দেখা যাউক। তিনি বলিয়াছেন—

"মহা বিপদের দিনে, যখন পিতা মাতার কাতর ক্রন্দনে উদাসীন করাল কালের পেষণে, হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে, যখন দুঃখ ও নিরাশার গভীর ভারে পৃথিবী অন্ধকারময় বোধ হয়, তখনই আমাদের অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত

হয়। যখন দুঃখ বিপদ্ নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে চারিদিক্ একেবারে আচ্ছন্ন বোধ হয়, তখনই যেন সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্য হইতে হটাৎ জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে, স্বপ্ন যেন ভাঙ্গিয়া যায়, আর তখন আমরা প্রকৃতির মহান্ রহস্য সেই অনন্ত সত্তাকে দিব্য চক্ষে দেখিতে থাকি। যখন জীবনভার এত দুর্ব্বহ হয় যে, তাহাতে অনেক ক্ষুদ্রকায় তরী ডুবাইয়া দিতে পারে, তখনই প্রতিভা-বান্, বীরহৃদয় ব্যক্তি, সেই অনন্ত, পূর্ণ, নিত্যানন্দময় সত্তামাত্র স্বরূপকে দেখে, যে অনন্ত পুরুষ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত ও পূজিত।"

—পত্রাবলী।

অন্যত্র স্বামীজি বলিয়াছেন,—

'ক্ষীর ননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে, এক ফোঁটা চ'খের জল কখনও না ফেলে, কার ব্রহ্ম কবে বিকসিত হয়েছেন? কাঁদ্‌তে ভয় পাও কেন? কাঁদ। কেঁদে কেঁদে তবে চোক সাফ হয়, তবে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তবে আস্তে আস্তে, মানুষ জন্তু গাছ পালা দূর হয়ে, তার জায়গায় সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন হয়।'

—পত্রাবলী।

অতএব দুঃখকে প্রীতি করিতে হইবেই। দুঃখের জন্য দুঃখকে প্রীতি করিতে যদি না পারি, অন্ততঃ প্রকৃত সুখলাভের একমাত্র উপায় জানিয়া দুঃখের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। যেরূপে হউক, স্বার্থপরতা ত্যাগ করিতে হইবে। এই স্বার্থ ত্যাগ সাধনের পন্থা শাস্ত্রে বিভিন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্ম্ম নামে যে সকল বিভিন্ন সাধনমার্গ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাদের সকল গুলিরই মূল কথা স্বার্থত্যাগ। জ্ঞানী নেতি নেতি বিচার দ্বারা পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু ত্যাগ করিতে করিতে অবশেষে সুখ স্বরূপ ভূমা সচ্চিদানন্দে গিয়া উপনীত হন, যোগী দেহ মন ইন্দ্রিয়াদি অতিক্রম করিয়া অবশেষে অন্তর্য্যামী শুদ্ধ আত্মাস্বরূপ ভগবানে গিয়া পহুঁছে, ভক্ত আপনার ইষ্টের নিকট স্বার্থত্যাগরূপ আত্মবলি দিয়া ভগবৎ কৃপা লাভে সক্ষম হয়, কর্ম্মী সর্ব্বভূতে বিরাজমান বিরাটের পূজায় নিযুক্ত থাকিয়া নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে শিক্ষা করে। সুতরাং দেখা গেল, মানব জীবনের চরম লক্ষ্য শান্তি বা অমৃতত্ব লাভ, যাহা কেবল ত্যাগ দ্বারা লভ্য—জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, প্রত্যেক পথের অনুসরণ দ্বারাই লাভ করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে কোনটী অপরটী অপেক্ষা ন্যূন নহে এবং যাহার যাহাতে অধিক

প্রীতি, ও যাহার প্রবৃত্তি যাহার দিকে অধিক, তাহার পক্ষে সেই পথই অবলম্বনীয়।

কিন্তু সাধারণতঃ জ্ঞানপথ দেহাভিমানী ব্যক্তির পক্ষে বড় কঠিন, গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন 'অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।' শুকদেব জনকাদির ন্যায় যাঁহারা 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা' শুনিবামাত্রই উহা অনুভব করিয়া সংসারকে অকিঞ্চিৎকর বোধে ত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী। বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেহাত্মবুদ্ধি একপ প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে জ্ঞানের পথ, ভাগ্যবান্ দুই চারি জন ভিন্ন, সকলের পক্ষেই সুদূরপরাহত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মচর্য্য ও দেহ মনের সম্পূর্ণ সুস্থতা যাহার আযত্ব নহে, শাস্ত্র তাহাকে যোগপথের অনধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আজ কাল প্রকৃত শিক্ষার অভাবে ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতির প্রাদুর্ভাবে, ব্রহ্মচর্য্য ও শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা যেরূপ বিরল, তাহাতে যোগ পথও যে সাধারণের উপযোগী নহে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ভক্তিপথ, জ্ঞান ও যোগ হইতে অপেক্ষাকৃত সহজ; কিন্তু তথাপি ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে নিরীশ্বরবাদ ও অজ্ঞেয়বাদ আমাদের অনেকের মনকে যেরূপ অভিভূত করিয়াছে, এবং ধর্ম্মের নামে নানারূপ পাপাচরণ ও কপটতা দেখিয়া লোকসাধারণ ধর্ম্মে যেরূপ সন্দিহান হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে ভক্তিও সকলের পক্ষে উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয় না। আজকাল লোকের দেহ ও মনের অবস্থা যেরূপ, ধর্ম্মবিশ্বাস ও শিক্ষা যেরূপ, তাহাতে কর্ম্মই একমাত্র সর্ব্বসাধারণের উপযোগী বলিয়া মনে হয়। অবিশ্বাসীরও কর্ম্মে অধিকার আছে, যদি সে চরিত্রহীন না হয়। কর্ম্মের আবশ্যকতাও যে আজকাল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভারত অতীত গৌরব হইতে বিচ্যুত হইয়া ক্রমশঃ অবনতির অতি নিম্নস্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এক্ষণে ইহার উন্নতির দিকে গতি পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী—পতনের পর উত্থান অপরিহার্য্য। হীন স্বার্থপরতা, এই দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, দুঃখ প্রভৃতি আনয়ন করিয়া আমাদিগকে এইরূপ অবনত করিয়াছে; স্বার্থত্যাগ দ্বারা পুনরায় উন্নতির দিকে আমাদিগকে যাইতে হইবে। বেদ-বেদান্তের প্রসূতি শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধাদির জন্মভূমি, ভারত, পৃথিবীর সমস্ত জাতির গুরুস্থানীয় হইয়াও আমাদের কর্ম্মদোষে ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও পদদলিত। ঋষির বংশধরগণ পিশাচে পরিণত, আমাদের দিন দরিদ্রগণ উপেক্ষিত ও অত্যাচার-পীড়িত। ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনঃস্থাপন করিতে হইলে, সাধারণের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব

আনয়ন করিতে হইলে, আমাদের অনেককে যে স্বার্থসুখে জলাঞ্জলি দিয়া সেবা-ব্রতে দীক্ষিত হইতে হইবে, ইহাতে কি আর সন্দেহ আছে? মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী, কেন আর বৃথা মৃত্যুভয়ে ভীত হই? চারিদিকে দুঃখ কষ্ট হাহাকার ক্রন্দন যখন অপরিহার্য্য, কেন আর বৃথা সুখ চেষ্টা,—এস মায়ের সন্তান, এস, হীন স্বার্থত্যাগ করিয়া, জননীর গৌরবোদ্দেশে সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া জীবন ধন্য করি।

ক্রমশঃ।

পদব্রজে কাশীযাত্রা।

—:০:—

[পরিব্রাজক।]

আজকাল রাত্রে সাড়ে নয়টার ডাক গাড়ীতে চাপিলে তৎপরদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বেই কাশী পঁহুছিতে পারা যায়। দিন দিন বিজ্ঞানের যেরূপ দ্রুতপদসঞ্চারে উন্নতি হইতেছে, তাহাতে আরো কিছু দিন পরেই প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া কাশীধামে গিয়া তথায় মণিকর্ণিকা স্নান এবং বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আফিস করাও হয়ত সম্ভব হইবে। এ হেন রেলওয়ে টেলিগ্রাফের দিনে আমাদের পদব্রজে কাশীযাত্রা পাঠকের কেমন লাগিবে, বলিতে পারি না। তবে আমাদের এ ধৃষ্টতা কেন? আজকাল খুব কম লোকই পদব্রজে কাশী গিয়া থাকেন—সুতরাং এই ভ্রমণ বৃত্তান্তে পাঠকের একটু কৌতূহল বোধ হইতে পারে, তাঁহার পক্ষে ইহাতে হয়ত একটু নূতনত্ব ঠেকিতে পারে। আরো আমাদের বিশ্বাস—পাঠকবর্গ, ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন—রেলযোগে দেশভ্রমণ অপেক্ষা পদব্রজে দেশভ্রমণে অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়। আমরা আমাদের দেশের সহিত সবিশেষ পরিচিত হইতে পারি। কোন্ ভাববশে আমাদের দেশের লোকের চিত্ত পরিচালিত হইতেছে, কোন্ স্থানে আমাদের জাতীয় জীবনের মর্ম্মদেশ তাহার কতকটা উপলব্ধি হয়। এইরূপ ভ্রমণে রাজা মহারাজ হইতে অতি হীন ভিক্ষুকের সহিত পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ

পরিচয় হয়। সকলের প্রাণের কথা বুঝিতে পারা যায়; সুতরাং দেশকে যথার্থভাবে ভালবাসিতে শেখা যায়। তাহার পর—আমাদের ধারণা—তীর্থদর্শনের যথার্থ ফল পাইতে গেলে পদব্রজে গেলে যেরূপ হয়, রেলযোগে গেলে তদ্রূপ হয় না। কারণ, পদব্রজে যাইতে হইলে নানাবিধ কষ্ট সহ্য করিতে হয়, সর্ব্বদা সেই উদ্দিষ্ট তীর্থ, ও সেই তীর্থাধিষ্ঠাতা দেবতার কথা স্মরণপথে উদিত হয় —তাহাতে ভক্তিবিশ্বাস নিষ্ঠা দৃঢ় হয়। এইরূপভাবে একটী তীর্থদর্শন করিলেও যে ফল হয়, রেলযোগে তাড়াতাড়ি ভাসা ভাসা রূপে ৫০০ তীর্থ দেখিলেও সে ফল হয় না। যাহা হউক, আমরা যখন গত বৎসর পদব্রজে কাশীযাত্রা করি, তখন যে এত কথা ভাবিয়াছিলাম, তাহা নহে। আমরা মনের খেয়ালে বাহির হইয়াছিলাম। তখন ইহাও ভাবি নাই যে, উদ্বোধনে এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিব। উদ্বোধন সম্পাদক মহাশয়ের এ বিষয়ে আগ্রহ হওয়ায় আমাদের লেখার অভ্যাস বা পাণ্ডিত্য অথবা পর্য্যবেক্ষণের শক্তি না থাকিলেও যাহা মনে পড়িল, গল্প করার মত লিখিয়া দিলাম। যদি এতৎপাঠে আমাদের মত কাহারও পদব্রজে ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, তবেই আমরা কৃতার্থ হইব।

একদিন আমরা তিনজন গুরুভাই ঘটনাক্রমে দক্ষিণেশ্বর রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে সমবেত হইয়াছিলাম। পরস্পরের দর্শনলাভজনিত আহ্লাদে সেই রাত্রি আমরা তথায় রহিয়া গেলাম। পঞ্চবটী মূলে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কঠোর তপস্যা ও সাধন ভজনের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরে বৃষ্টিপাত হইতে থাকিলে আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরের বারাণ্ডায় আসিয়া রাত্রি কাটাইলাম। এই সময়ে কথা প্রসঙ্গে তীর্থ ভ্রমণের কথা উঠিল। পরদিন প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর স্নানাদির পর জগন্মাতা ভবতারিণী দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করিলাম এবং পরস্পর স্থির করিলাম যে, দুইএকদিন মধ্যেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দেশে যাইয়া তাঁহার প্রসাদলাভ ও অনুমতি গ্রহণ করিয়া পদব্রজে পুরী অভিমুখে যাত্রা করিব।

এই সংকল্পানুসারে ৩রা শ্রাবণ, ১৩১৪ শুক্রবার রাত্রিতে কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজ মেলে চড়িয়া খড়্গপুর হইয়া রাত্রি প্রায় ৪ ঘটীকার সময় বিষ্ণুপুরে পৌছিলাম। আমরা নবাগত সুতরাং অন্ধকারে পথ ঘাট কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কোনরূপে রাত্রিটুকু কাটাইয়া পরদিন ৭।৮ টার সময় একখানি গাড়ী লইয়া কোতলপুরাভিমুখে রওনা হইলাম ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে তথায় পৌছিলাম। সে সময় উল্টা রথযাত্রা উপলক্ষে তথায় অনেক জনতা হইয়াছিল। রাত্রিতে

এক ময়রার দোকানে আশ্রয় লইয়া আমরা সেই রাত্রি তথায় কাটাইয়া দিলাম। সে দিন কিছু কিছু মুড়িমুড়কির উপরই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই বর্ষাকালীন জলকাদাপূর্ণ মাটির রাস্তা দিয়া পরম উৎসাহে হাঁটিয়া জয়রামবাটী উপস্থিত হইলাম এবং সর্ব্বাগ্রেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর শ্রীচরণ দর্শন করতঃ কৃতকৃতার্থ হইলাম। মাতাঠাকুরাণী সাদরে আমাদিগকে তাঁহার নিকট বসাইলেন এবং আমাদিগের হৃদ্‌গত ভাব ও উদ্দেশ্য সমুদয় অবগত হইয়া মনে মনে অত্যন্ত খুসী হইলেন। তাঁহার বদনে সেই স্নেহপূর্ণ বাৎসল্যভাব দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য আমরা সব ভুলিয়া গেলাম, শোক তাপ জ্বালা যন্ত্রণা সব ভুলিয়া বাল্য স্মৃতির উদয় হইল। শৈশবে মাতৃকোলে কি ভাবে লালিত হইয়াছিলাম, অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন থাকায় উহা যথাযথ স্মৃতিপথারূঢ় না হইলেও এখানে যেন সেই বস্তু আস্বাদ পাইতে লাগিলাম। আমাদিগের দুইজন চাকুরী করিতেন। ইতিপূর্ব্বে ঐ অবস্থায় জ্বালাতন হইয়া তাঁহারা একদিন মাতাঠাকুরাণীকে বলিয়াছিলেন, 'মা আর চাকুরী ভাল লাগে না।' তচ্ছ্রবণে মা তাঁহাদিগকে চাকুরী পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে কিন্তু আমরা সকলে চাকুরী বাকুরী সব পরিত্যাগ করিয়া মায়ের নিকট উপস্থিত হইলেও মা সাদরে বলিলেন, "বেশ করেছ বাপু, কেন মিছামিছি দাসত্ব করা।" আমাদিগের পুরীধাম যাত্রার সংকল্প শুনিয়া মা নিষেধ করিয়া বলিলেন, "পুরীতে নাকি এখন ব্যায়রাম হইতেছে। তোমরা কাশীধামে যাও। আমি তথাকার অদ্বৈত আশ্রমে চিঠি লিখিয়া দিব।" আমরা নিঃসঙ্গ অবস্থায় প্রত্যেকে একাকী যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি বলিলেন, "তোমাদের অত কষ্ট করিবার দরকার নেই, তিনজনে একত্রে যাবে, কেউ রান্না করবে, কেউ বা ভিক্ষা করবে, অত কষ্ট তোমরা কেন করবে?' শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট যে কয়দিন রহিলাম তাহার মধ্যে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগিনেয় হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের বাসভূমি শিহড় গ্রামে গিয়া তথায় শান্তিনাথ মহাদেব দর্শন করিয়াছিলাম।

এই মহাদেবের মন্দিরটী আকৃতিতে ছোট হইলেও স্থাপত্য দেখিয়া বহু পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। ঐ স্থানের জনশ্রুতি এই যে,—ইহা জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মাতার হস্তনির্ম্মিত। ঐ কথা সত্য না হইলেও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরান্তর্গত বিমলা দেবীর মন্দির প্রভৃতির সহিত এই ক্ষুদ্র মন্দিরটীর স্থাপত্যের কিছুমাত্র প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। উহাদিগের ন্যায় এই মন্দিরটীও প্রস্তর নির্ম্মিত।

প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে গাজনের সময় এখানে মেলা বসে এবং খুব ধুমধাম হয়। ৺তারকনাথ মহদেবের নিকটে যেরূপ যাত্রীগণ মনোগত কামনাপূরণ বা ব্যাধিনাশের নিমিত্ত হত্যা দিয়া থাকে, চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামবাসীগণ এইস্থানেও ঐরূপ করিয়া থাকে এবং অভিলষিত ফল লাভ করে। তবে তারকেশ্বরের ন্যায় এখানে অত্যধিক যাত্রী সমাগম নাই। কেবলমাত্র চৈত্রমাসে এবং শিবরাত্রির সময় ভিড় হইয়া থাকে।

এইরূপে কয়টা দিন মহানন্দে কাটিয়া গেল এবং শ্রীশ্রীমার নিকট হইতে বিদায়গ্রহণের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। বিদায় দিবার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণী আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার ঠাকুর ঘরে গেলেন এবং দুর্গানাম জপ করিয়া বিল্বপত্র লইয়া আমাদিগের মস্তকে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিমূর্ত্তির নিকট আমাদিগকে নমস্কার করাইয়া নিজে করযোড়ে ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, 'ইহারা জলে, জঙ্গলে, পাহাড়ে যেখানে যে অবস্থায় পড়ুক, দুটী দুটী খেতে দিও।

১২ই শ্রাবণ শ্রীগুরুর আদেশানুসারে আমরা মস্তক মুণ্ডন করিলাম এবং স্ব স্ব কাপড়গুলিকে গেরুয়া রঙ্গে রঞ্জিত করিলাম। পরদিন সোমবার আমাদিগের জীবনের একটী চিরস্মরণীয় দিন। ঐ দিনেই শ্রীগুরু আমাদিগকে সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষিত করিয়া কৃতকৃতার্থ করিলেন এবং গেরুয়া ধারণের অনুমতি দিলেন। ঐ দিনই আবার আমরা তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া প্রথমে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের পবিত্র জন্মস্থান কামারপুকুর দর্শনাভিলাষে যাত্রা করি।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা কামারপুকুর পৌঁছিলাম। এখানে আসিয়া আমা-দিগের মনে কতই ভাবের উদয় হইতে লাগিল। রঘুবীর ও শীতলাদেবীকে প্রণাম করিয়া আমরা লক্ষ্মীদিদির (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী) দেখা করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাদের কুশলাদি প্রশ্ন করিয়া জলখাবারের আয়োজন করিলেন। জলখাবার খাইয়া আমরা বাজারে বহির্গত হইলাম। রাস্তার শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক শ্রীযুক্ত গণেশ চন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের সহিত দেখা হইল। ইনি একজন ভক্ত ও প্রেমিক পুরুষ। রাত্রিতে আসিয়া লক্ষ্মীদিদির নিকট প্রসাদাদি গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহার সহিত নানা কথা-বার্ত্তায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া শয়ন করিলাম। এই স্থানে আমরা নয়রাত্রি থাকি। ইতিমধ্যে আমরা এক স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বুড়ো শিব দর্শন করি, ইহার দক্ষিণ দিকে চিনু শাঁখারির সমাধিমন্দির। তথায় যাইয়া সকলে

ভক্তিভাবে প্রণাম করিলাম। এই চিনুই প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া জানিতে পারিয়া তুলসী চন্দন দিয়া পূজা করিয়াছিলেন। ইঁহারই বাটীতে তিনি সর্ব্বদা যাইয়া ভগবৎ কথার চর্চ্চা করিতেন এবং কোন কোন দিন ভগবৎ প্রসঙ্গে সমুদয় রাত্রি কাটাইয়া দিতেন। কিম্বদন্তী আছে যে, ইঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়া জমিদারের বরকন্দাজকে কপাট-সংলগ্ন হস্ত ও অচল হইয়া সারা রাত্রি কাটাইতে হইয়াছিল। পরদিন সকালে ঠাকুরের হস্তে মুক্তি-লাভ করে। আরও প্রবাদ যে, ইনি অকালে অনেক লোককে আমের অম্বল খাওয়াইয়াছিলেন। চিনু শাঁখারির সমাধি মন্দির দেখিয়া তাঁহার জীবনের এইরূপ অনেক কথা ও কিম্বদন্তী আমাদের মনে উদয় হইতে লাগিল।

এখান হইতে একদিন বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী বিবৃত গড় মান্দারণের ভগ্নস্তূপ ও পরিখাদি দর্শন করিতে গেলাম। গড়ে প্রবেশ করিবার সময় অসংখ্য হনুমান দৃষ্টিগোচর হইল। এখানে এখন কেবল প্রাচীন কালের স্মৃতিটুকু আছে মাত্র। গড়টী খুব প্রশস্ত ও উচ্চ—অনেক স্থান এখনও মাটির দেয়াল বেষ্টিত আছে। জমি খুঁড়িলে প্রাচীন কীর্ত্তিসকলের সত্যতার এখনও অনেক উপলব্ধি হয়। এখানে আসিয়া আমরা শৈলেশ্বরের মন্দির অন্বেষণ করিলাম, যথায় উপন্যাসকার জগৎ সিংহের প্রথম তিলোত্তমা সন্দর্শন সংঘটন করাইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, সে মন্দির আর নাই, এখন একখানি খড়ের চালের নীচে শিবজির পূজাদি হয়। প্রাচীন কীর্ত্তির সেই শেষ চিহ্নটুকুর দিকে চাহিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিলাম। অতঃপর এখান হইতে ৩ মাইল দূরবর্ত্তী আনুড় গ্রামে যাইয়া আমরা বিশালাক্ষী দেবী দর্শন করি। এইস্থানেই বাল্যকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব্ব ভাবাবস্থা হইয়াছিল। এতদ্দেশীয় লোকে এইটীকে পীঠস্থান কহে। ইহা ৫২ পীঠের অন্তর্গত না হইলেও উপপীঠের অন্যতম হইতে পারে।

২২শে শ্রাবণ বুধবার আমরা রঘুবীরের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কাশীধামোদ্দেশে ৺বিশ্বনাথের নাম স্মরণ করতঃ বহির্গত হইলাম। প্রায় ৭ মাইল পথ চলিয়া দারকেশ্বর নামক এক নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম, নদীতে তখন ভাঁটা থাকায় অল্প জল ছিল, স্ব স্ব বহির্বাস খুলিয়া পদব্রজে পার হইয়া নিকটবর্ত্তী নির্জ্জাপুর গ্রামে আসিলাম। গ্রামটী খুব ছোট, কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ও অপরাপর জাতির বাস। আমরা সন্ধ্যার সময় একটী ব্রাহ্মণের বাটী অতিথি হইলাম। ব্রাহ্মণ যথোচিত অতিথি সৎকার করিলেন। তাঁহার পত্নী অতি যত্নের সহিত

ডাল ভাত তবকারি প্রস্তুত কবিযা রাত্রিতে খাওযাইযা চণ্ডীমণ্ডপে শয়নের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। প্রত্যুষে তথা হইতে বিদায হইযা উচালাও নামক স্থানে আসিলাম। এইস্থানে পূর্ব্বে অতিশয দস্যুভয ছিল। এখানে একটী প্রকাণ্ড দীঘি আছে। পূর্ব্বকালে নাকি দস্যুরা পথিকদিগের সর্ব্বস্বান্ত কবিয়া তাহাদিগকে হত্যা কবতঃ এই দীঘিতে ডুবাইযা বাখিত। এক্ষণে দস্যু-ভয আর বড় নাই, এখন এখানে চটী, বাজাব, থানা প্রভৃতি হইযাছে। আমরা বেলা প্রায় ৮।৯ টার সময একজন কাঙাল বৈবাগীব বাটী অতিথি হইলাম। লোকটী গৃহস্থ—স্ত্রী পুত্রাদি আছে, তবে অতি দবিদ্র। ২ বিঘা মাত্র জমি আছে, তাহাও ঠিকা। একটী মণিহাবী দোকান আছে. তাহা দ্বারাই কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। লোকটীব এইরূপ হীনাবস্থা পূর্ব্বে জানিতে পাবিলে আমরা কদাচ তথায আশ্রয গ্রহণ কবিতাম না। জানিবার পবে স্থানান্তরে যাইবাব চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুতেই তাহাব অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। সে ঘৃত সংযুক্ত মুড়ি ও গুড জলখাবাব দিযা কিছুক্ষণ পবেই মাধ্যাহ্নিক ভোজন কবাইল। আমাদেব নিকট এণ্ডী মুগা মিশ্রিত একখানি চাদব ছিল। সেই চাদবখানি তাহাকে দিযা বলিলাম, ইহাদ্বাবায তোমাব ছেলেদেব গাযেব গবম জামা হইতে পাবে। সে প্রথমে গ্রহণ কবিতে চাহিল না; পবে অনেক পীড়াপীড়ি কবায অনিচ্ছাব সহিত গ্রহণ কবিল। মধ্যাহ্ন ভোজনেব পব আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম কবিযা তথা হইতে রওনা হইলাম এবং সন্ধ্যার সময আসিয়া একটী চটিতে উপস্থিত হইলাম। একজন মোদক তাহাব বৈটকখানায আমাদিগের থাকিবাব স্থান নির্দ্দিষ্ট কবিযা দিল। লোকটী উগ্রক্ষত্রিয, শূল বেদনায অতি কষ্ট পাইতেছিল। তথাপি সে আমাদিগেব নিকট আসিযা কবযোড়ে বলিল, "আপনাদিগের যাহা যাহা প্রয়োজন, অনুমতি ককন আমি যথাসাধ্য আপনা-দেব সেবা কবিব।" আমবা কেবলমাত্র বাত্রিটুকু কাটাইবার জন্য একটু স্থানের প্রত্যাশায তাহার নিকট গিযাছিলাম কিন্তু সে বিশেষ অনুরোধ করিযা বাত্রিতে প্রচুর পরিমাণে মুড়কী, দুগ্ধ ও মিঠাই আহাব করাইল। এই অচিন্তনীয ব্যাপার দেখিযা আমাদের শ্রীশ্রীমাতার সেই স্নেহপূর্ণ কাতর প্রার্থনাটী "এদের দুটী খেতে দিও" মনে পড়িল।

এই স্থান হইতে ৪ ক্রোশ দূবে বর্দ্ধমান অবস্থিত। পবদিন প্রত্যুষে উঠিয়া আমরা বর্দ্ধমানাভিমুখে রওনা হইব বলিযা তাহার নিকট বিদায চাহিলাম। সে মধ্যাহ্নে থাকিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুবোধ করিতে লাগিল—কিন্তু আমাদিগের

আগ্রহাতিশয্যে আর কিছু না বলিয়া কিছুদূর পর্য্যন্ত আমাদিগের সমভিব্যাহারে আসিয়া বিদায় দিয়া গেল। প্রায় ছয় মাইল হাঁটিয়া আমরা দামোদর নদের ধারে আসিলাম। তখন বর্ষাকাল—দেখিলাম, দামোদরের প্রবল স্রোতে সমূলোৎপাটিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল রথচক্রের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে সবেগে চলিয়া যাইতেছে, নৌকা সকল নিমেষ মধ্যে দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্দ্ধান হইতেছে। পরপারে যাইবার ভাবনা করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম অনেকগুলি চৌকিদার বর্দ্ধমানে হাজিরা দিতে যাইতেছে। তাহাদের মুখে জানিলাম, সরকারি ডাক লইয়া যাইবার জন্য একখানি নৌকা ঘাটে অপেক্ষা করিতেছে। তৎক্ষণাৎ আমরা সেই নৌকার নিকট গিয়া মাঝিকে পার করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। সে আমাদিগকে নিঃসম্বল জানিয়া বলিল, "আচ্ছা, বসুন।" আমরা নৌকায় বসিবার কিয়ৎক্ষণ পরে নৌকা ছাড়িয়া দিল। অমনি আরোহীরা সমস্বরে হরি হরি ধ্বনিতে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। নৌকা নিমেষমধ্যে সবেগে কোথায় চলিয়া গেল। বোধ হয়, এক জন ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়াও অত শীঘ্র যাইতে পারে না। চকিতের মধ্যে নৌকা পরপারে আসিয়া লাগিল। জলমধ্যে একস্থানেই আমাদিগকে নামাইয়া দিল। আমরা স্বীয় স্বীয় বহির্বাস খুলিয়া হস্তে লইয়া কৌপীন মাত্র অবলম্বনে হাঁটিয়া কোথাও এক কোমর জল কোথাও এক বুক জল অতিক্রম করিয়া, রাস্তায় উঠিলাম।

ক্রমশঃ।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষ মোচন কার্য্য।

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বহরমপুরের নিকটবর্ত্তী মহুলা ও পলাশীর নিকটবর্ত্তী সোমপাড়া নামক স্থানে রামকৃষ্ণ মিশন দুইটী দুর্ভিক্ষ মোচন কেন্দ্র খুলিয়াছেন এবং তথায় মিশন হইতে ২জন সেবক প্রেরিত হইয়াছেন। সেখানকার অবস্থা সেবকগণের পত্র হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

সোমপাড়া (মুর্শিদাবাদ)

৭ই জুলাই, ০৮।

"বাঙ্গালা দেশের চাষাভুষার মধ্যে কয় বৎসরের যে কিরূপ দরিদ্রতা ও হীনাবস্থা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে আমি এদিককার অনেক জেলার অনেক গ্রামে ঘুরিযাছি, কিন্তু তখনকার অবস্থার সহিত এখনকার অবস্থার তুলনা করিলে প্রাণে অত্যন্ত নিরাশ ভাব আসে। যতই ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের আভ্যন্তরিক অবস্থা দেখিতেছি, ততই দেখিতেছি—এখানে উড়িষ্যাদেশের ন্যায়ই অন্নকষ্ট। অনেকেই একদিন দেড়দিন বাদে হয়ত আধপেটাও পায না। মিল্‌কী, বিনুপাড়া, ঘোল্লা ও বাছড়া প্রভৃতি গ্রামের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয। চাউল এখানে টাকায ৴৭॥০ এর বেশী পাওযা যায না। গত দুর্ভিক্ষের সময় অর্থাৎ যে বার গভর্ণমেণ্ট এখানে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিযাছিলেন, তখন চাউলের দর টাকায ।০ সের ছিল।"

বিতরণের রিপোর্ট।

সোমপাড়া কেন্দ্র—২৯শে জুন।

গ্রাম।	পরিবার।	সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিসংখ্যা।	সাহায্য পরিমাণ।
সোমপাড়া	২৫	৩২	১॥৩
মহৎপুর	৪	৫	।০
বালিহর পাড়া	৬	১০	॥০
মামুদপুর	১	২	৴৪
পলিত পাড়া	৪	৫	।০
মালোপাড়া	৩	৩	৴৬
বিনুপাড়া	২	২	৴৪
ফকিদপুর	৬	৮	।৬
নূতন পাড়া	১	৪	৴৮
বাছড়া	৩	৩	৴৬
নারিকেল বাড়ী	১	১	৴২
১১টী গ্রাম	৫৬	৭৫	৩৸০

৭ই জুলাই ঐ।

গ্রাম।	পরিবার।	সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিসংখ্যা।	সাহায্য পরিমাণ।
পূর্ব্বের ১১টী গ্রাম	১২২	১৬৫	৮।০
মিল্কি	৪৪	৬০	৩৵০
ঘোলা	১৬	২১	১৵২
১৩টী গ্রাম	১৮২	২৪৬	১২।২ সের।

মহুলা কেন্দ্র—২রা জুলাই।

তাজপাড়া	১৬	৪৩	২৵৬
ধওবাপাড়া	৪	৫	।০
খিদিবপুর	৬	১১	॥২
শঙ্কর পাড়া	১	১	৵২
পাঠানপুব	১	২	৵৬
বনিনামপুব	১	১	৵২
রাজাপুর	১	১	৵২
চক্রমাঠ	১	২	৵৪
মহুলা	২	৭	।৪
শিবনগর	৩	৬	।২
১০টী গ্রাম	৩৬	৭৯	৩৸৮

প্রতি সপ্তাহে ২০০৲ টাকা করিয়া না পাঠাইলে এই দুইটী কেন্দ্র চালাইতে পারা যাইবে না।

পুরী জেলার ফতেপুব ও তিতিপ কেন্দ্রে পূর্ব্ববৎ কার্য্য চলিতেছে। যদিও বৃষ্টি আরম্ভ হইযাছে, তথাপি সেখানে লোকেব কষ্ট এখনও বাড়িতেছে। কাবণ, যাহাদের পূর্ব্বে কিছু ধান্যাদি সঞ্চিত ছিল, তাহা সমুদয ফুবাইয়া যাওযায—তাহারাও দলে দলে আসিয়া আমাদেব সাহায্য তালিকাভুক্ত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত কলেবা, শোষ, রক্তামাশায প্রভৃতি বোগেব অতিশয প্রাদুর্ভাব। এখানেও সাপ্তাহিক ৪০০৲ টাকা না পাঠাইলে আব চলিবে না। এই দুই স্থানের শেষ যে কার্য্যবিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রদত্ত হইল।

ফতেপুর কেন্দ্র (পুরী)।

গ্রাম।	পরিবার।	সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিসংখ্যা।	সাহায্য পরিমাণ।
৪৬	৪১৬	৭১৯	৩৫৸৮

তিতিপ কেন্দ্র (পুরী)।

৩৭	৩১৩	৫৫২	২৭৷৪

পূর্ব্বে আমাদেব সাপ্তাহিক ব্যয ৩০০৲ টাকা হইতেছিল, তাহাব স্থানে এক্ষণে ৬০০৲ করিয়া হইবে। অন্ততঃ আবো ৩ মাস কাজ চালাইতে হইবে।

আমবা এখানে কৃতজ্ঞতা সহকাবে প্রকাশ কবিতেছি যে, পুরীব সহৃদয় কলেক্টব হ্যামিল্টন সাহেব ঐ জেলার ভদ্রমহিলাগণেব সাহায্যার্থ আমাদেব হস্তে ৫০০৲ টাকা দিযাছেন এবং পরে আবো সাহায্য করিবেন বলিয়া আশা দিযাছেন। এই কলেক্টবটী খুব ভাল লোক। ইনি দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান সমূহ পবিদর্শনকালে একটী কলেরা বোগাক্রান্ত বোগীকে স্বহস্তে সেবাশুশ্রূষা কবেন, কিন্তু কোন মতে তাহাকে বাঁচাইতে না পাবায অবশেষে নিজহস্তে তাহাব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন কবেন।

পুরী জেলার সদানন্দ পট্টনায়ক দরিদ্রগণকে বিতরণের জন্য ৫০ জোড়া নূতন কাপড় এবং বিখ্যাত ঔষধ বিক্রেতা বটকৃষ্ণ পাল মহাশয ২ ডজন ক্লোবোডাইন ও ৬ বোতল এডওয়ার্ডস্ টনিক দিযাছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষফণ্ডে প্রাপ্তি স্বীকার।

:০:

(১৭ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১০ই আষাঢ় পর্য্যন্ত)।

আষাঢ়ের উদ্বোধনে স্বীকৃত	৭৫৬৮।৶৮ পাই	শেঠ পেশুমল আব্রান, সিন্ধু	৫০৲
পি, এল, ভাসোয়ানি, সিন্ধু	৬২॥৵০	বি, বসু বর্ম্মন্, দেওঘর	৫৲
ঐ ঐ	১০০৲	লক্ষ্মণ অর্জ্জুন	২৲
কে, ঘোষ, ফরিদপুর	২৲	ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা	১॥০
ডঃ সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা	১০৲	রামকৃষ্ণ অনাথবন্ধু সমিতি, শালকিয়া	৫০৲
		পি, এল, ভাসোয়ানি, সিন্ধু	১০০৲

রাধিকা প্রসাদ, মুঙ্গের	১৲	ত্রৈলোক্য নাথ পাল, মেদিনীপুর	২৲
রামকৃষ্ণ মিশন, মিরাট	২৫৲	কৃষ্ণরাও বাবুরাও মহস্কার, বোম্বাই	৬৲
জয়গোপাল রায়, খুলনা	১৪৷৵০	সুচারুভূষণ ঘোষ, কলিকাতা	৮৵০
শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ, কালিঘাট	১০।০	সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জেনারল পোষ্ট আফিস, বোম্বাই	৬।৵০
শ্যামাচরণ দে	৩৲	গিরিবালা দেবী, ঢাকা	১৫৲
নাজিয়ারাম ব্যাঙ্করি, ফিরোজপুর	১০৲	পি, এল, ভাসোয়ানি, সিন্ধু	২০০৲
প্রেসিডেণ্ট, এস, ভি, সভা, উত্তকমন্দ	৬৪৷০	জনৈক বন্ধু, অষ্ট্রেলিয়া	৭৫৲
এস, ডি, দেশাই, বোম্বাই	১৫৲	বুলচাঁদ মতিরাম, সিন্ধু	৫৲
শিবাজী সমিতি	৪৵৩	দৌলতরাম দয়ারাম, ভিরিয়া	৭৫৲
মাঃ কানাইলাল রায়, কলিকাতা	১৯৷৵০	পি, এল, ভাসোয়ানি, সিন্ধু	২০০৲
বিভিন্ন স্থান হইতে লব্ধ চাল বিক্রী হইতে প্রাপ্ত	২১৸৵৩	ঐ ঐ	২০০৲
অমরেন্দ্র নাথ দত্ত	।৴০	এ, সি, মুখোপাধ্যায়, প্রতাপগড়	৪৲
বালিগঞ্জ সেবক সমিতি	৭৫৲	ভবাণী চরণ আচার্য্য	৩৲
আশারঞ্জন সেন, কলিকাতা	২৲	ক্ষিতিনাথ ঘোষ	১১৷৴০
কুঞ্জলাল চন্দ্র, কলিকাতা	২৲	সর্ব্বশুদ্ধ মোট—৯০৯৩।৫ পাই	

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি পাওয়া গিয়াছে,—

মুখি কেয়ান সং, হায়দরাবাদ (কাপড়), ঘোষ ব্রাদার্স, কটক (ঔষধ), হীরালাল রায়, কলিকাতা (কলেরা পিল), শিবাজী সমিতি, (চাল ৩ মণ ৩৫ সের), মাঃ শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্ত, কলিকাতা, (চাল ১ মণ ২ সের ১২ ছটাক)।

যিনি যাহা সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন (চাল, কাপড়, কলেরার ঔষধ প্রভৃতি) তাহা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া) অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, ৩০ নং বসুপাড়া লেন, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা— ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

স্বামী বিমলানন্দের মহাসমাধি।

গত ৯ই শ্রাবণ, ইংরাজী ২৪শে জুলাই, শুক্রবার প্রাতে, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের হিমালয়স্থ অদ্বৈত আশ্রমে স্বামী বিমলানন্দ মহাসমাধি মগ্ন হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স বোধ হয় ৩৮ বৎসরের অধিক হয় নাই। স্বামীজির এত অল্প বয়সে দেহত্যাগে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের যে কতদূর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা জানাইবার নহে। আগামীবারে এই মহাপুরুষের জীবনি এবং সুলেখনী প্রসূত একটী প্রবন্ধ গ্রাহক বর্গের সমক্ষে ধারণ করিতে আমাদের ইচ্ছা রহিল।

মূলানুবাদ। হে পার্থ! আসঙ্গ এবং ফলসমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই ত্রিবিধ কর্ম্ম করাই উচিত, ইহাই আমার নিশ্চিত এবং উত্তম মত। ৬।

ভাষ্য। এতান্যপি। এতান্যপি তু কর্ম্মাণি যজ্ঞদানতপাংসি পাবনানি উক্তানি, সঙ্গমাসক্তিং তেষু ত্যক্ত্বা ফলানি চ তেষাং ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য কর্ত্তব্যানি অনুষ্ঠেয়ানি ইতি মে নিশ্চিতং মতমুত্তমং। "নিশ্চযং শৃণু মে তত্রে" তি প্রতিজ্ঞায পাবনত্বং চ হেতুমুক্ত্বা এতান্যপি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানীত্যেতন্নিশ্চিতং মতমুত্তমমিতি প্রতিজ্ঞাতার্থোপসংহার এব, নাপূর্ব্বার্থং বচনমেতান্যপীতি, প্রকৃতসংনিকৃষ্টার্থতোপপত্তেঃ। সাসঙ্গস্য ফলার্থিনো বন্ধহেতব এতানি কর্ম্মাণি মুমুক্ষোঃ কর্ত্তব্যানি ইত্যপিশব্দার্থঃ ন ত্বন্যানি কর্ম্মাণি অপেক্ষ্য এতান্যপীত্যুচ্যতে। অন্যে বর্ণয়ন্তি নিত্যানাং কর্ম্মণাং ফলাভাবাং "সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ" ইতি নোপপদ্যতে। এতান্যপীতি যানি কাম্যানি কর্ম্মাণি নিত্যেভ্যঃ অন্যানি এতান্যপি কর্ত্তব্যানি কিমুত যজ্ঞদানতপাংসি নিত্যানি ইতি। তদসং। নিত্যানামপি কর্ম্মণাং ফলবত্ত্বস্যোপপাদিতত্বাং। "যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানী" ত্যাদিবচনেন নিত্যান্যপি কর্ম্মাণি বন্ধহেতুত্বাশঙ্কযা জিহাসোর্মুমুক্ষোঃ, কুতঃ কাম্যেষু প্রসঙ্গঃ। "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম" ইতি চ নিন্দিতত্বাং। 'যজ্ঞার্থাং কর্ম্মণোঽন্যত্র" ইতি চ কাম্যকর্ম্মণাং বন্ধহেতুত্বস্য নিশ্চিতত্বাং। "ত্রৈগুণ্যবিষযাবেদাঃ" "ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ" "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" ইতি দূরব্যবহিতত্বাং চ ন কাম্যেষু এতান্যপীতি ব্যপদেশঃ। ৬।

ভাষ্যানুবাদ। এতান্যপি ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ—এই ত্রিবিধ যজ্ঞ, দান, ও তপস্যারূপ কর্ম্মসমূহ পাবন বলিযা উক্ত হইযাছে, সেই ত্রিবিধ কর্ম্মসমূহে "সঙ্গ" আসক্তি পরিত্যাগ করিযা, এবং সেই ত্রিবিধকর্ম্মের ফলনিচযকেও পরিত্যাগ করিযা, ঐ ত্রিবিধ কর্ম্ম "কর্ত্তব্য" অনুষ্ঠেয়, ইহাই আমার নিশ্চিত এবং উত্তম মত। "সেই বিষযে নিশ্চয় শুন" এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া, পাবনত্বই (কর্ম্মানুষ্ঠানের) হেতু নির্দ্দেশ করিযা "এই সকল কর্ম্ম করাই উচিত" এই প্রকার বলিযা শেষে বলা হইযাছে "ইহাই আমার নিশ্চিত এবং উত্তম মত"। ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ভগবান্ প্রতিজ্ঞাত অর্থের উপসংহারই করিতেছেন, অন্য কোন প্রকার যে নূতন অর্থের অবতারণা করিতেছেন, তাহা নহে। কারণ, এই কর্ম্ম সকল—এই প্রকার নির্দ্দেশ করিলে, নিকটে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই বুঝান হয, এই প্রকার কল্পনাই সুসঙ্গত। যাহার কর্ম্মে আসক্তি আছে, যে, কর্ম্মের ফলে স্পৃহাবান্, তাহার পক্ষে বন্ধের কারণ

হইলেও মুমুক্ষুরও এই সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য—ইহাই অপিশব্দটীর দ্বারা সূচিত হইতেছে। অন্য কোন প্রকার কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া যে "এতানি' (—এই সকল) "অপি' (—ও) এই দুইটী শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা নহে। অন্য কেহ কেহ এই প্রকার বর্ণন করিয়া থাকেন যে, নিত্যকর্ম্মসমূহের কোন ফল নাই, (নিত্যকর্ম্ম) না করিলে প্রত্যবায় হয়, করিলে কোন স্বর্গাদি ফল হয় না। সুতরাং নিত্যকর্ম্ম-সমূহকে অপেক্ষা করিয়া, "ফলপরিত্যাগ পূর্ব্বক" এই প্রকার অর্থ সঙ্গত হয় না। সুতরাং "এতান্যপি" এই শব্দের দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, যখন এই সকল কাম্য কর্ম্মও করিতে হইবে, তখন যজ্ঞ, দান ও তপোরূপ নিত্যকর্ম্ম সমূহও যে করিতেই হইবে সে বিষয়ে আর অধিক করিয়া কি বক্তব্য হইতে পারে। এই প্রকার বর্ণনও ঠিক নহে, নিত্য কর্ম্মসমূহেরও ফল আছে, তাহা পূর্ব্বেই উপপাদিত হইয়াছে। যজ্ঞ, দান এবং তপঃ এই ত্রিবিধ কর্ম্মই পাবন, এই কথার দ্বারা সূচিত হইতেছে, যে বন্ধের হেতু বলিয়া নিত্যকর্ম্মসমূহকে পরিত্যাগ করিতে চাহে যে মুমুক্ষুব্যক্তি, তাহার পক্ষে কাম্যকর্ম্মের প্রসঙ্গ কি প্রকারে হইতে পারে? কারণ "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম" (—কর্ম্ম অতিশয় জঘন্য) ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা কাম্য কর্ম্মের নিন্দা করা হইয়াছে। "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র" (পরমেশ্বরের প্রীতির জন্য যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত না হয় তাহাতেই লোক বদ্ধ হইয়া থাকে) ইত্যাদি বচনের দ্বারা কাম্যকর্ম্মসকল যে বন্ধের কারণ, তাহাও নিশ্চিত হইয়াছে। "ত্রৈগুণ্য বিষয়াবেদাঃ," (—বেদসমূহের বিষয় ত্রৈগুণ্য অর্থাৎ সংসার) "ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ" (—সোমপায়ী ত্রিবেদবিদ্‌গণ আমাকে উপসনা করিয়া ইত্যাদি) "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি" (—পুণ্যক্ষয় হইলে তাহারা আবার মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করিয়া থাকে) ইত্যাদি বহুতর বাক্যের দ্বারা কাম্য কর্ম্ম সকল সন্ন্যাসী আত্মজ্ঞ হইতে বহুদূরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া এইস্থলে "এতান্যপি" এই বচন দ্বারা কাম্যকর্ম্ম প্রতিপাদিত হইতেছে, ইহা কখনই বলা যায় না। ৬।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণোনোপপদ্যতে।
মোহাৎতস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়। নিয়তস্য কর্ম্মণঃ সন্ন্যাসঃ ন উপপদ্যতে। মোহাৎ তস্য পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ৭।

মূলানুবাদ। নিত্য কর্ম্মের সন্ন্যাস উপপন্ন হইতে পারে না। অজ্ঞান বশতঃ যে নিত্য কর্ম্ম পরিত্যাগ তাহা তামস সন্ন্যাস। ৭।

ভাষ্য। তস্মাদজ্ঞস্যাধিকৃতস্য মুমুক্ষোঃ, নিয়তস্য নিত্যস্য, সন্ন্যাসঃ পরিত্যাগঃ, কর্ম্মণো নোপপদ্যতে অজ্ঞস্য পাবনত্বস্য ইষ্টত্বাৎ মোহাৎ অজ্ঞানাৎ তস্য নিয়তস্য পরিত্যাগঃ। নিয়তং চাবশ্যং কর্ত্তব্যং ত্যজ্যতে চেতি বিপ্রতিষিদ্ধমতো মোহ-নিমিত্তঃ পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ মোহশ্চ তম ইতি। ৭।

ভাষ্যানুবাদ। সেই কারণে যে ব্যক্তি মুমুক্ষু অথচ অনাত্মজ্ঞ, সেই ব্যক্তি নিত্য কর্ম্মে অধিকারী—তাহার পক্ষে—"নিয়ত" নিত্য কর্ম্মের "সন্ন্যাস" পরিত্যাগ যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ, অজ্ঞের নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধির একান্ত আবশ্যকতা আছে। "মোহ" অজ্ঞান বশতঃ সেই নিয়ত কর্ম্মের যে পরিত্যাগ (তাহা তামস)। নিত্য কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য, যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহার আবার ত্যাগ (জানিয়া শুনিয়া) কিরূপে করিতে পারা যায়? সুতরাং নিত্য কর্ম্মের পরিত্যাগ এইরূপ কথন পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, এই প্রকার শঙ্কা নিরাস করিবার জন্যই বলিতেছেন যে, এই পরিত্যাগ তামস অর্থাৎ অজ্ঞানকৃত, কারণ, "মোহ" অজ্ঞান ও তমঃ একই পদার্থ। ৭।

দুঃখমিত্যেব যঃ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়। দুঃখং ইত্যেব কায়ক্লেশভয়াৎ কর্ম্ম যঃ ত্যজেৎ স রাজসং ত্যাগং কৃত্বা নৈব ত্যাগফলং লভেৎ। ৮।

মূলানুবাদ। দুঃখজনক এইরূপ বিবেচনা করিয়া শরীরের ক্লেশের ভয়ে যে নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সে রাজস ত্যাগ করিয়া ত্যাগের ফল প্রাপ্ত হয় না। ৮।

ভাষ্য। কিঞ্চ দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ শরীরদুঃখভয়াৎ, ত্যজেৎ পরিত্যজেৎ, স কৃত্বা রাজসং রজোনির্বৃত্তং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং জ্ঞান-পূর্ব্বকস্য সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসস্য ফলং মোক্ষাখ্যং, ন লভেৎ নৈব লভতে। ৮।

ভাষ্যানুবাদ। আরও—দুঃখকর এই জন্য শরীরের ক্লেশ হইবে এই ভয়ে যে কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে "রাজস" রজোগুণ প্রযুক্ত ত্যাগ করিয়া ত্যাগের অর্থাৎ জ্ঞান-পূর্ব্বক-কৃত সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসের "ফল" মোক্ষ কিছুতেই লাভ করিতে পারে না। ৮।

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়। হে অর্জ্জুন সঙ্গং ফলং চ ত্যক্ত্বা যৎ নিয়তং কর্ম্ম কার্য্যমিত্যেব ক্রিয়তে স সাত্ত্বিকঃ ত্যাগোমতঃ। ৯।

মূলানুবাদ। হে অর্জ্জুন। আসক্তি ও ফলকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে যে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, সেই অনুষ্ঠানকেই সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া (শাস্ত্রকারগণ) বিবেচনা করিয়া থাকেন। ৯।

ভাষ্য। কঃ পুনঃ সাত্ত্বিকস্ত্যাগঃ—কার্য্যং কর্ত্তব্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং নিত্যং ক্রিয়তে নির্বর্ত্ত্যতে, হে অর্জ্জুন সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব। নিত্যানাং কর্ম্মণাং ফলবত্ত্বে ভগবদ্বচনং প্রমাণমবোচাম। অথবা যদ্যপি ফলং ন শ্রূয়তে নিত্যস্য কর্ম্মণঃ—তথাপি নিত্যং কর্ম্ম কৃতং আত্মসংস্কারং প্রত্যবায় পরিহারং বা ফলং করোত্যাত্মনঃ ইতি কল্পয়ত্যেবাজ্ঞঃ, তত্র তামপি কল্পনাং নিবারয়তি, ফলং ত্যক্ত্বেত্যনেন অতঃ সাধূক্তং সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চেতি। স ত্যাগো নিত্য-কর্ম্মসু সঙ্গফলপরিত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ সত্ত্বনির্বৃত্তঃ, মতোঽভিমতঃ। নন্বু কর্ম্ম-পরিত্যাগস্ত্রিবিধঃ সন্ন্যাস ইতি চ প্রকৃতস্তত্র রাজসস্তামসশ্চোক্তস্ত্যাগঃ কথমিহ সঙ্গফলত্যাগস্তৃতীয়ত্বেনোচ্যতে, যথা ত্রয়ো ব্রাহ্মণা আগতাস্তত্র ষড়ঙ্গবিদৌ দ্বৌ ক্ষত্রিয়স্তৃতীয়স্তদ্বৎ ইতি। নৈষ দোষঃ, ত্যাগসামান্যেন স্তুত্যর্থত্বাৎ। অস্তি হি কর্ম্মসন্ন্যাসস্য ফলাভিসন্ধিত্যাগস্য চ ত্যাগত্বং সামান্যং তত্র রাজসতামসত্বেন ত্যাগনিন্দয়া কর্ম্মফলাভিসন্ধিত্যাগঃ সাত্ত্বিকত্বেন স্তূয়তে স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমত ইতি। ৯।

ভাষ্যানুবাদ। সাত্ত্বিক ত্যাগ কিরূপ? (তাহাই বলিতেছেন যে) "কার্য্য" কর্ত্তব্য এই প্রকার স্থির করিয়া, যে "নিয়ত" নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়। (কি ভাবে করা যায়?) সঙ্গ এবং ফলকে পরিত্যাগ করিয়া। নিত্য কর্ম্ম ও যে সফল, সেই বিষয়ে ভগবানের এই বাক্যই প্রমাণ, ইহাই আমরা বলিয়াছি। অথবা (যদি একান্ত নিত্য কর্ম্মের কোন ফল নাই এই প্রকার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে হয় তাহা হইলে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই ভাবে বর্ণন করিতে হইবে যে) যদ্যপি নিত্য কর্ম্মের ফল শাস্ত্রে বিহিত নাই থাকে, তাহা হইলেও নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইলে, তাহা আত্মাতে নূতন কোন সংস্কার বা প্রত্যবায় পরিহাররূপ, ফলকে উৎপাদিত করিবেই—এই প্রকার কল্পনা অনাত্মজ্ঞের হৃদয়ে হইতে পারে, সেই কল্পনাকেও নিবারণ করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন

যে "সঙ্গ ও ফলকে পরিত্যাগ করিয়া" সেই ত্যাগ অর্থাৎ নিত্য কর্ম্মসমূহের সঙ্গ ও ফলের পরিত্যাগই সাত্ত্বিক ত্যাগ, যাহা সত্ত্বগুণের কার্য্য তাহাই সাত্ত্বিক। এক্ষণে এরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, সন্ন্যাস বা কর্ম্মপরিত্যাগ ত্রিবিধ এই প্রকার পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিযা রাজস এবং তামস এই দ্বিবিধ কর্ম্মেরই পরিত্যাগ প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু এই শ্লোকে যে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলা হইতেছে, তাহাত আর কর্ম্ম পরিত্যাগ নহে, তাহা কর্ম্মের ফল ত্যাগ, (ফলত্যাগ কিন্তু প্রক্রান্ত নহে কর্ম্মত্যাগই প্রক্রান্ত,) ফলে দাঁড়াইতেছে যেমন, তিনজন ব্রাহ্মণ আসিযাছেন এই প্রকাব বলিয়া, যদি কেহ বলে যে, ঐ তিন জনের মধ্যে দুইজন ষড়ঙ্গবিদ্ ব্রাহ্মণ, আর তৃতীয ব্যক্তি একজন ক্ষত্রিয়, তাহা হইলে তাহার কথা যেমন পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ হয়, এই স্থলেও সেইরূপ পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ কথনই হইতেছে। এই প্রকার শঙ্কাও ঠিক নহে। কারণ (কর্ম্মত্যাগ বা কর্ম্মফলত্যাগ এইরূপ বিশেষভাবে ত্যাগের উল্লেখ না করিয়া) সামান্যভাবে ত্যাগত্বরূপে—কর্ম্মত্যাগের সহিত, কর্ম্মফল ত্যাগের যে সাধর্ম্ম্য আছে, তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া ভগবান্ এইভাবে কর্ম্মফলত্যাগের স্তুতি করিয়াছেন। কর্ম্মফলত্যাগ এবং কর্ম্মত্যাগ এই উভযেরই ত্যাগত্বরূপ সামান্য ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিযাছে, তাহার মধ্যে কর্ম্মত্যাগ রাজস ও তামস হইলে উহা নিন্দিত হয়, সেই নিন্দাদ্বারা এস্থানে (প্রকারান্তরে) সাত্ত্বিক কর্ম্মফল ত্যাগেরই প্রশংসা করা হইতেছে, এই জন্য (ভগবান্ বলিতেছেন যে) সেই ত্যাগই সাত্ত্বিক বলিযা অভিমত। ৯।

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবীচ্ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ মেধাবী ছিন্নসংশযঃ ত্যাগী অকুশলং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি কুশলে (কর্ম্মণি চ) ন অনুষজ্জতে। ১০।

মূলানুবাদ। সত্ত্বগুণযুক্ত মেধাবী ও ছিন্নসংশয় ত্যাগী অকুশল কর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ করে না এবং কুশল কর্ম্মেও আসক্ত হয় না। ১০।

ভাষ্য। যস্ত্বধিকৃতঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলাভিসন্ধিং চ, নিত্যং কর্ম্ম করোতি তস্য ফলরাগাদিনা অকলুষীক্রিয়মাণং অন্তঃকরণং নিত্যৈশ্চ কর্ম্মভিঃ সংস্ক্রিয়মাণং বিশুধ্যতি। বিশুদ্ধং প্রসন্নমাত্মালোচনক্ষমং ভবতি। তস্যৈব নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানেন বিশুদ্ধান্তঃকরণস্য আত্মজ্ঞানাভিমুখস্য ক্রমেণ যথা তন্নিষ্ঠা স্যাৎ

তদ্বক্তব্যমিত্যাহ ন দ্বেষ্টি অকুশলং অশোভনং কাম্যং কর্ম্ম শরীরারম্ভদ্বারেণ সংসারকারণং কিমনেন ইত্যেবং। কুশলে শোভনে নিত্যকর্ম্মণি সত্ত্বশুদ্ধি-জ্ঞানোৎপত্তিতন্নিষ্ঠাহেতুত্বেন মোক্ষকারণমিদমিত্যেবং নানুষজ্জতে, তথাপি প্রয়োজনমপশ্যন্ অনুষঙ্গং প্রীতিং ন করোতি ইত্যেতৎ। কঃ পুনরসৌ ত্যাগী পূর্ব্বোক্তেন কর্ম্মফলত্যাগেন তদ্বান্ ত্যাগী, যঃ কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা তৎফলঞ্চ নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠায়ী, স ত্যাগী। কদা পুনরসাবকুশলং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি কুশলে চ নানুষজ্জতে ইত্যুচ্যতে—সত্ত্বসমাবিষ্টঃ যদা সত্ত্বেন আত্মানাত্মবিবেকবিজ্ঞান-হেতুনা সমাবিষ্ট সংব্যাপ্তঃ সংযুক্ত ইত্যেতৎ। অতএব মেধাবী মেধয়া আত্ম-জ্ঞানলক্ষণপ্রজ্ঞয়া সংযুক্তঃ তদ্বান্মেধাবী মেধাবত্ত্বাদেবচ্ছিন্নসংশয়ঃ ছিন্নঃ অবিদ্যাকৃতঃ সংশয়ঃ যস্য আত্মস্বরূপাবস্থানমেব পরং নিঃশ্রেয়সসাধনং নান্যৎ কিঞ্চিৎ ইত্যেবং নিশ্চয়েন ছিন্নসংশয়ো যোঽধিকৃতঃ পুরুষঃ পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ কর্ম্মযোগানুষ্ঠানেন ক্রমেণ সংস্কৃতাত্মা সন্, জন্মাদিবিক্রিয়ারহিতত্বেন নিষ্ক্রিয়মাত্মানমাত্মত্বেন সংবুদ্ধঃ স এব সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্য নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্নাসীনো নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাং জ্ঞাননিষ্ঠামশ্নুতে ইতি পূর্ব্বোক্তস্য কর্ম্মযোগস্য প্রয়োজনমনেন শ্লোকেন উক্তম্। ১০।

ভাষ্যানুবাদ। যে ব্যক্তি অধিকৃত হইয়া, সঙ্গ এবং ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার অন্তঃকরণ ফলবিষয়ে অনুরাগাদি দ্বারা কলুষিত হয় না—এবং নিত্যকর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠানের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া শুদ্ধিলাভ করে। অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ এবং প্রসন্ন হইলে আত্মার স্বরূপালোচনা করিতে সমর্থ হয়। সেই অধিকৃত ব্যক্তির বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ আত্মজ্ঞানের অভিমুখ হইলে, ক্রমে যে ভাবে তাহার জ্ঞাননিষ্ঠা উৎপন্ন হয়, তাহাই বলিতে হইবে এইজন্য বলিতেছেন যে, "অকুশল" অশোভন কর্ম্ম অর্থাৎ কাম্য কর্ম্ম, শরীরারম্ভদ্বারা সংসারের কারণ, সুতরাং ইহাদ্বারা আমার কি লাভ? এইভাবে, কাম্য কর্ম্মের প্রতি যে ব্যক্তি দ্বেষ করে না, এবং নিত্যকর্ম্মই কুশল, অর্থাৎ শোভন কর্ম্ম, কারণ, নিত্যকর্ম্ম চিত্ত শুদ্ধি ও জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা মোক্ষলাভের হেতু হয়, এই ভাবিয়া সেই নিত্যকর্ম্মের প্রতি যে আসক্তও না হয়, অর্থাৎ তাহাতেও কোনপ্রকার প্রয়োজন না দেখিতে পাইয়া যাহার অনুষঙ্গ বা প্রীতি হয় না। কে এইপ্রকার হয়? ত্যাগী, পূর্ব্বোক্তপ্রকারে কর্ম্মফল পরিত্যাগ যে করে সেই ত্যাগী, যে ব্যক্তি—সঙ্গ এবং কর্ম্মফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে সেই এইখানে ত্যাগী (বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে)

কোন সময়ে সে অকুশল কর্ম্মের উপর বিদ্বেষ করে না এবং কুশল কর্ম্মের প্রতি আসক্তিপর হয় না তাহাই বলা হইতেছে "সত্ত্বসমাবিষ্ট" যে সময় আত্মা ও অনাত্মার বিবেকজ্ঞানের হেতু সত্ত্বগুণ অধিক হইয়া, তাহাকে ব্যাপিয়া ফেলে তখনই সে সত্ত্বসমাবিষ্ট হয় (এবং কুশল এবং অকুশল কর্ম্মের প্রতি যথাক্রমে দ্বেষ বা আসক্তিপর হয় না), অতএব সে মেধাবী, মেধা অর্থাৎ আত্মজ্ঞানরূপ প্রজ্ঞা, সেই প্রজ্ঞা যাহার আছে, সেই মেধাবী, মেধাবিত্ব নিবন্ধনই ছিন্নসংশয়, আত্মার স্বরূপে অবস্থানই পরম-নিঃশ্রেয়স সাধন, অন্য কোন উপায়ে নিঃশ্রেয়স হইতে পারে না, এইপ্রকার নিশ্চয়ের দ্বারা যাহার অবিদ্যা জনিত সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, তাহাকে ছিন্নসংশয় বলা গিয়া থাকে। যে অধিকৃত পুরুষ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান দ্বারা ক্রমে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়। এবং আত্মা জন্মাদি বিকারহীন সুতরাং নিষ্ক্রিয়—এইভাবে আত্মাকে বুঝিতে সমর্থ হয়, সেই ব্যক্তি সকল কর্ম্মকেই মনের দ্বারা সন্ন্যাস করে এবং প্রকৃতপক্ষে কোন কার্য্যই করে না এবং কাহারও দ্বারা করায়ও না, এইরূপে সেই ব্যক্তি নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিরূপ জ্ঞাননিষ্ঠাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপ বলিয়া ভগবান্ এই শ্লোকের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানযোগের প্রয়োজন প্রদর্শন করিতেছেন। ১০।

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১॥

অন্বয়। দেহভৃতা অশেষতঃ কর্ম্মাণি ত্যক্তুং ন শক্যং হি, যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীতি অভিধীয়তে। ১১।

মূলানুবাদ। দেহাভিমানী কিছুতেই একেবারে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, যে কর্ম্মফলকে পরিত্যাগ করে, সেই ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ১১।

ভাষ্য। যঃ পুনরধিকৃতঃ সন্ দেহাত্মাভিমানিত্বেন দেহভৃদজ্ঞোঽবাধিতাত্মকর্তৃত্ববিজ্ঞানতয়া অহংকর্ত্তেতি নিশ্চিতবুদ্ধিঃ তস্য অশেষকর্ম্মপরিত্যাগস্যাশক্যত্বাৎ কর্ম্মফলত্যাগেন চোদিতকর্ম্মানুষ্ঠান এবাধিকারঃ ন তত্ত্যাগ ইত্যেতমর্থং দর্শয়িতুমাহ—ন হি যস্মাৎ দেহভৃতা দেহং বিভর্ত্তি ইতি দেহভৃৎ দেহাত্মাভিমানবান্ দেহভৃদুচ্যতে, নহি বিবেকী, স হি "বেদাবিনাশিন" মিত্যাদিনা কর্তৃত্বাধিকারান্নিবর্ত্তিতঃ তেন দেহভৃতা অজ্ঞেন ন শক্যং ত্যক্তুং সন্ন্যসিতুং কর্ম্মাণি অশেষতঃ নিঃশেষেণ। তস্মাদ্ যস্তু অজ্ঞোঽধিকৃতোনিত্যানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্

কর্ম্মফলত্যাগী কর্ম্মফলাভিসন্ধিমাত্রসন্ন্যাসী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে কর্ম্মী অপি সন্ ইতি স্তুত্যভিপ্রায়েণ। তস্মাৎ পরমার্থদর্শিনা এব অদেহভৃতা দেহাত্মভাব-রহিতেন অশেষকর্ম্মসংন্যাসঃ শক্যতে কর্ত্তুম্। ১১।

ভাষ্যানুবাদ। যে ব্যক্তি—কর্ম্মে অধিকৃত হইয়া দেহের উপর আত্মাভিমান করিয়া থাকে বলিয়া, দেহভৃৎপদবাচ্য হয়, সেই ব্যক্তি অজ্ঞ, কারণ, তাহার আত্মাতে কর্তৃত্বজ্ঞান বাধিত হয় নাই, তাহার "আমি কর্ত্তা" এইপ্রকার নিশ্চয় বিদ্যমান আছে বলিযা, সকলপ্রকার কর্ম্ম একেবাবে পরিত্যাগ করিবার সামর্থ্য নাই, সুতরাং কর্ম্মফল পবিত্যাগ পূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই তাহার অধিকার আছে, কর্ম্মত্যাগে তাহাব অধিকার নাই, এই অর্থটীকে দেখাইবার জন্য বলিতেছেন যে, যে কারণে, "দেহভৃৎ" দেহকে যে ধারণ করে সেই দেহভৃৎ অর্থাৎ যাহার দেহেতে আত্মাভিমান আছে সেই দেহভৃৎ বলিযা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, বিবেকী পুরুষ এস্থলে দেহভৃৎ এই শব্দের অর্থ নহে। "বেদাবিনাশিনং" ইত্যাদি শ্লোকে তাহার যে কোন কর্ম্মে অধিকার নাই তাহা প্রদর্শিত হইযাছে। সুতরাং দেহভৃৎ এই শব্দটীর অর্থ অনাত্মতত্ত্বজ্ঞ, সেই দেহভৃতের একেবারে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার সামর্থ্য নাই। সেই কারণে, যে অজ্ঞ অথচ নিত্যকর্ম্মে অধিকৃত হইযা "কর্ম্মফল ত্যাগ" কর্ম্ম ফল লাভের প্রতি সর্ব্বপ্রকার অভিসন্ধিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক—নিত্য কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান করিযা থাকে, সে কর্ম্মী হইলেও ত্যাগী বলিযা অভিহিত হয়। ইহা স্তুতির অভিপ্রায়ে বলা হইতেছে। সুতরাং যে পরমার্থদর্শী অতএব দেহভৃৎ নহে অর্থাৎ যাহার দেহের উপর আত্মভাব বিনষ্ট হইযাছে, সেই বিবেকীই সকল প্রকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। ১১।

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলং।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥ ১২॥

অন্বয়। কর্ম্মণঃ অনিষ্টং ইষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং ফলং অত্যাগিনাং প্রেত্য ভবতি সংন্যাসিনাং ক্বচিৎ ন ভবতি।১২।

মূলানুবাদ। অত্যাগিগণেরই মরণের পর ইষ্ট অনিষ্ট ও মিশ্ররূপ ত্রিবিধ কর্ম্মফলের ভোগ হইয়া থাকে। সন্ন্যাসিগণের কখনও কর্ম্মফলের ভোগ হয় না। ১২।

ভাষ্য। কিং পুনস্তৎ প্রয়োজনং যৎ সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগাৎ স্যাৎ ইত্যুচ্যতে, অনিষ্টং নরকতির্য্যগাদিলক্ষণং, ইষ্টং দেবাদিলক্ষণং, মিশ্রমিষ্টানিষ্টসংযুক্তং মনুষ্যলক্ষণং চৈবং ত্রিবিধং ত্রিপ্রকারং কর্ম্মণো ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণস্য ফলং বাহ্যানেককারকব্যাপারনিষ্পন্নং সদাঽবিদ্যাকৃতমিন্দ্রজালমায়োপমং মহামোহকরং প্রত্যগাত্মোপসর্পীব, ফল্গুতয়া লয়ং অদর্শনং গচ্ছতীতি ফলং, ইতি ফল নির্ব্বচনং, তদেতদেবং লক্ষণং ফলং, ভবতি অত্যাগিনাং অজ্ঞানাং কর্ম্মিণাং অপরমার্থ-সন্ন্যাসিনাং প্রেত্য শরীরপাতাদূর্দ্ধং। নতু পরমার্থসন্ন্যাসিনাং পরমহংস-পরিব্রাজকাণাং কেবলজ্ঞাননিষ্ঠানাং ক্বচিৎ। নহি কেবলসম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠা অবিদ্যাদিসংসারবীজং ন উন্মূলয়ন্তি কদাচিদিত্যর্থঃ। ১২।

ভাষ্যানুবাদ। কি সে প্রয়োজন? যাহা সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগ করিলে হইয়া থাকে, তাহাই বলা হইতেছে যে "অনিষ্ট" নরক বা তির্য্যগ্‌ যোনি প্রভৃতিতে যে জন্ম তাহাই অনিষ্ট শব্দের অর্থ। "ইষ্ট" দেবাদি লোকে জন্ম প্রভৃতি ইষ্টশব্দের অর্থ, "মিশ্র' ইষ্ট ও অনিষ্ট মিশ্রিত, মনুষ্য হইয়া জন্ম গ্রহণ মিশ্র শব্দের অর্থ। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম রূপ কর্ম্মের এই "ত্রিবিধ' তিন প্রকার ফল, এই ফলকে উৎপন্ন করিতে হইলে, বাহ্য অনেক প্রকার কারকব্যাপারের অপেক্ষা করিতে হয়, অথচ ইহা অবিদ্যারই কার্য্য, ইহা ইন্দ্রজাল ও মায়ার ন্যায় (অনির্ব্বাচ্য) এবং মহামোহের হেতু, ইহার সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও বোধ হয়, ইহা যেন আত্মার সহিত মিলিত হইয়াই রহিয়াছে, ইহা অত্যন্ত ফল্গু (তুচ্ছ) এবং শীঘ্রই লয় প্রাপ্ত হয়, এই কারণে ইহার নাম "ফল," ইহাই হইল ফল শব্দের ব্যুৎপত্তি, সেই এই প্রকার স্বভাবযুক্ত ফল (কাহাদের হয়?) যাহারা অত্যাগী—অজ্ঞ কর্ম্মী বা অপরমার্থসন্ন্যাসী তাহাদেরই দেহ পাতের পর এই ত্রিবিধ ফল (ভোগ) হইয়া থাকে। যাঁহারা পরমার্থসন্ন্যাসী পরমহংস-পরিব্রাজক ও কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ তাঁহাদের কোন সময়েই এই ত্রিবিধ কর্ম্মফলের ভোগ হয় না। যাঁহারা কেবল সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠ তাঁহারা যে অবিদ্যাদি সংসার বীজকে উন্মূলিত করেন না তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। ১২।

পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্‌॥ ১৩॥

অন্বয়। হে মহাবাহো কৃতান্তে সাংখ্যে সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে প্রোক্তানি পঞ্চ ইমানি কারণানি মে নিবোধ। ১৩।

মূলানুবাদ। হে মহাবাহো কর্ম্মসমাপ্তিবোধক বেদান্ত-শাস্ত্রে সকল প্রকার কর্ম্মের সিদ্ধিহেতু বলিয়া কথিত এই যে পাঁচটী কারণ উক্ত হইয়াছে, তুমি তাহা আমার নিকট হইতে বুঝিয়া লও। ১৩।

ভাষ্য। অতঃ পরমার্থদর্শিন এবাশেষকর্ম্মসন্ন্যাসিত্বং সংভবতি, অবিদ্যাধ্যারোপিতত্বাদাত্মনি ক্রিয়াকারকফলানাং, নত্বজ্ঞস্য অধিষ্ঠানাদীনি ক্রিয়া কর্তৃণি কারকাণি আত্মত্বেন পশ্যতোঽশেষকর্ম্মসন্ন্যাসঃ সম্ভবতি। তদেতদুত্তরৈঃ শ্লোকৈর্দর্শয়তি। পঞ্চ ইমানি বক্ষ্যমাণানি হে মহাবাহো কারণানি নির্ব্বর্ত্তকানি নিবোধ মে মমেতি। উত্তরত্র চেতঃসমাধানার্থং বস্তুবৈষম্যপ্রদর্শনার্থং তানি কারণানি জ্ঞাতব্যতয়া স্তৌতি। সাংখ্যে জ্ঞাতব্যাঃ পদার্থাঃ সংখ্যায়ন্তে যস্মিন্ শাস্ত্রে তৎ সাংখ্যং বেদান্তঃ। কৃতান্ত ইতি তস্যৈব বিশেষণং কৃতমিতি কর্ম্ম উচ্যতে, তস্যান্তঃ কৃতস্য পরিসমাপ্তিঃ যত্র স কৃতান্তঃ, কর্ম্মান্ত ইতি এতৎ। "যাবানর্থ উদপানে" "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" ইত্যাত্মজ্ঞানে সঞ্জাতে সর্ব্বকর্ম্মণাং নিবৃত্তিং দর্শয়তি। অতস্তস্মিন্ আত্মজ্ঞানার্থে সাংখ্যে কৃতান্তে বেদান্তে প্রোক্তানি কথিতানি সিদ্ধয়ে নিষ্পত্ত্যর্থং সর্ব্বকর্ম্মণাম্। ১৩।

ভাষ্যানুবাদ। এই কারণে পরমার্থদর্শীরই অশেষকর্ম্মসন্ন্যাস সম্ভব হয়, কারণ, ক্রিয়া, কারক এবং ফল অজ্ঞানের দ্বারাই আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে অজ্ঞ সুতরাং, অধিষ্ঠানপ্রভৃতি ক্রিয়াসম্পাদক কারকগুলিকেই আত্মা বলিয়া বুঝিয়া থাকে, তাহার পক্ষে সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মের সন্ন্যাস সম্ভবপর নহে, এই বিষয়টীকে উত্তরবর্ত্তী শ্লোকগুলির দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন, "এই" অর্থাৎ উত্তরবর্ত্তী শ্লোকে বক্ষ্যমাণ, হে মহাবাহো "কারণসমূহ" অর্থাৎ পাঁচটী নির্ব্বাহকসমূহকে তুমি আমার নিকট বুঝ। পরে যাহা বলিবেন তাহার প্রতি (অর্জ্জুনের চিত্তকে) সমাহিত করিবার জন্য ও যে বিষয়ের উপদেশ এইক্ষণে হইবে, এবং এতক্ষণ যাহা বলা হইতেছিল, তাহা এক নহে, ইহা বুঝাইবার জন্য (তুমি আমার কাছে বুঝ এই কথা বলা হইল অর্থাৎ) সেই পাঁচটী কারণকে অবশ্যজ্ঞাতব্য বলিয়া প্রশংসা করা হইল। "সাংখ্য" যে শাস্ত্রে জ্ঞাতব্য পদার্থ সমূহ সম্যক্ প্রকারে বর্ণিত হয় তাহারই নাম সাংখ্য, অর্থাৎ বেদান্তই এই স্থলে সাংখ্য শব্দের অর্থ। "কৃতান্ত" এই শব্দটী সাংখ্যেরই বিশেষণ—কৃত শব্দের অর্থ কর্ম্ম, সেই কর্ম্মের অন্ত অর্থাৎ পরিসমাপ্তি যে শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয়, তাহাকে কৃতান্ত বলা যায় কৃতান্ত ও কর্ম্মান্ত এই দুইটী শব্দের একই অর্থ। "যাবানর্থ উদপানে" এই শ্লোকে এবং "সর্ব্বং

কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" ইত্যাদি শ্লোকে, আত্মজ্ঞান হইলে যে সকল প্রকার কর্ম্মের নিবৃত্তি হয়, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কারণে, সাংখ্য শব্দের অর্থ আত্মজ্ঞানার্থ এবং কৃতান্ত শব্দের অর্থ (কর্ম্ম সমাপ্তি বোধক) বেদান্ত। সেই এই সাংখ্য বেদান্ত শাস্ত্রে সকল প্রকার কর্ম্মের সিদ্ধির অর্থাৎ নিষ্পত্তির জন্য কথিত (যে পাঁচটী কারণ তাহা তুমি শুন, ইহাই তাৎপর্য্য)। ১৩।

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ ১৪॥

অন্বয়। অধিষ্ঠানং, তথা কর্ত্তা, পৃথগ্‌বিধং করণং চ, বিবিধাঃ পৃথক্ চেষ্টাশ্চ অত্রচ পঞ্চমং দৈবং এব চ। ১৪।

মূলানুবাদ। শরীর, ভোক্তা, করণসমূহ, পৃথক্ নানাবিধ চেষ্টা এবং ইহাদের মধ্যে পঞ্চম দৈব (এই পাঁচ প্রকার কারণ)। ১৪।

ভাষ্য। কানি তানি ইত্যুচ্যতে অধিষ্ঠানমিচ্ছা-দ্বেষ-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানাদীনাং অভিব্যক্তেরাশ্রয়ঃ শরীরং, তথা কর্ত্তা উপাধিলক্ষণো ভোক্তা, করণঞ্চ শ্রোত্রা-দিকং শব্দাদ্যুপলব্ধয়ে পৃথগ্‌বিধং নানাপ্রকারং দ্বাদশসংখ্যং, বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা বায়বীয়া প্রাণাপানাদ্যাঃ, দৈবং চৈব দৈবমেব চ অত্র এতেষু চতুর্ষু পঞ্চমং পঞ্চানাং পূরণমাদিত্যাদি চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকম্। ১৪।

ভাষ্যানুবাদ। সে পাঁচটী কি তাহাই বলা হইতেছে "অধিষ্ঠান' ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতির অভিব্যক্তির আশ্রয়কে অধিষ্ঠান কহে, অধিষ্ঠান বলিলে শরীর বুঝায়। সেইরূপ, "কর্ত্তা" অন্তঃকরণ রূপ উপাধিদ্বারা সূচিত জীবই ভোক্তা (সেই জীবকেই এখানে কর্ত্তা বলা হইয়াছে)। "করণ" শব্দাদিভোগ্যবস্তুনিবহের উপলব্ধির সাধন শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, তাহা "পৃথগ্‌বিধ" নানা প্রকার অর্থাৎ দ্বাদশ বিধ, (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মনঃ এবং বুদ্ধি) বিবিধ পৃথক্ চেষ্টা (অর্থাৎ) প্রাণাপান প্রভৃতি বায়বীয় ব্যাপার, এবং দৈব অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের অনুগ্রাহক ইন্দ্রাদি দেবতা সমূহই দৈব শব্দের অর্থ, এই পূর্ব্বোক্ত চারিটীর পূরণ স্বরূপ পঞ্চম দৈব হইয়া থাকে। ১৪।

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়। নরঃ শরীর বাঙ্মনোভিঃ ন্যায্যং বা বিপরীতং বা যৎ কর্ম্ম প্রারভতে এতে পঞ্চ তস্য হেতবঃ। ১৫।

মূলানুবাদ। মানব, শরীর বাক্ এবং মনের দ্বারা যাহা কিছু ন্যায্য অথবা অন্যায্য কর্ম্ম করে, এই পাঁচটী তাহার হেতু হইয়া থাকে। ১৫।

ভাষ্য। শরীরেতি শরীরবাঙ্মনোভিঃ যৎ কর্ম্ম ত্রিভিঃ এতৈঃ প্রারভতে নির্ব্বর্ত্তয়তি নরো ন্যায্যং বা ধর্ম্ম্যং শাস্ত্রীয়ং, বিপরীতমশাস্ত্রীয়ং অধর্ম্ম্যং, যচ্চাপি নিমিষিতচেষ্টাদি জীবনহেতুস্তদপি, পূর্ব্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্মযোরেব কার্য্যং ইতি ন্যায্যবিপরীতয়ো গ্রহণেন গৃহীতম্। নন্বধিষ্ঠানাদীনি সর্ব্বকর্ম্মণাং কারণানি, কথমুচ্যতে 'শরীরবাঙ্মনোভিঃ কর্ম্ম প্রারভতে' ইতি। নৈষ দোষঃ, বিধিপ্রতিষেধলক্ষণং সর্ব্বং কর্ম্ম শরীরাদিত্রয়প্রধানং, তদঙ্গতয়া দর্শনশ্রবণাদীনি চ জীবনলক্ষণং ত্রিধৈব রাশীকৃতমুচ্যতে শরীরাদিভিরারভতে ইতি, ফলকালেঽপি তৎ প্রধানৈর্ভুজ্যতে ইতি পঞ্চানামেব হেতুত্বং ন বিরুধ্যতে। ১৫।

ভাষ্যানুবাদ। "শরীরেত্যাদি" শ্লোকের অর্থ—শরীর বাগিন্দ্রিয় এবং মনঃ এই তিনটীর দ্বারা মানুষ যাহা কিছু কর্ম্ম সম্পাদন করে তাহা "ন্যায্য" —ধর্ম্মের হেতু অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত, অথবা "বিপরীত" অধর্ম্ম জনক অর্থাৎ অশাস্ত্রীয়। ইহা ছাড়া নিমেষ বা চেষ্টা প্রভৃতি জীবন হেতু কর্ম্ম, (যাহা মানুষ করে) তাহাও পূর্ব্বজন্মের কৃত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফল এই কারণে ন্যায্য ও বিপরীত কর্ম্মের মধ্যে তাহাও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। (সেই পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত পাঁচটী বস্তু এই সকল প্রকার কর্ম্মেরই হেতু।) যদি বল, অধিষ্ঠান প্রভৃতি পাঁচটীই সকল প্রকার কর্ম্মের কারণ বলিয়া যখন কথিত হইতেছে, তখন, "শরীর বাক্ এবং মনের দ্বারা যাহা কিছু মানব আরম্ভ করে" এই প্রকার কথন আবার কি প্রকারে সঙ্গত হইবে? ইহার উত্তর এই যে, এই প্রকার উক্তিতে কোন প্রকার দোষ দেখা যায় না, কারণ, বিহিত বা প্রতিষিদ্ধ যত কার্য্য আছে সকল কার্য্যেরই প্রধান হেতু শরীর, বাক্ ও মনই হইয়া থাকে। দর্শন বা শ্রবণ প্রভৃতি কারণ হইলেও উহারা প্রধান ভাবে নহে, কিন্তু অপ্রধান ভাবেই কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং জীবনলক্ষণ দর্শন শ্রবণাদিকেই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ঐ সকল দর্শন শ্রবণ প্রভৃতিও ত শরীরাদীরই কার্য্য। সুতরাং কর্ম্মফলের ভোগসময়ে শরীরাদিরূপ প্রধান

সাধন দ্বারাই ভোগ হইযা থাকে, এই কারণে, পাঁচটী পদার্থকে যে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইযাছে, তাহাতে পূর্ব্বাপর কোন বিরোধের সম্ভাবনা নাই।

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়। তত্র এবং সতি যঃ কেবলং আত্মানং কর্ত্তারং পশ্যতি স দুর্ম্মতি অকৃতবুদ্ধিত্বাং ন পশ্যতি। ১৬।

মূলানুবাদ। তাহাই যদি হইল, তবে যে ব্যক্তি, কেবল আত্মাই কর্ত্তা এইরূপ দেখিযা থাকে, সে দুর্ম্মতি, অসংস্কৃত-বুদ্ধিত্ব-নিবন্ধন যথার্থ ভাবে দেখিতে পাবে না। ১৬।

ভাষ্য। তত্রেতি প্রকৃতেন সংবধ্যতে. এবং সতি এবং যথোক্তৈঃ পঞ্চভিঃ হেতুভিঃ নির্বর্ত্ত্যে সতি কর্ম্মণি। তত্রৈবং সতি ইতি দুর্ম্মতিত্বস্য হেতুত্বেন সংবধ্যতে। তত্র তেষু আত্মানমন্যত্বেন অবিদ্যযা পরিকল্প্য তৈঃ ক্রিযমাণস্য কর্ম্মণঃ অহমেব কর্ত্তাইতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং শুদ্ধং তু যঃ পশ্যতি অবিদ্বান্, কস্মাং বেদান্তাচার্য্যোপদেশন্যাযৈরকৃতবুদ্ধিত্বাদসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাং যঃ অপি দেহাদি ব্যতিরিক্তাত্মবাদী আত্মানমেব কেবলং কর্ত্তারং পশ্যতি অসাবপ্যকৃতবুদ্ধিরেব, অতোঽকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি আত্মনস্তত্ত্বং কর্ম্মণো বা ইত্যর্থঃ। অতো দুর্ম্মতিঃ কুৎসিতা বিপরীতা দুষ্টা অজস্রং জননমরণপ্রতিপত্তিহেতুভূতা মতিরস্যেতি দুর্ম্মতিঃ, স পশ্যন্নপি ন পশ্যতি, যথাতৈমিরিকঃ অনেকং চন্দ্রং, যথা বা অভ্রেষু ধাবৎসু চন্দ্রং ধাবন্তং, যথা বা বাহনে উপবিষ্টঃ অন্যেষু ধাবৎসু আত্মানং ধাবন্তম্। ১৬।

ভাষ্যানুবাদ। তত্রেত্যাদি শ্লোকের অর্থ "তত্র" এই শব্দটীর সম্বন্ধ প্রকৃতের (অর্থাৎ পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত পাঁচটী কারণের) সহিত। "এবং সতি" এমন হইলে অর্থাৎ যথোক্ত পাঁচটী হেতুর দ্বারাই সকল কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে এই প্রকার সিদ্ধান্ত হইলে, "তত্রৈবং সতি" এই প্রকার কথনই দুর্ম্মতিত্বেরই হেতু স্বরূপে অন্বিত হইতেছে। তত্র অর্থাৎ সেই পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী কারণের মধ্যে আত্মাকে অপর কয়টী হইতে অভিন্নভাবে অজ্ঞান বশতঃ পরিকল্পনা করিয়া, তাহাদের দ্বারা সম্পাদিত কার্য্যের "আমিই কর্ত্তা" এই ভাবে "কেবল" শুদ্ধ আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া যে ব্যক্তি দেখিয়া থাকে (সে) অবিদ্বান্, কারণ,

বেদান্ত শাস্ত্র, আচার্য্যোপদেশ, এবং যুক্তি সমূহের দ্বারা তাহার বুদ্ধি সংস্কৃত নহে, যে ব্যক্তি, দেহাদি হইতে ব্যতিরিক্ত আত্মা ইহা অঙ্গীকার করে, অথচ সেই কেবল আত্মাকেই কর্ত্তা বলিয়া দেখিয়া থাকে, সে ব্যক্তিও অসংস্কৃত বুদ্ধি, এই কারণে অর্থাৎ অকৃত-বুদ্ধিত্ব-নিবন্ধন, পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ ব্যক্তিই আত্মা কিম্বা কর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব দেখিতে পায় না, এই কারণে, তাহারা দুর্ম্মতি অর্থাৎ তাহাদের মতি দুষ্ট কুৎসিত অর্থাৎ বিপরীত, কারণ, ঐ প্রকার মতি অজস্র জন্ম ও মরণ প্রাপ্তির হেতু হয়, এই কারণেই ঐ মতি দুষ্ট, সেই দুর্ম্মতি দেখিয়াও দেখিতে পায় না যেমন "তৈমিরিক" তিমিরোপহতনেত্র এক চন্দ্রকে অনেক বলিয়া দেখে অথবা যেমন গতিশীল মেঘের মধ্যে চন্দ্রকে লোকে গতিশীল দেখে কিংবা যেমন কোন ভ্রান্ত ব্যক্তি নিজে বাহনে উপবিষ্ট থাকিয়া অন্যের গতিকালে নিজেকে গতিমান্ বলিয়া বিবেচনা করে সেইরূপ। ১৬।

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭॥

অন্বয়। যস্য ভাবঃ ন অহঙ্কৃতঃ, যস্য বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে, স ইমান্ লোকান্ হত্বাপি ন হন্তি ন নিবধ্যতে (চ)। ১৭।

মূলানুবাদ। যাহার ভাব অহঙ্কৃত নহে, যাহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, সে যদি সকল লোককেও হনন করে, তাহা হইলেও, সে প্রকৃত পক্ষে হত্যাকারী হয় না, এবং সেই হত্যানিবন্ধন তাহার কোন প্রকার কর্ম্মবন্ধনও হয় না। ১৭।

ভাষ্য। কঃ পুনঃ সুমতির্য, সম্যক্ পশ্যতীত্যুচ্যতে, যস্য শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ-ন্যায়সংস্কৃতাত্মনঃ, ন ভবতি অহঙ্কৃতঃ অহংকর্ত্তেত্যেবংলক্ষণঃ ভাবো ভাবনা প্রত্যয়ঃ—অতএব পঞ্চাধিষ্ঠানাদয়ঃ অবিদ্যয়া আত্মনি কল্পিতাঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং কর্ত্তারঃ নাহং, অহং তু তদ্ব্যাপারাণাং সাক্ষিভূতঃ অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রোহক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ কেবলঃ অবিক্রিয়ঃ ইত্যেবং পশ্যতীত্যেতৎ। বুদ্ধিরন্তঃকরণং যস্য আত্মনঃ, উপাধিভূতা ন লিপ্যতে নানুশায়িনী ভবতি, ইদমহম্ কার্য্যং করোমি তেনাহং নরকং গমিষ্যামি ইত্যেবং যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে, স সুমতিঃ স পশ্যতি। হত্বাপি স ইমান লোকান্ সর্ব্বান্ প্রাণিন ইত্যর্থঃ। ন হন্তি হনন ক্রিয়াং ন করোতি। ন নিবধ্যতে নাপি তৎ কার্য্যেণ অধর্ম্মফলেন সংবধ্যতে। ননু হত্বাপি ন হন্তীতি বিপ্রতিষিদ্ধং যদ্যপি স্তুতিঃ, নৈষদোষঃ। লৌকিক পারমার্থিক দৃষ্ট্যপেক্ষয়া তদুপপত্তেঃ। দেহাদ্যাত্মবুদ্ধ্যা হন্তাহমিতি লৌকিকীং দৃষ্টিমাশ্রিত্য

হত্বাপীত্যাহ, যথাদর্শিতাং পারমার্থিকীং দৃষ্টিমাশ্রিত্য ন হন্তি ন নিবধ্যতে ইতি তদুভয়মুপপদ্যতে এব। নবধিষ্ঠানাদিভিঃ সম্ভূয় করোত্যেব "কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং ত্বি" তি কেবলশব্দপ্রয়োগাৎ। নৈষদোষঃ, আত্মনোঽবিক্রিয়স্বভাবত্বে অধিষ্ঠানাদিভিঃ সংহতত্বানুপপত্তেঃ। বিক্রিয়াবতোহি অন্যৈঃ সহননং সম্ভবতি, সংহত্য বা কর্ত্তৃত্বং স্যাৎ, ন ত্ববিক্রিয়স্য আত্মনঃ কেনচিৎ সংহননং অস্তি, ইতি ন সম্ভূয় কর্ত্তৃত্বমুপপদ্যতে। অতঃ কেবলত্বমাত্মনঃ স্বাভাবিকমিতি কেবলশব্দোঽনুবাদমাত্রম্।

ভাষ্যানুবাদ। কে সুমতি, যে সম্যগ্‌ দর্শন কবিতে পাবে। তাহাই বলা হইতেছে, শাস্ত্র, আচার্য্যোপদেশ এবং যুক্তি দ্বারা যাহার অন্তঃকরণ সংস্কৃত হইযাছে, যাহার "অহঙ্কৃত ভাব' আমি কর্ত্তা এই প্রকার ভাবনা বা প্রত্যয় হয় না, যে ভাবিযা থাকে যে "এই অধিষ্ঠান প্রভৃতি পাঁচটী হেতু অবিদ্যা-প্রভাবে আত্মাতে কল্পিত হইযা সকল প্রকার কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব করিযা থাকে, 'আমি কিছুই কবি না' আমি কেবল ঐ সকল ব্যাপারের সাক্ষী আমি অপ্রাণ এবং অমনাঃ, আমি শুভ্র এবং পর, অক্ষর হইতে ও পর, আমি কেবল ও বিকার-হীন' আরও আত্মার উপাধিভূত যে বুদ্ধি তাহাও লিপ্ত হয না, অনু অর্থাৎ পশ্চাৎ তাপযুক্ত হয না "আমি এই অকার্য্য করিযাছি সেই জন্য আজি নরকে যাইব" এইরূপ ভাবে যাহার বুদ্ধি লিপ্ত হয না। সে এই লোক সকলকে অর্থাৎ সকল প্রাণীকেও হনন করিলেও প্রকৃত পক্ষে হনন কবে না, এবং নিবদ্ধও হয় না, অর্থাৎ সেই হননের ফল, স্বরূপ যে পাপ, সে পাপ ও তাহার হয় না। এক্ষণে শঙ্কা হইতে পারে যে এ কি প্রকার উক্তি! "হনন করিয়া ও হনন করে না" ইহা যে পরস্পর বিরুদ্ধ উক্ত হইলেও যদি বল, ইহা স্তুতি বাক্য, তাহা হইলেই বা কি হইল! (পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যের দ্বারা স্তুতিই বা কি প্রকার সম্ভবপর?) এই (প্রকার শঙ্কা রূপ) দোষ হইতে পারে না, কারণ, লৌকিক এবং পারমার্থিক এই দ্বিবিধ দৃষ্টিকে অবলম্বন করিলে সকলই উপপন্ন হইয়া যায়। দেহ প্রভৃতির উপর আত্মবুদ্ধি থাকা প্রযুক্ত "আমি হন্তা" এইরূপ যে লৌকিক বুদ্ধি হইয়া থাকে, সেই বুদ্ধিকে অপেক্ষা করিয়াই বলা হইয়াছে যে "সে এই লোক সকলকে হনন করিযাও" এবং পূর্ব্বে প্রদর্শিত যে পারমার্থিকী দৃষ্টি, তাহাকে অপেক্ষা করিয়া বলা হইয়াছে যে "সে হননও করে না এবং বদ্ধও হয না'। (এই ভাবে দেখিলে) এই দুই প্রকার কথনই উপপন্ন হইতে পারে। যদি বল আত্মা অধিষ্ঠান

প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া বাস্তবিকই ত কর্ত্তা হইয়া থাকে, কারণ, এই খানেই বলা হইতেছে যে, যে কেবল আত্মাকেই কর্ত্তা বলিয়া দেখিয়া থাকে (সেই ব্যক্তি দুর্ম্মতি ইত্যাদি) এই কেবল শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে (ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে কেবল আত্মাকে কর্ত্তা বোধকরা ঠিক্ নহে অর্থাৎ দেহাদির সহিত মিলিত হইলে আত্মার কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি দোষাবহ নহে) এই প্রকার শঙ্কারূপ দোষও এখানে হওয়া উচিত নহে, কারণ, আত্মার স্বভাব যদি অবিক্রিয়ত্ব হয়, তবে তাহার সহিত (কোন বস্তুই যখন সংহত হইতে পারে না, তখন) অধিষ্ঠান প্রভৃতির সংহতত্ব বা সম্বন্ধ কোন প্রকারেই উপপন্ন হইতে পারে না। যে বস্তু বিকারি তাহার সহিতই অন্য কোন বস্তু সংহত বা মিলিত হইতে পারে। এবং মিলিত হইলে তবে কর্ত্তৃত্বও সম্ভবপর হয়। আত্মার যখন কোন প্রকার বিকার (বা অবস্থান্তর) অসম্ভব, তখন আত্মার সহিত কাহারও মিলন হইতে পারে না, সুতরাং মিলিত হইয়া আত্মার কর্ত্তৃত্বও হইতে পারে না। এই কারণে বলিতে হইবে যে, আত্মার কেবলত্ব স্বাভাবিক, সুতরাং এই শ্লোকের কেবল শব্দটী তাহার স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপের অনুবাদ মাত্র (ইহা দ্বারা যে মিলিত আত্মার কর্ত্তৃত্ব প্রকারান্তরে সূচিত হইতেছে, তাহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে)।

ভাষ্য। অবিক্রিয়ত্বং চাত্মনঃ শ্রুতিস্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধং। "অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে" "গুণৈরেব কর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তে" 'শরীরস্থোঽপি ন করোতি" ইত্যাদ্য সকৃদুপপাদিতং গীতাস্বেব তাবৎ। শ্রুতিষু চ "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইত্যেবমাদ্যাসু। ন্যায়তশ্চ নিরবয়বমপরতন্ত্রং অবিক্রিয়মাত্মতত্ত্বং ইতিরাজমার্গঃ। বিক্রিয়াবত্ত্বাভ্যুপগমেঽপি আত্মনঃ স্বকীয়ৈব বিক্রিয়া স্যস্য ভবিতুমর্হতি নাধিষ্ঠানাদীনাং কর্ম্মাণি আত্মকর্ত্তৃকাণি স্যুঃ। নহি পরস্য কর্ম্ম পরেণাকৃতং আগন্তুমর্হতি। যত্ত্ব অবিদ্যয়া গমিতং ন তত্তস্য। যথা রজতত্বং ন শুক্তিকায়া যথা বা তলমলবত্ত্বং বালৈর্গমিতমবিদ্যয়া নাকাশস্য, তথা অধিষ্ঠানাদিবিক্রিয়াঽপি তেষামেব নাত্মনঃ। তস্মাদ্ যুক্তমুক্তং 'অহঙ্কৃতত্ববুদ্ধিলেপাভাবাৎ বিদ্বান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ইতি। 'নায়ং হন্তি ন হন্যতে' ইতি প্রতিজ্ঞায় "ন জায়তে" ইত্যাদি হেতুবচনেন অবিক্রিয়ত্বমাত্মন উক্ত্বা "বেদাবিনাশিনং" ইতি বিদুষঃ কর্ম্মাধিকার নিবৃত্তিং শাস্ত্রাদৌ সংক্ষেপেণ উক্ত্বা মধ্যে প্রসারিতাঞ্চ তত্র তত্র প্রসঙ্গং কৃত্বা ইহ উপসংহরতি শাস্ত্রার্থপিণ্ডীকরণায় "বিদ্বান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে" ইতি। এবং চ সতি দেহভৃত্ত্বাভিমানানুপপত্তৌ অবিদ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত।

শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্]   [পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

বলরাম বসু প্রায় প্রত্যহই আসেন—যখনই সুবিধা পান, তখনই আসেন। রামকৃষ্ণদেবের সকল ধর্ম্ম, সকল সম্প্রদায়ের কথাতেই সমান উৎসাহ; কালী, কৃষ্ণ, রাধা, শিব, গৌরাঙ্গ, যীশু প্রভৃতি সকল দেবদেবী, সকল অবতারের সম্বন্ধে কথা কহিতে কহিতেই তাঁহার প্রেমে অশ্রুপাত ও ভাবাবেশ হয়, আবার নির্গুণ ব্রহ্মের চর্চ্চাতেও সমাধিস্থ হইয়া যান—ইহাই দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর বলরাম অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে ভাবেন, "এঁর মূল ভাবটী কি?" কিন্তু কিছুই কুল কিনারা করতে পারেন না। "আচ্ছা, এঁর কোন ভাবটীর কখনও পরিবর্ত্তন হয় না? বোধ হয় অহিংসা পরমো ধর্ম্ম এইটী।" একদিন প্রাতঃকালে পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতেছেন আর এইরূপ ভাবিতেছেন—"ছয় বৎসর দিন রাত যাওয়া আসা করছি, কিন্তু কৈ হিংসা তো এঁর কারো প্রতি কখন দেখি নাই। আমার চিরকাল অহিংসাটাই বড় ধর্ম্ম বলে মনে হ'তো, কিন্তু এঁর কাছে এসে সেটা যেন উল্টে গিয়াছে। এখন মনে হয় ভক্তিটাই বড়। যদি ভগবৎ পাদপদ্মে ভক্তি থাকে, এমন লোক একটু আধটু মাছ খায় বা ছার-পোকা মাকড়সাটা মারে, তাকে আর ঘৃণা হয় না, তার পদধূলী নিতে ইচ্ছা হয়। ভক্তিলাভ না করে খালি অহিংসা পালন কল্লে অহঙ্কারই বাড়ে; যা হোক্ ঠাকুরের কিন্তু অহিংসা পালনটা সর্ব্বদা দেখেছি।" এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াই দেখেন, রামকৃষ্ণদেব তাঁহার বিছানার উপর বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে ছারপোকা মারিতেছেন! বলরাম স্তম্ভিত, ভাবিলেন, "এ কি এ ত কখন দেখি নাই! বাবা! ভাগ্যে এই ছারপোকা মারা কিছুদিন আগে দেখি নাই, তা হ'লে ত এঁর ভাব সমাধি কিছুই গ্রাহ্য করতুম না। ঐ ছারপোকা মেরেছেন বলে পালাতুম, আর ওঁর দিক্ মাড়াতুম না। বোধ হয় আমার মনের ভাব ঐরূপ ছিল বলেই আমার ভাব নষ্ট হ'য়ে অকল্যাণ হবে, তাই আমায় ওঁর এভাব দেখান নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ছয় বৎসরের একটী দিনও উহা চক্ষে পড়ে নাই!" বলরাম এইরূপ নিজ ধর্ম্ম-জীবনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যতবার যত রকম নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন,

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেও সেই মতাবলম্বী দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতেন ও ভাবিতেন, "ইঁহারই নিকটে শুনিয়াছি, ভগবানের ভাবের 'ইতি' হয় না-ইঁহারও তাই।"

কবিবর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভ্রাতা, দেবেন্দ্রনাথ, দেখিতে খর্ব্বাকার, গৌরবর্ণ ও শান্তপ্রকৃতি, কোন জমিদারের সরকারে কর্ম্ম করেন ও কলিকাতায় আত্মীয়ের বাটীতে থাকেন। "ভগবান আছেন কি না?"—মধ্যে মধ্যে ইঁহার মনে তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয়। এই সমস্যার মীমাংসার জন্য কত লোককে জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু কাহারও কথায় কোন প্রকার প্রত্যয় জন্মে না। ইনি এখন কয়েকদিন যাবৎ ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিলেন, এজন্য কর্ম্মস্থলে যাইতে হয় না, অথচ বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া সময়ও কাটে না; সম্মুখে সাধু অঘোরনাথের একখানি জীবনচরিত পড়িয়া ছিল, দেবেন্দ্রনাথ তাহাই পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পুস্তকখানি পড়িতে এতই ভাল লাগিল যে শেষ না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। অঘোরনাথ শ্রীযুৎ কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়ের দলভুক্ত একজন ব্রাহ্ম প্রচারক। কোন সময়ে ইনি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কোন এক স্থানে প্রচার করিবার জন্য যাইতেছিলেন। গন্তব্যস্থান রেলপথ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত, এজন্য একা করিয়া রজনী যোগে যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, দূরে আলোক লইয়া জন কতক লোক দল বাঁধিয়া গান করিতেছে। ঐ স্থান ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই পশ্চাৎ হইতে জন কয়েক লোক আসিয়া একার গাড়োয়ানকে বলিল, 'ঠ্যারো" (দাঁড়াও)। একাওয়ালা ভীত হইয়া একা থামাইলে লোকগুলি আসিয়া অঘোরনাথের নিকট যাহা কিছু আছে বাহির করিয়া দিতে বলিল, এবং দলের একজন অন্য লোকদের একটী ইঙ্গিত করিল। অঘোরনাথ তাহার প্রাণ বধের ইসারা হইয়াছে স্থির বুঝিয়া তাহাদের কহিলেন, "বাবা আমাকে মার তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমরা অনুগ্রহ কোরে একটু সময় দেও, আমি ভগবানকে ডেকে নিই।" দস্যুরা সম্মতি দিল। অঘোরনাথ একা হইতে নামিয়া নিকটে উপবিষ্ট হইয়া একটু ধ্যান করিলেন, পরে একটী ভজন গাহিতে লাগিলেন। প্রাণ যাইবে এই জ্ঞানে সকাতরে বিশ্বনাথকে স্মরণ করিয়া গাহিতে লাগিলেন। গান শুনিয়া দস্যুরা বলাবলি করিতে লাগিল, "এ ভেইয়া ইসকো মৎ মারো, ইয়ে তো ফকির হ্যায়।" দস্যুরা অঘোরনাথকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পুস্তকের ঐ স্থানটী পড়িয়াই দেবেন্দ্রনাথ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কে বলে ভগবান নেই, এই যে ভগবান আছেন দেখছি, নইলে অঘোরনাথকে কে বাঁচালে?' দেবেন্দ্রনাথ ক্রমে ভগবান

লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহাকে কেমন করিয়া পাইবেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন না। একদিন হঠাৎ মনে ফুট উঠিল, 'গুরু বিনা গতি নাই।" আবার মনে হইল, যে সে গুরু হইলে তো চলিবে না; খাটী গুরু চাই। গুরুর জন্য ভগবানের নিকট কতই প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্ম গ্রন্থাদি পড়িয়া একটু ব্রাহ্ম মতাবলম্বী হইয়াছিলেন, সুতরাং মহাত্মা কেশবের ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কেশবের বক্তৃতা বড়ই ভাল লাগিতে লাগিল, কিন্তু সদ্গুরু লাভের পিপাসা এখানেও মিটিল না।

ভগবান লাভের জন্য মন যতই ব্যাকুল হইতে লাগিল, বিষয়ী লোকের সমাগম ততই বিষবৎ মনে হইল, তাই পূর্ব্বের বাসা পরিবর্ত্তন করিয়া পাথুরিয়াঘাটায় জনৈক আত্মীয়ের নিকট একটী নির্জ্জন বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। ব্যগ্রতা যতই বাড়িতে লাগিল অশান্তিও তেমনি বাড়িতে লাগিল। "যদি ভগবান থাকেন ত কেন তাঁর দর্শন পাই না" এই প্রকার চিন্তায় হয়ত সমস্ত রাত্রি কাটিয়া যায়। একদিন প্রাতঃকালে ভাবিলেন, কালনায় যাইয়া ভগবান দাস বাবাজীর নিকট দিক্ষা গ্রহণ করিবেন, ভগবান জানা লোক নইলে আমায় ভগবান কেমন কোরে তিনি দর্শন করাবেন? এই ভাবিয়া তখনই কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া আহিরীটোলার ঘাটে আসিলেন। দেখিলেন জাহাজ চলিয়া গিয়াছে। মহা বিষাদে মগ্ন হইলেন। ম্রিয়মান হইয়া আবাসে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া, নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে গমন করিলেন। কিন্তু সেখানে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না। মন অত্যন্ত অস্থির, কি করেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না; সম্মুখে একখানি পুস্তক পড়িয়াছিল, অন্যমনস্ক হইয়াই তাহা খুলিলেন। যে পৃষ্ঠাটী খুলিলেন তাহার তলদেশে টীকা হিসাবে লেখা—"দক্ষিণেশ্বরে রাসমনির দেবালয়ের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেরও এই মত।" পড়িয়াই ভাবিতে লাগিলেন—রামকৃষ্ণ পরমহংস। পরমহংস তো যার ভগবান লাভ হয়েছে তাকে বলে। সে যে অতি উচ্চ অবস্থা, তবে কি ইনি আমার অভীষ্ট লাভে সহায় হইবেন? কোন্ মতের সমর্থনে ঐ নাম পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আর পড়িবার বাসনা হইল না। পুস্তকখানি মুড়িয়া দেখিলেন, উহার নাম—"ভক্তি চৈতন্য চন্দ্রিকা"। দেবেন্দ্র ভাবিলেন, "যাই, ইঁহাকেই দেখে আসি।" অমনি উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, এবং বাটীর একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দক্ষিণেশ্বর রাসমনির ঠাকুরবাড়ী কোথা জান?" ভৃত্য ঠিকানা বলিয়া তথায় কি প্রকারে যাইতে হয়, তাহাও বলিয়া দিল। দেবেন্দ্র আপন আবাসে যাইয়া

একটী টাকা ও চারি আনা পয়সা লইয়া বাটীর বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, দ্বারের বহির্ভাগে বামদিকে একটী পিতলের জলপূর্ণ কুম্ভ! দেবেন্দ্রের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। দ্রুতপদে আহিরীটোলার ঘাটে আসিয়া একখানি পান্‌সিতে উঠিলেন। মাঝিকে বলিলেন, "বাপু, আমায় রাসমণির ঠাকুরবাড়ীতে নামিয়ে দিও।" গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণে বাতাস, আবার গঙ্গায় জোয়ার—নৌকা তীরবেগে ছুটিল। কিয়দ্দূর যাইয়া ঘুস্‌ড়ির ট্যাঁকের নিকট মাঝি কহিল, "মশাই, ঐ রাসমণির ঠাকুরবাড়ী দেখা যাচ্ছে।" দেবেন্দ্রের হৃদয়ে নানা তোলাপাড়া হইতে লাগিল; একবার মনে হইল, এই পথটুকু শীঘ্র শীঘ্র যেতে পাল্লে হয়, আবার ভাবিলেন, না, নৌকা খান। একটু দেরীতে পৌঁছাইলেই ভাল—ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, সাধুকে যাইয়া কি বলিবেন। কখন পরমহংস সাধু দর্শন করেন নাই, সে জন্য দেবেন্দ্র নাথ সাধুকে যাইয়া কি বলিবেন, এই ভাবিয়া চিন্তান্বিত হইলেন, অন্য সময়ে কত তর্ক যুক্তি হৃদয়ে উঠে কিন্তু এ সময়ে হৃদয় যেন শূন্য—সে সকলের কাহাকেও ভিতরে খুঁজিয়া পাইলেন না! এই বারে নৌকা রাসমণির দেবালয়ের ঘাটে লাগিবে। দেবেন্দ্র উঁকি মারিয়া দেবালয়ের দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন অতি সুরম্য স্থান, ঘাটের উপরেই ফুল বাগান। বাগানে একজন লোক দণ্ডায়মান, তাঁহার গলদেশ হইতে একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা একটী হস্ত বাঁধা যেন হাতে কোন আঘাত লাগায় হাতটীকে ঐ ভাবে রাখা হইয়াছে।

নৌকা লাগিল, দেবেন্দ্র কূলে উঠিতে উঠিতে দেখিলেন, জলে একজন (পরে জানিলেন উহার নাম নিরঞ্জন) স্নান করিতেছেন ও একজন সুন্দর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্নানান্তে কাপড় বগলে করিয়া করজোড়ে স্তব পাঠ করিতে করিতে ঘাটের সিঁড়িতে উঠিতেছেন। দেবেন্দ্র নাথ তাঁহাকেই জিজ্ঞাসিলেন, "মশাই, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কোথায় থাকেন?" ব্রাহ্মণ অতি সুমিষ্ট স্বরে উত্তর করিলেন, "ঐ যে বাবা, তিনি ঐ ঘরে থাকেন, ঐ গোল বারাণ্ডাওয়ালা ঘর, ঐ খানে যাও।" দেবেন্দ্র নাথ ঘরের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া উদ্বিগ্নচিত্তে সেই বারাণ্ডায় বসিয়া থাকিলেন। মুহূর্তেক পরে ফট্‌ ফট্‌ শব্দে চটি জুতা পরিয়া একজন লোক, কোঁচার কাপড়টী স্কন্ধে ফেলা, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই স্থির করিলেন, "ইনিই সেই পরমহংস।" ভাবিয়াছিলেন, জটাজুট ধারী, গেরুয়া পরা, চিমটে হস্তে সাধু দেখিবেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শনমাত্র তাঁহার ও সমস্ত চিন্তা কোথায় চলিয়া গেল, ভাবিলেন, ইনিই সেই পরমহংস।

দেবেন্দ্র নাথ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলে রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "ঐ দিক দিয়ে ঘরের ভিতর এস।" দেবেন্দ্র নাথ উত্তর দিক দিয়া ঘুরিয়া চলিলেন, রামকৃষ্ণদেব ঘরের ভিতর দিয়া অপর দিকে চলিলেন। দেবেন্দ্র নাথ উত্তর দিকে যাইয়া দেখিলেন, রামকৃষ্ণদেব উত্তরের দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। দেবেন্দ্র একটু দূরে জুতা ছাড়িয়া আসিতেছিলেন দেখিয়া রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "ঐ খানকে রেখনি জুতা চুরি যাবে, এই খানকে রাখ," দেবেন্দ্র জুতা রাখিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "কোথা থেকে আসা হয়েছে ?"

দেবেন্দ্র কহিলেন, "কোলকেতা থেকে।"

রামকৃষ্ণদেব নিজ হস্তে বংশীধারীর ভঙ্গি করিয়া কহিলেন, "কি, এমনি ঠাকুর দেখতে এসেছ ?" অর্থাৎ দেবালয়ে কৃষ্ণ রাধার বিগ্রহ দেখ্‌তে এসেছ ?

দেবেন্দ্র কহিলেন, "আজ্ঞে না আমি আপনাকেই দেখিতে এসেছি।" রামকৃষ্ণদেব বালকের মত কাতর ভাবে কহিলেন, "আর বাপু। আমাকে আর কি দেখবে, এই দেখ আমার হাত ভেঙ্গে গেছে। বড়ই যন্ত্রণা হচ্ছে।" এই বলিয়া দেবেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া তাঁহার ভাঙ্গা হাতটীর উপর দিলেন ও বলিলেন, "দেখ দেখি হাত ভেঙ্গেছে কি না, বড যন্ত্রণা, কি করি ?" দেবেন্দ্র অগত্যা একটু টিপিয়া দেখিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন কোরে ভেঙ্গেছে ?"

রামকৃষ্ণদেব কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিলেন, "একটা অবস্থা হয়, সেই সময়ে ভেঙ্গেছে (অর্থাৎ ভাবের অবস্থায় পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে)। আবার অষুধ দিলে বাড়ে অধর সেন আবোক পাঠিয়ে দিয়েছিল। তা দিয়ে আরো ফুলে গেল, তাই আর কিছু দিইনি। হ্যাগা, ভাল হবে ত ?"

দেবেন্দ্র ভাবিলেন, "সাধু মানুষ, এঁদের আপনা আপনিই ভাল হয়ে যাবে।" প্রকাশ্যে কহিলেন, "ভাল হবে বই কি, ভাল হয়ে যাবে।"

এই কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণদেব বালকের ন্যায় আনন্দে আটখানা হইয়া সকলকে ডাকিয়া কহিতে লাগিলেন, "দেখ ইনি কোলকেতা থেকে এসেছেন, ইনি বলছেন—হাত ভাল হয়ে যাবে।"

ক্রমশঃ।

স্বামি-শিষ্য সংবাদ।

[শ্রীশরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।]

স্বামীজি কয়েকদিন হইল পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শরীর অসুস্থ, পা ফুলিয়াছে। শিষ্য আসিয়াই স্বামীজির কাছে মঠের উপরতলায় গিয়া প্রণাম করিলেন। এত রোগ সত্বেও স্বামীজির সহাস্যবদন, সেই স্নেহ-মাখা দৃষ্টি, যাহাতে সকলকে মহা কষ্টের সময়ও সকল ভুলাইয়া আত্মহারা করিয়া দিত!

শিষ্য। স্বামীজি, কেমন আছেন?

স্বামীজি। আর বাবা, থাকাথাকি কি? দেহ ত দিনদিন অচল হ'চ্ছে। বাঙ্গালা দেশে এসে শরীর ধারণ কত্তে হ'য়েছে, তাই এ শরীরে রোগ লেগেই আছে। এ দেশের physique একেবারে ভাল নয়। বেশী কায কত্তে গেলেই শরীরে বয় না। যে কটা দিন এ দেহ আছে, তোদের জন্য খাট্‌বো। খাট্‌তে খাট্‌তে মোর্‌বো।

শিষ্য। আপনি এখন কিছুদিন একটু স্থির হয়ে থাকুন। এ দেহের রক্ষায় জগতের মঙ্গল হবে।

স্বামীজি। ব'সে থাক্‌বার যো আছে কি বাবা। ঐ যে ঠাকুর যাকে 'কালী' 'কালী' ব'লে ডাক্‌তেন, ঠাকুরের দেহ রাখবার দু তিন দিন আগে সেইটে, এই শরীরে ঢুকে গেছে; সেইটেই আমাকে এদিক্ ওদিক্ কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়—স্থির হয়ে থাকতে দেয় না। আপনার সুখের দিকে দেখতে দেয় না।

শিষ্য। সে শক্তি আপনার ভিতর ঢুক্‌লো কি করে?

স্বামীজি। কি জানিস্, ঠাকুরের দেহ যাবার তিন চারদিন আগে, তিনি আমাকে একাকী একদিন কাছে ডাকলেন। আর সামনে বসিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। আমি তখনি ঠিক অনুভব কত্তে লাগলুম, তাঁর শরীর থেকে একটা সূক্ষ্ম তেজ (electric shockএর মত) এসে ঢুকছে! ক্রমে আমিও বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম। কতক্ষণ এইরূপ ভাবে ছিলাম আমার কিছু মনে পড়েনা; যখন বাহ্য চেতনা হোলো, দেখি ঠাকুর কাঁদছেন। জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বল্লেন, "আজ যথাসর্ব্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির

হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কায করে তবে ফিরে যাবি।" আমার বোধ হয়, ঐ শক্তিই আমাকে এ কাজে সে কাজে কেবল ঘুরায়। বসে থাকবার জন্য আমার এ দেহ হয় নাই।

শিষ্য অবাক্ হইয়া শুন্‌ছে আর ভাবছে, এ সকল কথা সাধারণ লোকে কি বিশ্বাস করবে?

শিষ্য। মহাশয়, আমাদের বাঙ্গাল দেশ (পূর্ব্ববঙ্গ) আপনার কেমন লাগলো?

স্বামীজি। দেশ কিছু মন্দ নয়; মাঠে দেখলুম খুব শষ্য ফলেছে। আব-হাওয়াও মন্দ নয়; পাহাড়ের দিকের দৃশ্য অতি মনোরম। ব্রহ্মপুত্র valleyর শোভা অতুলনীয়। আমাদের এদিকের চেয়ে লোকগুলো কিছু মজবুত ও কর্ম্মঠ। তার কারণ বোধ হয় মাছ মাংসটা খুব খায়। আর যা করে, খুব গোঁয়ে করে। খাওয়া দাওয়াতে খুব তেল চর্ব্বি দেয়; ওটা ভাল নয়। তেল চর্ব্বি বেশী খেলে শরীরে মেদ জন্মে।

শিষ্য। ধর্ম্মভাব কেমন দেখলেন?

স্বামীজি। আর ধর্ম্মভাব; তোদের দেশের লোকগুলো বড় conservative, তা হোক্, কিন্তু ধর্ম্ম কত্তে গিয়ে আবার অনেকে fanatic হয়ে পড়েছে। ঢাকার মোহিনীবাবুর বাড়ীতে একদিন একটি ছেলে, একখানা কার photo এনে আমায় দেখালে ও বল্লে, "মশায়, বলুন ইনি কে? অবতার কি না?" আমি তাকে অনেক বুঝায়ে বল্‌লুম, "তা বাবা আমি কি জানি।" তিন চার বার বল্লেও, সে ছেলেটী দেখলুম, কিছুতেই তার জেদ্ ছাড়ে না। অবশেষে আমাকে বাধ্য হয়ে বল্‌তে হল, "বাবা এখন থেকে ভাল কোরে খেয়ো দেয়ো, তাহ'লে মস্তিষ্কের বিকাশ হবে—পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে তোমার মাথা যে শুকিয়ে গেছে।" একথা শুনে বোধ হয় ছেলেটীর অসন্তোষ হয়ে থাক্‌বে। তা কি করব বাবা, ছেলেদের একপ না বল্‌লে তারা যে ক্রমে পাগল হয়ে দাঁড়াবে।

শিষ্য। আমাদের পূর্ব্ব বাঙ্গালায় আজকাল অনেক অবতার উঠ্‌ছে।

স্বামীজি। গুরুকে তুমি অবতার বলতে পার, যা ইচ্ছা তাই বলে ধারণা কর্‌বার চেষ্টা কত্তে পার। কিন্তু বাবা, ভগবানের অবতার যখন তখন যেখানে সেখানে হয় না। এক ঢাকাতেই শুন্‌লাম, ৩।৪টী অবতার দাঁড়িয়েছে।

শিষ্য। ও দেশের মেয়েদের কেমন দেখলেন?

স্বামীজি। মেয়েরা সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ। বৈষ্ণব ভাবটা ঢাকায় বেশী দেখলুম। হ—র স্ত্রীকে খুব intelligent বলে বোধ হল। সে খুব যত্ন করে আমার বেঁধে খাবার পাঠিয়ে দিত।

শিষ্য। শুনলুম নাগ মহাশয়ের বাড়ী নাকি গিয়েছিলেন?

স্বামীজি। হঁ্যারে, অমন মহাপুরুষ—এতদূর গিয়ে তাঁর জন্মস্থান দেখ্‌ব না? নাগ মহাশয়ের স্ত্রী আমায় কত বেঁধে খাওয়ালেন। বাড়ী খানি কি মনোরম! যেন শান্তির আশ্রম। ওখানে গিয়ে এক পুকুরে সাঁতার কেটে নেয়ে ছিলুম। তারপর এসে এমন নিদ্রা দিলুম যে, বেলা ২॥০ টা। আমার জীবনে যে কয় দিন সুনিদ্রা হয়েছে, নাগ মহাশয়ের বাড়ীর নিদ্রা তার মধ্যে এক দিন। তার পর উঠে প্রচুর আহার। নাগমহাশয়ের স্ত্রী একখানা কাপড় দিয়েছিলেন। সেইখানি মাথায় বেঁধে ঢাকায় রওনা হলুম। নাগ মহাশয়ের ফটো পূজা হয় দেখলুম। তাঁহার সমাধি স্থানটী বেশ ভাল করে রাখা উচিৎ। এখন যেমন হওয়া উচিত, তেমন হয় নাই।

শিষ্য। মশায়, নাগ মহাশয়কে ওদেশে তেমন চিন্‌তে পারেনি।

স্বামীজি। ওরে ওসব মহাপুরুষকে সাধারণে কি বুঝ্‌বে। যারা তাঁর সঙ্গ পেয়েছে তারাই ধন্য।

শিষ্য। কামাখ্যা গিয়ে কি দেখ্‌লেন?

স্বামীজি। শিলং পাহাড়টী অতি সুন্দর। সেখানে Chief Commissioner Cotton সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "স্বামীজি। ইয়ুরূপ ও আমেরিকা বেড়িয়ে এই দূর পর্ব্বতপ্রান্তে আপনি কি দেখিতে এসেছেন?" Cotton সাহেবের মত অমন সদাশয় লোক প্রায় দেখা যায় না। আমার অসুখ করতে বড় বড় Govt. ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দু বেলা আমার খবর নিতেন। সেখানে বেশী লেক্‌চার ফেক্‌চার কত্তে পারিনি; শরীর বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। রাস্তায় নিতাই খুব সেবা করেছিল।

শিষ্য। সেখানকার ধর্ম্মভাব কেমন দেখ্‌লেন?

স্বামীজি। খুব তন্ত্রপ্রধান দেশ; তবে এক 'হঙ্কর' দেবের নাম শুনলুম যিনি ও অঞ্চলে অবতার বলিয়া পূজিত হন। শুনলুম তাঁহার সম্প্রদায় খুব বিস্তৃত; ঐ 'হঙ্কর' দেব শঙ্করাচার্য্যেরই নামান্তর কি না বুঝিতে পারিলাম না। উহারা ত্যাগী—বোধ হয় তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। কিম্বা শঙ্করাচার্য্যেরই সম্প্রদায় বিশেষ।

অতঃপর শিষ্যের সহিত পূর্ব্ব বঙ্গের কথার টান ও উচ্চারণ লইয়া স্বামীজি ঠাট্টা তামাসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে শিষ্য বলিলেন, মহাশয়, যা বলুন, বাঙ্গালরা কিন্তু আপনাকে ঠিক্ বুঝ্‌তে পারেনি।

স্বামীজি। আমায় বুঝুক্ আর নাই বুঝুক্—এ অঞ্চলের লোকের চেয়ে তাদের রজোগুণ প্রবল; কালে সেটা আরও বিকাশ হইবে। যেরূপ চালচলনকে ইদানীং সভ্যতা বা শিষ্টাচার বলা হয়, সেটা এখনও ও অঞ্চলে ভালরূপে প্রবেশ করেনি। সেটা ক্রমে হবে।

শিষ্য। কিন্তু আগে যেমন আমাদের প্রদেশের লোক এদেশে এসে হতাদর হ'ত, এখন আর তেমন হয় না।

স্বামীজি। সকলকে আপনার করে নিতে হবে। প্রেমে বাঙ্গাল বাঙ্গালী এক হয়ে যায়। ত্যাখ্ না মঠের লোকে তোকে বাঙ্গাল ব'লে ঠাট্টা করলে তুই কি রাগ করিস? এ দেশে ইংরেজী চাল্ বেশী হয়েছে বো'লে, এরা বুঝি বড় লোক হয়ে গেছে? তবে সকল সময়ে Capital থেকেই ক্রমে প্রদেশ সকলে চাল চলন আদব কায়দার বিস্তার হয়। ও দেশেও তাই হচ্ছে।

শিষ্য। মশায়, আপনি বা মঠের লোক আমায় যে 'বাঙ্গাল' বলেন, তাতে আমি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করি। আপনার মুখে ঐ কথা শুনলে, আমার কত আনন্দ হয়।

স্বামীজি। যে দেশে নাগ মহাশয়ের মত মহাপুরুষ জন্মায়, সে দেশে আমরা আর'র ধর্ম্ম প্রচার করবো কি? তাঁর আলোতেই পূর্ব্ব বঙ্গ উজ্জ্বল হয়ে আছে।

শিষ্য। সাধারণ লোক তাঁহাকে তত জানিত না, তিনি বড় গুপ্তভাবে ছিলেন।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর স্বামীজি বলিলেন, "দেখ্, ওদেশে আমার খাওয়া দাওয়া নিয়ে বড় গোল করতো। বোল্‌ত ওটা কেন খাবেন, ওর হাতে কেন খাবেন, ইত্যাদি। তা জানিস্ বাবা, আমি ত ফকীর সন্ন্যাসী লোক—আমার আবার আচার বিচার কি? তোদের শাস্ত্রেই না বল্‌ছে, "চরেন্মাধুকরীং বৃত্তিং অপি ম্লেচ্ছকুলাদপি।"

শিষ্য। সত্য আমাদের দেশ বড় conservative; বাহ্যিক আচার বিচারে "লম্বশাটপটাবৃত", কিন্তু ভেতরে উচ্চভাব কিছুমাত্র নাই।

স্বামীজি। তা আমি বলতে পারি না। তবে অবশ্য বাহিরের আচার, ভিতরে ধর্ম্মের অনুভূতির জন্য, প্রথম প্রথম চাই; শাস্ত্র জ্ঞানটা নিজের জীবনে

practical করে নেবার জন্য চাই। ঠাকুরের সেই পাঁজি নেওড়ান জলের কথা শুনেছিস্ ত? এই সকল আচার বিচার কেবল তোর ভেতরের মহাশক্তি স্ফুরণের উপায় বই ত নয়। যাতে সেই ভেতরের শক্তি জাগে, যাতে তোর স্বরূপ ঠিক্ ঠিক্ বুঝতে পারিস্, তাই সর্ব শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। উপায়গুলি বিধি-নিষেধাত্মক: উদ্দেশ্য হারিয়ে, খালি উপায় নিয়ে ঝগড়া কর্‌লে কি হবে? যে দেশেই যাই, দেখি উপায় লুইয়াই লাঠালাঠি চলছে। উদ্দেশ্যের দিকে লোকের নজর নাই। ঠাকুর ঐটী দেখাতেই এসেছিলেন। 'অনু[illegible]'—ইহাই সার কথা। হাজার বৎসর গঙ্গাস্নান কর্, আর হাজার বৎসর নিরামিষ খা—ওতে যদি আত্ম বিকাশের সহায়তা না হয়, তবে জানবি সর্ব্বৈব বৃথা হল। আর আচার বর্জিত হয়েও যদি তুই সেই আত্মদর্শনে সফল হস ত তোকে কে পায়? আবার লোক সংস্থিতির জন্য আচার কিছু কিছু মানা ভাল।

শিষ্য। তবে এই সকল আচারাদির উদ্দেশ্য কি?

স্বামীজি। উদ্দেশ্য কি জানিস, মনকে একনিষ্ঠ করা। এক বিষয়ে নিষ্ঠা হ'লে—মনের একাগ্রতা হয়, অর্থাৎ মনের অন্য বৃত্তিগুলি নিবে গিয়ে, এক বিষয়ে একতানতা হয়। অনেকের বাহ্যিক আচার বা বিধিনিষেধের জালেই সব সময়টা কেটে যায়, আত্মচিন্তা করা হয় না। খেই ছাড়িয়ে গাছের ডাল পালায় বেড়িয়ে কি হবে? দিনরাত বিধিনিষেধের গণ্ডির মধ্যে থাকলে, আত্মার প্রসারতা হবে কি করে? যে যতটা আত্মানুভূতি করতে পেরেছে, তার বিধিনিষেধ ততই কমে যায়। তোর শঙ্করও না বল্‌ছে—'নিস্ত্রৈগুণ্যেপথি বিচরতাং কো বিধিঃ, কো নিষেধঃ?'

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ—ঐ পথে যারা উঠেছে, তাদের পক্ষে ঐ কথা সত্য বটে। কিন্তু কয় জনের সে অবস্থা হয়।

স্বামীজি। যদি কারো হয়—তার কথাই বলা হচ্ছে। মূলকথা অনুভূতি। উহাই জানবি Goal, মত—পথ, রাস্তা মাত্র। কার কতটা ত্যাগ হচ্ছে, এইটী জানবি উন্নতির test। কাম কাঞ্চনের আসক্তি যেখানে দেখবি কমতি— সে যে মতের, যে পথের লোক হোক্‌না কেন—তার জানবি শক্তি জাগ্রত হচ্ছে। তার জানবি আত্মানুভূতির দোর খুলে গেছে। আর হাজার আচার মেনে চল্, হাজার শ্লোক আওড়া, তবু যদি ত্যাগের ভাব না এসে থাকে ত জান্‌বি, জীবন বৃথা। এই অনুভূতি লাভে তৎপর হ, লেগে যা। শাস্ত্র টাস্ত্র ত ঢের পড়লি।

বল দিকি এতে হোল কি? কেউ না হয় ধনে কুবের হয়েছে; তুই না হয় শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়েছিস্। তা উভয়ই বন্ধন। পরাবিদ্যা লাভে বিদ্যা অবিদ্যার পারে চলে যা।

শিষ্য। মশায়, আপনার কৃপায় সব বুঝি, কিন্তু কর্ম্মের ফেরে ধারণা কত্তে পারি না।

স্বামীজি। কর্ম্ম ফর্ম্ম ফেলে দে। তুই যদি পূর্ব্বজন্মে কর্ম্ম করে এই দেহ পেয়েছিস্—তবে কর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম কেটে, তুই আবার কেননা এ দেহেই জীবন্মুক্ত হবি? জানবি মুক্তি বা আত্মজ্ঞান তোর নিজের হাতে। জ্ঞানে কর্ম্মের লেশ মাত্র নাই। তবে যারা জীবন্মুক্ত হয়েও কায করে, তারা জানবি "পরহিতায়" কর্ম্ম করে। তারা ভালমন্দ ফলের দিকে চায় না, কোন বাসনা-বীজ তাদের মনে স্থান পায় না। সংসার আশ্রমে থেকে ঐরূপ যথার্থ 'পরহিতায়' কর্ম্ম করা এক প্রকার অসম্ভব জানবি। তোর সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে এক জনক রাজার নাম আছে। তোরা এখন বছর বছর ছেলের জন্ম দিয়ে, ঘরে ঘরে বিদেহ 'জনক' হতে চাস্।

শিষ্য। আপনি কৃপা করুন—যাতে আত্মানুভূতি লাভ এ শরীরেই হয়।

স্বামীজি। ভয় কি বাবা? মনের ঐকান্তিকতা থাকলে, আমি নিশ্চয় বলছি, এ জন্মেই হবে। তবে পুরুষকার চাই। পুরুষকার কি জানিস? এই আত্মজ্ঞান লাভ করবই করব, এতে যে বাধা বিপদ্ সাম্‌নে পড়ে তা কাটাবই কাটাব। মা, বাপ্, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র মরে মরুক্, এ দেহ থাকে থাক্, যায় যাক্, আমি কিছুতেই ফিরে চাইব না যতক্ষণ না আমার আত্মদর্শন ঘটে—এইরূপে সকল বিষয় উপেক্ষা ক'রে, এক মনে আপনার Goal এর দিকে অগ্রসর হ'বার চেষ্টার নামই পুরুষকার। নতুবা অন্য পুরুষকার ত পশু পক্ষীরাও কচ্ছে। মানুষ এ দেহ পেয়েছে সেই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য। সংসারের সকলে যে পথে যাচ্ছে, তুইও কি সেই স্রোতে গা ঢেলে চলে যাবি? তবে আর তোর পুরুষকার কি? সকলে ত মর্‌তে বসেছে। তুই যে মৃত্যু জয় কত্তে এসেছিস। মহাবীরের ন্যায় অগ্রসর হ। কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করবিনি। কর্যদিনের জন্য বা শরীর, কর্যদিনের জন্য বা সুখ দুঃখ। যদি দেহই পেয়েছিস, তবে ভেতরের আত্মাকে জাগা, আর বল্—আমি অভয় পদ পেয়েছি। বল্—আমি সেই আত্মা যাহাতে আমার কাঁচা আমিত্ব ডুবে গেছে। এই ভাবে সিদ্ধ হয়ে যা, তারপর যতদিন দেহ থাকে, ততদিন পরকে এই মহাবীর্য্যপ্রদ নির্ভয়বাণী শুনা—"তত্ত্বমসি", 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" এইটী হলে জানব, তুই যথার্থ একগুঁয়ে বাঙ্গাল।

স্বামী বিমলানন্দ।

[স্বামী সারদানন্দ লিখিত।]

কালচক্র চিরদিন সমান ফিরিতেছে। বিকাশ বিলোপ, সৃষ্টি সংহার, জীবন মৃত্যু আসে আসুক—পরিবর্ত্তন-প্রিয় কাল সমান উদাসীন। নগণ্য মানব চিরদিন বড়াই করিতেছে—আমিই সৃষ্টির রাজা আমি গেলে জগতে আর রহিল কি? 'God made man after His own image'—পরম পুরুষ আপনার ছাঁদে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। থাকেন উত্তম, কাল কিন্তু আপনার চক্রে ক্ষুদ্র পিপীলিকাবৎ তাহার কত সাধের অমূল্য শরীরমনকে সমান পিশিতেছে। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে কিছুমাত্র শঙ্কিত বা বেদনা অনুভব করিতেছে না। তুমি বলিবে, কি নূতন কথাই বলিতেছ। ও কথা কে না জানে? আমি বলি, আমরা জানিয়াও জানি না, শুনিয়াও শুনি না, বুঝিয়াও বুঝি না, নতুবা এ উৎসব-ব্যসনের একত্র বাসভূমি মহাশ্মশানে কিরূপে, কেনই বা রহিয়াছি। নতুবা মরুভূমে জলের ন্যায় এখানে সুখের প্রত্যাশা বৃথা বলিয়া মনে নিশ্চয় হইলেও, প্রাণ কেন নিয়ত সুখান্বেষণে ব্যস্ত।

কালচক্র ফিরিতেছে, অথবা কেহ উহা ফিরাইতেছে?

সিদ্ধ কবি গাহিয়াছেন—'চল্‌তি চক্কি সব কোই দেখে, কীল ন দেখে কোই'—চক্র ফিরিতেছে ইহাই সকলে দেখিতেছে, কিন্তু যাহাকে ধরিয়া, যাহার জোরে ফিরিতেছে, তাহাকে কেহ দেখিতেছে না। বেদোপনিষৎ বলেন—তাহাকে দর্শন করিবার চেষ্টা না থাকাতেই মানবের পরিবর্ত্তনমুখে এত দুঃখ যন্ত্রণা আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু সংসারের সকল সুখ উপেক্ষা করিয়া, ঐ চেষ্টায় বিন্দু বিন্দু হৃদয়-শোণিত দান করিতে পারে, এমন বীর-হৃদয় কয়টী নয়ন গোচর হয়? বিরল হইলেও ভগবৎ কৃপায় তদ্দর্শন অপ্রাপ্য নহে। ঐরূপ চরিত্রের আলোচনায় হৃদয়ে নব বল সঞ্চারিত হইয়া, নিজ নিজ আদর্শাভিমুখে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে আমাদিগকে উত্তেজিত করে। এস পাঠক, অদ্য আমরা পরলোকগত ঐরূপ একটী জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত বাগাণ্ডা গ্রামে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস। ইনি অধুনা আন্দুলে বাস করিতেছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে রংপুরের রাজা গোবিন্দ লাল রায়ের

রাজ সরকারের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, পরে কার্য্যদক্ষতা এবং চরিত্র বলে বিশ্বাস-ভাজন হইয়া ঐ সরকারে সর্ব্ববিষয়ের তত্ত্বাবধানকারী বা ম্যানেজারের পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হন। কলিকাতায় থাকিলে কাজ কর্ম্মের সুবিধা হয় দেখিয়া ইনি পটল-ডাঙ্গা কেথিড্রাল মিশন লেনে, একখানি বাটী ক্রয় করিয়া, কখন কখন সেখানেও সপরিবারে বাস করিতেন। ইঁহার মত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও গুরুভক্ত লোক, আজ-কালকার ইংরাজি পড়ার দিনে, পাওয়া বিরল। শুনিয়াছি, বিষয় কর্ম্মের তদ্বিরে ব্যস্ত থাকিয়া যখন সময়ে সময়ে নিত্য পুজাহ্নিকাদির অবসর পাইতেন না, তখন সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া, রাত্রি দেড় প্রহরের পর বাটী যাইয়া, অগ্রে পূজাদি সাঙ্গ করিতেন, পরে জল গ্রহণ করিতেন। গৃহিণীও তাঁহারই অনুরূপ ভক্তিমতী ও তেজস্বিনী। প্রতিবেশী স্ত্রীলোকেরা বলেন—ইনি পূর্ব্বে দেখিতে যেন লক্ষ্মী-ঠাকুরুণটীর মত সুশ্রী ছিলেন। সাধারণ স্ত্রীলোকদিগের সংসারে যেমন একটা বিশেষ আঁট দেখা যায়, দেখিলে বোধ হয় ইঁহার সেরূপ নাই। 'পুত্রের বিবাহ দিব', 'পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া সুখী হইব'—সাধারণ স্ত্রীলোক এই সকল বাসনা লইয়াই যেমন বাঁচিয়া থাকে—ইনি সেরূপ নন। 'পুত্রের ধর্ম্মে মতি হউক,' ইহাই চট্টো-পাধ্যায় মহাশয়ের গৃহিণীর সর্ব্বাগ্রে কামনা। এমন একসুরে বাঁধা দম্পতি যুগল যদি গৃহে গৃহে দেখা যাইত, তাহা হইলে সংসারে কিছু সুখ যে আছে—এ কথা নিশ্চয় ধারণা হইত। এমন পবিত্রতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা যদি প্রতি পরিবারে বিরাজ করিত, তাহা হইলে হীনবুদ্ধি, নীচমনা সন্তানসন্ততি জন্মগ্রহণ করিয়া সমাজ-শরীর রুগ্ন করিত না।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনেকগুলি পুত্র কন্যা। কিন্তু সন্তানগুলির শরীর তত দৃঢ় ও সবল হয় নাই। পিতৃগুণ সন্তানে সংক্রমিত হয়, সুতরাং চট্টো-পাধ্যায় মহাশয়ের ধর্ম্মনিষ্ঠার সহিত তাঁহার বহু কালারব্ধ অজীর্ণ রোগটীও তাঁহার পুত্রকন্যাগণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ ভীষণ রোগ পরিণামে যক্ষ্মায় পরিণত হইয়া তাহাদের দুইটীর অকালমৃত্যুর কারণ হয় এবং একটী কন্যার ও জামাতারও হঠাৎ মৃত্যু হয়। সেইজন্য উক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের জীবনে পুত্র শোকের নিদারুণ যাতনার অভাব ছিল না। তবে ভক্ত-হৃদয়, সংসারের তীব্র যাতনায়, প্রভুপাদপদ্মই দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া থাকে—ইঁহাদেরও তাহাই হইয়াছে।

স্বামী বিমলানন্দ বেণীমাধব বাবুর দ্বিতীয় পুত্র। ইনি সন ১২৭৯ সাল, ইংরাজি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মাতা ইঁহার নাম খগেন্দ্র নাথ রাখিয়াছিলেন। কবি বলিয়াছেন, 'বালকই বৃদ্ধের পিতা'—বালকের কার্য্য-

কলাপ পর্য্যালোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়, পরে সে কেমন মনুষ্য দাঁড়াইবে। বাল্যকালেই খগেন্দ্র নাথের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সরলতা, বয়স্য-প্রেম প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া সকলে বুঝিতে পারিত, বালক ভবিষ্যতে সামান্য মনুষ্য হইবে না, তেমনি আবার তাহার নিত্য রোগ দেখিয়া নিশ্চয় করিত, নিদাঘ-শুষ্ক পুষ্পকলিকার ন্যায় তাহার জীবন পূর্ণ-বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই শুকাইয়া যাইবে।

খগেন্দ্রনাথের বয়স্য-প্রেম পাঠ্যাবস্থায় অনেক সহপাঠীকে তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত করিয়াছিল। স্বার্থপর জগতে যথার্থ বন্ধুলাভ সুলভ নহে। ফুল ফুটিলে ভ্রমর আপনা হইতেই যেমন বুঝিতে পারে, তোমার প্রাণে যথার্থ সহানুভূতি ও প্রেম আছে কি না অপরে তেমনি আপনা আপনি বুঝিয়া লয়। তুমি বুঝিবে না তাহারা কেন তোমায় চায়, তোমার কোন্ গুণে তাহারা আকর্ষিত হয়। যে দিন উহা জানিবে বা বুঝিবে, সে দিন হইতে তোমার আর সে আকর্ষণ থাকিবে না—ইহা নিশ্চয়। খগেন্দ্র নাথের ভিতর সেই প্রেম কিঞ্চিৎ ছিল বলিয়াই বয়স্যেরা তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইত এবং কালে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া একটী যুবক সম্প্রদায় *গঠিত হইয়াছিল।

খগেন্দ্রনাথ তখন প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। ঐ সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার একজন সহপাঠী আমাদের লিখিয়াছেন—

"খগেন্দ্র বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুগণের নিকট ঈশ্বর প্রসঙ্গে দিন যাপন করিতেন এবং বন্ধুবান্ধবগণের সকলেই যাহাতে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়, তাহার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সহানুভূতি, ভালবাসা এবং সদুপদেশে তিনি বহু বালক এবং যুবকদিগকে সৎ পথে আনিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গ এবং উপদেশ না পাইলে অনেকের জীবন-গতি যে অন্য পথে যাইত—এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার বহুলোক বিদ্যমান আছে।"

আর এক জন সহপাঠীর কথাও এক্ষণে না উদ্ধৃত করিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না—

"১৮৯০ খৃষ্টাব্দে, রিপন কলেজে প্রবেশিকা শ্রেণীতে যখন পড়ি, তখন খগেন্দ্রের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ। খগেন তখন কোনও স্থলে সাধুভক্ত

* এই যুবক দলের পাঁচ জন পরে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দকে গুরুপদে বরণ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং অদ্যাবধি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত উহা সম্পন্ন করিতেছেন। ঐ দলের অপর দুই এক জন আবার সংসারে থাকিলেও, আজীবন কৌমার-ব্রত অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন।

আছেন শুনিলেই দেখিতে যাইত। আমাদের প্রথম জানাজানি ক্রমে প্রগাঢ় বন্ধুতায় পরিণত হয়। এইরূপে স্বল্পকাল মধ্যেই আমার পিতামাতা তাহাকে নিজের সন্তানের মত দেখিতে লাগিলেন, তাহার পরিবার মধ্যে আমিও তদ্রূপ পরিগণিত হইতে লাগিলাম। দুই চারিজন সহাধ্যায়ীও এই সময়ে আমাদের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়েন। খগেনের ধর্ম্মভাব প্রথমে আমার ভিতর, পরে উহাদের ভিতরও সংক্রমিত হইয়া পড়ে। কলেজ বন্ধ হইবার পর প্রতিদিন আমরা একত্রিত হইতাম এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অতি আগ্রহের সহিত ধর্ম্মবিষয়ক চর্চ্চা করিতাম। কিরূপে ধর্ম্মানুভূতি হইবে, ইহাই আমাদের দলের প্রত্যেকের একমাত্র প্রাণের কামনা ছিল। এই সময়ে খগেনের ভালবাসা, বুদ্ধি এবং মন্ত্রনা আমাদের সকলকেই তাহার প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়াছিল। আমরা সে সময়ে অবশ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতি অল্পই বুঝিতাম, তবে যতটুকু বুঝিতাম ততটুকু চেষ্টা করিতাম। প্রাণে যেমন উঠিত তেমনি ধ্যান ভজন করিতাম। আমার পিতা ঐ সময়ে একখানি বাগান ভাড়া লইয়াছিলেন। আমরা অনেক সময় ঐ বাগানে মিলিত হইতাম এবং সংসারের সকল কথা ভুলিয়া গিয়া, সমস্ত দিন ধর্ম্মচর্চ্চা, ধ্যান ভজনে কাটাইতাম। ঐ সকল দিনে আমরাই আমাদের আহার্য্য অন্নাদি রন্ধন করিতাম। আমাদের ভিতর সকলেরই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার উপর বিশেষ লক্ষ্য ছিল এবং অন্যে যাহাতে ঐ ভাব গ্রহণ করে সে বিষয়ে চেষ্টাও ছিল।

এইরূপে কয়েক মাস গত হইলে, আমরা শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের উক্তি" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানি প্রথম পাঠ করি। তাহার কিছুকাল পরেই রাস্তায় প্লেকার্ড দেখিয়া, কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসব হইবে জানিতে পারিয়া, তথায় উপস্থিত হই। ঐ দিন উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদের যে কি আনন্দ হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। ইহার পর প্রায়ই আমরা কাঁকুড়গাছিতে যাইতাম এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী সম্বন্ধীয় নানা কথাবার্ত্তা শুনিতাম।

খগেন ও আমি ঐ সময়ে একবার স্থির করিয়াছিলাম, সংসার ত্যাগ করিয়া হিমালয়ে বাস করিব এবং ধ্যান ভজনে দিন কাটাইব। দার্জ্জিলিঙ্গে যাইবার আমাদের সুবিধা ছিল। অতএব সংকল্প করিলাম, সেখানেই যাইব। সব স্থির, কাল যাইব, এমন সময়ে খগেন যাহাকে খুব বিশ্বাস করিত এমন এক ব্যক্তি আমাদের যাইতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, তিনি পূর্ব্বরাত্রে এমন কিছু

দেখিয়াছেন, যাহাতে টের পাইয়াছেন যে, দার্জ্জিলিঙ্গে যাইলে আমাদের ভারি কষ্ট পাইতে হইবে। কাজেই সে যাত্রা আমাদের উদ্যম ভগ্ন হইল।

এইরূপে রিপন কলেজে পড়াশুনা এবং ধর্ম্মচর্চ্চা আমাদের একসঙ্গে চলিতে লাগিল। ১৮৯০ খৃঃ শেষে আমরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। খগেন বোধ হয় ১৫ টাকার একটী বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। আমরা সকলেই রিপন কলেজে এফ এ পড়িতে লাগিলাম। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তখন আমাদের পড়াইতেন। নানা গুণে তিনি ছাত্রদের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। ইঁহার সহিত আলাপ হইয়া আমাদের যে কত উপকার হইয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। ক্রমে মহেন্দ্র বাবুকে আমরা সাধু পুরুষ বলিয়া জানিলাম। এবং ধর্ম্মবিষয়ক কথা শুনিবার জন্য তাঁহার বাটীতে গমন করিতে লাগিলাম। একদিন ঐরূপ গিয়াছি এমন সময়ে তিনি কথায় কথায় ভগবান লাভের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগের আবশ্যকতা ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, 'যদি ইহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও ত একদিন বরাহনগর মঠে, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যমণ্ডলী থাকেন, যাইও।'

দুই চারিদিন পরে একদিন কলেজে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছি এমন সময় মহেন্দ্র বাবুর ঐ কথা আমাদের মনে পড়িল এবং তদ্দণ্ডেই বরাহনগর মঠ দর্শনে যাত্রা করিলাম। আমরা পদব্রজেই চলিলাম। মহেন্দ্র বাবুর নিকট শুনিয়াছিলাম—শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, রিক্তহস্তে সাধুর নিকট যাইতে নাই, কিছু খাবার, একটা ফল বা একটা দাঁতনও লইয়া যাইতে হয়, তাই দুই এক পয়সা যাহা সঙ্গে ছিল, তাহাতেই কিছু কিনিয়া লইলাম। তথায় পৌঁছিলে মঠের সন্ন্যাসীগণ বিশেষ আদর যত্ন সহকারে আমাদের সহিত আলাপ করিয়া আপ্যায়িত করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া এবং তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া মনে হইল, আমাদের প্রাণের বাসনাই ইঁহারা কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। অতঃপর আমরা অবসর পাইলেই মঠে যাইতে লাগিলাম এবং সংসার ত্যাগ করিয়া মঠে বাস করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম।

খগেন্দ্র এতদিন নানাস্থানে গমন করিয়া যে বস্তুর সন্ধান করিতেছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের মঠস্থ সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গকে দর্শন করিয়া অবধি যেন, সেই অভীষ্ট বস্তু লাভের পথের সন্ধান পাইল এবং একথাও বুঝিল যে, সংসার ত্যাগ না করিলে তল্লাভ অসম্ভব। ১৮৯২ খৃঃ এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই

বোধ হয় আমরা মঠ দর্শন করি। এই সময়ে খগেন্দ্রনাথের মাথায় লম্বা লম্বা চুল ছিল। চুলগুলি ঘাড়ের উপর এবং মুখের চতুর্দ্দিকে পড়ায় মুখখানির অপূর্ব্ব শ্রী হইয়াছিল। তাঁহার মুখখানি যেমন সুন্দর, ব্যবহারও তেমনি অমায়িক ছিল। তাঁহাকে দেখিলেই লোকের মনে সদ্ভাব এবং ভালবাসার উদয় হইত। এই বয়সেই তিনি অনেক যুবক এবং প্রৌঢ় ব্যক্তিকে সদুপদেশ এবং সাধু দৃষ্টান্তে সৎপথে আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি নিজেও নানা সময়ে নানা প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু চরিত্রবলে সকল বারেই জয়ী হইয়াছিলেন।

খগেন বি এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময়ে তাহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। কাজেই এখন হইতে তাহাকে পড়াশুনা ছাড়িয়া দিতে হইল (১৮৯৪।৯৫ খৃঃ)। অতঃপর কিছু কাল বাটীতে থাকিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে যত্নবান হইলেন।"

১৮৯৭খৃঃ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ধূম লাগিয়া গেল। লোকের মুখে, সংবাদপত্র সমূহে, সর্ব্বত্রই ঐ এক বিষয়ের আন্দোলন—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ, বৈদিক ধর্ম্মের বিজয়-নিশান পাশ্চাত্য জগতে উড্ডীন করিয়া পুনরায় ভারতে ফিরিয়া আসিতেছেন। আজ তিনি জাহাজ হইতে কলম্বোতে নামিয়াছেন, কাল মান্দ্রাজের আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করায় তিনি সর্ব্বসমক্ষে অদ্ভুত ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন তিনি যেখানে যাইতেছেন, সেখানেই যেন ধর্ম্ম-বন্যার অকূল প্লাবন আসিতেছে, ইত্যাদি। খগেন্দ্রনাথের শরীর তখনও অজীর্ণের ভীষণ আক্রমণে কৃশ ও রুগ্ন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁহার সহিত বিধাতা তাঁহার নিত্য-সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার আগমনের কথা শুনিয়া কেমন করিয়া চুপ করিয়া থাকিবেন! খগেন্দ্র প্রাণে প্রাণে বিষম আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। অবশেষে যথাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া সহপাঠী এবং কলিকাতার ছাত্রমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া শিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে স্বামীজির গাড়ী টানিয়া আনিলেন। কলিকাতায় যেখানে স্বামীজি ধর্ম্ম ব্যাখ্যা বা বক্তৃতা দিতে লাগিলেন, সেখানেই উপস্থিত হইয়া তাঁহার পুণ্যদর্শন ও ওজস্বিনী বাণী শ্রবণে নয়ন মন ধন্য করিতে লাগিলেন। আলমবাজার মঠে এবং শ্রীযুত গোপাল লাল শীলের বাগানে—যেখানে কলিকাতার জনসাধারণ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে কিছুদিনের জন্য স্বামীজির বাস নিরূপণ করিয়া দিয়াছিল—খগেন্দ্র উপস্থিত হইয়া স্বামীজির কথাবার্ত্তা এবং অমায়িক

ব্যবহার দর্শনে মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। কিন্তু এ সকল দেখা শুনা দূর হইতেই হইতে লাগিল, কারণ সর্ব্বত্রই লোকে লোকারণ্য—সে ভিড় ঠেলিয়া স্বামীজির সমীপে উপস্থিত হওয়া দুঃসাধ্য এবং পারিলেও তাঁহার নিকট মনোভাব প্রকাশ করিবার অবসর কোথায়? তাহার উপর আবার স্বামীজির শরীর, নিরন্তর জনতার মধ্যে বাস, কথাবার্ত্তা, বক্তৃতা এবং ভ্রমণাদিতে, অসুস্থ হইয়া পড়িল। কিন্তু জগতের লোক আর কত দিন এক বিষয় লইয়া গোল করিতে পারে? মাসাবধি কাল যাইতে না যাইতে গোল থামিল—স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা লইয়া অনেকদিন মাতা হইয়াছে বুঝিয়া—সহরের লোক যে যার কাজে ব্যস্ত হইল। খগেন্দ্রনাথও এতদিনে অবসর পাইলেন। পিতা মাতার অনুজ্ঞা লইয়া চিরদিনের জন্য গৃহ ছাড়িলেন এবং মঠে আসিয়া স্বামীজির শরণ লইলেন। এইরূপে খগেন্দ্রনাথ যেদিন সংসার হইতে বিদায় লইলেন, স্বামী বিবেকানন্দের মানস-পুত্র গৈরিকধারী, মণ্ডিত, যতী বিমলানন্দও সেই দিন জন্মগ্রহণ করিয়া, 'আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়,' তাঁহারই স্থানে সংসারে প্রবেশ করিলেন।

* * * * * * *

বিবেকানন্দ স্বামীজির নিদেশে তুরীয়ানন্দ স্বামী তখন মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দকে উপনিষদাদি গ্রন্থের পাঠ দিতেছিলেন। বিমলানন্দও সেই সঙ্গে ঐ সকলের অধ্যয়ন ও নিয়মিতরূপে ধ্যান ভজন এবং সাধুবৃন্দের সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বভাগে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড়ে নূতন মঠবাটী প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই আবার হিমালয়ে মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামক ইংরাজি মাসিক পত্র তথা হইতে মুদ্রিত হইতে লাগিল। ঐ আশ্রমে কৃতবিদ্য লোকের অভাব হওয়ায় স্বামীজি অন্য দুই একজনের সহিত বিমলানন্দকে তথায় পাঠাইতে মনোনীত করিলেন।* বিমলানন্দ মায়াবতী উপস্থিত হইয়া প্রথমে উক্ত পত্রিকার ম্যানেজারের কার্য্য এবং পরে সহকারী সম্পাদকের কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া, মঠে এতদিন থাকিয়া স্বামীজির প্রসাদে যাহা শিখিয়াছিলেন, জগৎকে তাহাই শিখাইবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন।

বিমলানন্দের শরীর দুর্ব্বল হইলেও তিনি কখনও অলস বা নিরুদ্যম থাকিতেন না। বাজে কথায় কালক্ষেপ করা তাঁহার কোষ্ঠীতে লেখা ছিল না।

* স্বামীজি বিমলানন্দের ইংরাজি ভাষার বিশেষ সুখ্যাতি করিতেন।

বেলুড়, মায়াবতী, যেখানেই থাকিতেন ধ্যান, জপ, পাঠ ইত্যাদি মানসিক পরিশ্রম ভিন্ন গৃহকর্ম, রন্ধনের বন্দোবস্ত, রোগীর সেবা ইত্যাদি কিছু না কিছু শারীরিক পরিশ্রমেও নিযুক্ত থাকিতেন। আপন শরীর অপটু হইলেও অনেক সময় জোর করিয়াও উহা করিতেন। রোগীর প্রতি তাঁহার চিরদিন বিশেষ সহানুভূতি লক্ষিত হইত এবং মঠস্থ কেহ পীড়িত হইলে তিনি অতি যত্নে তাঁহার সেবা করিতেন। নিজে বহুকাল রোগের যন্ত্রণা অনুভব করাতেই বোধ হয় পীড়িতের যন্ত্রণা তিনি এত বুঝিতেন। আবার লোকাভাবে মঠস্থ কাহাকেও অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে দেখিলে, তিনি নিজের শারীরিক দুর্ব্বলতার কথা একেবারে ভুলিয়া যাইয়া, তাহার সাহায্যে অগ্রসর হইতেন—অনেক সময় ঐ জন্য তাঁহাকে ভুগিতেও হইয়াছে।

হিমালয়ে যাইয়া প্রথম দুই বৎসর বিমলানন্দের শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হয়। ১৯০০খৃঃ কোন বিশেষ কারণে তাঁহাকে কিছুকালের জন্য কলিকাতা আসিতে হয়। তখন তাঁহাকে যেই দেখিয়াছিল, সেই ভাবিয়াছিল, এতদিনে তিনি সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইয়াছেন। সকলেই আশা করিয়াছিলেন, এই উন্নতি চিরস্থায়ী হইবে এবং বিমলানন্দের ন্যায় প্রতিভাশালী যুবক, দীর্ঘকাল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্য করিতে পারিবেন ভাবিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। এ যাত্রায় বিমলানন্দ শীঘ্রই মায়াবতী ফিরিয়া যাইলেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ কিছুকালের জন্য মায়াবতী আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অনুগত ভক্ত কাপ্তেন সেভিয়ারের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায়, কাপ্তেনের সহধর্ম্মিণীকে সান্ত্বনা প্রদান করাই, এই আগমনের প্রয়োজন। স্বামীজির নিকটে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবার সাধ—বিমলানন্দের বহুকাল হইতে ছিল। স্বল্পকালের জন্য হইলেও এই সুযোগে তাহা পূর্ণ হইল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দ ৪ঠা জুলাই স্বামীজি দেহরক্ষা করায়, বিমলানন্দের ভাগ্যে আর শ্রীগুরুর পবিত্র দর্শনজনিত আনন্দ লাভ হয় নাই।

মায়াবতী আশ্রমে শীতের প্রকোপ অত্যন্ত অধিক। বরফ পড়িয়া পথঘাট শীতকালে অগম্য হইয়া যায়। আশ্রমবাসীদিগের ঐ কয়মাস বহির্জগতের সহিত বড় একটা সম্বন্ধ থাকে না। ঐ কয়মাসের খাদ্যদ্রব্য এবং রন্ধনের কাঠাদি সেজন্য পূর্ব্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। যাঁহাদের অত শীত সহ্য না হয়, তাঁহারা বরফ পড়িবার পূর্ব্বেই পাহাড় হইতে নামিয়া আসেন এবং

শীত ফুরাইলে পুনরায় আশ্রমে ফিরিয়া যান। সেভিয়ার সহধর্ম্মিণীকে প্রতি বৎসরই প্রায় ঐরূপ করিতে হইত। তখন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী স্বরূপানন্দ প্রায়ই তাঁহার সহিত ঐ কয় মাসের জন্য নামিয়া আসিতেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বিমলানন্দের শরীর তত ভাল ছিল না। সেজন্য ইঁহারা উভয়েই কার্য্যভার অন্যের উপর ন্যস্ত করিয়া, সেভিয়ার পত্নীর সহিত ঐরূপে প্রয়াগধামে আসিয়া উপস্থিত হন। শীত কয়মাস বক্তৃতাদির দ্বারা ধর্ম্মান্দোলন করা যাইবে এই পরামর্শ স্থির করিয়াই তাঁহারা ঐস্থানে আগমন করেন। বিমলানন্দের ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকিলেও বক্তৃতা প্রদান কখন করেন নাই। ঐ বিষয়ে এই তাঁহার প্রথম হাতে খড়ি, কাজেই হারিব কি পারিব ভাবিয়া, কিছু ত্রস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বক্তৃতাকালে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি এমন সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলেন যে, সকলেই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। ঐস্থানে ঐবার তিনি বেদান্তবিষয়িণী দুইটী বক্তৃতা মাত্র প্রদান করেন। ঐ দুইটীতেই জটিল বেদান্তজ্ঞানের এমন সরল ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন যে, তত্রস্থ কৃতবিদ্য জনগণ মোহিত হইয়া ঐ স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একটী আশ্রম ও কেন্দ্র স্থাপন করিয়া নিয়মিত ভাবে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে বার বার তাঁহাকে অনুরোধ করেন।

এলাহাবাদে আসিয়া বিমলানন্দের স্বাস্থ্য ভাল না হইয়া খারাপই হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে জ্বর হইতে লাগিল। সকলে ভাবিলেন, শীতের পর মায়াবতী ফিরিয়া যাইলেই আবার তাঁহার শরীর পূর্ব্ববৎ হইবে। কিন্তু সব বিপরীতই হইল। মায়াবতী ফিরিয়া বিমলানন্দের তদ্রূপ জ্বর ত মধ্যে মধ্যে হইতই, তদুপরি আবার অজীর্ণ ধীরে ধীরে দেখা দিল। এ অবস্থায় আশ্রম বা পত্রিকার কার্য্যে কিন্তু তিনি কিছুমাত্র অবহেলা করিলেন না। ক্রমে শরীর যেরূপ দুর্ব্বল হইতেছে, তাহাতে অধিক দিন একরূপ অগ্রাহ্য করিয়া পরিশ্রম অসম্ভব দেখিয়া—তিনি আশ্রম কার্য্য হইতে অবসর লইলেন এবং কিছুদিন সমুদ্র তীরবর্ত্তী কোন স্থানে থাকিয়া শরীরটা সারিয়া লইবেন ভাবিয়া, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে পাহাড় হইতে বেলুড় মঠে আসিলেন। তৎপরে ওয়ালটেয়ার নামক স্থানে কিছুদিন অবস্থান করিয়া, মিশনের মান্দ্রাজ মঠে আগমন করিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এবং তত্রস্থ বন্ধুগণ এখানে তাঁহার চিকিৎসা, ঔষধ, পথ্যাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, কিন্তু বিশেষ কিছু উপকার হইল না। দীর্ঘকাল অবস্থান করিলে উপকার হইবে, চিকিৎসক বন্ধু নন্দন রাও একথা বলায়, তিনি আরও কয়েক মাস মান্দ্রাজেই রহিলেন।

মহীশূর রাজ্যের বাঙ্গালোর সহরে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্য ইতিপূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং বিমলানন্দের পাঠ্যাবস্থার বন্ধু, স্বামী আত্মানন্দ, ঐ কার্য্যের ভার লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার শরীরও বিমলানন্দের ন্যায় কৃশ ও দুর্ব্বল ছিল এবং বক্তৃতা দ্বারা লোকশিক্ষা কার্য্যের দিন দিন প্রসার হওয়ায়, ঐ কার্য্যের পরিচালনা তাঁহার ভগ্নদেহে অসম্ভব হইয়া উঠিল। লোকাভাব দেখিয়া বিমলানন্দ তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটিলেন এবং কয়েক মাস মহা উদ্যমে তথায় লোক শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার শরীর যে দিন দিন চিকিৎসার অসাধ্য অবস্থায় উপনীত হইতেছে, তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। বিমলানন্দের উদ্যমে বাঙ্গালোরে মিশন-কেন্দ্র চিরপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাঁহার বন্ধুও ঐ কয়মাস বিশ্রাম লাভে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। ভগ্নশরীরে ঐরূপ উদ্যম আর কতদিন চলে? বিমলানন্দ পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়া মান্দ্রাজে ফিরিলেন এবং পুনরায় নিয়মিত চিকিৎসাধীন থাকিয়া সুস্থ হইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডাইবে—কিছুদিন বিশ্রাম লাভ করিতে না করিতেই শুনিলেন, মায়াবতী আশ্রমাধ্যক্ষ, পুণ্যচরিত্র, মহোদ্যমী স্বামী স্বরূপানন্দ ১৯০৬ খৃঃ নৈনিতালে হঠাৎ কালকবলে পতিত হইয়াছেন। ইঁহার সহিত বিমলানন্দের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। সুতরাং ঐ ঘটনায় কিছুকাল তাঁহাকে অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ করে। কিন্তু যথার্থ সন্ন্যাসীর ঐ ভাব কয়দিন থাকে? গুরুকৃপায় যাঁহার ধারণা চিরদিনের জন্য স্থির হইয়াছে যে, তিনি এবং অন্য সকলেই অজরামর আত্মা, যাঁহার প্রাণে সর্ব্বদা—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বাভবিতা বা ন ভূয়ঃ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো।
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

—এই গীতধ্বনি সর্ব্বদা উঠিতেছে, তাঁহাকে সংসারের শোক দুঃখাদি উদ্যমরহিত করিয়া কবে রাখিতে পারিয়াছে? শয়নে স্বপনে যে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব পরমকারুণিক পরমপুরুষের সহিত আপনার নিত্য সম্বন্ধ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছে, বিয়োগ মরণ তাহাকে আবার কি প্রভাব দেখাইবে? ঋষিত্ব, মৃত্যুঞ্জয়ত্ব তাহার বিনা চেষ্টায় উপস্থিত হইয়া থাকে এবং দেশ কালের পরপারে প্রভুর সহিত আপনার নিত্য অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া, 'অভী' হইয়া, সে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করে।

বিমলানন্দ আপনাকে সংযত করিয়া কর্ত্তব্যাবধারণ করিলেন এবং মান্দ্রাজী বন্ধুদিগের চিকিৎসাগুণে উপশম হইয়া একটু সুস্থ বোধ করিলেই বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। মঠে ইহাই তাঁহার শেষ অবস্থান।

ইতিপূর্ব্বে আমেরিকার মিশনাধিকৃত ক্ষেত্র বিস্তারের সহিত লোকাভাব উপস্থিত হয় এবং বিমলানন্দের কার্য্য-নিপুণতা, পাণ্ডিত্য এবং কর্ত্তব্যপরতার বিষয় সুপরিচিত থাকায়, নিউইয়র্ক এবং সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো সহরের বেদান্ত সমিতির পরিচালক স্বামীগণ, তথায় যাইতে তাঁহাকে বারবার সাদরে আহ্বান করেন। কিন্তু জীর্ণ শরীর আর অধিক কাল টিকিবে না নিশ্চয় হওয়ায়, বিমলানন্দ তাঁহাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন।

মঠে আসিয়া বিমলানন্দ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেই মঠস্থ স্বামীগণকে সকল বিষয়ে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের শীতকালে সেভিয়ার পত্নী কলিকাতায় আসিলে, তিনি তাঁহার সহিত মায়াবতী ফিরিয়া যাইবার সংকল্প করিলেন। ঐ সময়ে 'বেহালা হিতকরী সভার' সভ্যগণের অনুরোধে, তথায় একটী সুন্দর ইংরাজী বক্তৃতা প্রদান করেন।

ঐ সময়ে তিনি কয়েক দিনের জন্য আন্দুলে আপন পিতামাতার নিকট অবস্থান করেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব উপলক্ষে মঠস্থ সমস্ত স্বামীগণকে তথায় নিমন্ত্রণ করেন। পিতামাতা এবং পরিবারবর্গের সহিত এই শেষ দর্শন ভাবিয়াই বোধ হয় ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে এত উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৯০৭ খৃঃ এপ্রিল মাসে বিমলানন্দ সেভিয়ার পত্নীর সহিত পুনরায় মায়াবতীতে উপস্থিত হইলেন। হিমালয়ের পবিত্র বায়ুতে আবার তাঁহার শরীর কিঞ্চিৎ সবল হইল। ঐ সময় আশ্রম হইতে পূজ্যপাদ স্বামি বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীর নব সংস্করণ মুদ্রিত করিবার চেষ্টা হইতেছিল। বিমলানন্দ বন্ধুবর্গের নিষেধ না শুনিয়া, সোৎসাহে তাহাতে যোগদান করিলেন এবং ছয়মাস কাল উহাতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। স্বামীজির অবর্ত্তমানে তাঁহার গ্রন্থাবলীই চিরদিন জনসাধারণকে নবালোক প্রদান করিয়া নবশক্তিতে পরিপূরিত করিবে এই ভাবিয়াই, ঐ কার্য্যে তিনি শেষ উদ্যম ও স্বকীয় অবশিষ্ট শক্তিটুকু ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। আরাধ্য দেবতার শ্রীপাদপদ্মে চিরানুরক্ত শিষ্যের এই হৃদয়ের শোণিতদান—এই প্রশংসা-স্বার্থ-বিরহিত অযাচিত প্রেমার্পণ—এই লোক-চক্ষু-বহির্ভূত, আড়ম্বর-বর্জ্জিত নিঃশব্দ হৃদয়ের পূজায়

কথা—মানব, তুমি কি বুঝিতে পারিবে? বুঝিবার চেষ্টাই বা তোমাদের কয়জন করিবে? হট্টগোলের জগতে মিথ্যা গোলযোগই লোকে করে ও বুঝে। বিমলানন্দ মূর্খের ন্যায় বৃথোদ্যমে শরীর পাত করে করুক—এস আমরা যাহা করিতেছি তাহাই করি!

মায়াবতী আশ্রমের অধ্যক্ষ, স্বামী বিমলানন্দের জীবনের শেষ কয়টা দিন সম্বন্ধে, এইরূপ লিখিয়াছেন—

"অক্টোবর মাস—সম্মুখে শীত—বিমলানন্দের জ্বর হইল। এক মাস ভুগিয়া এই জ্বর কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল বটে, কিন্তু চিকিৎসক তাঁহার শরীর পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা দিলেন—দুই বৎসর তিনি কোনরূপ লেখা পড়ার কাজ করিতে পাইবেন না, মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক। শীতকালে পাহাড় হইতে নামিয়া আসিবার কথায় ডাক্তার বলিলেন—"এখানেই থাকা ভাল; কারণ তোমার অনুকূল জলবায়ু এই স্থানাপেক্ষা আর কোথাও নাই।" বিমলানন্দ অতঃপর কিছুকাল আশ্রমের বাগবাগিচার কায ইত্যাদি দেখিয়াই, সময় কাটাইতে লাগিলেন। ভিতরে ঘুসঘুসে জ্বরভাব সর্ব্বদাই থাকিত এবং স্বল্প মাত্র মানসিক পরিশ্রমে এত দুর্ব্বল বোধ করিতেন যে, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু একটু বল পাইলেই আবার লেখাপড়ার কাজ করিতেন। নিষেধ করিলে বলিতেন—"আমার শরীর যখন আর সারিবে না নিশ্চয়, তখন কেন আমি তোমাদের যত টুকু সাহায্য করিতে পারি, ততটুকু না করি? ঐরূপ করায় মনের প্রীতি, আনন্দ তো নিশ্চয় পাইব। তবে কেন বাধা দাও?' তাঁহার ঐরূপ ব্যবহারে সকলে দুঃখিত হইলেও, তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং তাঁহার দৃষ্টান্তে, পরস্পরের প্রতি প্রেমের উদয় হইত।

১৯০৮ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাস হইতে তিনি পুনরায় জ্বরে পড়িলেন। ঐ জ্বরের আর বিরাম হইত না। আশ্রমাধিবাসীগণ এতদিনে টের পাইলেন, বিমলানন্দের ক্ষয় রোগ উপস্থিত। ডাক্তার কর্ণোরোয়ন আসিয়া পরীক্ষা করিয়া উহাই স্থির করিলেন, কিন্তু বলিলেন যে, বোধ হয় এ যাত্রা ঐ রোগের হস্ত হইতে তিনি রক্ষা পাইবেন। কলিকাতা বা অন্যত্র লইয়া যাইবার কথা হইলে বিমলানন্দ নিজেই বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অতঃপর ঐ স্থানেই ডাক্তার, ঔষধ ও পথ্যাদির যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা হইল এবং আশ্রমের সকলে তাঁহার যথাসাধ্য সেবায় নিযুক্ত রহিল। এত অসুখেও তিনি একদিনের জন্য

কিছুতে বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই অথবা তাঁহার মেজাজ কিছুমাত্র খিট্‌খিটে হয় নাই। শরীর ত্যাগের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি একদিন বলিলেন—"আর বড় বেশী দিন দেরি নাই। আমার শরীর কিন্তু প্রত্যূষে যাইবে, রাত্রিতে নহে।" আবার বলিলেন, "আমার গোটা কয়েক টাকা আছে। আমার ইচ্ছা, একদিন তোমরা ঐ টাকায় নিমকি, গজা প্রভৃতি সকল রকম খাবার তৈয়ার করিয়া, আমার সামনে সকলে মিলিয়া খাও এবং কুলোয় ত আশ্রমের চাকর বাকরদেরও খাওয়াও।" তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী সকল বন্দোবস্ত করা হইলে তিনি আবার বলিলেন, 'নিমকি ও গজা করিতে আমি দেখাইয়া দিব।' অতঃপর শয্যায় শয়ন করিয়াই, একজন ব্রহ্মচারীকে বলিয়া ও দেখাইয়া, তাঁহার দ্বারা অতি সুন্দর নিমকি ও গজা করাইলেন এবং আমাদের খাওয়াইয়া যেন কত তৃপ্ত হইলেন।

শরীর ত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে বিমলানন্দের আর জ্বর হইত না। বিষম দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কোন রোগের লক্ষণই তাঁহার শরীরে রহিল না। তিনি ইদানীং এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, অপরের সাহায্য ব্যতীত শয্যার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন না। ৮ই শ্রাবণ, ইংরাজী ২৩শে জুলাই, রাত্রি ২টার সময় দুগ্ধ ও ঔষধ খাইলেন এবং এক বোতল গরম জল করিয়া রাখিতে বলিলেন। রাত্রি ৪টা হইতে বোধ হইল, যেন তিনি নিদ্রা যাইতেছেন। কিন্তু বেলা ৬টার সময়ও সেইভাবে থাকিতে দেখিয়া, আমাদের ভয় হইল। দেখিলাম—তাঁহার নাড়ী সূতার মত চলিয়াছে অতি ধীরে নিশ্বাস পড়িতেছে, চক্ষুর্দ্বয় অনেকক্ষণ অন্তরে খুলিতেছেন, আবার ততক্ষণ বাদে বন্ধ করিতেছেন এবং মুখ শান্ত স্থির—অথচ ডাকিয়া কোন সাড়া পাইলাম না। আমরা ভাবিলাম, বোধ হয় দুর্ব্বলতায় অজ্ঞান হইয়াছেন—এখনি আবার জ্ঞান হইবে। এইরূপে কিছুক্ষণ গত হইলে, তাহার মুখ হইতে, দুই তিনবার ওঃ ওঃ ওঃ এইরূপে অস্ফুট ধ্বনি বিনির্গত হইল, এবং পরক্ষণেই সব স্থির হইয়া আসিল।"

* * * * * * *

মায়াবতীর গিরিব্রজে সান্ধ্যসমীর সামগানে প্রবৃত্ত হইয়াছে—সান্ধ্যালোকে অবগাহিত পুণ্য প্রয়াগভূমি * শান্ত মধুর গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে—খর-

* হিমালয়ে যেখানেই দুই নদী একত্র মিলিত হয়, সেই সঙ্গমস্থলই প্রয়াগ বলিয়া কেদারখণ্ডে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

স্রোতা গিরি নদী কূল, 'হর, হর' নিনাদে পরস্পরের অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া, প্রেমের সার্থকতা শিক্ষা দিতেছে—চিরতুষারাবৃতা নন্দাদেবী, মেঘাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া, স্তব্ধভাবে ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্র জগতে সকরুণ কটাক্ষ করিতেছেন—হেন কালে শত জিহ্বা বিস্তার করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত হইল এবং অগ্নিপূত বিমলানন্দ, পৃথিবীর পঞ্চভূত পৃথিবীকে প্রত্যর্পণ করিয়া, আত্মস্বরূপে পরমধামে উপনীত হইলেন।

সংশয়াত্মা ইহকাল-সর্ব্বস্ব মন, হাহাকার রবে বলিয়া উঠিল—"কি হইল—কোথা গেল?"

অমনি ধীর, স্থির শ্রদ্ধা আসিয়া, পরকালের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া, উজ্জ্বলা-লোকে দেখাইল—

"যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥"

হরি ওঁ। শান্তিঃ। শান্তিঃ। শান্তিঃ।

জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়।

[স্বামী বিমলানন্দ লিখিত।]

শাস্ত্র পাঠ করিয়া দেখি, ভক্তি ও জ্ঞান পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। সাধুদিগের জীবনি আলোচনা করিয়া দেখি, উহাতে জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সম্মিলন। দেখিতে পাই, যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের অন্তঃকরণ প্রেমে পূর্ণ। আবার যাঁহার, যথার্থ ভক্ত, তাঁহারা সময়ে সময়ে জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে অধিরূঢ় হইয়া, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল পদার্থের মধ্যেই তাঁহাদের ইষ্ট প্রত্যক্ষ করতঃ, আনন্দে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িতেছেন! ইহা দেখিয়া মনে হয়, জ্ঞান ও ভক্তি প্রকৃত পক্ষে পৃথক পদার্থ নহে, অবস্থা ভেদে ভিন্ন আকারে প্রকাশ পায় মাত্র। তবে ঐ দুই পদার্থের বিবাদ কোথা হইতে ধর্ম্ম জগতে উপস্থিত হইল? ভক্ত ও জ্ঞানী বলিয়া এতদিন যাঁহারা আপনাদিগকে পরিচয় দিয়া আসিতেছেন, কেনই বা তাঁহারা পরস্পরের সহিত প্রেমে মিলিত না হইয়া, পরস্পরের উচ্ছেদ সাধনেই আবহমানকাল হইতে চেষ্টা করিতেছেন? দেখিতে

পাই—ভক্ত সমাজের অভিধানে যেমন জ্ঞানী শব্দের অর্থ অবিশ্বাসী, নাস্তিক, পাষণ্ড বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; জ্ঞানীদিগের মধ্যে তেমনি ভক্ত শব্দ জড়বুদ্ধি, অন্ধবিশ্বাসী, সংসারাবদ্ধ জীববিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব ভক্তি ও জ্ঞান দুইটী পরস্পর বিরোধী পদার্থ বলিয়াই অনেকের ধারণা রহিয়াছে। একপ ধারণার হেতু কি তাহা বুঝিতে এবং ঐ দুই বস্তুর যথার্থ সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে—অদ্য আমরা চেষ্টা করিব।

লক্ষণ দেখিয়াই আমরা বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। তজ্জন্য জ্ঞান ও ভক্তি কি, তাহা জানিতে হইলে আমাদিগকে জ্ঞানী ও ভক্তের লক্ষণ অগ্রে জানিতে হইবে। এক্ষণে দেখা যাউক, শাস্ত্র এই লক্ষণ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন: প্রামাণ্য ভক্তি গ্রন্থের মধ্যে গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত শীর্ষস্থানীয়। উপনিষদের অনেক স্থানে মানবান্তঃকরণের অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে সকল স্থানে ভক্তি শব্দটীর উল্লেখ বিরল—এই নিমিত্ত উপস্থিত ক্ষেত্রে উপনিষদের প্রমাণ না লইলেও চলিবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভক্তিযোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত আছে, সে গুলির প্রত্যেকটী জ্ঞানীর জীবনেও প্রকাশ পায়। জ্ঞানের অবতার ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন—

"অধ্যায়ে ভক্তিযোগাখ্যে গীতায়াং ভক্তিলক্ষণং।
যদুক্তং অষ্টভিঃ শ্লোকৈঃ দৃষ্টং জ্ঞানিনিতন্ময়া॥"

অর্থাৎ "গীতার ভক্তিযোগ নামক অধ্যায়ে ৮টী শ্লোক দ্বারা যে ভক্তির লক্ষণ কথিত হইয়াছে, আমি জ্ঞানী জনে সেই ভক্তি চিহ্ন দেখিয়াছি।" গীতার এই অষ্ট শ্লোক পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যে অবস্থায় স্থিত হইলে জীব আর কোনও দ্রব্যের অভাব বোধ করে না, সংসারিক জ্বালা যন্ত্রণায় কাতর বা সুখে হৃষ্ট হয় না, সেই অবস্থাকেই প্রকৃত ভক্তির অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে আবার গুণাতীত জ্ঞানীর লক্ষণ সম্বন্ধে ভগবান অর্জ্জুনকে যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে এবং ঐ পূর্ব্ব কথিত অবস্থাতে বিশেষ কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না। ১৪ অধ্যায়ে জ্ঞানীর লক্ষণে শ্রীভগবান বলিতেছেন—"জ্ঞানী মান, অপমান, শত্রু ও মিত্রকে সমভাবে দেখিয়া থাকেন"—"মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যোমিত্রারি পক্ষয়োঃ।" ১২ অধ্যায়ে ভক্তের অবস্থাও তাঁহা দ্বারা অবিকল এইরূপ বিবৃত হইয়াছে, যথা—"সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ"। জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়েই 'আপ্তকাম' হইয়া যান এবং তজ্জন্য

সংসারের কোন দ্রব্য বিশেষ পাইবার 'আকাঙ্ক্ষা' বা স্বার্থপর কোন কার্য্যে উৎসাহ, তাঁহাদের বিন্দুমাত্র থাকে না বলিয়া উভয়কেই ভগবান্ সমভাবে 'সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী' বলিয়া ঐ দুই অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন। গীতার ৭ম অধ্যায়েও জ্ঞান ও ভক্তির একাশ্রয়ত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে—"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে"। এস্থলে স্পষ্ট বলা হইতেছে যে, যে প্রকৃত জ্ঞানী সেই একভক্তি, অর্থাৎ তাহারই পরমেশ্বরের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের ১২ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে ভক্তি সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, সে গুলিতেও জ্ঞানের সহিত ভক্তির ঐরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ব্যক্ত হইতেছে। ভগবান্ বলিতেছেন—

"অস্মিন্‌লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোহনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া॥"

অর্থাৎ ইহ সংসারে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ নিষ্পাপ ও নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তি শুদ্ধ জ্ঞান কিম্বা ইচ্ছা হইলে মদ্ভক্তি লাভ করেন। 'যদৃচ্ছয়া' কথাটীর দ্বারা এস্থলে স্পষ্ট বলা হইতেছে যে, শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ ভক্তি বস্তুতঃ একই পদার্থ, যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে এক উপায় দ্বারা উভয় বস্তু লাভ করা কিরূপে সম্ভবে? ঐ গ্রন্থেই আবার দেখিতে পাই, ভগবান্ কপিলদেব তাঁহার জননীকে ভক্তি উপদেশ কালে এরূপ অনেক কথা বলিতেছেন, যাহা ভক্ত এবং জ্ঞানীর উভয়েরই সমভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। ভক্তি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি ঐরূপ জ্ঞানের কথা বলায়, ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যে ভক্তির কথা তিনি বলিতেছেন, উহা কখনই জ্ঞানের বিরোধী নয়, পরন্তু জ্ঞানেরই রূপান্তর মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রন্থের ঐ স্থল হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল—

"যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ
দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্ন দর্শিনঃ
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি।"

১৮।২৯।৩

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি মূঢ়তা প্রযুক্ত আমাকে সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান সকলের আত্মা ও সকলের নিয়ন্তা না জানিয়া কেবল প্রতিমাদিতে আমার অর্চ্চনা করে, সে কেবল

ভস্মে আহুতি প্রদান করে। সেই অভিমানী ব্যক্তি সমস্ত ভূতকে আমা হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের সহিত শত্রুতাচরণ করায়, ঐ সকল ভিন্ন দেহে বস্তুতঃ আমারই দ্বেষ করে, সেই নিমিত্ত তাহার কখনও শান্তি লাভ হয় না।" এ স্থলে সর্ব্বভূতে এক বস্তুরই সত্তা উপলব্ধি করা, জ্ঞানীর যাহা চরম লক্ষ্য, তাহাই শ্রেষ্ঠ ভক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উক্ত সংবাদের অপর এক স্থলে ভগবান্ বলিতেছেন, "আমার গুণ শ্রবণ মাত্র সর্ব্বান্তর্যামী আমাতে সমুদ্রাভিমুখগামী গঙ্গা সলিলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না, ফলানুসন্ধান রহিতা এবং ভেদ দর্শন বর্জ্জিতা মনের গতিরূপ যে ভক্তি, তাহাই শ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগের লক্ষণ।" শুদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবত কেন, ঐরূপ ভাবের কথা আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের নানাস্থান হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। পুনঃ পুনঃ শাস্ত্র বলিতেছেন যে, ভগবদ্বস্তু লাভ হইলে জ্ঞানী ও ভক্তের অবস্থা ঠিক একরূপই হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে কোন প্রভেদই থাকে না। জ্ঞানী 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' জানিযা একেবারে নিশ্চিন্ত হইযা যান। ভক্তও সর্ব্বভূতকেই তাঁহার অভীষ্ট দেবতার মূর্ত্তি জানিযা আনন্দে গাহিতে থাকেন—"আমার ব্রহ্মময়ী ঘটে ঘটে, পদে গয়াগঙ্গা কাশী।" জ্ঞানী যাহা কিছু দেখিতেছেন, সকল বস্তুতেই তাঁহার আত্মরূপ দেখেন, তাই আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেরই প্রতি তাঁহার সমান প্রেম। ভক্তও প্রত্যক্ষ করেন—"যো রাম দশরথকো বেটা, ওহি রাম ঘট্ ঘট্ মে লেটা"; সেই জন্য সকলকেই তিনি ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি জানিযা হৃদয়ের সহিত ভাল বাসেন। উভয়েই সেজন্য প্রাণ দিযা সর্ব্ব প্রাণীর দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করেন। জ্ঞানী জানেন, তিনি সৎস্বরূপ, অনাদি, অনন্ত, কোন কালে তাঁহার অভাব হইবে না, তাই তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয় অন্তরে সংসারে বিচরণ করেন। ভক্তও জানেন, তাঁহার ভগবান অবিনাশী, ভগবানের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ তাহাও নিত্য, তাই তিনি যে কালের নামে সমস্ত জীব ভয়ে কাঁপিযা উঠে, তাহাকে সম্বোধন করিযা বীরদর্পে বলেন, "আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা, দূর হয়ে যা যমের ভটা।" জ্ঞানী জানেন, চিৎ তাঁহার স্বরূপ, মায়ার আবরণে তিনি কখনও আবৃত হইতে পারেন না, তাই তাঁহার মোহ নিদ্রার চিরাবসান হয়। ভক্তেরও তদ্বৎ ইষ্ট দেবতার চিন্ময় মূর্ত্তি সন্দর্শন করতঃ, চিন্ময়ত্ব লাভ হইয়া, মাযার ঘোর চিরদিনের মত কাটিয়া যায়, তাই তিনি বলেন, "ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাগে জেগে আছি।" আনন্দস্বরূপ আত্মাকে জানিযা জ্ঞানী যেরূপ সদানন্দময়, ভক্তও শ্রীভগবানের আনন্দঘন-মূর্ত্তি সন্দর্শনে তদ্রূপ। নিরানন্দ তাঁহাদিগকে কিরূপে স্পর্শ করিবে? জ্ঞানী আপ-

নাকে মায়া-প্রপঞ্চের অতীত বলিয়া জানেন, তাই বাসনার হিল্লোল তাঁহার হৃদয়কে তরঙ্গায়িত করিতে পারে না। ভক্ত সম্বন্ধেও ভগবান বলিতেছেন—

"ন পারমেষ্ঠং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং।
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং॥
ন যোগসিদ্ধিং ন পুনর্ভবং বা।
মযার্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥"

"আমার ভক্ত ব্রহ্মার পদ বা ইন্দ্রত্ব, সম্রাটপদবী বা পাতালের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি বা মোক্ষ, কিছুই চাহেন না; আমা ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন বস্তুতেই অভিলাষ নাই।" এজন্য প্রকৃত জ্ঞানীর দর্শন লাভ করিয়া আমাদের যেরূপ আনন্দ ও প্রীতি হয়, প্রাণে যেরূপ স্বর্গীয় ভাবের উদয় হয়; যথার্থ ভক্ত সঙ্গ লাভ করিয়াও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে, প্রাণ তেমনই মাতিয়া উঠে, তেমনই মনে হয়—সমস্ত মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া, তদ্দণ্ডেই আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া যাই। এইরূপে যেদিক্ দিয়া দেখি না কেন দেখিতে পাই, জ্ঞান বা ভক্তিতে কোন প্রভেদ নাই।

এক্ষণে কথা হইতেছে, যদি জ্ঞান ও ভক্তি এক পদার্থই হইল তবে এত তর্ক বিতর্ক, বাদানুবাদ কেন? 'ভক্তি বড়, কি জ্ঞান বড়' একথা লইয়া বৃথা বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া ধর্ম্ম জগতে এত অশান্তি বিস্তৃত হইবার হেতু কি? এতক্ষণ আমরা যে জ্ঞান ভক্তি লইয়া আলোচনা করিলাম, তাহা শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধভক্তি, বা বিজ্ঞান ও পরাভক্তি। এই বিজ্ঞান ও পরাভক্তি লাভ করাই মনুষ্য জীবনের চরম উদ্দেশ্য। ইহা প্রাপ্ত হইলে আর অপর কিছু পাইবার থাকে না। ইহা প্রাপ্ত হইলে জীবের যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থার কথাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন—

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"

দেবর্ষি নারদ তাঁহার ভক্তিসূত্রে এই অবস্থার কথাই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "ওঁ যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি, ন শোচতি, ন দ্বেষ্টি, ন রমতে, নোৎসাহী ভবতি।" "ওঁ যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি।" "ওঁ যজ্ জ্ঞানাৎ মত্তো ভবতি, স্তব্ধো ভবত্যাত্মারামো ভবতি।" অর্থাৎ ভক্তি লাভ করিলে কোন বিষয়েই বাসনা, শোক, দ্বেষ, রতি বা উৎসাহ থাকে না; ভক্তি লাভ করিলে মনুষ্য সিদ্ধ হয়, অমৃতময় হয় ও একেবারে চিরদিনের জন্য

তৃপ্ত হইয়া যায়; ভক্তি লাভ হইলে মানব স্তব্ধ, মত্ত হইয়া আত্মাতেই রমণ করে। শুদ্ধ জ্ঞান বা ভক্তি একবার লাভ হইলে জীব তাহা হইতে আর বঞ্চিত হয় না, ইহাই ভগবানের পরম ধাম। মনুষ্য জীবনের ইহাই পরম পুরুষার্থ।

বিজ্ঞান বা পরাভক্তি ইচ্ছা করিলেই লাভ করিতে পারা যায় না; কোন বস্তুই বিনা চেষ্টায় লাভ হয় না। জগতে প্রত্যেক পদার্থেরই মূল্য আছে, আর এই জ্ঞান-ভক্তি রূপ মহারত্ন, যল্লাভে পৃথিবীর ধনসম্পত্তি কাকবিষ্ঠাবৎ জ্ঞান হইয়া জীব ত্রিতাপের অবস্থা হইতে চিরদিনের জন্য মুক্ত হয়, সে অতুল ঐশ্বর্য্যের কি মূল্য নাই? প্রকৃতপক্ষে তাহার কোন মূল্য নাই বটে; তত্রাচ প্রাণে যখন পিপাসা আসিযা উপস্থিত হয়, যখন কি করিয়া জ্ঞান ভক্তি লাভ করিব এই ভাবিয়া প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন অভিলষিত দ্রব্যের লাভোদ্দেশে কিছু করিতে ইচ্ছা হয়। পূর্ব্বপরিচিত অন্য সকল বিষয় ছাড়িয়া, ইষ্টবস্তুর ভাবোদ্দীপক ব্যক্তি ও বস্তু সকলের সহিতই অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধস্থাপন করিবার ইচ্ছা, সত্বরই আসিযা প্রাণে উদয় হয়। প্রথমে এই সকল ভাব অতি অস্ফুট ভাবে উদয় হয়। প্রাণে একটা কিছু করিবার ইচ্ছা বেশ বুঝা যায, কিন্তু কি করিব, কোন পথ ধরিব, ইহা স্থির করিতে পারা যায় না। এই অবস্থাতেই ভগবান গুরুরূপে দর্শন দিয়া, সাধকের জন্মজন্মান্তরীণ সংস্কার গঠিত প্রকৃতির অনুরূপ পথ দেখাইযা দেন। সাধক বহু জন্ম যাহা করিয়া আসিযাছে, তাহার সংস্কার তাহার অন্তঃকরণে একেবারে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। তাহার মনের আভ্যন্তরিক গতি কোন্ দিকে ধাবিত হইতেছে, কোন্ পথ ধরিলে ঐ গতিকে সহজে ফিরাইযা ইষ্ট বস্তুলাভের সহায়ক করিয়া লইতে পারিবে, এ সকল কথা সে নিজে বুঝিতে পারে না। এজন্য অন্তর্যামী ভগবান কৃপাপরবশ হইযা গুরুরূপে তাহাকে তদবস্থোপযোগী পথ প্রদর্শন করেন। এক ব্যক্তির প্রকৃতি আবার অপর ব্যক্তির প্রকৃতির মত নহে। দেখিতে পাই—এ সংসারে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট। সেজন্য সাধনের পথও ভিন্ন ভিন্ন হওযাই আবশ্যক। এইরূপে নানাপ্রকার পন্থা নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে, নানা প্রকার বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট মানবগণের পক্ষে, ভগবান লাভ অসম্ভব হইত। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্র অধিকারী ভেদে নানাপ্রকার পথ দেখাইযা দিতেছেন।

বিজ্ঞান ও পরাভক্তি লাভের নির্দ্দিষ্ট পথ সকল, প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। ইহাদের এক একটীকে শাস্ত্রে এক এক প্রকারের যোগ বলিযা অভিহিত হইয়াছে, যথা—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ। সাধারণতঃ এই তিনটী যোগপথকে

জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি বলিয়া সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়। জ্ঞান ও ভক্তি লইয়া এত বিবাদ, এই সকল সাধনের পথ লইয়াই উত্থিত হইয়াছে। স্থূল দৃষ্টিতে জ্ঞান ও ভক্তি দুইটী পথ পৃথক বলিয়া বোধ হয়; সেই জন্য অনেকে মনে করেন যে, এই দুইটী ভিন্ন পথে যাইলে, বুঝি অবশেষে ভিন্ন স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইব, ভিন্ন ভিন্ন বস্তু লাভ হইবে। যাঁহাদের বিশ্বাস ঐরূপ ভ্রমাত্মক, তাঁহাদের ভ্রমাপনোদনের জন্য এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, আমাদের প্রামাণ্য ধর্ম্ম-গ্রন্থ সমূহ ঐ দুই পথ সম্বন্ধেও এরূপ কথা বলিতেছেন, যাহা দ্বারা ইহাদের গন্তব্য স্থল একই, ইহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় সখা উদ্ধবকে ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য ব্যাখ্যা করিবার প্রারম্ভেই বলিতেছেন—

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাম শ্রেয়ো বিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ।"

অর্থাৎ "মানবের মঙ্গল কামনায় আমি জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিন প্রকার যোগের বিষয় কহিয়াছি। এতদ্ভিন্ন জীবের কল্যাণ সাধনের অন্য পথ নাই।" এস্থলে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়কেই একই উদ্দেশ্য সাধনের বিভিন্ন উপায় মাত্র বলিয়া স্পষ্ট বর্ণিত হইতেছে। গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথমেও শ্রীভগবান্ প্রিয়ভক্ত অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও জ্ঞান ও ভক্তি উভয় পক্ষেই সমান আদর দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্লোকে ভক্তিযোগীকে যোগী-শ্রেষ্ঠ বলিয়া, পুনরায় তৃতীয় শ্লোকে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক জ্ঞানযোগীর বিষয় বলিতেছেন যে, "সর্ব্বত্র সমদর্শী যে সকল ব্যক্তি, ইন্দ্রিয় সমূহ সংযত করিয়া, শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করিবার অযোগ্য, রূপাদিবিহীন, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অবিনাশী ব্রহ্মের উপাসনা করেন, সমুদয় প্রাণিগণের হিতকারী তাঁহারা, আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন।" এস্থলেও জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ উভয় পন্থা দ্বারাই ভগবৎ প্রাপ্তি নির্দ্দেশ করা হইল। গীতায় ৯ম অধ্যায়ে ভগবান বলিতেছেন, "হে পার্থ, দৈবী প্রকৃতিযুক্ত মহাত্মাগণ, অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে জগৎকারণ ও নিত্যস্বরূপ জানিয়া, ভজনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দৃঢ়ব্রত, সংযতেন্দ্রিয়, সংযতমনাঃ এবং নিত্যযুক্ত হইয়া, অতিশয় ভক্তি সহকারে সর্ব্বদা নমস্কার ও গুণকীর্ত্তনাদি দ্বারা, আমাকে আরাধনা করেন। আর কেহ বা জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা (অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদজ্ঞান দ্বারা) আমার আরাধনা করেন।" এস্থলে ভগবান্ প্রথমে কি প্রকার প্রকৃতির লোক তাঁহার উপাসনা করিতে সমর্থ হয়, তাহা জ্ঞাপন করিয়া পরে বলিতেছেন যে, তাঁহার উপাসকদিগের মধ্যে কেহ ভক্তিমার্গ

আর কেহ জ্ঞানমার্গ আশ্রয় করে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, যদি জ্ঞান ও ভক্তি উভয় মার্গ দ্বারাই ভগবৎ উপাসনা সমভাবে সাধিত না হইত, তাহা হইলে ভগবান্ ঐরূপ উপদেশ কখনই অর্জ্জুনকে দিতেন না। রুচি এবং গুরূপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া, যে যে পথ ধরিয়াই যাক্ না কেন, গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইলে সকলে একই বস্তু প্রত্যক্ষ করিবে, একই আনন্দ সম্ভোগ করিবে। কারণ, "যত মত, তত পথ" হইলেও সেই এক ব্যতীত আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই।

ভক্তি ও জ্ঞানের গন্তব্য স্থান এক হইলেও পথ দুইটী যে ভিন্ন এবং সেজন্য ভিন্নপথাবলম্বী সাধকদ্বয় অভীষ্ট বস্তু লাভ হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বতোভাবে একত্র মিলিতে চেষ্টা করিলে, উভয়কেই পথভ্রষ্ট হইয়া গন্তব্য স্থান হইতে দূরে যাইয়া পড়িতে হইবে, একথা আমাদের সতত স্মরণ রাখা উচিৎ। সেই নিমিত্তই পরমহংসদেব বলিতেন, "চারা গাছে বেড়া দিয়া রাখিতে হয়"—অর্থাৎ যতদিন না একটী ভাবে সিদ্ধ হওয়া যায়, ততদিন অন্য ভাবের লোকের সহিত মিলিতে যাইলে, ভাবসঙ্কর হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সকল সাধকেরই নিজ নিজ ভাবের উপর বিশেষ নিষ্ঠা রাখা আবশ্যক। সকল ভাবে একেবারে গা ঢালিয়া দিলে, প্রবর্ত্তী সাধক নিজ পথে অগ্রসর হইতে পারে না। সেই নিমিত্ত প্রথম প্রথম নিজের ভাবের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলা, সাধকদিগের কর্ত্তব্য। কিন্তু নিজের ভাবের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইলে, যে অপর ভাবকে অবজ্ঞা করিতে হইবে, এরূপ কোন কথা নাই। আমার নিকট আমার ভাব যেরূপ প্রিয়, অপরের নিকট তাহার ভাব ঠিক সেইরূপ, এই ধারণা রাখিলেই আর গোঁড়ামির আশঙ্কা থাকে না। এইটী না বুঝিলেই নিষ্ঠার পরিবর্ত্তে গোঁড়ামি আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপিপাসা একেবারে লোপ পাইয়া, "জ্ঞান বড়, কি ভক্তি বড়" এই তর্ক উপস্থিত হইবে।

জ্ঞান ও ভক্তি লইয়া যে বিবাদ চলিয়া আসিতেছে, তাহার আরও একটী কারণ এই যে, পুরাণ ও ইতিহাসাদিতে যে সকল মহাপুরুষদিগের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করি, তাঁহারা যদিও নিজ নিজ জীবনে জ্ঞান ও ভক্তির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখাইয়া গিয়াছেন, তত্রাচ তাঁহাদের কেহবা জ্ঞান এবং কেহবা ভক্তির কথা অধিক করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্য, অবতার ও ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষগণ বিশেষ বিশেষ ভাব লইয়া, পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং তত্তৎকালে ধর্ম্মজগৎ সেইভাবেই পরিপূর্ণ করিয়া গিয়াছিলেন। পূজ্যপাদাচার্য্য

শঙ্কর এবং শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব কালের আলোচনায়, আমরা উহা বেশ বুঝিতে পারিব।

অদ্বৈত কেশরী শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য যখন ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন ধর্ম্মপ্রাণ জীবসকল অদ্বৈতজ্ঞানে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের চারি সীমান্তে যে চারিটী মঠ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে কত শত মুণ্ডিত-মস্তক, কৌপীনধারী যতী, সংসারের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, স্বজনবর্গের মমতা-বন্ধন চিরদিনের মত ছিন্ন করিয়া, কত প্রকার দুঃসহ ক্লেশ অম্লানবদনে সহ্য করিয়া, দিবারাত্র সেই নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যানে কালাতিপাত করিতেন। সেই সকল বৈরাগ্যবান্ মহাপুরুষদিগের ব্রহ্ম-তেজে দীপ্তমান দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, কত লোকের মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা আমরা সকলেই বিদিত আছি। তাঁহাদের আত্ম-প্রসন্নতাই বহু লোকের প্রাণে যে আত্মানুসন্ধান-রতি জন্মাইয়াছিল, ইহা সুনিশ্চিত। এইরূপে অদ্বৈতজ্ঞান তখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল। কি ধনী, কি নির্ধনী, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ব্রাহ্মণ, কি চণ্ডাল, সকলেরই ভিতর ঐ ভাব কিছু না কিছু প্রবিষ্ট হইয়াছিল। আচার্য্য শঙ্কর পঞ্চ দেবতার উপাসনাদির সমর্থন করিলেও অদ্বৈত জ্ঞানকেই জীবের চরম লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করায়, বৈষ্ণব ধর্ম্মানুমোদিত শ্রীভগবানের সহিত জীবের সেব্য-সেবক ভাবরহস্য কিছুদিনের জন্য ভারতভূমি হইতে প্রায় লোপ হইয়াছিল। কালের অনতিক্রম্য গতিতে শ্রীশঙ্কর প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈত-তত্ত্ব আবার বিকৃতভাব ধারণ করিল এবং উহা দ্বারা জীবের কল্যাণ সাধিত না হইয়া মহা অনিষ্ট হইতে লাগিল। তখন অপর দিক হইতে এক অপরিমেয় ঐশী শক্তি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া, উত্থিত হইল এবং জীবকে এক নূতন রসে মাতাইয়া তুলিল। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সে শক্তি প্রভাবে হরিনামে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তখন 'দ্বৈতবাদ শ্রেষ্ঠ কি অদ্বৈতবাদ শ্রেষ্ঠ', 'জ্ঞান বড় কি ভক্তি বড', ইহা মীমাংসা করিবার আর কাহারও অবকাশ রহিল না; কেবল শ্রীভগবানকে আপনার সর্ব্বস্ব জানিয়া, জীব অপূর্ব্ব আনন্দ সম্ভোগেই ব্যস্ত রহিল।

এইরূপে পুরাকালে যে মহাপুরুষগণ জীবের কল্যাণার্থ জগতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি যে ধর্ম্মমার্গবিশেষ প্রবর্ত্তন করেন, তিনি সেই পথেরই সম্পূর্ণ পোষকতা করিয়া, প্রকারান্তরে অন্যান্য পথকে অল্পাধিক নির্ব্বাসন প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন যে এরূপ অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছিল,

এ কথা বলিলে আমাদের যৎপরোনাস্তি ধৃষ্টতার পরিচয় দেওয়া হয়। তাঁহারা সকলেই ঈশ্বরের অবতার বা ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ। অতএব অজ্ঞতা তাঁহাদের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। জনসমাজের তাৎকালিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া, ঐরূপ মতের পোষকতা করিলে, লোককল্যাণ সাধিত হইবে নিশ্চয় করিয়াই, তাঁহারা ঐরূপ করিয়াছিলেন এবং উহাতেই তখন বহু লোকের কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। সে কাল এখন নাই। কালচক্রের পরিবর্ত্তনে মনুষ্য-সমাজের রীতি, নীতি ও চিন্তা প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে লোকের চিন্তাস্রোত যেদিকে যেরূপে ধাবিত হইতেছে, কিছুকাল পূর্ব্বে ঐরূপ ছিল না। তখন সাধারণ লোকের সংস্কার ভিন্ন প্রকার ছিল। জন সমাজের ঐরূপ পরিবর্ত্তন হয় বলিয়াই, ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমার্গ জগতে প্রচারিত হইয়া থাকে। এক ঔষধ যেমন সকল রোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না এক ধর্ম্ম সেইরূপ সকল সময়ে জনসমাজে সমভাবে কার্য্যকরী হয় না। স্বাবুদ্ধিশালিবিশিষ্ট জীব, মার্গবিশেষের প্রবর্ত্তক কোনও মহাপুরুষ যে পথ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই পথই সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায় সকলের পক্ষে সত্য, অন্যান্য পথ সকল মিথ্যা বলিয়া, বৃথা চিৎকার করিলে কি হইবে?

পরিবর্ত্তনই সংসারের অপরিহার্য্য নিয়ম। এ জগতে কিছুই একভাবে চিরদিন থাকিতে পারে না। সেইজন্য মানব আবার শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ ভক্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মজগৎকে অধমাধম বাহ্য পূজা ও গোঁড়ামীর ভীষণ কোলাহল-ক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছিল। শ্রীভগবান্‌কে হৃদয় হইতে স্থানান্তরিত করিয়া শুষ্ক বাগ্‌জালে হৃদয় পূর্ণ করিয়াছিল। সেই জন্যই আবার 'জ্ঞান বড় কি ভক্তি বড়', এই বিবাদ জন সমাজে পুনরায় উপস্থিত হইয়াছিল। যাঁহারা জ্ঞানের পক্ষ সমর্থন করিতেন, তাঁহারা শঙ্করাচার্য্যের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিতেন, "ভক্তির্জ্ঞানং তথামুক্তিরিতি সাধারণ ক্রমঃ" অর্থাৎ প্রথমে ভক্তি, পরে জ্ঞান ও তৎপরে মুক্তি, ইহাই সাধারণ নিয়ম,—অতএব জ্ঞানই ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আবার যাঁহারা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতে ব্যস্ত, তাঁহারা বৈষ্ণব শাস্ত্রান্তর্গত কতকগুলি উক্তির বিকৃতার্থ করিয়া, অথবা কতকগুলি অর্থশূন্য প্রলাপবাক্য রচনা করিয়া, জ্ঞানকে একেবারে নাস্তিকতার রূপান্তর বলিয়া, অবজ্ঞা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

বর্ত্তমানকালে ধর্ম্ম-জগতে বাস্তবিকই ঐরূপ এক মহা গোলযোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। যাহাদের প্রাণে যথার্থ একটু ধর্ম্মভাব উদ্দীপন হইত, তাহারা

সেই নীরস তর্কযুক্তির তাড়নায় কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইত এবং নাস্তিকতা ও সংশয়ের অধিকারই সমগ্র প্রদেশে বিস্তৃত হইতেছিল। দেশ বা কুলের প্রথানুসারে লোকে বাহিরে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও, অধিকাংশেরই মনে, ধর্ম্ম বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থ আছে বলিয়া সন্দেহ হইত। এইরূপে যখন ভীষণ গ্লানি আসিয়া ধর্ম্ম জগৎকে মহা অশান্তির ক্ষেত্র করিয়া তুলিল, তখন এক অলৌকিক পুরুষ স্বীয় জীবনে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্ম্ম-জগতে এক নূতন বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন। এই মহাপুরুষের জ্বলন্ত জীবনই পূর্ব্বোক্ত সন্দেহজালের অপূর্ব্ব মীমাংসা সমস্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রের পরিস্ফুট ব্যাখ্যা ও সমুদায় ধর্ম্মপ্রাণ জীবের একমাত্র জুড়াইবার স্থল। জ্ঞান ও ভক্তি লইয়া ধর্ম্ম-জগতে যে মহা বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণ মীমাংসা একমাত্র এই মহাপুরুষের জীবনেই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার জ্বলন্ত জীবন এবং শ্রীমুখবিনির্গত অনন্তময় সিদ্ধান্ত বাক্য "শুদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞান এক" শ্রবণ করিলেই সম্যক্ বুঝিতে পারা যায় যে, জ্ঞান ও ভক্তি একই পদার্থ। শুদ্ধজ্ঞান বা শুদ্ধাভক্তি লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে আবার তিনি বলিতেন—"যাহার যে নামে ও যে ভাবে রুচি, সে সেই নামে ও সেই ভাবে ভগবানের উপাসনা করিলে, তাহার বস্তুলাভ হইবে।" পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে, পরমহংসদেব তাহার প্রত্যেকটীকেই, সেই এক অদ্বিতীয় ভগবানের নিকট যাই-বার এক একটী পথমাত্র বলিতেন। তিনি বলিতেন, 'যেমন মই, বাঁশ, সিঁড়ী প্রভৃতি নানা উপায় দ্বারা এক ছাদের উপর উঠিতে পারা যায়, তদ্রূপ নানা প্রকার উপাসনা-পথ অবলম্বন করিয়া সেই এক ভগবানকে লাভ করা যায়। পৃথিবীতে যতগুলি ধর্ম্ম মত আছে, সকলগুলি এক একটী পথ দেখাইয়া দিতেছে মাত্র।" পরমহংসদেবের কাছে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবের লোক যাতায়াত করিত, সেরূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির মানবের সমাগম আর কুত্রাপিও হইতে শুনা যায় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ সকল লোকের প্রত্যেকে তাঁহার জীবনে নিজ নিজ ভাবের পূর্ণ বিকাশ দেখিত এবং তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ও সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া সেই সেই পথে দৃঢ় শ্রদ্ধা হইত। এরূপ নূতন দৃ[illegible] আর কখনও দেখিতে পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। যখন [illegible] বিচারে তিনি প্রবৃত্ত হইতেন, তখন মনে হইত—নাম-রূপ পরিচ্ছিন্ন এই পরিদৃশ্য-মান জগতের অস্তিত্ব, তাঁহার নিকট একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। সত্ত্বগুণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া তিনি সেই গুণাতীত অবস্থায় অধিরূঢ় হইতেন এবং শ্রোতৃবর্গের

অন্তরাত্মাও ধীরে ধীরে সেই সঙ্গে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের দিকে সবলে আকৃষ্ট হইত। ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্য্যন্ত বলিতে তিনি একেবারে ব্রহ্মসাগরের অগাধ জলে ডুবিয়া যাইতেন। তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইত না; সমস্ত শরীর স্পন্দহীন, নয়নযুগল পলকশূন্য, শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ ও ধমনিতে শোণিতপ্রবাহ পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া যাইত! এইরূপ অবস্থায় ব্রহ্মবাচক প্রণবধ্বনি, তাঁহার কর্ণকুহরে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলে, সংজ্ঞা লাভ হইত। আবার যখন ভক্তের সহিত মিলিতেন, তখন তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমোন্মত্ততা প্রত্যক্ষ করিয়া, পাষাণ হৃদয়ও ভক্তিতে গলিয়া যাইত। নির্ম্মল ভগবৎ-প্রেমানন্দ ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা কাহারও মনে স্থান পাইত না এবং শ্রীভগবান্‌কে অতি নিকটে প্রত্যক্ষ অনুভব করায়, কাহারও মনে কোন প্রকার সন্দেহ আসিয়া, চিত্তবিক্ষেপ জন্মাইতে পারিত না। যাঁহার অদৃষ্টে এই মহাপুরুষের সঙ্গ ঘটিয়াছে, তিনিই প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছেন, যে যত দিন মানব প্রকৃত ধর্ম্মরস আস্বাদন করিতে না পায়, তত দিনই বৃথা তর্ক যুক্তির মধ্যে পড়িয়া থাকে। একটু ভিতরে প্রবেশ করিলে, একবার প্রাণে একটু আনন্দ পাইলে, আর এ সকল তর্ক বিতর্ক থাকে না। নিজের রুচি অনুযায়ী যিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি সরল বিশ্বাসের সহিত সেই পথ অনুসরণ করিলেই, বস্তুলাভ হইবে। কোন পথে শীঘ্র পাওয়া যায় আর কোন পথে বিলম্ব হয়, এরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা যেন মনে রাখেন যে, প্রাণের ব্যাকুলতা অনুসারেই ধর্ম্মজীবন গঠিত হইয়া থাকে। যে পথই ধরি না কেন, আমার যদি প্রাণের পিপাসা না রহিল, যদি বিবেক বৈরাগ্য না রহিল, তাহা হইলে আমার পথের দোহাই দিয়া কিছুই করিতে পারিব না। তাই পরমহংসদেব বলিতেন, "যেমন ভাব তেমনি লাভ"। ব্যাকুলতা বৈরাগ্য থাকিলে ষষ্ঠী, মাকাল পূজা করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। আর সংশয়াত্মা মানব বেদের মহাবাক্য পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও উচ্চারণ দ্বারাও ধর্ম্মপথে এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না।

জ্ঞানপথেই যাও আর ভক্তিপথেই যাও, ইষ্টদেবে ষোল আনা মন না থাকিলে, কখন কৃতকার্য্য হইবে না। তাই ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—'লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া, এড়াবে না রতি মাসা।' যদি যথার্থ ভক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তোমাকে যেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, যেরূপ অধ্যবসায়ের সহিত সদা সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে, জ্ঞানীরও ঠিক তদনুরূপ করিতে হইবে। শাস্ত্রোপদিষ্ট ভক্তির সাধনপ্রণালী পাঠ করিয়া বুঝিতে পারি—ভক্তির

পথ অবলম্বন করা সহজ নয়। ভক্তি-সাধন সম্বন্ধে মহর্ষি নারদ প্রথমেই বলিতেছেন,—"ওঁ তত্তুবিষয়ত্যাগৎ সঙ্গ ত্যাগাচ্চ"; অর্থাৎ, ভক্তি সাধন করিতে হইলে বিষয় ও লোক সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। মহর্ষি আবও বলিতেছেন,—"ওঁ অব্যাকৃত ভজনা", অর্থাৎ ভক্তিলাভ করিতে হইলে অহর্নিশি ভগবানের আরাধনা করিতে হইবে। জ্ঞানপন্থী সাধককেও শাস্ত্র উপদেশ দিতেছেন,—তুমি সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন না হইলে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাব অধিকারী হইবে না।" তাই বলিতেছি, শাস্ত্রপাঠ বা সাধুভক্তদিগের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নিশ্চয় মনে হইবে যে, জ্ঞান বা ভক্তির কোনটীই সহজসাধ্য নহে। ভক্ত বা জ্ঞানী সাজা এক কথা, আর যথার্থ জ্ঞান-ভক্তির রসাস্বাদন কবা বা তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা, আর এক কথা। যে পথেই যাও না কেন, তোমাকে সমস্ত পার্থিব সুখের আশা বিসর্জ্জন দিতে হইবে, নতুবা বস্তুলাভ হওয়া একেবারে অসম্ভব।

আরও একটী কথা আমাদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। শাস্ত্র যে যে স্থলে জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোন একটীকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন, সেই স্থানেই দেখা যায়, অপর শব্দটীর অনুরূপ অর্থ অবলম্বন করিয়াছেন। যে স্থলে জ্ঞানকে ভক্তি অপেক্ষা বড় বলা হইয়াছে, সেই স্থানেই দেখিতে পাইবে, জ্ঞান শব্দ "শুদ্ধজ্ঞান" (গন্তব্য স্থান) ও ভক্তি শব্দ সেই "শুদ্ধজ্ঞান" লাভ করিবার একটী উপায় (পথ) মাত্র অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। আবার যে স্থলে ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, সেই স্থানেও ভক্তি "শুদ্ধাভক্তি" ও জ্ঞান তল্লাভের পন্থা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই কথাটী মনে রাখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, "জ্ঞান হইতে ভক্তি" ও "ভক্তি হইতে জ্ঞান" এই যে দুই প্রকার মত লইয়া তর্ক বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে—ইহার উভয়টীই সত্য। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, উহার মধ্যে কোন একটীকে ধরিয়া গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলে, সাধক উভয়েরই অধিকারী হইবে। সেইজন্য পরমহংসদেব বলিতেন,—"কেহ জ্ঞান অবলম্বন করিয়া ভক্তিতে যায়, আব কেহ ভক্তি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানে যায়। কেহ সাকার হইতে নিরাকারে যায় এবং কেহ বা নিরাকার হইতে সাকারে যায়।" যাহার যে ভাবে রুচি, প্রাণপণে সেই ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া, একবার ভাবের সাগর ভগবানকে লাভ করিতে পারিলে, আব তাহার কোন ভাবেরই অভাব থাকিবে না। সে পূর্ণ হইয়া যাইবে। সেজন্য উদাহরণ দ্বারা শাস্ত্র বলিতেছেন, যেমন এক ব্যক্তি পাপশান্তির নিমিত্ত গঙ্গাস্নান করিলে, পাপশান্তি ও শীতলতা উভয়ই প্রাপ্ত হন, সেইরূপ জ্ঞান বা ভক্তি সহায়ে ভগবানের উপাসনা করিলে,

সাধক উভয় বস্তুই লাভ করিয়া থাকেন। ভক্তবীর হনুমান একদা শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত ভগবৎস্বরূপ দর্শনে প্রেম-বিহ্বল হইয়া বলিয়াছিলেন,—"হে প্রভু! যখন আমি দেহবুদ্ধিতে থাকি, তখন দেখি যে তুমি সেব্য, আমি তোমার সেবক, যখন জীববুদ্ধিতে থাকি অর্থাৎ নিজেকে জীবাত্মা মনে করি, তখন আপনাকে পরমাত্মারূপী তোমারই অংশ বলিয়া দেখি, আর যখন আত্মবুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া আপনাকে অনাদিনিধন বলিয়া দেখি, তখন দেখি যে তুমি ও আমি এক—তোমাতে আমাতে কোনও প্রভেদ নাই।" অতএব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে ভগবদ্দর্শনলাভের পর, জীব যখন যে অবস্থায় থাকুক না কেন, তদুপযোগী ভাববিশেষ লইয়া, সে অদ্বিতীয় পরমপুরুষকেই সম্ভোগ করে। যখন হনুমান্ সেব্য-সেবক ভাবে দেহমনপ্রাণ দিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিতেন, তখন কি তাঁহার আনন্দের অবধি থাকিত? আবার যখন পরমাত্মায় অবস্থিত থাকিয়া নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইতেন, তখন যে তাঁহার কিছু অভাব থাকিত, এ কথাই বা কে বলিতে সাহস করিবে?

কি জ্ঞানী, কি ভক্ত, উভয়েই এই দেহবুদ্ধিবিশিষ্ট 'অহং' জ্ঞানকে ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছেন। ভক্ত বলিতেছেন,—"হে ভগবন, তুমি আমার দেহমনপ্রাণ সমস্ত লও, যেন আমার বলিতে কিছু না থাকে, সকলই যেন তোমার হইয়া যায়।" জ্ঞানী বলিতেছেন,—'এই দেহমনবিশিষ্ট আমি প্রকৃত আমি নাই, আমি এই দেহমনবুদ্ধিচিত্তাদির অতিরিক্ত এক বস্তু। সেই বস্তুই একমাত্র সৎ—আমি তাহাই হইতে চাই।" বাস্তবিক যতদিন না এই ক্ষুদ্র অহংবুদ্ধি নষ্ট হয়, ততদিন জীব যথার্থ ভক্তি-প্রেম লাভ করিয়া, অথবা তাপত্রয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, অমৃতত্ব ও শান্তি কখনই পাইবে না। সেই জন্য পরমহংসদেব বলিতেন,—"মুক্ত হব কবে? 'আমি' যাব যবে। 'আমি' ম'লে ঘুচ্‌বে জঞ্জাল।"

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষমোচন কার্য্য।

মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরের নিকটবর্ত্তী মহুলা ও পলাশীর নিকটবর্ত্তী সোমপাড়া নামক স্থানে, রামকৃষ্ণ মিশন দুইটী দুর্ভিক্ষমোচন কেন্দ্র খুলিয়াছেন এবং তথায় রীতিমত কার্য্য হইতেছে, ইহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। সম্প্রতি

ঐ উভয় কেন্দ্রে আরও দুইটী বিলি হইয়াছে। তাহার রিপোর্ট নিম্নে দেওয়া গেল। সেখানে যাহারা কার্য্য করিতেছেন, তাহাদিগকে প্রতি সপ্তাহে ২০০৲ টাকা পাঠান হইতেছে।

বিতরণের রিপোর্ট।

সোমপাড়া কেন্দ্র—১৫ই জুলাই।

গ্রাম	পরিবার	সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিসংখ্যা	সাহায্য পরিমাণ।
পূর্ব্বের ১৩টী গ্রাম	২০৩	২৬৭	১৩।৪ সের
মধ্য বাছড়া	১	২	⁄৪ „
দক্ষিণ বাছড়া	২১	২৮	১।৬ „
মানি কাহার	৭	৭	।৪ „
পাঁচকাটী	১	১	⁄২ „
দুপুকুর	৪	৫	।০ „
গড়বার	১	১	⁄২ „
১৯টী গ্রাম	২৩৮	৩১১	১৫॥২ সের
১৬ জন ব্যক্তিকে এককালীন দান			⁄৪ „
		মোট—	১৫॥৬ সের

মহুলা কেন্দ্র—১৮ই জুলাই।

গ্রাম	পরিবার	সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিসংখ্যা	সাহায্য পরিমাণ
পূর্ব্বের ১০টী গ্রাম	৫৭	১০২	৫⁄৪ সের
মহেশতলি	৩	৪	⁄৮ „
বিষ্কার	৮	১২	॥৪ „
দহরধর	৫	৯	।৮ „
মুচিপাড়া	৩	৫	।০ „
ভাবদা	৭	১১	॥২ „
গুপিনাথপুর	১০	১৯	৸৮ „
গঙ্গাপুর	৮	১৫	৸০ „

সারগাছি	২	৩	/৬ ,,
রামনগর	২	২	/৪ ,,
সাল্লাপাড়া	২	৪	/৮ · ,,
২০টী গ্রাম	১০৭	১৮৬	৯।২ সের

পুরী জেলার ফতেপুর ও তিন্তিপ কেন্দ্রে পূর্ব্ববৎ কার্য্য চলিতেছে। পুরীর সহৃদয় কলেক্টর হ্যামিলটন সাহেব আমাদের হস্তে যে ৫০০৲ টাকা দিয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত উপায়ে ব্যয় করা হইতেছে :—

(১) কতকগুলি অনাথ পরিবার, জনপ্রতি দৈনিক ⁄॥০ হিঃ চাউল, এবং তৈলাদি খরচের বাবদ দৈনিক ৴৫, বস্ত্র, বিছানা, ঔষধ পথ্যাদি পাইতেছে।

(২) যাহারা নিজের বা অপরের জন্য ঔষধ লইতে আসে, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেই পথ্যাদি বাবদ ।০ হিঃ পাইয়া থাকে।

(৩) যে সব ভদ্র পরিবার সম্মান ও লোকলজ্জার ভয়ে, প্রাণান্তেও কোনও প্রকার সাহায্যগ্রহণ নিমিত্ত ঘরের বাহির হয়েন না, তাঁহারা প্রত্যেকে চাউলের সঙ্গে সঙ্গে ।০ করিয়া পাইয়া থাকেন।

(৪) যাহারা গভর্ণমেণ্ট হইতে নামমাত্র সাহায্য পান এবং তাহাও অনিয়মিতরূপে, তাহারাও প্রত্যেকে ।০ আনা হিসাবে পাইয়া থাকে।

(৫) যাহারা গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত তাগাবি পায় নাই অথবা অল্পমাত্র পাইয়াছে, তাহাদিগকে খরিদ দরে ধান্যবীজ বিক্রয়ের জন্য ১টী দোকান খোলা হইয়াছে। অন্যত্র হইতে বীজ আনিতে যে খরচ পড়ে তাহাও তাহাদিগকে দিতে হয় না।

(৬) কৃষিজীবিদের যাহারা অর্থাভাবে বীজ ক্রয় বা হাল গরু ও লোকাভাবে জমী চাষ করিতে পারে না, তাহাদিগকে বীজ বা ভাড়া করিয়া হাল, গরু এবং বেতন দিয়া লোক দ্বারা, তাহাদের চাষের সকল রকমই সাহায্য করা হয়।

এতদ্ব্যতীত এখানে চাউল বিতরণ পূর্ব্ববৎ সমান ভাবে চলিতেছে বলিয়া আর তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল না; এ পর্য্যন্ত ফতেপুর কেন্দ্র হইতে যে মাসে যত জন রোগী ঔষধ পাইয়াছে তাহার একটী বিবরণ দেওয়া গেল :—

মাস	গ্রাম সংখ্যা	রোগীর সংখ্যা	আরোগ্য সংখ্যা
এপ্রেল	৬	১৬	১৫
মে	১৬	৭২	২৫
জুন	১৫	৪২	৪০

তিতিপ কেন্দ্রের শেষ যে কার্য্যবিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রদত্ত হইল ।

তিতিপ কেন্দ্র—(পুরী)

গ্রাম ৩৪	২৬৮	৪৪৮	২২।৬ মন

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে প্রাপ্তি স্বীকার ।

শ্রাবণের উদ্বোধনে স্বীকৃত	৯০৯৩৫ পাই ।
পি, এল, ভাগোয়ানি, হায়দারাবাদ	১২০০৲
কৃষ্ণরাও বাবাবো মোহলকার, গিরগাঁও	৮৮৸০
শ্রীমতী ইচ্ছাময়ী আইচ, নোয়াখালি	৫৲
শ্রীকালিমোহন সাহা, ঢাকা	২৲
বি, কে, দাস রায়, মদনগঞ্জ	২৲
কাসিম খাঁ, পোর্টব্লেয়ার	১২॥০
জমল মহম্মদ, বুম্বাই	৫০৲
জনৈক মহিলা, ঐ	৫০৲
মুলজি দামোদর, বালকেশ্বর	১০০৲
কলেক্টর, পুরী	৫০০৲
শ্রীদীনবন্ধু পাইত, শেখরনগর	৫৲
শ্রীনন্দলাল ভট্টাচার্য্য, মতিহারি	২৲
স্বামী প্রকাশানন্দ, আমেরিকা	৭৸৴০
বি, বি, বর্দ্ধন, দেওঘর	৫৲
রাধিকা প্রসাদ, মহল্লা মৃজাপুর	১৲
শ্রীমতী মৃন্ময়ী গুহ, রাজসাহী	৫৲
শ্রীমতী নির্ম্মলিনি বসু, বারাকপুর	২৲
শ্রীবৈকণ্ঠ নাথ রায়, কমলাগঞ্জ	২।৵০
হংসরাজ প্রাগো, মালাবার	৩৫৲
শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ, আলিপুর	১০৲
দরিদ্র সমিতি, নবাসন	২৲

শ্রীমহেশ্বর দাস, পোর্টব্লেয়ার	২॥০
জনৈক মহিলা, ময়মনসিংহ	১৩৲
শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মজুমদার, মিরাট	১৪৲
শিবাজি সমিতি, কলিকাতা	৪৶১০
মাঃ শ্রীঅমৃত লাল দত্ত, কলিকাতা	।৴০
চাউল বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত	৫৯।৴০
বৈবাহিক দান, কলিকাতা	৫৲
শ্রীউমেশ চন্দ্র সাহা, কলিকাতা	৩৲
শ্রীব্রজ নাথ দত্ত	২৲
শ্রীগুরুদয়াল সাহা, কাশ্মীর	১৲
শ্রীঅঘোর চন্দ্র পাল, কলিকাতা	২৲
ডাঃ নৃপেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রতাপগড়	৫৲
শ্রীহরি চরণ দাস, কলিকাতা	১৲
চট্টগ্রাম রেলওয়ে অডিট আফিস	১।৴০
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, পোর্টব্লেয়ার	২৲
পি, ?: খিলাবাণী, খাণ্ডারো	৫৲
বেলুড় মঠের দুর্ভিক্ষ বাক্স হইতে প্রাপ্ত	৸৵০
শ্রীললিত মোহন ঘোষ, কলিকাতা	৭৫৲
শ্রীহারাধন ঘোষ, কলিকাতা	১০৲
শ্রীত্রৈলোক্য নাথ মৌলিক, জলপাইগুড়ি	১০৲
ডি, এন, সিংহ রায়, নিকাশিপাড়া	৫৲

মোট——১১৪২০৩পাই

অমৃতবাজার দুর্ভিক্ষমোচন মণ্ডলীর (হায়দ্রাবাদের) সম্পাদক শ্রীযুত পি, এল, ছাসোযানি, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য ও পুরী জেলার কলেক্টর মিঃ হ্যামিলটন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ভদ্র পরিবারবর্গের সাহায্যার্থে তাঁহার সাময়িক দানের জন্য এবং বরিশালের শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১ বস্তা নূতন ও পুরাতন বস্ত্র প্রেরণে, মিশনের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

অর্থাদি সাহায্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া) অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, ৩০ নং বসুপাড়া লেন, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

বিংশ-শতাব্দীর ধর্ম্ম।

[স্বামী বোধানন্দের বক্তৃতা।]

আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যান্তর্গত পিট্‌সবর্গ সহরের বেদান্ত সমিতির সভ্যগণের সমক্ষে স্বামী বোধানন্দ বিগত জুন মাসে "বিংশ-শতাব্দীর ধর্ম্ম" শীর্ষক একটী অতি সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তৃতার সারমর্ম্ম, ১০ই জুন তারিখের পিট্‌সবর্গ প্রেস" নামক সংবাদ-পত্র হইতে, আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

'উন্নতির পথে নিয়ত ধাবমান আমাদের জগতে সময়ে সময়ে নূতন নূতন বন্দোবস্তের আবশ্যক হয়। ঐরূপ আবশ্যকতা উপস্থিত হইলেই শক্তি-তরঙ্গ, কোথা হইতে উত্থিত হইয়া, সেই অভাব পরিপূরণ করে। বাহ্য এবং অধ্যাত্ম এই উভয় জগতে মানব যুগপৎ অবস্থিত বলিয়া ঐ শক্তিতরঙ্গ উভয় জগতেই মানবের অভাব পরিপূরণ করিয়া থাকে। প্রাচ্য প্রদেশই স্মরণাতীত কাল হইতে আধ্যাত্মিক তরঙ্গরাজির জন্মভূমি এবং উৎপত্তি-কেন্দ্র। সমগ্র পৃথিবীর উন্নতি সাধনে কোন্ প্রদেশ কি দিয়াছে বিচার করিতে গেলে, অধ্যাত্মভাবরাজিই প্রাচ্য প্রদেশের বিশেষ দান বলিয়া বেশ বুঝা যায়, কেননা ধর্ম্মই প্রাচ্যের জীবন। অধুনা ইউরোপ ও আমেরিকা ব্যবহারিক জগতে বানিজ্যাদিতে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্য জনসমূহ ঐ উন্নতি সাধনে যখন গভীর অভিনিবেশে মগ্ন হইয়াছিল, প্রাচ্য জনগণ তখন অধ্যাত্ম-তত্ত্ব সমূহ জীবনে পরিণত

করিতে ব্যস্ত ছিল। সংসারের ক্ষণভঙ্গুর সুখলাভই পাশ্চাত্য জীবনের উদ্দেশ্য, তত্ত্যাগই আবার প্রাচ্য জীবনের লক্ষ্য। জড়োপাসনার গভীর পঙ্কে নিমগ্ন পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহের উদ্ধারের জন্য, সেই কারণে প্রাচ্য হইতে অধ্যাত্ম-তরঙ্গ উত্থিত হওয়াই স্বাভাবিক। বর্ত্তমান যুগে এক মহাতরঙ্গ ভারতে উত্থিত হইয়াছে, উহা অনতিবিলম্বে অসীম প্রতিভাবলে সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎকে প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। কেহই উহার গতিরোধে সমর্থ হইবে না। যাহার কান আছে, সেই এই অধ্যাত্ম-বন্যার দূরাগত গভীর গর্জ্জন শুনিতে পাইতেছে।

চিন্তা করিয়া দেখিলে আবার বুঝিতে পারা যায়, ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। মনুষ্য সমাজের অভাব-পূরণ সর্ব্বকালেই এইরূপে হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান ঘটনা তাহারই দৃষ্টান্ত-বিশেষ মাত্র। ঘটনাচক্রের পুনরাবর্ত্তন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। পুরাকালে ঐরূপ কতবার হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আবার কতবার হইবে, তাহার নির্ণয় কে করিবে? ভাবরাজ্যের ইতিহাসজ্ঞ বিশেষরূপে বিদিত আছেন যে, উত্থান পতন, পুনরুত্থান ও পুনঃ পতন, ইহাই অধ্যাত্মজগতের ব্যবহারিক ও সাধারণ নিয়ম। প্রতি উত্থানের অগ্র পশ্চাতে সেজন্য দুইটী ধর্ম্মাবসন্নতার বা ধর্ম্মগ্লানির কাল দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগের অধ্যাত্মতরঙ্গের পশ্চাতে আবার কালে ঐরূপ এক ধর্ম্মগ্লানি আসিয়া উপস্থিত হইবে, ইহা যেমন নিশ্চিত, সেইরূপ ঐ ভাবপতনাধিকালের পশ্চাতে আবার যে অধ্যাত্ম-ভাবের উত্থান হইবে, ইহাও তেমনি সুনিশ্চিত। যাক্ এখন সে কথা।

সম্মুখাগত যুগধর্ম্ম-তরঙ্গের অভিব্যক্তি প্রকারের কিছু বিশেষত্ব আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ন্যায় উহা মহীয়ান্ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক-বিশেষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান নহে, কিন্তু কাল যে সত্যের অপলোপ করিতে কখন সক্ষম নহে—যাহাকে আশ্রয় করিয়াই সর্ব্বকালে মনুষ্যত্ব, আচার্য্যত্ব, ঋষিত্বের আবির্ভাব, যাহা স্বরূপতঃ সনাতন এবং সম্প্রদায়-বিশেষে কখনই আবদ্ধ নহে—সেই সত্য মাত্র সহায়ে উহা অধুনা উপস্থিত। সেই জন্যই পৃথিবীতে অদ্যাবধি যত ধর্ম্ম সম্প্রদায় উদিত হইয়াছে বা পরে হইবে, তাহারা সকলেই উহার উদারহৃদয়ে সমভাবে স্থান লাভ করিবে এবং উহারই আংশিক প্রকাশ বলিয়া আদরণীয় হইবে। শুদ্ধাদ্বৈতের কল্পনাতীত উচ্চ সিদ্ধান্ত হইতে দ্বৈতবাদের প্রতিমা পূজাদি সকলই উহার সহায়ে সত্য বলিয়া নির্ণীত হইয়া স্ব স্ব স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে! কেবল সাম্প্রদায়িকতা এবং গোঁড়ামি—যাহা এত কাল এই পৃথিবীতে অপর সকল মতের অভ্যুত্থানে অসহিষ্ণু হইয়া, ঐ সকলের উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল

—তাহারাই কেবল উহার শক্তিতে সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া, সমূলে বিনষ্ট হইবে এবং প্রেম, মুদিতা, ও শান্তি আসিয়া তৎস্থান অধিকার করিবে।

অজ্ঞান এবং তৎপ্রসূত জঘন্য বৃত্তি সকলের এইরূপে ধ্বংস সাধন করিয়া, উহা মানবে মনুষ্যত্বের তেজ সংক্রামিত করিবে এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবে। যেখানে যাহা কিছু সত্য পাওয়া যাইবে, সেখান হইতেই তাহা উহা সাদরে গ্রহণ করিবে। ঘৃণা ও দোষদৃষ্টি উহার শক্তিতে তিরোহিত হইবে এবং প্রেম ও সহানুভূতি তৎস্থানে বিরাজ করিবে। স্বাধীনতাই আত্মপ্রসার ও আত্মোন্নতির একমাত্র পথ এবং 'যত মত, তত পথ'—ইহাই উহার মূল মন্ত্র, সেজন্য ধর্ম্মজগতে যাহার যে মত অবলম্বন-রুচিকর হইবে, তাহাকেই উহা সেই মত গ্রহণে নিযোগ করিবে। ধর্ম্মশক্তির সম্যক বিকাশের জন্য, বহুমতের অভ্যুদয় নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়াই, উহা ঘোষণা করিবে। কারণ বহুত্বেই সর্ব্ববস্তুর বাহ্য বিকাশ ও উৎকর্ষপ্রাপ্তি প্রতিষ্ঠিত। বহুত্বের লোপ হইলে বিকাশেরও লোপ হইবে। ঐ কারণেই আবার বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম-প্রচারকগণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালের ন্যায় ভিন্নমতাবলম্বী মানবের "ভাব নষ্ট" করিয়া, তাহাকে সম্প্রদায় বিশেষের গণ্ডির ভিতর আনিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন না। পাপ, 'অনন্ত নরক' এবং অজ্ঞান-প্রসূত বন্ধনের কথা তাঁহারা কখন মুখাগ্রেও না আনিয়া, কেবল পবিত্রতা, অমরত্ব ও সর্ব্ববিধ বন্ধন মোচন বা মুক্তি যাহাতে হয়, সেই কথাই প্রচার করিবেন। ঐ শুন, তাঁহাদের গম্ভীর নির্ঘোষ—"কে কোন্ সম্প্রদায় অবলম্বন করিয়া বা কোন আচার্য্যপাদের অনুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছে, তদ্বিচারে তোমার প্রয়োজন নাই। তুমি 'ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া' আপনার মতে দৃঢ় নিষ্ঠা রাখ এবং 'যত মত, তত পথ' জানিয়া, সকল মতকেই প্রেম ও সহানুভূতির চক্ষে অবলোকন কর।"

বন্ধুগণ। ঘোর নাস্তিকতা এবং জড়োপাসনা হইতে জগৎ উদ্ধারের জন্য, এই নবীন যুগধর্ম্ম তোমাদের নিকট সমুপস্থিত। দেশবিশেষের বা জাতিবিশেষের জন্যই কেবল উহার অভ্যুদয় হয় নাই। সর্ব্বদেশের সকলের উদ্ধারের জন্য, উহা সমাগত। অনন্ত ধর্ম্ম-মত-প্রসারিণী এই সনাতনী মুক্তি-বার্ত্তা অগ্রে অনুভূতি কর, নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ কর, পরে অপার প্রেম এবং আশীর্ব্বাদের সহিত ঐ বার্ত্তা প্রচার কর।

সংবাদ ও মন্তব্য।

লণ্ডনের বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে, স্বামী অভেদানন্দ, গত জুন মাসে প্রতি রবিবার প্রাতে, তত্রস্থ ডেনিসন্ হাউস্ নামক বাটীতে, নিম্নলিখিত বিষয়ে চারিটী বক্তৃতা করিয়াছেন—"বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম," "ঈশ্বর ও আত্মার সম্বন্ধ," "আত্মসংযম," "পিতৃসংস্কার-সংক্রমণ ও পুনর্জ্জন্মবাদ"।

বক্তৃতাগুলির ফলে সমিতির সভ্যেরা বিশেষ উৎসাহান্বিত হইয়াছেন এবং ১লা জুলাই তারিখে ২২নং কণ্ডুইট-ষ্ট্রীটে সমিতির গৃহ স্থাপিত হইয়াছে।

গত ২৮শে মে তারিখে, বাঙ্গালোরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ "জীবনোদ্দেশ্য" সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। মহীশূরের দেওয়ান, ভি, পি, মাধব রাও মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঐ স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন চির-প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, উক্ত দেওয়ান বাহাদুর, স্বীয় তত্ত্বাবধানে গত ২৯শে মে তারিখ হইতে একটী মঠ বাটী নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

ভগিনী দেবমাতা (যিনি আমেরিকা হইতে অল্পদিন হইল ভারতে আসিয়াছেন) গত ৩১শে মে ও ১৪ই জুন তারিখে মহীশূরে "বাঙ্গালোরে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন" এবং "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন" সম্বন্ধে দুইটী বক্তৃতা দিয়াছেন।

সম্প্রতি নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ, কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের বাটী-নির্ম্মাণ ফণ্ডে, এককালীন দান করিয়াছেন :—

জনৈক ভদ্রলোক, তাঁহার পুত্র ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর স্মরণার্থে ২০০০৲ টাকা। এতদ্ব্যতীত ইনি আশ্রমের ৬টী রোগীর সেবার্থে মাসিক ৩০৲ সাহায্য করিতেছেন।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ, রামেশ্বরপুর, বসিরহাট—১০০০৲ (ইনফেক্সন ওয়ার্ডের জন্য)।

রাণী ভবসুন্দরী দেবী, তাঁহার স্বামী ৺কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া বাহাদুরের স্মরণার্থে, একটী কলেরা ওয়ার্ডের জন্য, ১০০০৲ টাকা।

কনখল সেবাশ্রমের ১৯০৭ সনের রিপোর্ট আমরা পাইলাম। সেবাশ্রমটী স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক ৯।০ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়া, ইহাতে অদ্যাবধি ১৯৬১২ জন রোগী চিকিৎসিত ও সেবিত হইয়াছে। অতএব গড়ে বৎসরে তিন হাজার এবং মাসে আড়াই শত জন রোগীর চিকিৎসা ও সেবা করা হয়। রোগীর সংখ্যাও প্রতিদিন বাড়িতেছে। এতদ্ব্যতীত পৃথক ঘর অভাবে যক্ষ্মা রোগীদের একেবারে ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে—ইহা দেখিয়া স্বদেশ-বৎসল ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় বিগলিত হয়। গত সনে চাঁদা আদায়, মোট ১০৫৩৴৫ তাহার মধ্যে মোট খরচ ৮৩৭।৶২॥ এবং বাকি হস্তে জমা আছে।

এই হর-পার্ব্বতীর লীলাস্থলের মাহাত্ম্য সকলেরই জানা আছে, কিন্তু পৌরাণিক কথা ছাড়িয়া দিলেও, কনখলের মাহাত্ম্য প্রকৃত হিন্দুর কাছে কিছুতেই কম নহে। কারণ, যে বেদান্তের উপর আমাদের ধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, যাহার অপ্রতিহত প্রভাবের নিকট আজ পাশ্চাত্য দেশের সুধীমণ্ডলীকেও মস্তক অবনত করিতে হইতেছে, সেই সার্ব্বজনীন ভাব সাধনার দ্বারা মানব জীবনে প্রতিফলিত করিবার পক্ষে, কনখল বিশেষ অনুকূল এবং সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন কেন্দ্র। অতএব আমাদের মনে হয় যে, সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই উক্ত সেবাশ্রমের অভাবগুলি মোচন করিতে যথাসাধ্য সচেষ্ট হইবেন।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—স্বামী কল্যাণানন্দ, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, কনখল পোঃ, জিলা সাহারাণপুর; অথবা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া)।

গত ১২ই আষাঢ় শুক্রবার, ১২ নং সার্পেণ্টাইন লেনস্থ ভবনে বহুবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতির বাৎসরিক উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিমূর্ত্তিদ্বয় সুন্দররূপে পুষ্পাদি দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল। পূজা পাঠ, ভজন কীর্ত্তন, এবং পরিশেষে সমাগত সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।* তদ্ভিন্ন প্রাতে ও সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তন করিতে করিতে পল্লি পরিভ্রমণ করাও হইয়াছিল।

উক্ত সমিতির সভ্যগণ, প্রায় ৪ বৎসর হইল "রামকৃষ্ণ অনাথ ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠা করিয়া, উহার উন্নতি কল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। উহার উদ্দেশ্য—সহায়-সম্পত্তি-বিহীনা বিধবা ও পিতৃমাতৃহীনা অনাথ বালিকাদিগকে মাসিক সাহায্যদান এবং ভদ্রবংশ-সম্ভূত হিন্দু অনাথ বালকদিগকে আশ্রয় ও

নিয়মিত শিক্ষা দান। উপস্থিত ৩২টী দরিদ্র হিন্দু বিধবা ও নিঃস্ব পরিবার এই ভাণ্ডার হইতে মাসিক অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছেন এবং ১২টী অনাথ বালক উঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত এবং শিক্ষিত হইতেছে।

ভাণ্ডারের সমস্ত ব্যয় হৃদয়বান্ মহোদয়গণের মাসিক চাঁদা ও এককালীন দান হইতে সংকুলান হয়। প্রতি রবিবার ভাণ্ডারের কর্তৃপক্ষগণ নিয়মিতরূপে পল্লীর গৃহস্থগণের নিকট হইতে চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিয়া থাকেন। এই চাউল বিক্রয় দ্বারা যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহা ভাণ্ডারের পরিপুষ্টি সাধনে ব্যবহৃত হয়। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এই ভাণ্ডারের সাহায্যার্থ ২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় ছোটলাট বাহাদুর এই বৎসর তাঁহার নিজ তহবিল হইতে ২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

জানুয়ারি ১৯০৮ হইতে জুন ১৯০৮ পর্য্যন্ত অনাথ ভাণ্ডারের আয় ও ব্যয়ের হিসাব, যাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আয়।

১৯০৭ সালের জের	১১৪৬৸১০
বঙ্গীয় গর্ভণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত	২০০৲
বঙ্গীয় ছোট লাট বাহাদুরের দান	২০০৲
বিক্রেয় চাউল হইতে	৫৮৫৶১৫
চাঁদা আদায়	২৮০৷৹
ব্যাঙ্কের সুদ	৬১৶১৫
এককালীন দান প্রাপ্তি	৪০৮৶০
মোট আয়—	৩৬৮১৸০

ব্যয়।

বাৎসরিক বিবরণী ছাপাই ইত্যাদি খরচ	৯১৩৸৴১৫
আতুর ও বিধবাদিগকে সাহায্য দান	১৮০৷০
অনাথ আশ্রমের ব্যয়—	
পাচকের বেতন ও বালকদিগের খাই খরচ	৩৪০৷৴১২৷
বস্ত্রাদি	৪৬৸৴১০
তৈজসাদি	৪৶১৫
ঔষধ	১৷৶১০
বাটীভাড়া	১৫৬৲
পুস্তকাদি	৬৸৴১০
শয্যাদি	১৷৶০
পাথেয়	১০৲
আলো ও খুচরা খরচ	২৯৷৭৷
হস্তে বাকি	২৭১০৶১৫
মোট—	৩৬৮১৸০

"শিবপুর রামকৃষ্ণ দরিদ্র ভাণ্ডারের" প্রথম বাৎসরিক রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই ভাণ্ডার যে অতি শৈশবাবস্থায়ই এত মহৎ কার্য্য করিতে পারিয়াছে, তজ্জন্য ইহার কর্তৃপক্ষগণ সকলেরই নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শিবপুরের কয়েকটী মাত্র যুবকের হৃদয়ে এই প্রকার একটী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প জাগে, যাহা দ্বারা স্থানীয় এবং নিকটবর্ত্তী হিন্দু বিধবা, অনাথ এবং আতুর লোকে সাহায্য পায়। এই সদাকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা, স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণের সমক্ষে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং এক একটী হাঁড়ি প্রত্যেক ভদ্র পরিবারের বাটীতে রাখিয়া আসেন, যাহাতে দিনান্তে এক মুষ্টি করিয়া চাউল প্রত্যেক পরিবার দিবেন এবং সপ্তাহান্তে ভাণ্ডারের যুবকগণ সংগৃহীত চাউল লইয়া আসিবেন। এই প্রকার আরম্ভ দ্বারা তাঁহারা এক্ষণে সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে তাঁহাদের কার্য্যের একটী বাৎসরিক রিপোর্ট ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ যে, নিয়মিত সাহায্য, এককালীন দান এবং চাউল বিক্রয় দ্বারা মোট আয়—৪৮৯৸৶১০, মোট খরচ—৬৮।০, হস্তে বাকি—৪২১॥৶১০ আনা। মোট চাউল আদায়, ৫১৸০ মন। খরচ, ৫০৸৴॥০ মন, হস্তে বাকি—৮৴৯॥০ সের। মাসিক সাহায্য-প্রাপ্ত বিধবা, অনাথ, ও আতুরের মোট সংখ্যা, ২১টী। শ্রীভগবান্ এই ভাণ্ডারের কার্য্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন—ইহা সকলেরই প্রার্থনা।

চাতরা-ভক্তাশ্রমের পঞ্চম বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী পাঠে জানা যায় যে, এই আশ্রমের উদ্দেশ্য মহৎ। আশ্রমস্থ সেবকগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান এবং তৎসঙ্গে দুঃস্থ লোকের সেবা করা ইহার উদ্দেশ্য। এই প্রকার আশ্রম সর্ব্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মঙ্গলজনক।

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের পরম বন্ধু পাথুরিয়াঘাটাস্থ ডাক্তার নিতাই চাঁদ হালদার হঠাৎ ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গকে শান্তি দান করুন।

কৃতাশেষকর্ম্মসন্ন্যাসোপপত্তেঃ সন্ন্যাসিনাং অনিষ্টাদিত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলং ন ভবতীত্যুপপন্নং। তদ্বিপর্য্যয়াৎ চ ইতরেষাং ভবতীত্যেতচ্চ অপরিহার্য্যং ইত্যেষ গীতাশাস্ত্রার্থ উপসংহৃতঃ। স এষ সর্ব্ববেদার্থসারোনিপুণমতিভিঃ পণ্ডিতৈঃ বিচার্য্য প্রতিপত্তব্য ইতি তত্র তত্র প্রকরণবিভাগেন দর্শিতোঽস্মাভিঃ শাস্ত্রন্যায়ানুসারেণ। ১৭।

ভাষ্যানুবাদ। আত্মার অবিকারিস্বভাব, শ্রুতি, স্মৃতি এবং যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। "এই আত্মা অবিকার্য্য বলিয়া কথিত হয়" "কর্ম্ম সমূহ গুণগণেরই কার্য্য" "শরীরস্থ হইয়াও কিছুই করে না" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা এই গীতা শাস্ত্রে আত্মার অবিক্রিয়ত্ব বহুবার উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতিতেও "যেন ধ্যান করে যেন ক্রীড়া করে" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারাও তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যুক্তিও রাজমার্গের ন্যায় (সর্ব্বজন সমক্ষে) পড়িয়া রহিয়াছে যে, আত্মা নিরবয়ব অপরতন্ত্র ও অবিক্রিয়। আত্মার কোন রূপ বিকার আছে, ইহা যদি অঙ্গীকার করিতে হয়, তাহা হইলে মানিতে হয় যে, ঐ বিকার তাহার নিজেরই ধর্ম্ম হইবে। অধিষ্ঠান প্রভৃতির ধর্ম্ম যে সকল ক্রিয়া, তাহাদের কর্ত্তা কোন রূপেই আত্মা হইতে পারে না। যাহা একের কর্ম্ম, তাহা অপরের হয় না, সুতরাং তাহা অপরকে কিছুতেই প্রাপ্ত হইতে পারে না। যদি বল, অবিদ্যার প্রভাবে উহা অপরের উপর আরোপিত হইতে পারে, তাহা হইলেও, তাহা কোন প্রকারেই অপরের ধর্ম্ম হইতে পারে না। যেমন অজ্ঞ ব্যক্তি রজতধর্ম্মকে শুক্তির উপর আরোপিত করে, বা ভূতলের ধর্ম্ম মলিনত্বকে আকাশের উপর আরোপিত করে বলিয়া, রজতত্ব শুক্তির ধর্ম্ম বা মলিনত্ব আকাশের ধর্ম্ম হইবে, ইহা কখনই সম্ভব পর নহে, সেইরূপ অধিষ্ঠান প্রভৃতির ধর্ম্ম যে বিক্রিয়া, তাহা অধিষ্ঠান প্রভৃতিরই ধর্ম্ম হইবে, কিছুতেই তাহা আত্মার ধর্ম্ম হইবে না। সেই কারণে ইহা ঠিক বলা হইয়াছে যে, বিদ্বানের অহঙ্কাররূপ লেপ না থাকা প্রযুক্ত, সে কাহাকে হননও করে না এবং হনন করিয়া নিজে বন্ধনও প্রাপ্ত হয় না। "এই আত্মা হনন করে না এবং হতও হয় না" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারাও, আত্মার অবিকারিত্ব প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, "আত্মার জন্ম হয় না" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা আত্মার অবিক্রিয়ত্বের প্রতি হেতু প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তাহার পর "এই আত্মাকে অবিনাশী বলিয়া যে জানে" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিদ্বানের কর্ম্মাধিকার নিবৃত্ত হয়, ইহা শাস্ত্রের আদি ভাগে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে এবং মধ্যভাগে এই কথাই বিস্তৃতভাবে নানাপ্রসঙ্গে

বলা হইয়াছে, এক্ষণে এক সঙ্গে ঐ সকল অর্থ একত্র করিয়া বুঝাইবার জন্য উপসংহার করিতেছেন যে, এই বিদ্বান্ কাহাকেও হনন করে না এবং বদ্ধও হয় না। এই প্রকার অবস্থা উপস্থিত হইলে, আত্মাতে আর দেহিত্বাভিমান থাকিতে পারে না, সুতরাং, তখন অবিদ্যা দ্বারা আরোপিত সকল কর্ম্মেরই সন্ন্যাস উপপন্ন হইয়া থাকে, এই জন্যই সন্ন্যাসিগণের পক্ষে কর্ম্মের অনিষ্ট প্রভৃতি ত্রিবিধ ফল হইতে পারে না, কিন্তু, যাহারা অজ্ঞান তাহাদেরই ঐ ত্রিবিধ কর্ম্মফলের ভোগ হইয়া থাকে। এই প্রকার মতটীকে কেহই খণ্ডন করিতে পারেন না। এই হইল গীতাশাস্ত্রের উপসংহৃত অর্থ। এই সিদ্ধান্তই সকল বেদার্থের সারভূত, যাহারা পণ্ডিত এবং নিপুণমতি, তাঁহাদের উচিত যে, বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তটী ভাল করিয়া বুঝা। আমরা শাস্ত্র এবং ন্যায়ের অনুসরণ করিয়া, সেই সেই স্থানে প্রকরণ বিভাগের দ্বারা এই সিদ্ধান্তটী প্রতিপাদন করিয়াছি। ১৭।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ॥ ১৮॥

অন্বয়। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ইতি কর্ম্মচোদনা ত্রিবিধা। করণং কর্ম্ম কর্ত্তা ইতি কর্ম্মসংগ্রহঃ ত্রিবিধঃ। ১৮।

মূলানুবাদ। জ্ঞান জ্ঞেয় এবং পরিজ্ঞাতা এই তিন প্রকার কর্ম্মের প্রবর্ত্তনা, এবং করণ কর্ম্ম ও কর্ত্তা এই তিন প্রকার কর্ম্ম সংগ্রহ। ১৮।

ভাষ্য। অথেদানীং কর্ম্মণাং প্রবর্ত্তকমুচ্যতে, জ্ঞানং জ্ঞায়তে অনেনেতি সর্ব্ববিষয়মবিশেষেণ উচ্যতে। তথা জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যং, তদপি সামান্যেনৈব সর্ব্বমুচ্যতে। তথা পরিজ্ঞাতা উপাধিলক্ষণোঽবিদ্যাকল্পিতো ভোক্তা, ইত্যেতৎত্রয়ং এষাং অবিশেষেণ সর্ব্বকর্ম্মণাং প্রবর্ত্তিকা ত্রিবিধা ত্রিপ্রকারা কর্ম্মচোদনা। জ্ঞানাদীনাং হি ত্রয়াণাং সন্নিপাতে হানোপাদানাদিপ্রয়োজনঃ সর্ব্বকর্ম্মারম্ভঃ স্যাৎ। ততঃ পঞ্চভিঃ অধিষ্ঠানাদিভিঃ আরব্ধং বাঙ্মনঃকায়াশ্রয়ভেদেন ত্রিধা রাশীভূতং ত্রিষু করণাদিষু সংগৃহ্যতে ইত্যেতদুচ্যতে। করণং ক্রিয়তেঽনেন ইতি বাহ্যং শ্রোত্রাদি, অন্তস্থং বুদ্ধ্যাদি কর্ম্মেপ্সিততমং কর্ত্তুঃ ক্রিয়য়া ব্যাপ্যমানং, কর্ত্তা করণানাং ব্যাপারয়িতা উপাধিলক্ষণ ইতি ত্রিবিধস্ত্রিপ্রকারঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ সংগৃহ্যতেঽস্মিন্ ইতি সংগ্রহঃ কর্ম্মণঃ সংগ্রহঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ। কর্ম্ম এষু হি ত্রিষু সমবৈতি। তেনায়ং ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ। ১৮।

ভাষ্যানুবাদ। তাহার পর এক্ষণে কর্ম্ম সমূহের প্রবর্ত্তক (কি তাহাই) বলিতেছেন। "জ্ঞান" যাহার দ্বারা বিষয় সমূহ প্রকাশিত হয়, তাহাকেই জ্ঞান কহে, এই জ্ঞান শব্দের অর্থ সামান্যতঃ সর্ব্ববিষয়েরই জ্ঞান। সেইরূপ "জ্ঞেয়" শব্দের অর্থ যাহা কিছু জ্ঞাতব্য সেই সকলই। সেইরূপ "পরিজ্ঞাতা" অর্থে বুদ্ধিরূপ উপাধিদ্বারা বিশেষিত অবিদ্যাকল্পিত ভোক্তা। এই যে তিনটী ইহারাই সামান্যভাবে সকলপ্রকার কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সুতরাং কর্ম্মচোদনা (কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বাক্যও) ত্রিবিধ। কারণ, এই যে জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং পরিজ্ঞাতা, এই তিনটীর পরস্পর সম্বন্ধ হইলেই, তবে কোন বস্তুর উপাদান বা পরিত্যাগের জন্য সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের আরম্ভ হইয়া থাকে। তাহার পর অধিষ্ঠান প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী হেতুদ্বারা আরদ্ধ হইয়া, বাক্ মনঃ এবং কায়রূপ আশ্রয়ের ত্রৈবিধ্য প্রযুক্ত, তিন প্রকারের ঐ কর্ম্ম তিনটী রাশিতে প্রবিভক্ত হয়, সুতরাং ঐ সকল কর্ম্মকরণপ্রভৃতি তিনটীর মধ্যেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। এই কথাই বলা হইতেছে—'করণ' যাহাদ্বারা করা যায় তাহার নাম করণ, করণ শব্দের অর্থ শ্রোত্র প্রভৃতি বাহ্য ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি প্রভৃতি। কর্ম্ম শব্দের অর্থ কর্ত্তার যাহা অত্যন্ত অভিলষিত, যাহার জন্য ক্রিয়া—তাহাই কর্ম্ম। 'কর্ত্তা" ঐ সকল শ্রোত্র প্রভৃতি করণের প্রবর্ত্তক ও বুদ্ধিরূপ উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ভোক্তা। এই তিনটীই হইল কর্ম্মসংগ্রহ। যাহাদ্বারা সংগৃহীত হয়, তাহার নাম সংগ্রহ, কর্ম্ম সমূহের সংগ্রহ এই অর্থে কর্ম্মসংগ্রহ এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। এই তিনটী বস্তুতেই সকল কর্ম্ম সমবেত হয় এই কারণে এই ত্রিবিধ বস্তুকেই কর্ম্ম সংগ্রহ বলা যায়। ১৮।

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥

অন্বয়। গুণসংখ্যানে গুণভেদতঃ জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব প্রোচ্যতে তানি যথাবৎ শৃণু। ১৯।

মূলানুবাদ। গুণ সংখ্যানে (অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্রে) গুণ ভেদ-নিবন্ধন জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা এই তিনটীই প্রত্যেকে ত্রিবিধ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাও তুমি যথাযথ ভাবে শ্রবণ কর। ১৯।

ভাষ্য। অথেদানীং ক্রিয়াকারকফলানাং সর্ব্বেষাং গুণাত্মকত্বাৎ সত্ত্বরজস্তমো-গুণভেদতঃ ত্রিবিধো ভেদো বক্তব্য ইত্যারভ্যতে। জ্ঞানং কর্ম্ম চ, কর্ম্ম ক্রিয়া, ন

কারকং পারিভাষিকমীপ্সিততমং কর্ম্ম, কর্ত্তা চ নির্ব্বর্ত্তকঃ ক্রিয়াণাং ত্রিধৈবাবধারণং গুণব্যতিরিক্তজাত্যন্তরাভাবপ্রদর্শনার্থং গুণভেদতঃ সত্ত্বাদিভেদেন ইত্যর্থঃ। প্রোচ্যতে কথ্যতে, গুণসংখ্যানে কাপিলে শাস্ত্রে, তদপি গুণসংখ্যানং শাস্ত্রং, গুণভোক্তৃবিষয়ে প্রমাণমেব পরমার্থব্রহ্মৈকত্ববিষয়ে যদ্যপি বিরুধ্যতে। তে হি কাপিলা গুণগৌণব্যাপারনিরূপণে অভিযুক্তা ইতি তচ্ছাস্ত্রমপি বক্ষ্যমাণার্থস্তুত্যর্থত্বেন উপাদীয়তে ইতি ন বিরোধঃ। যথাবৎ, যথান্যায়ং। যথাশাস্ত্রং শৃণু তান্যপি, জ্ঞানাদীনি তদ্‌ভেদজাতানি গুণভেদকৃতানি শৃণু বক্ষ্যমাণে অর্থে মনঃ সমাধিং কুরু ইত্যর্থঃ। ১৯।

ভাষ্যানুবাদ। তাহার পর এইরূপে ক্রিয়া কারক এবং ফল এই ত্রিধা বিভক্ত জগৎ সকলই গুণময়, সুতরাং গুণের (সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এইরূপে) ত্রৈবিধ্য আছে বলিয়া, ঐ তিনটী পদার্থও ত্রিবিধ হয় ইহাই বুঝাইতে হইবে, এই জন্য, এই শ্লোকের আরম্ভ করা হইতেছে। "জ্ঞান" (বিষয়রূপে পরিণত বুদ্ধিবৃত্তি) কর্ম্মশব্দের অর্থ ক্রিয়া, কর্ত্তার ঈপ্সিততম যে কারককে পূর্ব্বে কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই কারক রূপ পারিভাষিক কর্ম্ম, এই স্থলে কর্ম্ম শব্দের অর্থ নহে। "কর্ত্তা" যে কর্ম্মের নির্ব্বর্ত্তক সেই কর্ত্তা। "ত্রিধা' তিনপ্রকার, "এব" শব্দের অর্থ অবধারণ অর্থাৎ তিন প্রকারই হইবে, অধিকও নহে, ন্যূন নহে। এই প্রকার অবধারণ দ্বারা প্রতিপাদন হইতেছে যে, জাগতিক যত কিছু বস্তু সকলই এই তিনটী গুণ জাতির মধ্যে প্রবিষ্ট। এই গুণ গত জাতি ছাড়া অন্য কোন জাতির সম্ভাবনা নিরাকরণ করিবার জন্যই, এই অবধারণার্থ 'এব' শব্দের প্রযোগ করা হইয়াছে। "গুণ ভেদ" অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের ভেদ। সেই ভেদ বশতঃ—অর্থাৎ ঐ গুণ তিন ভাগে বিভক্ত বলিয়া—গুণের কার্য্য গুলিও তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। "প্রোচ্যতে" এই শব্দটীর অর্থ—কথিত হয়। "গুণ সংখ্যান" এই শব্দটীর অর্থ কপিল প্রোক্ত সংখ্য দর্শন, (সেই সাংখ্য দর্শনে এই রূপ কথিত হয়)। সেই কপিলোক্ত শাস্ত্রও গুণ সংখ্যান শব্দের অর্থ হইতে পারে, এবং সেই শাস্ত্র গুণভোক্তার স্বরূপ নির্ণয়ে প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। যদিচ ঐ শাস্ত্র পরমার্থ ব্রহ্মৈকত্ব রূপ বেদান্ত-প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিরুদ্ধ মত প্রকাশিত করে, (তাহা হইলেও গুণ ও গুণভোক্তার বিষয়ে ঐ শাস্ত্র প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে)। সেই কাপিলগণ গুণ ও গুণ ব্যাপার নিরূপণে পণ্ডিত, একারণে তাঁহাদের শাস্ত্রও বক্ষ্যমাণ বিষয়ের প্রশংসার জন্য এখানে পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং কোন বিরোধ হইতেছে না। যথাবৎ এই শব্দের অর্থ

যথা ন্যায়—অর্থাৎ যথাশাস্ত্র, সেই জ্ঞানাদি এবং তাহাদের অবান্তর ভেদ সকলকে শুন অর্থাৎ আমি এক্ষণে যাহা বলিব তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য মনকে সমাহিত কর। ইহাই তাৎপর্য্য। ১৯।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্‌॥ ২০॥

অন্বয়। বিভক্তেষু সর্ব্বভূতেষু যেন একং অবিভক্তং অব্যযং ভাবং ঈক্ষতে তং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং বিদ্ধি। ২০।

মূলানুবাদ। পরস্পর বিভক্ত সকল ভূতেই যাহার দ্বারা একমাত্র অবিনাশী ও অবিভক্ত ভাবকে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকেই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে। ২০।

ভাষ্য। জ্ঞানস্য তু তাবৎ ত্রিবিধত্বমুচ্যতে, সর্ব্বভূতেষু অব্যক্তাদিস্থাবরান্তেষু যেন জ্ঞানেন একং ভাবং বস্তু, ভাবশব্দো বস্তুবাচী একমাত্মবস্তু ইত্যর্থঃ। অব্যযং ন ব্যেতি স্বাত্মনা ধর্ম্মৈঃ বা কূটস্থনিত্যমিত্যর্থঃ। ঈক্ষতে যেন জ্ঞানেন পশ্যতি, তং চ ভাবং অবিভক্তং প্রতিদেহং বিভক্তেষু দেহভেদেষু ন বিভক্তং তদাত্মবস্তু ব্যোমবন্নিরন্তরং ইত্যর্থঃ। তজ্‌ জ্ঞানং অদ্বৈতাত্মদর্শনং সাত্ত্বিকং সম্যগ্‌দর্শনং বিদ্ধি ইতি। যানি দ্বৈতদর্শনানি অসম্যগ্‌ভূতানি রাজস তামসানি চ ইতি ন সাক্ষাৎ সংসারোচ্ছিত্তয়ে ভবন্তি। ২০।

ভাষ্যানুবাদ। জ্ঞানও যে তিন প্রকার, তাহা বলিতেছেন, সর্ব্বভূতে অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রপঞ্চে, যে জ্ঞানের দ্বারা এক 'ভাব" বস্তুকে দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে ভাবশব্দের অর্থ বস্তু অর্থাৎ এক আত্ম স্বরূপ বস্তু। (সেই আত্ম বস্তু কেমন?) অব্যয, যাহা স্বরূপতঃ এবং ধর্ম্মতঃ ব্যযকে প্রাপ্ত হয না, অর্থাৎ যাহা অপরিবর্ত্তনশীল নিত্য। যে জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বত্র এই রূপ আত্ম বস্তুকে দেখিতে পাওয়া যায়—(সেই আত্ম বস্তুকে কি ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়?) অবিভক্ত স্বরূপে, প্রতি দেহ পরস্পর প্রবিভক্ত হইলেও সেই আত্ম-স্বরূপ বস্তু আকাশের ন্যায এক ও নিরন্তর, ইহাই অর্থ—সেই অদ্বৈতাত্মদর্শনই সম্যগ্‌ দর্শন এবং তাহাই সাত্ত্বিক ইহা জানিও। তাহা ভিন্ন আর যত প্রকার দ্বৈত জ্ঞান আছে সে সকলই অসম্যগ্‌ দর্শন, সুতরাং হয় রাজস না হয় তামস, ঐ সকল রাজস এবং তামস জ্ঞান সাক্ষাৎ সংসারের উচ্ছেদক হইতে পারে না। ২০।

পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১॥

অন্বয়। যং জ্ঞানং সর্ব্বেষু ভূতেষু পৃথগ্‌ বিধান্ নানা ভাবান্ পৃথক্‌ত্বেন বেত্তি তদ্ রাজসং জ্ঞানং বিদ্ধি। ২১।

মূলানুবাদ। সর্ব্বভূতে পৃথগ্‌ বিধ নানা ভাবকে যে জ্ঞান পৃথগ্‌ ভাবেই প্রকাশিত করে, তাহাই রাজস জ্ঞান ইহা জানিবে। ২১।

ভাষ্য। পৃথক্‌ত্বেন ইতি, পৃথক্‌ত্বেন তু ভেদেন প্রতিশরীরমন্যত্বেন যজ্জ্ঞানং নানা ভাবান্ ভিন্নানাত্মনঃ পৃথগ্‌বিধান পৃথক্ প্রকারান ভিন্নলক্ষণানিত্যর্থঃ। বেত্তি বিজানাতি, যজ্‌জ্ঞানং সর্ব্বেষু ভূতেষু জ্ঞানস্য কর্ত্তৃত্বাসম্ভবাৎ যেন জ্ঞানেন বেত্তি ইত্যর্থঃ, তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং রজোনির্বৃত্তম্। ২১।

ভাষ্যানুবাদ। পৃথক্‌ত্বেন ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। পৃথক্‌ত্ব এই শব্দটীর অর্থ ভেদ, সেই ভেদপুরস্কারে অর্থাৎ প্রতি দেহেই ভিন্ন ভাবে নানা অবস্থা সম্পন্ন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বহু আত্মা বিদ্যমান রহিয়াছে, ঐ সকল আত্মার স্বরূপ ও লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্, এইভাবে যে জ্ঞানের দ্বারা আত্মাকে বুঝিতে পারাযায় সেই জ্ঞানই রাজস অর্থাৎ রজো গুণের কার্য্য। এই শ্লোকে জ্ঞান শব্দটীর উত্তর কর্ত্তৃ বোধক প্রথমা বিভক্তি থাকিলেও বাস্তবিক জ্ঞান কর্ত্তৃ হইতে পারে না এই জন্য ঐ প্রথমাকে তৃতীয়ার ন্যায় বুঝিয়া, 'জ্ঞানের দ্বারা' এই রূপ অর্থ করিতে হইয়াছে। ২১।

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন কার্য্যে সক্তমহেতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২॥

অন্বয়। যৎ একস্মিন কার্য্যে কৃৎস্নবৎ সক্তং অহেতুকং অতত্ত্বার্থবৎ অল্পঞ্চ তৎ (জ্ঞানং) তামসমুদাহৃতম্। ২২।

মূলানুবাদ। যে জ্ঞান কোন একটী কার্য্যে "ইহাই সব" এই ভাবে সক্ত হয়, যে জ্ঞান যুক্তিহীন, যে জ্ঞানের বিষয় মিথ্যাভূত এবং পরিচ্ছিন্ন, সেই জ্ঞানই তামস বলিয়া উদাহৃত। ২২।

ভাষ্য। যত্ত্বিতি। যত্তু জ্ঞানং কৃৎস্নবৎ সমস্তবৎ সর্ব্ববিষয়মিব একস্মিন্ কার্য্যে দেহে বহির্বা প্রতিমাদৌ, সক্তং এতাবান্ এব আত্মা ঈশ্বরো বা নাতঃ পরমস্তি ইতি যথা নগ্নক্ষপণকাদীনাং শরীরানুবর্ত্তী দেহপরিমাণো জীব ঈশ্বরো বা পাষাণদার্ব্বাদিমাত্র ইত্যেবমেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তং, অহেতুকং হেতুবর্জ্জিতং,

নির্যুক্তিকং অতত্ত্বার্থবৎ যথাভূতোঽর্থঃ তত্ত্বার্থঃ সোঽস্য জ্ঞেয়ভূতোঽস্তীতি তত্ত্বার্থবৎ ন তত্ত্বার্থবৎ অতত্ত্বার্থবৎ, অহেতুকত্বাদেব অল্পং চ অল্পবিষয়ত্বাদল্পফলত্বাদ্বা তত্তামসমুদাহৃতং। তামসানাং হি প্রাণিনাং অবিবেকিনাং ঈদৃশং জ্ঞানং দৃশ্যতে। ২২

ভাষ্যানুবাদ। যত্তু ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। যে জ্ঞান একটী কার্য্যে অর্থাৎ দেহে বা বাহ্য প্রতিমা প্রভৃতিতে "কৃৎস্নবৎ" সমস্তবৎ, অর্থাৎ ইহাই আত্মা বা ইহাই ঈশ্বর, ইহা ছাড়া আর কিছু আত্মা বা ঈশ্বর হইতেই পারে না, এই ভাবে যেন সর্ব্ব বিষয়ক হইয়া সক্ত হয়। যেমন নগ্ন ক্ষপণক প্রভৃতির মতে, জীব দেহপরিমাণ বা শরীরকে অনুবর্ত্তন করে কিম্বা ঈশ্বর কাষ্ঠাদি পরিমাণ মাত্র, সেইরূপ যে জ্ঞান একটী কোন কার্য্যে আসক্ত অথচ সর্ব্ব বিষয়কবৎ প্রতীয়মান; "অহেতুক" যাহার হেতু নাই অর্থাৎ যে জ্ঞান নির্যুক্তিক, "অতত্ত্বার্থবৎ" তত্ত্বার্থ শব্দের অর্থ সত্য বস্তু, যে জ্ঞান সত্য বস্তুকে প্রকাশ করে, তাহা তত্ত্বার্থবৎ যে জ্ঞান তত্ত্বার্থবৎ নহে, তাহাই অতত্ত্বার্থবৎ, যাহা নির্যুক্তিক তাহা ত অতত্ত্বার্থবৎ হইয়াই থাকে; "অল্প" যাহার বিষয় অল্প বা যাহার ফল তুচ্ছ, সেই জ্ঞানকেই অল্প বলা যায়। এই প্রকার যে জ্ঞান, তাহাই শাস্ত্রে তামস বলিয়া উদাহৃত হয়। তামস অর্থাৎ অবিবেকী প্রাণীগণেরই ঈদৃশ জ্ঞান হইয়া থাকে। ২২।

নিয়তং সঙ্গরহিত মরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।

অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ ২৩॥

অন্বয়। অফল প্রেপ্সুনা অরাগদ্বেষতঃ নিয়তং সঙ্গরহিতং চ (যথা ভবতি তথা) যৎ কর্ম্ম কৃতং (ভবতি) তৎ সাত্ত্বিকং উদাহৃতম্। ২৩।

মূলানুবাদ। ফলকামনাহীন ব্যক্তি রাগ ও দ্বেষ পরিহার পূর্ব্বক নিয়ত ও অনাসক্ত ভাবে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই কর্ম্মই সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। ২৩।

ভাষ্য। অথ কর্ম্মণস্ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে, নিয়তং নিত্যং সঙ্গরহিতং আসক্তি-বর্জ্জিতং অরাগদ্বেষতঃ কৃতং রাগপ্রযুক্তেন দ্বেষপ্রযুক্তেন চ কৃতং রাগদ্বেষতঃ কৃতং, তদ্বিপরীতং কৃতং অরাগদ্বেষতঃ কৃতং, অফলপ্রেপ্সুনা ফলং প্রেপ্সতীতি ফলপ্রেপ্সুঃ ফলতৃষ্ণঃ তদ্বিপরীতেন অফলপ্রেপ্সুনা কর্ত্রা কৃতং কর্ম্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে। ২৩।

ভাষ্যানুবাদ। অনন্তর কর্ম্ম ও যে ত্রিবিধ তাহাও বলিতেছেন—"নিয়ত" নিত্য, "সঙ্গরহিত" আসক্তি বর্জ্জিত, "অরাগদ্বেষতঃ কৃত" রাগ বা দ্বেষদ্বারা প্রেরিত হইয়া লোকে যে কর্ম্ম করে, তাহাই রাগ দ্বেষতঃকৃত, যে কর্ম্ম রাগ-দ্বেষতঃ কৃত নহে তাহাই অরাগ-দ্বেষতঃ কৃত, "অফলপ্রেপ্সু" যে ফল কামনা করে, অর্থাৎ ফলে যার তৃষ্ণা আছে, তাহাকে ফল-প্রেপ্সু বা ফলতৃষ্ণ কহে, যে ফল-প্রেপ্সু নহে তাহাকে অফলপ্রেপ্সু কহা যায়, সেই অফলপ্রেপ্সু ব্যক্তি যে কর্ম্ম করে সেই (পূর্ব্বোক্ত বিশেষণ যুক্ত) কর্ম্মকেই সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ২৩।

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়। যত্তু পুনঃ বহুলায়াসং কর্ম্ম কামেপ্সুনা সাহঙ্কারেণ বা ক্রিয়তে তৎ রাজসং উদাহৃতম্। ২৪।

মূলানুবাদ। ফলকামী অথবা অহঙ্কারী মানব বহুক্লেশকর যে কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাই রাজস কর্ম্ম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। ২৪।

ভাষ্য। যত্ত্বিতি। যত্তু কামেপ্সুনা ফলপ্রেপ্সুনা ইত্যর্থঃ, কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা সাহঙ্কারেণেতি ন তত্ত্বজ্ঞানাপেক্ষয়া, কিং তর্হি? লৌকিকশ্রোত্রিয়নিরহঙ্কারা-পেক্ষয়া যোহি পরমার্থনিরহঙ্কার আত্মবিৎ ন তস্য কামেপ্সুত্ববহুলায়াসকর্তৃত্ব-প্রাপ্তিরস্তি। সাত্ত্বিকস্যাপি কর্ম্মণঃ অনাত্মবিৎ সাহঙ্কারঃ কর্ত্তা, কিমুত রাজস তামসয়োঃ। লোকেঽনাত্মবিদপি শ্রোত্রিয়ঃ নিরহঙ্কার উচ্যতে, নিরহঙ্কারোঽয়ং ব্রাহ্মণ ইতি। তস্মাত্তদপেক্ষয়ৈব সাহঙ্কারেণ বা ইত্যুক্তং। পুনঃশব্দঃ পাদপূর-ণার্থঃ। ক্রিয়তে বহুলায়াসং—কর্ত্রা মহতা আয়াসেন নির্ব্বর্ত্ত্যতে, তৎকর্ম্ম রাজসমুদাহৃতম্। ২৪।

ভাষ্যানুবাদ। যত্তু ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। যে কর্ম্ম কিন্তু কামেপ্সু অর্থাৎ ফলকামী অথবা সাহঙ্কার জনকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়,—এই যে সাহঙ্কার বলা হইল, ইহা যে তত্ত্বজ্ঞানীকে অপেক্ষা করিয়া উক্ত হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু লৌকিক যে নিরহঙ্কার শ্রোত্রিয় তাহার, অপেক্ষায় সাহঙ্কার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ, যে ব্যক্তি পরমার্থ নিরহঙ্কার সুতরাং আত্মতত্ত্বজ্ঞ সে কামেপ্সু হইতে পারে না, এবং বহু ক্লেশদায়ক কর্ম্মও তাহার দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। অনাত্মবিদ্ যদি সাত্ত্বিক কর্ম্মেরও কর্ত্তা হয়, তাহা হইলেও সে

নিরহঙ্কার কর্ত্তাই হইয়া থাকে, রাজস বা তামস কর্ম্মের কর্ত্তা যে সাহঙ্কার কর্ত্তা হইবে, এ বিষয়ে আর অধিক বক্তব্য কি হইতে পারে? সংসারে আত্মতত্ত্বজ্ঞ না হইলেও, ব্রাহ্মণ যদি বিদ্যাদি গুণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাকেও নিরহঙ্কার বলা যায়, যেমন প্রায়ই লোকে বলিয়া থাকে, এই ব্রাহ্মণটী নিরহঙ্কার, সেই কারণে, সেই প্রকার নিরহঙ্কার শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে অপেক্ষা করিয়া এই শ্লোকে "সাহঙ্কারেণ" এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। পুনঃ শব্দটীর কোন অর্থ নাই, ইহা দ্বারা পাদপূরণ হইয়াছে মাত্র, এই প্রকার কর্ত্তা বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে,—সেই কর্ম্মই রাজস কর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ২৪।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে॥ ২৫॥

অন্বয়। অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাং পৌরুষং চ অনপেক্ষ্য মোহাৎ যৎ কর্ম্ম আরভ্যতে তৎ তামসমুচ্যতে। ২৫।

মূলানুবাদ। ফল, হানি, হিংসা ও নিজের সামর্থ্যকে অপেক্ষা না করিয়া, মোহ বশতঃ যে কার্য্য করা যায়, সেই কর্ম্মকে তামস কর্ম্ম কহা যায়। ২৫।

ভাষ্য। অনুবন্ধমিতি। অনুবন্ধং পশ্চাদ্ভাবি যদ্বস্তু সোঽনুবন্ধ উচ্যতে, তং চানুবন্ধং, ক্ষয়ং যস্মিন্ কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে শক্তিক্ষয়ঃ অর্থক্ষয়ো বা স্যাৎ তং ক্ষয়ং, হিংসাং প্রাণিপীড়ামনপেক্ষ্য চ, পৌরুষং পুরুষকারং, শক্নোমীদং কর্ম্ম সমাপয়িতুং ইত্যেবমাত্মসামর্থ্যং, ইত্যেতানি অনুবন্ধাদীনি অনপেক্ষ্য পৌরুষান্তানি মোহাদবিবেকতঃ আরভ্যতে কর্ম্ম যৎ তৎ তামসং তমোনির্বৃত্তং উচ্যতে। ২৫।

ভাষ্যানুবাদ। অনুবন্ধং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। যে বস্তু পরে হয় তাহাকে অনুবন্ধ কহা যায়, সেই অনুবন্ধকে,—যে কর্ম্ম করিলে শক্তি বা অর্থের ক্ষয় হইবে তাহাই এই স্থলে ক্ষয় শব্দের অর্থ,—সেই ক্ষয়কে, প্রাণিগণের পীড়াই হিংসা শব্দের অর্থ সেই হিংসাকে,—অপেক্ষা না করিয়া এবং "পৌরুষ" অর্থাৎ এই কার্য্য আমি সমাপন করিতে সমর্থ হইব, এই প্রকার সামর্থ্যরূপ পুরুষকারই পৌরুষ শব্দের অর্থ, সেই পৌরুষকেও অপেক্ষা না করিয়া, অর্থাৎ অনুবন্ধ হইতে পৌরুষ পর্য্যন্ত উক্ত কয়টী বস্তুর প্রতি একেবারে লক্ষ্য না করিয়া, "মোহ" অর্থাৎ অবিবেক বশতঃ যে কার্য্য করা যায় সেই কার্য্যকে "তামস" তমোগুণের পরিণাম কহা যায়। ২৫।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়। **মুক্তসঙ্গঃ অনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে।** ২৬।

মূলানুবাদ। আসক্তিশূন্য, নিরহঙ্কার, ধৈর্য্য ও উৎসাহযুক্ত, সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে নির্বিকার কর্ত্তাই সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ২৬।

ভাষ্য। মুক্তেতি। মুক্তঃ পরিত্যক্তঃ সঙ্গো যেন স মুক্তসঙ্গঃ, অনহংবাদী নাহংবদনশীলঃ, ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিতঃ—ধৃতিঃ ধারণমুৎসাহঃ উদ্যমঃ, তাভ্যাং সমন্বিতঃ সংযুক্তঃ ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ, সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ ক্রিয়মাণস্য কর্ম্মণঃ ফলসিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ, নির্ব্বিকারঃ কেবলং শাস্ত্র প্রমাণপ্রযুক্তঃ ন ফলরাগাদিনা যুক্তো যঃ স নির্ব্বিকারঃ উচ্যতে, এবংভূতঃ কর্ত্তা যঃ স সাত্ত্বিক উচ্যতে। ২৬।

ভাষ্যানুবাদ। মুক্ত ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। "মুক্তসঙ্গ" যে ব্যক্তি সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তিকে পরিত্যাগ করিয়াছে সেই মুক্তসঙ্গ, "অনহংবাদী" আমিই (কর্ত্তা) এই প্রকার বলা যাহার স্বভাব নহে সেই অনহংবাদী, "ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিত" ধৃতিশব্দের অর্থ ধারণ (সহিবার শক্তি) উৎসাহ শব্দের অর্থ উদ্যম যাহার ধীরতা ও উদ্যম আছে সেই ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিত, সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি এই উভয়েই যাহার চিত্ত বিকৃত হয় না অর্থাৎ শাস্ত্রে ইহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এইজন্য আমি এই কার্য্য করিব এই প্রকার বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া যে কার্য্য করে, কর্ম্মফলে তৃষ্ণাবশতঃ কার্য্য করে না, সেই ব্যক্তিই সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার হইয়া থাকে, এইরূপ গুণশালী যে কর্ত্তা সেই সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ২৬।

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়। **রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ লুব্ধঃ হিংসাত্মকঃ অশুচিঃ হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।** ২৭।

মূলানুবাদ। রাগী, কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, লোভযুক্ত, হিংসাপ্রকৃতি, অপবিত্র এবং হর্ষশোকযুক্ত (যে) কর্ত্তা (সে) রাজস (কর্ত্তা) বলিয়া (শাস্ত্রে) পরিকীর্ত্তিত হয়। ২৭।

ভাষ্য। রাগীতি। রাগী রাগোঽস্যাস্তীতি রাগী, কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ কর্ম্মফলার্থী, লুব্ধঃ পরদ্রব্যেষু সঞ্জাততৃষ্ণঃ তীর্থাদৌ চ স্বদ্রব্যাপরিত্যাগী, হিংসাত্মকঃ পরপীড়াস্বভাবঃ, অশুচিঃ বাহ্যান্তঃ শৌচ বর্জ্জিতঃ, হর্ষশোকান্বিতঃ ইষ্টপ্রাপ্তৌ হর্ষঃ অনিষ্টপ্রাপ্তৌ ইষ্টবিয়োগে চ শোকঃ, তাভ্যাং হর্ষশোকাভ্যাং অন্বিতঃ সংযুক্তঃ, তস্যৈব কর্ম্মণঃ সংপত্তিবিপত্ত্যোঃ হর্ষশোকৌ স্যাতাং তাভ্যাং সংযুক্তো যঃ কর্ত্তা স রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ২৭।

ভাষ্যানুবাদ। রাগী ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। যাহার রাগ (আসক্তি) আছে সেই রাগী, "কর্ম্মফলপ্রেপ্সু" যে কর্ম্মফলের প্রার্থনা করে সেই কর্ম্মফল প্রেপ্সু, "লুব্ধ" পরের দ্রব্য সমূহে যাহার তৃষ্ণা আছে অথবা তীর্থাদিতে যাই-যাও যে নিজ দ্রব্যদান করে না সেই লুব্ধ, "হিংসাত্মক" পরকে পীড়ন করাই যাহার স্বভাব সেই হিংসাত্মক, "অশুচি' বাহ্য এবং আন্তর এই দ্বিবিধ শৌচের মধ্যে একটীও যাহার নাই সেই অশুচি, "হর্ষশোকান্বিত' ইষ্ট প্রাপ্তিতে হর্ষ, এবং অনিষ্ট প্রাপ্তি বা ইষ্ট বস্তুর বিয়োগে শোক, এই উভয়টী যাহার আছে তাহাকেই হর্ষশোকসমন্বিত কহা যায়, সেই কর্ম্মেরই সংপূর্ণতা বা বিপত্তিতেও যাহার হর্ষ বা শোক হয় তাহাকেও হর্ষ শোকসমন্বিত কহা যায়, এইরূপ যে কর্ত্তা সেই রাজস (কর্ত্তা) বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। ২৭।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈকৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥ ২৮॥

অন্বয়। অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠঃ নৈকৃতিকঃ অলসঃ বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামসঃ উচ্যতে। ২৮।

মূলানুবাদ। চঞ্চল, মূর্খ, অনতিপর, শঠ, পরের বৃত্তিচ্ছেদকারী, অলস, বিষাদ পূর্ণ ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তাই তামস (কর্ত্তা) বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। ২৮।

ভাষ্য। অযুক্ত ইতি। অযুক্তঃ অসমাহিতঃ, প্রাকৃতঃ অত্যন্তাসংস্কৃতবুদ্ধিঃ বালসমঃ, স্তব্ধঃ দণ্ডবৎ ন নমতি কস্মৈচিৎ, শঠঃ মায়াবী শক্তি গূহনকারী, নৈষ্কৃতিকঃ পরবৃত্তিচ্ছেদনপরঃ, অলসঃ অপ্রবৃত্তিশীলঃ কর্ত্তব্যেষ্বপি, বিষাদী সর্ব্বদা অবসন্নস্বভাবো দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তব্যানাং দীর্ঘপ্রসারণঃ যদ্ অদ্য শ্বো বা কর্ত্তব্যং তন্মাসেনাপি ন করোতি। যশ্চৈবম্ভূতঃ কর্ত্তা স তামস উচ্যতে। ২৮।

ভাষ্যানুবাদ। অযুক্ত ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। "অযুক্ত" অসমাহিত, "প্রাকৃত" যাহার বুদ্ধি একেবারে অসংস্কৃত, অর্থাৎ যে বালকের তুল্য সেই প্রাকৃত,

"স্তব্ধ" দণ্ডের ন্যায়, কাহাকেও নমস্কার যে করে না সেই স্তব্ধ—"শঠ" মায়াবী অর্থাৎ নিজের শক্তিরও গোপন করিয়া থাকে যে, সেই শঠ, "নৈষ্কৃতিক" পরের বৃত্তি ছেদন যে করে সেই নৈকৃতিক, "বিষাদী" সর্ব্বদা অবসন্নস্বভাব, "দীর্ঘসূত্রী" কার্য্যকে প্রসারিত করে অর্থাৎ যে কার্য্যটী আজ বা কাল সমাপ্ত হইতে পারে তাহা একমাসেও যে করিয়া উঠিতে পারে না—সেই দীর্ঘসূত্রী, এইরূপ যে কর্ত্তা, সেই তামস কর্ত্তা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। ২৮।

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।

প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥

অন্বয়। হে ধনঞ্জয়। এবং বুদ্ধেঃ ধৃতেশ্চ গুণতস্ত্রিবিধং ভেদং পৃথক্ত্বেন অশেষেণ প্রোচ্যমাণং শৃণু। ২৯।

মূলানুবাদ। হে ধনঞ্জয়। এইরূপ গুণভেদ প্রযুক্ত বুদ্ধি এবং ধৃতির ও ত্রিবিধ ভেদ, যাহা আমি পৃথগ্‌ভাবে অশেষ প্রকারে বলিতেছি, তাহা তুমি শুন। ২৯।

ভাষ্য। বুদ্ধের্ভেদমিতি। বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব ভেদং গুণতঃ সত্ত্বাদি-গুণতঃ ত্রিবিধং শৃণু ইতি সূত্রোপন্যাসঃ। প্রোচ্যমানং কথ্যমানম্, অশেষেণ নিরবশেষতঃ যথাবৎ পৃথক্‌ত্বেন বিবেকতঃ, ধনঞ্জয় দিগ্বিজয়ে মানুষং দৈবং চ প্রভূতং ধনম্ অজয়ৎ তেনাসৌ ধনঞ্জয়োঽর্জ্জুনঃ। ২৯।

ভাষ্যানুবাদ। বুদ্ধি এবং ধৃতির ও সত্ত্বাদি গুণ বশতঃ ত্রিবিধ ভেদ শুন। (ভবিষ্যতে বিস্তার পূর্ব্বক বলিবার জন্য) সূত্রের ন্যায় সংক্ষেপে সূচনা করা যাইতেছে। "প্রোচ্যমান" অর্থাৎ যাহা আমি বলিতেছি, অশেষরূপে অর্থাৎ কিছু বাদ না দিয়া পৃথক্‌ত্বের সহিত অর্থাৎ বিবিক্ত ভাবে, হে ধনঞ্জয়, পূর্ব্ব কালে মানুষ এবং দৈব প্রভূত ধনকে অর্জ্জুন জয় করিয়াছিলেন এই জন্য অর্জ্জুনকে ধনঞ্জয় বলা যায়। ২৯।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।

বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্তিকী ॥ ৩০ ॥

অন্বয়। হে পার্থ যা বুদ্ধিঃ প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে বন্ধং মোক্ষং চ বেত্তি সা সাত্ত্বিকী। ৩০।

মূলানুবাদ। হে পার্থ! যে বুদ্ধি (-র দ্বারা মানুষ) প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য্য অকার্য্য, ভয়, অভয়, বন্ধ, এবং মোক্ষ জানিতে পারে, সেই বুদ্ধিই সাত্ত্বিকী। ৩০।

ভাষ্য। প্রবৃত্তিঞ্চেতি। প্রবৃত্তিং চ প্রবৃত্তিঃ প্রবর্ত্তনং বন্ধহেতুঃ কর্ম্মমার্গঃ, নিবৃত্তিং চ নিবৃত্তিঃ মোক্ষহেতুঃ সন্ন্যাসমার্গঃ, বন্ধমোক্ষসমানবাক্যত্বাৎ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তী কর্ম্মসন্ন্যাসমার্গৌ ইত্যবগম্যতে। কার্য্যাকার্য্যে বিহিতপ্রতিষিদ্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে করণাকরণে ইত্যেতৎ, কস্য দেশকালাদ্যপেক্ষয়া দৃষ্টাদৃষ্টার্থানাং কর্ম্মণাম্। ভয়াভয়ে বিভেত্যস্মাৎ ইতি ভয়ং, তদ্বিপরীতমভয়ং, ভয়ং চ অভয়ং চ ভয়াভয়ে, দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়য়োঃ ভয়াভয়য়োঃ কারণে ইত্যর্থঃ। বন্ধং সহেতুকং মোক্ষং চ সহেতুকং যা বেত্তি বিজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী। অত্র জ্ঞানং বুদ্ধেঃ বৃত্তিঃ, বুদ্ধিস্তু বৃত্তিমতী। ধৃতিরপি বৃত্তিবিশেষ এব বুদ্ধেঃ। ৩০।

ভাষ্যানুবাদ। প্রবৃত্তিং চ ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। "প্রবৃত্তি" প্রবর্ত্তন অর্থাৎ বন্ধের হেতু কর্ম্মমার্গই প্রবৃত্তি শব্দের অর্থ। "নিবৃত্তি" মোক্ষের কারণ সন্ন্যাস-মার্গই নিবৃত্তি শব্দের অর্থ। এই শ্লোকের একটী বাক্যের মধ্যেই যেহেতু বন্ধ ও মোক্ষের প্রযোগ রহিয়াছে, সেই জন্য প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুইটী শব্দের যথাক্রমে বন্ধ এবং মোক্ষ কারণ, অর্থাৎ কর্ম্মমার্গ এবং সন্ন্যাসমার্গ এই দুইটী অর্থ করা হইল। "কার্য্যাকার্য্যে" বিহিত সুতরাং কর্ত্তব্য, প্রতিষিদ্ধ সুতরাং অকর্ত্তব্য এই দ্বিবিধই কার্য্যাকার্য্য শব্দের অর্থ, (ফলতঃ) করা এবং না করা, ইহাই হইতেছে কার্য্যাকার্য্য শব্দের তাৎপর্য্যার্থ। কাহার? দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট ফলের হেতু, যে সকল কর্ম্ম তাহাদের দেশ ও কালের অপেক্ষায় করণ ও অকরণই (কার্য্যাকার্য্য শব্দের তাৎপর্য্যার্থ)। 'ভযাভয়' যাহা হইতে ভয় হয় তাহাই এখানে ভয় শব্দের অর্থ, তাহার বিপরীতই অভয়, ঐহিক এবং পারলৌকিক ভয় এবং অভয়ের কারণই এখানে ভয়াভয় শব্দের তাৎপর্য্যার্থ। "বন্ধ" অর্থাৎ কারণের সহিত বন্ধ এবং "মোক্ষ" অর্থাৎ সকারণমোক্ষ, এই বিষয় কয়টীকে যথাযথ ভাবে যে বুদ্ধি প্রকাশিত করে, হে পার্থ! তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। জ্ঞান বুদ্ধির বৃত্তি, জ্ঞান-রূপ বৃত্তি বুদ্ধিরই ধর্ম্ম, এই রূপ ধৃতিও বুদ্ধির বৃত্তিবিশেষ। ৩০।

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেবচ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থরাজসী॥ ৩১॥

অন্বয়। যয়া ধর্ম্মং অধর্ম্মং চ কার্য্যং অকার্য্যং এব চ অযথাবৎ প্রজানাতি হে পার্থ! সা বুদ্ধিঃ রাজসী। ৩১।

মূলানুবাদ। হে পার্থ যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কার্য্য ও অকার্য্যকে অযথা ভাবে বুঝিতে পারা যায়, সেই বুদ্ধিই রাজসী। ৩১।

ভাষ্য। যয়েতি। যয়া ধর্ম্মং শাস্ত্রচোদিতং অধর্ম্মং চ তৎপ্রতিষিদ্ধং কার্য্যং চাকার্য্যমেব চ পূর্ব্বোক্তে এব কার্য্যাকার্য্যে অযথাবৎ ন যথাবৎ সর্ব্বতো নির্ণয়েন ন প্রজানাতি, বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী। ৩১।

ভাষ্যানুবাদ। যয়া ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। "ধর্ম্ম" শাস্ত্র বিহিত, "অধর্ম্ম" শাস্ত্র প্রতিষিদ্ধ, এবং কার্য্য ও অকার্য্য, পূর্ব্ব শ্লোকে কার্য্য এবং অকার্য্য শব্দের যে অর্থকরা হইয়াছে এখানেও তাহাই (গ্রহণ করিতে হইবে), এই কয়টী বস্তুকে "অযথাবৎ" ঠিক ইহারা যে রূপ, সে ভাবে নহে, এই প্রকার অর্থে অযথাবৎ এই শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে নিশ্চিত ভাবে যে বুদ্ধির দ্বারা এই কয়টী বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে পারা যায় না, হে পার্থ সেই বুদ্ধিই রাজসী। ৩১।

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

অন্বয়। হে পার্থ তমসা আবৃতা যা বুদ্ধিঃ অধর্ম্মং ধর্ম্মং ইতি মন্যতে, তথা সর্ব্বার্থান্ বিপরীতান্ চ মন্যতে সা তামসী। ৩২।

মূলানুবাদ। হে পার্থ তমোগুণে আবৃত যে বুদ্ধি, অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশিত করে, এবং সকল পদার্থকেই বিপরীত ভাবে বুঝাইয়া থাকে, সেই বুদ্ধিই তামসী। ৩২।

ভাষ্য। অধর্ম্মমিতি। অধর্ম্মং প্রতিষিদ্ধং ধর্ম্মং বিহিতং ইতি যা মন্যতে জানাতি, তমসা আবৃতা সতী সর্ব্বার্থান্ সর্ব্বানেব জ্ঞেয়পদার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বিপরীতানেব বিজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী। ৩২।

ভাষ্যানুবাদ। অধর্ম্মং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। "অধর্ম্ম" অর্থাৎ প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মকে "ধর্ম্ম" অর্থাৎ বিহিত বলিয়া যে বুদ্ধি বিবেচনা করে—এবং তমো গুণের দ্বারা আবৃত হইয়া যে বুদ্ধি জগতে সকল প্রকার জ্ঞেয় বস্তুকে বিপরীত ভাবেই বুঝিয়া থাকে, হে পার্থ! সেই বুদ্ধিই তামসী বুদ্ধি। ৩২।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়। হে পার্থ! যোগেন অব্যভিচারিণ্যা যয়া (ধৃত্যা) মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়-ক্রিয়াঃ ধারয়তে সা সাত্ত্বিকী ধৃতিঃ। ৩৩।

মূলানুবাদ। হে পার্থ সমাধির নিত্য অনুগত যে ধৃতির দ্বারা মনঃ প্রাণ এবং ইন্দ্রিয় সমূহের ক্রিয়ানিবহকে ধারণ করা যায়, সেই ধৃতিই সাত্ত্বিকী। ৩৩।

ভাষ্য। ধৃত্যেতি। ধৃত্যা যয়া অব্যভিচারিণ্যা ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ধারয়তে কিং—মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়া মনশ্চ প্রাণাশ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ মনঃপ্রাণে-ন্দ্রিয়াণি, তেষাং ক্রিয়াশ্চেষ্টাঃ তা উচ্ছাস্ত্রমার্গ প্রবৃত্তেঃ ধারয়তি। ধৃত্যা হি ধার্য্যমাণা উচ্ছাস্ত্রবিষয়া ন ভবন্তি। যোগেন সমাধিনা অব্যভিচারিণ্যা নিত্যসমাধ্যনুগতয়া ইত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি অব্যভিচারিণ্যা ধৃত্যা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়া ধারয়-মাণঃ যোগেন ধারয়তীতি। যা এবং লক্ষণা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী। ৩৩।

ভাষ্যানুবাদ। ধৃত্যা ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। (তৃতীয় চরণের) "অব্যভি-চারিণ্যা" এই পদটী দূরবর্ত্তি হইলেও তাহারই সহিত "ধৃত্যা" এই পদটীর অন্বয় করিতে হইবে। যে ধৃতির দ্বারা ধারণ করে, তাহা কি? (তাহারি উপর হইতেছে যে) "মনঃ প্রাণেন্দ্রিয় ক্রিয়া" অর্থাৎ মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয় সমূহের "ক্রিয়া" চেষ্টা সমূহকে, (কাহা হইতে?) শাস্ত্রে যাহা প্রতিষিদ্ধ মার্গ, সেই মার্গে যে প্রবৃত্তি সেই প্রবৃত্তি হইতে, (ইহাই তাৎপর্য্যার্থ)। ধৃতির সাহায্যে নিবারিত হইয়া তাহারা প্রতিষিদ্ধ কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। যোগ এই শব্দটীর অর্থ সমাধি, সেই সমাধির সহিত সর্ব্বদা সংযুক্ত যে ধৃতি, তাহাই অব্যভিচারিণী ধৃতি। এই কথা বলা হইতেছে যে, যে অব্যভিচারিণী ধৃতির দ্বারা মনঃ প্রাণ এবং ইন্দ্রিয় নিচয়ের ধারণা করিলে, সাধক যোগের দ্বারা ধারণা করিতে সমর্থ হয়, হে পার্থ, সেই ধৃতিই সাত্ত্বিকী ধৃতি। ৩৩।

যযাতু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যাধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়। হে পার্থ অর্জ্জুন। প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী যয়া ধৃত্যা ধর্ম্মকামার্থান্ ধারয়তে সা রাজসী ধৃতিঃ। ৩৪।

মূলানুবাদ। আসক্তি বশতঃ ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া যে ধৃতি দ্বারা ধর্ম্ম কাম এবং অর্থকে ধারণ করে সেই ধৃতি রাজসী। ৩৪।

ভাষ্য। যয়া ইতি। যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান ধর্ম্মশ্চ কামশ্চ অর্থশ্চ ধর্ম্ম-কামার্থাস্তান্ ধর্ম্মকামার্থান্, ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনসি নিত্যকর্ত্তব্যরূপান্ অবধারয়তে

হে অর্জ্জুন প্রসঙ্গেন যস্য যস্য ধর্ম্মাদেঃ ধারণপ্রসঙ্গস্তেন তেন প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী চ ভবতি যঃ পুরুষঃ তস্য ধৃতিঃ যা সা পার্থ রাজসী। ৩৪।

ভাষ্যানুবাদ। যয়া ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। যে ধৃতির দ্বারা "ধর্ম্মকামার্থ" ধর্ম্ম কাম এবং অর্থকে ধারণ করে, অর্থাৎ ইহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য এই প্রকারে মনের মধ্যে নিশ্চয় করিয়া রাখে। (যখন যখন) যে ধর্ম্ম কাম বা অর্থের ধারণ করে, সেই সেই প্রসঙ্গে তাহার ফল ভোগও ঐ ধৃতির দ্বারা প্রেরিত হইয়া পুরুষ কামনা করে, সেই ধৃতিই হে পার্থ অর্জ্জুন রাজসী ধৃতি। ৩৪।

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা॥ ৩৫॥

অন্বয়। দুর্ম্মেধাঃ যযা স্বপ্নং ভযং শোকং বিষাদং মদং এব চ ন বিমুঞ্চতি সা তামসী ধৃতির্ম্মতা। ৩৫।

মূলানুবাদ। দুর্ম্মেধা ব্যক্তি যে ধৃতির বশে নিদ্রা, ভয, শোক, বিষাদ এবং মদকে ছাড়িতে পারে না, সেই ধৃতিই তামসী বলিযা বিবেচিত হয়। ৩৫।

ভাষ্য। যয়েতি। যয়া স্বপ্নং নিদ্রাং ভযং ত্রাসং শোকং বিষাদং অবসাদং বিষণ্ণতাং মদং বিষযসেবাং আত্মনো বহুমন্যমানঃ মত্ত ইব মদমেব চ মনসি নিত্যমেব কর্ত্তব্যরূপতয়া কুর্ব্বন্ ন বিমুঞ্চতি ধারযত্যেব দুর্ম্মেধাঃ কুৎসিতমেধাঃ পুরুষঃ যস্তস্য ধৃতির্যা সা তামসী মতা। ৩৫।

ভাষ্যানুবাদ। যযা ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। "স্বপ্ন" নিদ্রা, "ভয়" ত্রাস, শোক, "বিষাদ" অবসাদ অর্থাৎ বিষণ্ণতা "মদ" নিজের বিষয়সেবাকে শ্লাঘনীয় বিবেচনা করিতে করিতে লোক মত্তের ন্যায যে মনোবৃত্তি-বিশেষের অনুভব করে, এবং দুর্ম্মেধা ব্যক্তি যাহাকে সর্ব্বদা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করে, এবং পরিত্যাগ করিতে চাহে না, তাহাই মদ; এই সকল নিদ্রাদি দোষকে যাহার দ্বারা ধারণ করে, তাহাই তামসী ধৃতি বলিয়া অভিমত। ৩৫।

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি॥ ৩৬॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥ ৩৭॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত।

শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্] [পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

অধর চন্দ্র সেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, আহিরীটোলায় বাড়ী, সেজন্য দেবেন্দ্র নাথের ঐ নাম অবিদিত ছিল না। অধর চন্দ্রের নাম শুনিয়া দেবেন্দ্র ভাবিলেন, "বটে, তবে বড় বড় লোকও এখানে আসে—দেখ্‌ছি।" দেবেন্দ্র দেখিলেন, রামকৃষ্ণদেবের দেহ স্ত্রীলোকের ন্যায় কোমল, আর তাঁহার অন্তরটী বালকের মত সরল। দেবেন্দ্রের চক্ষে রামকৃষ্ণদেব যেন স্ত্রীলোকের দেহে বালকের মন—এইরূপ এক অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল! ভাবিলেন, "ইনি যেন আমায় বাক্‌-সিদ্ধ পেলেন; আমি বোলেছি বোলেই হাত আরাম হয়ে যাবে এঁর বিশ্বাস! এত সরল বিশ্বাস মানুষে হতে পারে।" আবার মনে হইল, "হয়ত এ সমস্ত লোক দেখান ঢঙ্।" ঐরূপ সন্দেহ করিয়া তিনি রামকৃষ্ণদেবের দিকে অনেকবার তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু সে সরল বালকের মত অমায়িক ব্যবহারের সম্মুখে সমস্ত সন্দেহ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কথায় কথায় রামকৃষ্ণদেব 'ভগবৎ-প্রেম কি' তাহা দেবেন্দ্র ও উপস্থিত আর দুই এক জন ভক্তকে বুঝাইতে লাগিলেন, বলিলেন, "দেখ, প্রেম কারে বলে জান? যখন ভগবানের নামে সমস্ত জগৎ ভুল হয়ে যাবে, আপনাকে ভুল হয়ে যাবে। ঝড় উঠ্‌লে যেমন গাছ পালা আর চেনা যায় না, সব এক রকম দেখায়, তেমনি ভগবৎ-প্রেমের উদয় হলে সব ভেদ-বুদ্ধি চলে যায়।" এই কথা বলিয়া হরিশকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ্, এঁকে কিছু জল খাবার দে।" হরিশের ভাব দেখিয়া দেবেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। হরিশের মুখে কথা নাই। যেন প্রাণ মন এক করিয়া রামকৃষ্ণদেবের প্রতি তাকাইয়া রহিয়াছে ও তাঁহার কথামৃত পান করিতেছে, আর রামকৃষ্ণদেব যখনি যে কার্য্য করিতে বলিতেছেন, কলের পুতুলের মত তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে সম্পন্ন করিতেছে! হরিশ প্রভু আজ্ঞা প্রাপ্ত মাত্রে এক হস্তে একটী সন্দেশ অপর হস্তে একটী পাত্র জল আনিয়া দেবেন্দ্রের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন; মুখে কিন্তু কোন কথাই বলেন না। দেবেন্দ্র মুস্কিলে পড়িলেন; বিনা আহ্বানে কেমন করিয়া উহা হরিশের হাত থেকে লয়েন! সেটা সামাজিক ও শিষ্টাচার নীতি বিরুদ্ধ বলিয়া মনে সংস্কার আছে। হরিশ কিন্তু সন্দেশ ও জলের

গেলাস হস্তে পূর্ব্ববৎ স্থাণুর ন্যায় দণ্ডায়মান। অগত্যা দেবেন্দ্রই হরিশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই এ কি আমার জন্যে এনেছেন?" হরিশ পূর্ব্ববৎ নির্ব্বাকই রহিলেন, কেবলমাত্র হস্তদ্বয় দেবেন্দ্রের দিকে আরও একটু অগ্রসর করিলেন। দেবেন্দ্র আর কি করেন, হরিশের হাত হইতে উহা লইয়া জলযোগ করিলেন। তৎপরে পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার সুমিষ্ট বাক্যালাপ শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার কথাগুলি যেন স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কোন বিষয়ে তর্ক যুক্তি করিবার দেবেন্দ্রের স্পৃহাও হইল না। রামকৃষ্ণদেবের নিকট অবস্থানই মহা শান্তিপ্রদ বোধ করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রের রামকৃষ্ণদেবকে দেখিতে ও তাঁহার কথা শুনিতে বড়ই ভাল লাগিতে লাগিল। মনে হইল, এমন কথা আর কখনও শুনেন নাই। সে কথা ভুলিবার যো নাই এবং তাহার মর্ম্ম বুঝিতেও বিলম্ব হয় না। বিশ্বাস না হইলেও সে কথা প্রাণে বাজিতে থাকে। আর রামকৃষ্ণদেবের চেহারায় কি একটী অনির্ব্বচনীয়ত্ব রহিয়াছে। উহা তাঁহার সৌন্দর্য্যে নাই, গঠনে নাই, মন ভুলান গৌরবর্ণে নাই; তথাপি সেটুকু এ সমস্ত অপেক্ষা বেশী আকর্ষক—ফিরিয়া ফিরিয়া তাঁহার প্রতি তাকাইতে হয়।

কতকক্ষণ এইরূপে কাটিলে, রামকৃষ্ণদেব কথায় কথায় বলিলেন, "দেখ, এখানে অনেক ভাল ভাল ব্রাহ্মণে খায়। ঠাকুর বাড়ী, ঠাকুরের প্রসাদ খাবার আপত্তি কিছু নেই। তুমি এখানে খাও, বেলা হয়েছে, এখন আর যেও না।" এই বলিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে এঁকে বিষ্ণু-ঘরের প্রসাদ দিস্।" শুনিয়া দেবেন্দ্র ভাবিলেন, তিনি যে নিরামিষাশী, রামকৃষ্ণদেব সে কথা কেমন করিয়া জানিলেন? ইনি কি অন্তরের কথাও জানিতে পারেন?

দেবেন্দ্র সে দিন আর স্নান করিলেন না, রামলালের সহিত আহার করিতে গেলেন। আহার করিতে বসিয়া রামলালের সহিত রামকৃষ্ণদেবেরই কথা কহিতে লাগিলেন। আহারান্তে একটু বিশ্রামের জন্য উত্তরের বারাণ্ডায় শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু দেবেন্দ্রের মনে সেদিন আর কোন চিন্তাই স্থান পাইল না, তিনি রামলালের নিকট রামকৃষ্ণদেবের সমস্ত সংবাদ লইতে লাগিলেন। তিনি যেন কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব স্বপ্ন-রাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

একটু বিশ্রামের পর আবার রামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দেখিবামাত্র কহিলেন, "তোমার কি কোন অসুখ বোধ হয়েছে, এ রকম দেখ্‌ছি কেন?"

দেবেন্দ্রের যেন চমক ভাঙ্গিল। সত্য সত্যই তিনি অসুস্থ হইয়াছেন, কিন্তু বুঝিতে পারিতেছিলেন না। প্রায় তিন মাস কাল আর ম্যালেরিয়া জ্বরগ্রস্ত হন নাই, অদ্য কিন্তু আবার সেই জ্বর হইয়াছে, পাঁজরটায় একটা বেদনা করিতেছে। দেবেন্দ্র কহিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু জ্বর হয়েছে—মনে হচ্ছে।"

শুনিয়া, রামকৃষ্ণদেবের মুখমণ্ডলে সদা-বিরাজমান আনন্দের ভাব একেবারে অন্তর্হিত হইল, অতীব ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "অ্যাঁ, তোমার কি জ্বর হয় না কি?"

দেবেন্দ্র। "আজ্ঞে, আগে অনেক দিন ম্যালেরিয়ায় ভুগেছি। তিন মাস হল জ্বর হয়নি, ভাল ছিলুম। আজ আবার সেই জ্বর হয়েছে।"

রামকৃষ্ণদেবের মুখমণ্ডল আরও চিন্তামগ্ন হইল। তিনি "তাইত, তাইত" বলিয়া ঘরের মধ্যে পদ চারণ করিতে লাগিলেন, যেন কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। ইতিমধ্যে পূর্ব্ব কথিত 'ভক্ত' * আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ও রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "—এসেছিস্, বেশ হয়েছে, দেখ্, ইনি কোলকেতা থেকে এসেছেন, বড় ভাল লোক। এঁর জ্বর হয়েছে, বাড়ী যাবেন। তা একলা কেমন কোরে যাবেন; তুই এঁকে (অতি ব্যগ্রতাব্যঞ্জক স্বরে) এক খানা নৌক কোরে, এঁর বাড়ী পৌছে দে।" প্রভুর আজ্ঞা ভক্তের শিরোধার্য্য। ভক্ত কত আশা করিয়া আসিয়াছেন—প্রভুর সঙ্গে কথা কহিয়া, প্রভুর পদ সেবা করিয়া—পরিতৃপ্ত হইবেন। এখন প্রভুর আজ্ঞা অন্যরূপ হইলেও, সানন্দ-চিত্তে তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া, তৎক্ষণাৎ গঙ্গার তীরে নৌকার চেষ্টায় দণ্ডায়মান হইলেন, রামকৃষ্ণদেবও পশ্চিমের দ্বার খুলিয়া, দ্বারে দাঁড়াইয়া, নৌকা দেখিতে লাগিলেন। পান্সি দৃষ্টিগোচর হইল না। রামকৃষ্ণদেব দূরে একখানি বাঙাল মাঝীর টাপুরে নৌকা দেখিতে পাইয়া, ভক্তকে ঐ নৌকা ডাকিতে কহিলেন। ভক্ত চীৎকার করিয়া, উত্তরীয় নাড়িয়া, মাঝীকে ইঙ্গিৎ করিলে, মাঝী নৌকা ফিরাইয়া ঘাটের দিকে আসিতে লাগিল। ভক্ত দেবেন্দ্রকে লইতে ঘরের ভিতর আসিলেন। রামকৃষ্ণদেব মধুর হাস্যবদনে ভক্তের হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "দেখ্, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে, তুই আজ যা, এঁকে এঁর বাড়ী পৌছে দে, তখন আর

* ইনি রামকৃষ্ণদেবের জনৈক আহুত ভক্ত। ইঁহার আজ্ঞামত নামোল্লেখ করা হইল না। 'ভক্ত' বলিলেই, পাঠক, ইঁহাকেই জানিবেন।

একদিন আসিস্, তোর সঙ্গে অনেক কথা কইব।" দেবেন্দ্র রামকৃষ্ণদেবের পদধূলি লইয়া, নৌকারোহণ করিতে গেলেন। রামকৃষ্ণদেব সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া কহিলেন, "দেখ, ঘরে গিয়ে একজন ভাল ডাক্তার দেখাইও। আর আরাম হলে আবার এসো, আবার আসবে ত?" দেবেন্দ্র কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ।" ভক্তও তাঁহার পদধূলি লইয়া নৌকায় উঠিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিলেন, "আর একদিন আসিস্, অনেক কথা আছে।"

পাঁজবার বিষম বেদনা, জ্বরও তেমনি জোরে আসিল। নৌকায় বসিয়া তথাপি দেবেন্দ্র রামকৃষ্ণদেবের কথাই কহিতে লাগিলেন, আর মধ্যে মধ্যে গঙ্গা হইতে জল লইয়া বেদনা স্থানে দিতে লাগিলেন। আহিরীটোলার ঘাটে আসিয়া দেবেন্দ্র ভক্তকে কহিলেন, "আমি বাড়ী আপনি যেতে পারব, আপনি যান, কেন আর আমার সঙ্গে কষ্ট কোরে আসবেন।"

ভক্ত কহিলেন, "সে কি মশাই, জ্বর অবস্থায় আপনি একলা কেমন কোরে যাবেন? আমার কোন কষ্ট হবে না, চলুন।"

দেবেন্দ্র একেবারে নাছোড় হইয়া কহিলেন, "না মশাই আমার এইখানেই একজন আত্মীয়ের বাড়ী আছে, আমি সেইখানেই যাব। আপনি আর কষ্ট করবেন না। আপনাকে ঢের কষ্ট দিয়েছি, আর কষ্ট দেব না। আমি আপনি বেশ যাব এখন। আপনি যান, বাড়ী যান।" এই বলিয়া দেবেন্দ্র যেন নেশাগ্রস্ত হইয়া, ভক্তের হাত ছিনাইয়া, দ্রুতপদে উক্ত আত্মীয়ের আলয়ে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের বৈঠকখানায় বসিলেন, এবং একজনকে কহিলেন, "আমার বড় জ্বর হয়েছে, পাঁজরায় বিষম বেদনা, আর কথা কইতে পারছিনি। তোমরা একখানা পালকি ডেকে দেও, আমি বাসায় যাব।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া দেবেন্দ্র জ্বরে ও বেদনায় অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। একচল্লিশ দিন পরে তাঁহার পুনরায় জ্ঞান আসিল, দেখিলেন, তিনি নিজ আবাসে নহেন, তাঁহার সেই আত্মীয়ের আলয়েই আছেন। জ্বরের অচৈতন্য অবস্থায় তিনি কেবল বলিয়াছেন, "ঠাকুর বাড়ীতে শৌচপ্রস্রাব করা হচ্ছে, ভাল হচ্ছে না।" আর মধ্যে মধ্যে পরমহংসদেবের কথা কহিয়াছেন। এই কথা তাঁহার আত্মীয়েরা বলিলেন। তখন দেবেন্দ্রের পুরাতন স্বপ্ন স্মৃতিবৎ মনে পড়িল; অসুস্থাবস্থায় যখনি যন্ত্রনায় চক্ষু খুলিয়াছেন, তখনি শিয়রে রামকৃষ্ণদেবকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। আরোগ্য লাভ করিয়া ভাবিলেন, 'ও সমস্ত মস্তিষ্কের খেয়াল।' নিজ আবাসে প্রত্যাগমন করিয়া ভাবিলেন, "লোকের সাধু দর্শনে

মঙ্গল হয় ; এ কি বাবা, প্রাণ নিয়ে টানাটানি! ঢের হয়েছে, আর ওমুখো নয় ; সাধু আছেন, আমার মাথায় থাকুন!"

ক্রমশঃ।

ভারতীয় জীবন সমস্যা।

শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়] [পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

ভারতের দীনদরিদ্রগণের সম্বন্ধে স্বামীজি কি বলিয়াছেন, শুনুন—

'ভারতবর্ষে আমরা গরিবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের, কি ভাবিয়া থাকি। তাহাদের কোন উপায় নাই ; পলাইবার কোন রাস্তা নাই, উঠিবার কোন উপায় নাই। ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপীগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। যে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই। তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর যে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে, তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না, কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে। তাহারা যে মানুষ, ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল—দাসত্ব ও পশুত্ব।'

—পত্রাবলি।

আমাদের সম্মুখে যে সমস্ত কার্য্য উপস্থিত, তাহা অতি কঠিন হইলেও আমাদিগকেই উহা করিতে হইবে, আমরা এই জন্যই বর্ত্তমান মহা সমন্বয়ের যুগে জন্মিয়াছি, ঐ শুনুন, কর্ম্মবীর স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

'যাও, এই মুহূর্ত্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি দীন দরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি রামাবতারে গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধ অবতারে, রাজপুরুষদের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও, এবং তাঁহার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর। বলি—জীবন বলি—তাহাদের জন্য, যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসেন, সেই দীন দরিদ্র পতিত

উৎপীড়িতদের জন্য। তোমাদের সারাজীবন এই ত্রিশকোটী ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য, ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।'

—পত্রাবলী।

আবার বলিতেছেন—

'তবে এস ভ্রাতৃগণ। স্পষ্ট করিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখ, কি ভয়ানক দুঃখ-রাশি ভারত ব্যাপিয়া। এ ব্রত গুরুতর, আমরাও ক্ষুদ্র শক্তি। তা হউক, আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। ভগবানের মহিমা ঘোষিত হউক। আমরা সিদ্ধিলাভ করিবই করিব। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে, আবার শত শত লোক উঠিবে। প্রভুর জয়। তোমরা রোগ কি বুঝিলে, ঔষধও কি তাহা জানিলে, এখন বিশ্বাসী হও। বিশ্বাস, বিশ্বাস, অগ্নিময় বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু। অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও —সম্মুখে, সম্মুখে। এইরূপেই আমরা অগ্রগামী হইব—একজন পড়িবে, আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে।'

—পত্রাবলী।

সত্ত্বের দোহাই দিয়া আমাদের দেশ যেরূপ ঘোর তমঃপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে রজোগুণ ও মহাকর্ম্মপ্রাণতা ভিন্ন আমাদের মঙ্গল নাই। স্বামীজি এই কথা বারবার আমাদিগকে বলিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন, 'কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম। কর্ম্ম ভিন্ন তোদের ইহকালও নাই, পরকালও নাই'। যাঁহারা ভক্তি বা যোগ পথের পথিক, তাঁহাদিগকেও কর্ম্ম করিতে হয়, বস্তুতঃ জ্ঞানলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক-কেই কোন না কোন রূপ কর্ম্ম করিতে হয়। ভক্তের কর্ম্ম—পূজা, স্তব, বন্দনা প্রভৃতি দ্বারা নিজ ইষ্টের প্রতি নিয়োজিত হইয়া থাকে, যোগীর—আসন, প্রাণায়া-মাদির দ্বারা আত্মানুভূতি কল্পে প্রযুক্ত হয়; কর্ম্মযোগীর কর্ম্ম—সেবাদি দ্বারা সর্ব্বভূতে অবস্থিত বিরাট্ পুরুষের প্রতি নিযুক্ত হইয়া থাকে। কে কোন্ ভাবে ভগবানের পূজা করিবে—ইষ্ট পূজা, আত্মসাক্ষাৎকার অথবা সর্ব্বভূতে অবস্থিত নারায়ণের সেবা দ্বারা—ইহা অবশ্য প্রত্যেকের নিজের নিজের বিবেচ্য। কিন্তু দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের আর্ত্তনাদে, পিতৃমাতৃহীন ও বিধবার ক্রন্দনে, ব্যাধিগ্রস্ত অসহায়ের হাহাকারের মধ্যে স্থির থাকিয়া, কেহ বিগ্রহ পূজা বা প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে পারেন কি? যদি পারেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই স্বভাবতঃ

ভক্ত বা যোগী। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের কোন দুঃখ, কষ্ট বা অভাব হইলে অস্থির হয়, অথচ অপরের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, তাহার ভক্তি বা যোগনিষ্ঠা সন্দেহের বিষয় নয় কি? ঐ দেখ, লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরিতেছে; ঐ শোন, সহস্র সহস্র পীড়িতের হাহাকারে গগণ বিদীর্ণ হইতেছে; ঐ দেখ, কত বিধবা ও পিতৃমাতৃহীনের নয়নাশ্রু প্রবাহিত হইয়া পৃথ্বীতল ধৌত করিতেছে; এক্ষণে আর হরি বলিয়া অশ্রু পুলকাদি প্রকাশের বা গৃহদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া প্রাণায়াম অভ্যাসের অবসর কোথায়? ঐ শোন, বর্ত্তমান ভারতের আচার্য্য-প্রবর, বেদান্ত-সিংহনাদে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন; —সত্বর হও, বিলম্ব করিও না—কর্ম্ম দ্বারা ভগবৎ পূজার জন্য অগ্রসর হও। ঐ শোন, কর্ম্মবীরের হৃদয়োন্মাদিনী বীরবাণী—'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত', 'Arise, awake and stop not till the goal is reached.'—ঐ শোন, তিনি আবার কি বলিতেছেন—"ঐ দেখ, তোমার অস্থি-মাংস-স্বরূপ ভারতবাসী, অন্নাভাবে কালের করাল কবলে পতিত হইয়া, তোমার দুর্ব্বলতা ও স্বার্থপরতাকে ধিক্কার দিতেছে। পুরুষ দেহ পাইয়া জন্মিয়াছ, পুরুষোচিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, বীরের ন্যায় কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও। অগ্রসর হও, পশ্চাৎপদ হইও না, ভীত হইও না, অনন্ত শক্তি তোমার পশ্চাতে; নিজের ক্ষুদ্রতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া, মহাশক্তির প্রবাহে গা ঢালিয়া দাও। পার্থসারথির কথা স্মরণ কর—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ,' 'ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ','নিমিত্ত-মাত্রং ভব সব্যসাচিন্।' 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—শ্রুতির কথা স্মরণ করিয়া muscles of iron and nerves of steel' লইয়া কার্য্যে আসিয়া নাম। বৃথা আত্মসন্দেহে বিচলিত হইও না।"

ঐ শোন স্বামীজির জীবনবেদ—

"বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্দ্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মত, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায,
ধর্ম্মতরে করি কতমত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়,
নদীতীর পর্ব্বতগহ্বর; ভিক্ষাশনে কত কাল যায়।
অসহায় ছিন্নবাস ধরে, দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে, কি ধন করিনু উপার্জ্জন?
শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ আকুল ভবঘোর, একতরি করে পারাপার—

—মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ নিয়মন, মতামত, দর্শন বিজ্ঞান,
ত্যাগ, ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম, 'প্রেম' 'প্রেম'—এই মাত্র ধন।

*　　*　　*　　*

ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়,।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

—বীরবাণী।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, দুর্ভিক্ষ মোচন, আতুরের শুশ্রূষা, দীন দরিদ্রের সেবা প্রভৃতি কর্ম্মের এমন কি প্রয়োজন—ইহা অপেক্ষা কি কিছু শ্রেষ্ঠ নাই? সত্ত্বগুণ কি মহাশক্তি-সঞ্চারক নহে? উত্তর এই যে, সত্ত্বগুণ রজঃ অপেক্ষা অধিক শক্তি-সঞ্চারক সন্দেহ নাই, কিন্তু বর্ত্তমান ভারতে বা জগতে কয়জন সত্ত্বগুণ লাভে সক্ষম হয়? স্বামীজি বলিয়াছেন—

'সে মহা বীরত্ব কয়জনের আছে যে, নির্ম্মম হইয়া সর্ব্বত্যাগী হয়? সে দূরদৃষ্টি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সে বিশাল হৃদয় কোথায়, যাহা সৌন্দর্য্য ও মহিমা চিন্তায় নিজ শরীর পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়? যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায়, তাঁহারা মুষ্টিমেয়। এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য, কোটী কোটী নরনারীকে সামাজিক আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে? এ পেষণেরই বা কি ফল? দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণ সমুদ্রে ডুবিয়া গেল।'

—ভাব্‌বার কথা।

মহারজোগুণ রূপ ক্ষত্রিয় শক্তির মধ্যে দিয়া না গেলে, সত্ত্বরূপ ব্রাহ্মণ-শক্তি লাভ করা তমঃ প্রধান ব্যক্তির পক্ষে, অতীব দুষ্কর। 'হেলে ধর্‌তে পারে না, কেউটে ধর্‌তে সাধ'—ক্ষত্রিয় শক্তিই লাভ কর্‌তে পারে না, তা আবার ব্রাহ্মণ হ'তে চায়! ভারতীয় বৈদান্তিক জ্ঞান ও ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায়, আধ্যাত্মিকতা প্রায় অন্তর্হিত; দুর্ব্বল, পিতৃমাতৃহীন ও বিধবা প্রবল আত্মীয় বা প্রতিবেশী কর্ত্তৃক উৎপীড়িত; দরিদ্র, সমাজের উচ্চশ্রেণী কর্ত্তৃক পদদলিত; কৃষক, নিজ পরিশ্রম লব্ধ অন্ন জমীদার প্রভৃতির বিলাসোপকরণ সংগ্রহার্থ প্রদান করিতে বাধ্য হইয়া, অর্দ্ধাশনে

মৃতপ্রায়, কখনও বা অনশনে মৃত—ইহা দেখিয়াও কর্ম্মই যে যুগধর্ম্ম, তাহা বুঝিতে কি আর বাকী থাকে? স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ স্মরণ কর; তাঁহার মতে সত্ত্বগুণ এখনও বহুদূরে, দেশ তমঃ দ্বারা আচ্ছন্ন এবং এই তমঃ অপসারিত করিতে হইলে, রজঃকে অবলম্বন করিতে হইবে। দুর্ভিক্ষ মোচনাদি কর্ম্মদ্বারা এদেশে এই রজোগুণকে উদ্যম, আত্মনির্ভর, স্বাধীনতা-প্রিয়তা, ধৈর্য্য ও কার্য্যকারিতা-রূপে প্রবাহিত করিতে হইবে—একমাত্র ইহারই উপর সমাজের সাধারণের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে।

শ্রীভগবান্ স্বয়ং আমাদের পথপ্রদর্শক ও নেতা—তবে কেন বৃথা আত্ম-সন্দেহ করি কেন বৃথা ভীত হই। ভারতবর্ষের যিনি ঈশ্বর, তাঁহার কথা স্মরণ কর, তিনি বলিয়াছেন,—

'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥'

—গীতা।

বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মের যেরূপ গ্লানি দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বে কখনও এরূপ হয় নাই, সুতরাং এখন যদি তিনি অবতীর্ণ না হন, তাঁহার কথা মিথ্যা হইবে। কিন্তু তাঁহার কথা মিথ্যা হইবার নয়—তিনি বাস্তবিকই আবার অবতীর্ণ হইয়াছেন। দেশব্যাপী নব জাগরণই তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে। মৃতপ্রায় নিদ্রিত জাতি এখন আর অসাড় নয়, নড়িতে আরম্ভ করিয়াছে—শীঘ্র সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইবে, সন্দেহ নাই। চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সময়ের লক্ষণ—signs of the time—পর্য্যবেক্ষণ কর; বুঝিতে পারিবে, তিনি আসিয়াছেন কি না। রাজনীতি ক্ষেত্রে থাকিয়া, যাঁহারা এতদিন কেবল রাজ-নীতি লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, এখন তাঁহারা ক্রমে অন্যরূপ বুঝিতেছেন। ধর্ম্মই যে আমাদের জাতীয় মেরুদণ্ড, তাহা তাঁহারা এক্ষণে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তৃতা, সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও রচিত পুস্তকাদি হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাও বুঝিতেছেন যে, ভারতের ভগবান আবার ভারতে অবতীর্ণ। কোন এক বিখ্যাত পত্রিকায়, সম্পাদকীয় মন্তব্যে, কিছুকাল হইল, এইরূপ অভিমত প্রকাশিত হইয়াছিল—

'Sri Ramakrishna came to begin the consummation of the work of the previous heroes, and all the development of the previous two thousand years and more, since Buddha appeared, has been a preparation for the harmonization of spiritual teaching and experience by the *avatar* of Dakshineshwar' অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের অবতার বা অবতার-প্রতিম পুরুষদিগের প্রারব্ধিত কার্য্যকলাপ সমষ্টিভূত করিয়া পূর্ণতা সম্পাদনের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। বুদ্ধের আবির্ভাবকাল হইতে গণনা করিয়া, গত দুই সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া, যে ধর্মাভিব্যক্তি এবং উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাহা, সকল মহাত্মার সকল অধ্যাত্মানুভূতি এবং শিক্ষা সমূহের ঐকতানতা সম্পাদন রূপ কার্য্যের অভ্যুদয়োদ্দেশেই হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভূত অবতারই ঐ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

জগতের পূর্ব্বতন অবতারগণের সহিত বর্ত্তমান যুগাবতারের তুলনা করিয়া, ঐ প্রবন্ধের আর একস্থানে লিখিত হইয়াছিল—

'Of all these souls, Sri Ramakrishna was the last and greatest, for while others felt God in a single or limited aspect, He felt Him in His illimitable unity as the sum of an illimitable variety. In Him, the spiritual experiences of the millions of saints, who had gone before, were renewed and united. Sri Ramakrishna gave to India, the final message of Hinduism to the world A new era dates from His birth; an era in which the peoples of the earth, will be lifted for a while into communion with God, and spirituality become the dominant note of human life What Christianity failed to do, what Mahomedanism strove to accomplish in times as yet unripe, what Buddhism half accomplished for a brief period, and among a limited number of men, Hinduism, as summed up in the life of Sri Ramakrishna, has to attempt to all the world. This is the reason of India's resurgence, this is why God has breathed life into Her once more, why

great souls are at work to bring about Her salvation, why a sudden change is coming over the hearts of Her sons.'

অর্থাৎ সর্ব্বশেষে আবির্ভূত শ্রীরামকৃষ্ণই অবতার সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ, অন্য সকলে শ্রীভগবানের একদেশী ভাব-বিশেষ মাত্রই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, আর ইনি তাঁহাকে অনন্তভাবের অনন্ত সমষ্টি স্বরূপে দর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সকল সাধু মহাত্মাদিগের ভিন্ন ভিন্ন ভগবদনুভূতি, শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে পুনরুজ্জীবিত হইয়া, একত্র সম্মিলিত হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্ম জগতকে যে চরম ধর্ম্মালোক প্রদান করিবে, তিনি তাহাই ভারতে আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবের দিন হইতে জগতে নবযুগের প্রারম্ভ। এই যুগে পৃথিবীর যাবতীয় লোক, কিছুকালের জন্য ভাবরাজ্যে উত্তোলিত হইয়া, ভগবন্নৈকট্য বিশেষরূপে অনুভব করিবে এবং অধ্যাত্মভাবই মনুষ্য জীবনের প্রধান নিয়ামক হইবে। খৃষ্টধর্ম্ম যাহা করিতে পারে নাই, মহম্মদীয় ধর্ম্ম যাহা অকালে করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল, বৌদ্ধধর্ম্ম যাহা স্বল্পকালের জন্য কিয়ৎসংখ্যক লোকের ভিতর অর্দ্ধ-সম্পন্ন মাত্র করিতে পারিয়াছিল, তাহাই শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনাশ্রিত হিন্দুধর্ম্মের চরম বিকাশ সমগ্র জগতে উদ্বোধিত করিবার প্রয়াসী। ইহাই ভারতের বর্ত্তমান নবোত্থানের কারণ। ঐ জন্যই ভারতের ভিতর আবার পরমপুরুষ নবজীবন নিঃশ্বসিত করিয়াছেন। ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিত্রাণ ও রক্ষার জন্য উদার-হৃদয় মনীষীগণ ঐ জন্যই অধুনা সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং ভারতসন্তান-মাত্রেরই হৃদয়ে সহসা ভাবান্তর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

স্বাধীনতাই প্রকৃত সুখ। পিঞ্জরাবদ্ধ মৃগশিশু বা পক্ষিশাবককে পিঞ্জরমুক্ত করিলে, স্থলে আনীত মৎস্যকে পুনরায় জলে ছাড়িয়া দিলে, তাহাদের যেরূপ পরম সুখ বোধ হয়, পরাধীন মানবসন্তান স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হইলে ততোধিক আনন্দ লাভ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু মানব, দেহ ও মন বিশিষ্ট আত্মা; সুতরাং ত্রিবিধ স্বাধীনতা লাভ ভিন্ন, উহার প্রকৃত সুখ লাভ অসম্ভব। শুদ্ধ রাজনৈতিক বা সামাজিক স্বাধীনতা দ্বারা উহা কখনই সম্ভবপর নহে। মৃত্যু ও জরাবার্দ্ধক্যের অধীন দেহ এবং কামক্রোধাদির অধীন মন লইয়া, রাজনৈতিক বা সামাজিক স্বাধীনতা লাভে, আপনাকে স্বাধীন মনে করা—আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র। তাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাঁহারা অধিক চিন্তাশীলতা ও স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই এক্ষণে বুঝিতে আরম্ভ করিতেছেন যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ধর্ম্ম সহায় না হইলে, কখনই পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। ধর্ম্মই

মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং যিনি যুগে যুগে জীবের উপর কৃপাপরবশ হইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তিনি পুনরায় ভারতক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, ধর্ম্ম-সমন্বয়রূপ মহান্ যুগধর্ম্ম আজ শিক্ষা দিতেছেন।

দক্ষিণেশ্বরে মহাশক্তির উদ্বোধনে—ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের 'জাগো মা, জাগো মা' ধ্বনিতে—মা যে সত্যই জাগ্রতা হইয়াছেন, উহা ভারত-ব্যাপী, জগত-ব্যাপী আন্দোলনেই প্রমাণিত। মহা রজঃশক্তির ক্রীড়া, যাহা ভারতবর্ষ হইতে সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে আজ দেখিতে দেখিতে প্রসারিত এবং যাহা সমগ্র পৃথিবীকে শীঘ্রই আলোড়িত করিয়া অভিনব আদর্শের দিকে ধাবিত করিবে, পূর্ব্বে ভারতে বা জগতে কে কবে এরূপ দেখিয়াছে? কুরুক্ষেত্রের মহা কোলাহলপূর্ণ কার্য্যতৎপরতা, উৎসাহ ও রণোদ্যমে মহাশক্তির ক্রীড়া অনেকটা দৃষ্ট হইলেও, উহা বর্ত্তমান মহাতরঙ্গের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী কোথায়? এমন বিশ্ব-বিস্তৃত রজঃক্রীড়া বৌদ্ধযুগেই বা কোথায়? শাঙ্করীয় বেদান্তজ্ঞান কবে এরূপ কার্য্যকরী (practical) হইয়াছিল? 'জীবে দয়া' নামে প্রচারিত গৌড়ীয় সেবাধর্ম্ম, বর্ত্তমান যুগ প্রচারিত 'দরিদ্র নারায়ণ' পূজার ন্যায়, আত্মজ্ঞান-সূচক ও পবিত্রভাবোদ্দীপক কোথায়? তাই বলিতেছি, বর্ত্তমান মহা সমন্বয়-যুগে, সর্ব্বভাবান্বিত, সর্ব্বত্রাতার আবির্ভাবে, মহাশক্তি অভূতপূর্ব্বরূপে প্রবুদ্ধ হইতেই পারে, কারণ, অভূতপূর্ব্ব পতনের পর অভূতপূর্ব্ব উত্থান অবশ্যম্ভাবী। ধন্য বর্ত্তমান ভারতের পবিত্রাতা। ধন্য মহাসমন্বয়-যুগধর্ম্ম-প্রচারক। ধন্য কাম-কাঞ্চন-ত্যাগী কর্ম্মবীর বিবেকানন্দ। আর ধন্য আমরা, যাহারা, বর্ত্তমান যুগে জন্ম-গ্রহণ করিয়া, সর্ব্ব-গ্রাসী ভারতীয় ধর্ম্ম-মহাতরঙ্গের আংশিক দর্শনে বিমোহিত হইয়া, উৎফুল্ল নয়নে মহা গৌরবান্বিত ভবিষ্যৎ ভারতের দিকে, দৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম হইতেছি।

ভারতশ্মশানে আজ মা স্বয়ং অবতীর্ণা—তবে আর বিলম্ব কেন, এস মার পূজার আয়োজন করি। মা বলি চান—সহস্র বলি চান্,—লক্ষ বলি চান্। কিন্তু পশুবলি নহে, আত্মবলি চান। কে মার সৌভাগ্যবান্ বীর সন্তান, আসুন্ মার চরণে বলি প্রদত্ত হউন। এস মার দুর্ব্বল সন্তান, মহাশক্তির পূজায় শক্তিলাভ করিয়া, আমরাও বীরোচিত আত্মোৎসর্গে ধন্য হই। আসুন্ সকলে, কেন্দ্রীভূত-শক্তির বিজয়-বৈজয়ন্ত তলে যে শক্তিশালী নেতা, প্রেমবিহ্বলচিত্তে 'উঠ, জাগো' বলিয়া বারবার আহ্বান করিতেছেন, তাঁহার নেতৃত্বের অধীনে আজ্ঞাবহ সৈনিকের ন্যায় মিলিত হইয়া, আপনাদিগকে ধন্য করি। যদি ভাগ্যবলে মহাযুগে

জন্মিয়াছি, আসুন, তুচ্ছ স্বার্থত্যাগে, তুচ্ছ জীবনদানে, অমরত্বলাভের অধিকারী হই। ঐ শুনুন, কর্ম্মবীর স্বামী বিবেকানন্দ কি বলিতেছেন—"আমাদের কার্য্য, কায করিয়া মরা—'কেন' প্রশ্ন করিবার আমাদের অধিকার নাই। সাহস অবলম্বন কর। আমা দ্বারা ও তোমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ কর্ম্ম হইবে, এই বিশ্বাস রাখ। ভগবান্ মহৎ মহৎ কার্য্য করিবার জন্য আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আর আমরা তাহা করিব। আপনাদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখ, অর্থাৎ পবিত্রতা, বিশুদ্ধ-স্বভাব ও নিঃস্বার্থ প্রেম-সম্পন্ন হও। দরিদ্র, দুঃখী, পদদলিতদিগকে ভালবাস, ভগবান্ আশীর্ব্বাদ করিবেন। মনে করিও না, আমরা দরিদ্র। অর্থ, জগতে শক্তি নহে; সাধুতা, পবিত্রতাই শক্তি।" ঐ শুনুন তিনি আবার বলিতেছেন—"দৃঢ়ভাবে কার্য্য করিয়া যাও, অবিচলিত অধ্যবসায়শীল হও ও প্রভুতে বিশ্বাস রাখ। কাযে লাগো। আমাদের কার্য্যের এই মূল কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখিবে—জনসাধারণের উন্নতি বিধান—ধর্ম্মে এক বিন্দুও আঘাত না করিয়া। মনে রাখিবে, দরিদ্রের কুটীরেই আমাদের জাতির জীবন। কিন্তু হায়! কেহই ইহাদের জন্য কিছুই করেন নাই! তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য, এবং ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতায় ঘোর হিন্দু হইতে পার? ইহাই করিতে হইবে এবং আমরাই ইহা করিব। তোমরা সকলে ইহা করিবার জন্যই আসিয়াছ। আপনাতে বিশ্বাস রাখ। প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কার্য্যের জনক। মৃত্যু পর্য্যন্ত গরীব পদদলিতদের উপর সহানুভূতি করিতে হইবে। ইহাই আমাদের মূল-মন্ত্র। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জ্জন দাও ও কার্য্য কর। মনে রাখিও, 'অনেক-গুলি তৃণগুচ্ছ একত্র করিয়া রজ্জু প্রস্তুত হইলে, তাহাতে মত্ত হস্তীকেও বাঁধা যায়।' বেদ বলিতেছেন, 'উঠো, জাগো, যতদিন না লক্ষ্যস্থলে পঁহুছিতেছ, থামিও না।' জাগো, জাগো, দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। দিবার আলোক দেখা যাই-তেছে। মহা তরঙ্গ উঠিয়াছে। কিছুতেই উহার বেগ রোধ করিতে পারিবে না। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর—প্রভুর আজ্ঞা ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে। ধর্ম্মের বন্যা আসিয়াছে—আমি দেখিতেছি, উহা পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, কিছুতে উহাকে বাধা দিতে পারিতেছে না—অনন্ত, অনন্ত, সর্ব্বগ্রাসী। সকলে আগুয়ান্ হও, এবং সকলের শুভেচ্ছা উহার সহিত মিলিত কর। সকল হস্ত উহার পথের বাধা সরাইয়া দিক্। জয় প্রভুর জয়।" ঐ শুনুন, তিনি আবার বলিতেছেন—"উদ্দেশ্য অনেক আছে, উপায় এদেশে নাই। আমাদের মস্তক আছে, হস্ত নাই। আমাদের বেদান্ত মত আছে, কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই।

আমাদের পুস্তকে মহা সাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্য্যে মহাভেদবুদ্ধি। মহা নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম কর্ম্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যে আমরা অতি নির্দ্দয়, অতি হৃদয়হীন, নিজের মাংসপিণ্ড শরীর ছাড়া অন্য কিছুই ভাবিতে পারি না। তথাপি উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়াই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে, অন্য উপায় নাই। ভারতবর্ষের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহার মূল কারণ—দেশীয় সমগ্র বিদ্যা-বুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে রাজ-শাসনে ও দম্ভবলে আবদ্ধ করা। আমাদিগকে পুনরায় উঠিতে হইলে, সাধারণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করা চাই। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে জাতির জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ইউরোপের বহু নগর পর্য্যটন করিয়া, তাহাদের দরিদ্রের ও সুখস্বচ্ছন্দ ও বিদ্যা দেখিয়া, আমাদের গরীবদের কথা মনে পড়াতে, অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? জবাব পাইলাম—'শিক্ষা'। ইহাদের শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন, আর আমাদের মধ্যে ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হইতেছেন! যে শ্রদ্ধা বেদবেদান্তের মূলমন্ত্র, যে শ্রদ্ধাবলে এই জগৎ চলিতেছে, সেই শ্রদ্ধার লোপ হওয়াতেই আমরা বিনাশের এত নিকট। এক্ষণে উপায়—শিক্ষার প্রচার; প্রথমে আত্মবিদ্যা। এই জীবাত্মাতেই অনন্ত শক্তি নিহিত আছে; পিপীলিকা হইতে উচ্চতম সিদ্ধপুরুষ পর্য্যন্ত, সকলের মধ্যে সেই 'আত্মা', তফাৎ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। অবকাশ ও উপযুক্ত দেশকাল পেলেই সেই শক্তির বিকাশ হয়। এই শক্তির উদ্বোধন কর্ত্তে হবে—দ্বারে দ্বারে গিয়ে।" তিনি আবার বলিতেছেন, "অন্ন—অন্ন। বল কি যে ভগবান্ আমাকে এখানে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পুরোহিতের দলকে এমন ধাক্কা দিতে হইবে যে, তাহারা যেন ঘুরপাক খাইতে খাইতে, একেবারে আটলাণ্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়ে—ব্রাহ্মণই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, আর যিনিই হউন।"

আসুন, আমরা মহা সমন্বয়কারী কর্ম্মবীরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নামিবার জন্য প্রস্তুত হই। 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন', শ্রীভগবানের এই কথা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া, ফলাফলের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, আসুন, আমরা বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম কর্ম্মযোগ-ব্রত গ্রহণ করি। কিরূপ ভাবে

আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে, তাহার ইঙ্গিত করিয়া, ঐ শুনুন্ কর্ম্মবীর কি বলিতেছেন—

'ভাঙ্গ বীণা প্রেমসুধাপান, মহা আকর্ষণ, দূর কর নারীমায়া।
আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজলপান, প্রাণপণ যাক্ কায়া॥
জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার, প্রেতভূমি চিতা মাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক্ তোমা।
চূর্ণ হোক্, স্বার্থ, সাধ, মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥'

—বীরবাণী।

বেদ বলিয়াছেন, 'দুর্ব্বল ব্যক্তি আত্মলাভে সক্ষম হয় না। বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, মেধাবী ব্যক্তিই উহা লাভ করিতে সমর্থ হন।' স্বামীজি বলিয়াছেন, 'চালাকী দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য হয় না, প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়।' যাঁহারা কর্ম্মযোগে ব্রতী হইবেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি অধিক মনোযোগী হইতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যের অভাব জন্যই আমাদের শরীর, মন এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা-নিবন্ধন আমরা ক্রমশঃ হীন হইয়া পশুর অধম হইয়া পড়িয়াছি। যদি আমাদিগকে পুনরায় মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে হয়, তবে একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। বেদ, ব্রাহ্মণের পক্ষে ত্রিশ বৎসর, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে চতুর্বিংশতি বৎসর, ও বৈশ্যের পক্ষে অষ্টাদশ বৎসর, বিবাহের উপযুক্ত বয়স, নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আজকাল পুত্রের দ্বাদশ বা চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে বিবাহ দিতে না পারিলে পিতামাতার মনস্তুষ্টি হয় না। ইহাতেই বুঝুন, আমাদের বর্ত্তমান্ অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমাদের কি ভয়ানক পতন হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যের অভাব-নিবন্ধন আমরা আত্মপ্রত্যয় হারাইয়াছি। আমরাও যে পৃথিবীতে কিছু মহৎ কার্য্য করিতে পারি, এ বিশ্বাস আমাদের নাই। যদি কখনও কোন সাধারণের মঙ্গলকর কার্য্যে অগ্রসর হই, দীর্ঘকাল ধৈর্য্য ধরিয়া উহাতে লাগিয়া থাকিতে পারি না, দীর্ঘকাল কোন বিষয় এক মনে ভাবিতে পারি না, আমাদের মস্তিষ্ক এমনই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। স্বামীজি এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, শুনুন্, "ভারতীয় জন মানবের আত্মনির্ভর ত দূরের কথা, আত্মপ্রত্যয় পর্য্যন্ত এখনও অণুমাত্রও হয় নাই। যে আত্মপ্রত্যয় বেদান্তের ভিত্তি,

তাহা এখনও ব্যবহারিক অবস্থায় কিছুমাত্রও পরিণত হয় নাই। আমরা এতই বীর্য্যহীন যে, কোনও বিষয়ের আন্দোলন করিতে গেলে, তাহাতেই আমাদের বল নিঃশেষিত হয়, কার্য্যের জন্য কিছুমাত্রও বাকী থাকে না, এ জন্যই আমরা প্রায়ই বঙ্গভূমে 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' সতত প্রত্যক্ষ করি।' ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা পবিত্রতা লাভ করিলে ও নারায়ণ জ্ঞানে সকলের প্রতি প্রেম-সম্পন্ন হইলে, শ্রীভগবান্ আমাদের দ্বারা তাঁহার কার্য্য করাইয়া লইবেন, সন্দেহ নাই। আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি সামান্য হইতে পারে, শক্তি ক্ষুদ্র হইতে পারে, কিন্তু যদি আমরা মায়ের চরণে বলি-প্রদত্ত হই, মহাশক্তি আমাদের ভিতর দিয়া কার্য্য করিবেন। জগতে এমন অনেক বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও শক্তিশালী লোক আছেন, যাঁহাদের সহিত তুলনায় আমরা মহাতরঙ্গের সমক্ষে ক্ষুদ্র বুদ্বুদ মাত্র, কিন্তু যদি আমরা আত্মপ্রত্যয়ে বলবান্ হই, যদি আমরা বিশ্বাস করিতে পারি যে, ক্ষুদ্র বুদ্বুদ হইলেও, মহাতরঙ্গের পশ্চাতে যেমন, আমাদের পশ্চাতেও তদ্রূপ সেই অনন্ত মহা-সমুদ্র সমভাবে বিদ্যমান—যিনি সকল মানবের বিদ্যাবুদ্ধি ও শক্তির একমাত্র নিয়ন্তা—তাহা হইলে আমরা নির্ভয়ে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইব। বেদান্ত বলিয়াছেন—'অভীঃ অভীঃ', ভয় পাইও না। ভয়ই দুর্ব্বলতা, ভয়ই পাপ। বিশ্বাসে বলবান্ হইয়া যদি আমরা কার্য্যে নামি, তাহা হইলে মায়ের 'মাভৈঃ' বাণী শ্রবণে অভয়লাভে সমর্থ হইব, সন্দেহ নাই।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

'যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥'

মানব, নিজকর্ম্মদ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে, পূর্ণ হয়। ভগবান্ হইতেই সকল প্রাণীর সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ও সংস্কারের উদয় হয় এবং তিনি জগতের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া বিরাজিত।

আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কর্ম্মের দ্বারা ভগবানের পূজা করিয়া, আমরা নিজেদেরই মঙ্গল সাধন করিয়া থাকি, নিজেরাই সিদ্ধির পথে অগ্রসর হই। জীবসেবাদিদ্বারা আমরা অন্য কাহারও উপকার করি না বা করিতে পারি না। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমাদের এমন কি সামর্থ্য যে, এই অনন্ত কোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাহারও উপকার করিতে পারি? দরিদ্রকে দান করিয়া, পীড়িতের সেবা করিয়া, আমরা তাহাদের কি উপকার করিতে পারি—তাহাদের অভাব মোচন করিতে

কতদূর সক্ষম হই ? এইজন্য কাহারও কোনরূপ সেবা করিয়া তাহাকে বাধিত বা অনুগৃহীত করিলাম, এরূপ ভাবা ঠিক নহে ; বরঞ্চ তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, সে ব্যক্তি তাহার সেবা করিতে দিয়া আমাদিগের নিজের উন্নতি সাধন করিবার সুযোগ দিয়াছে। কাহারও উপকার করিবার জন্য বা কাহারও প্রতি দয়া প্রকাশের জন্য কর্ম্ম করা নহে, কিন্তু ঘটে ঘটে বর্ত্তমান নারায়ণের সেবার জন্য—সর্ব্বভূতে অবস্থিত বিরাট্ পুরুষের পুজার জন্যই কর্ম্ম। আমাদিগকে ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক, একজন সামান্য গৃহী, যথাযথ ব্রহ্মচর্য্য বা ত্যাগের অভিজ্ঞতা তাঁহার নাই। প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ বা নিঃস্বার্থ কর্ম্ম কি, যদি কাহারও দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝিবার বাসনা জন্মিয়া থাকে, তবে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী পাঠ করুন এবং যথার্থ কামকাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদিগের জীবন পর্য্যালোচনা করুন,—লেখকের এই বিনীত নিবেদন। বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম প্রচারক, পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ, জনসাধারণের নিকট যুগাবতার শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার পুনরাবৃত্তি, এই প্রবন্ধের উপসংহার হউক—

'বারম্বার এই ভারতভূমি মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছিলেন এবং বারম্বার ভারতের ভগবান্ আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইহাকে পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছেন। কিন্তু ঈষন্মাত্রযামা গতপ্রায়া বর্ত্তমান গভীর বিষাদরজনীর ন্যায় কোনও অমানিশা এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন সমস্ত গোষ্পদের তুল্য এবং সেইজন্য এই প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় অন্য সমস্ত পুনর্বোধন সূর্য্যালোকে তারকাবলীর ন্যায়। এই পুনরুত্থানের মহাবীর্য্যের সমক্ষে পুনঃপুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য্য বাললীলাপ্রায় হইয়া যাইবে। পতনাবস্থায় সনাতন ধর্ম্মের সমগ্র ভাব সমষ্টি অধিকারি হীনতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আকারে পরিরক্ষিত হইতেছিল এবং অনেক অংশ লুপ্ত হইয়াছিল।

এই নবোত্থানে, নব বলে বলীয়ান্ মানবসন্তান, বিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা সমষ্টিকৃত করিয়া, ধারণা ও অভ্যাস করিতে সমর্থ হইবে ; এবং লুপ্ত বিদ্যারও পুনরাবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে ; ইহার প্রথম নিদর্শন স্বরূপ, শ্রীভগবান্ পরম কারুণিক," সর্ব্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্ব্বভাবসমন্বিত, সর্ব্ববিদ্যাসহায, যুগাবতাররূপ প্রকাশ করিলেন। অতএব, এই

নবযুগের প্রত্যূষে সর্ব্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্তভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্ম্মে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চনিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে। এই নব যুগধর্ম্ম, সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান; এবং এই নব যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীভগবান্ পূর্ব্বগ শ্রীযুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের পুনঃ সংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর ও ধারণ কর।

মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গতরাত্রি পুনর্ব্বার আসে না। বিগতোচ্ছাস সেরূপ আর প্রদর্শন করে না। জীব দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্ত্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি। লুপ্তপন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে, সদ্যোনির্ম্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান্, বুঝিয়া লও। যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর; এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্ব্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষা দ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র পরিবর্ত্তনের সহায়তা কর। আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলার সহায়ক, এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।"

—ভাব্‌বার কথা।

পদব্রজে কাশীযাত্রা।

পরিব্রাজক।] [পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

অতঃপর প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া আহারের কথা মনে পড়িল। অদূরে বর্দ্ধমান রাজপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাকৃষ্ণজিউর মন্দির ছিল। তথায় যাইলে, একজন বাঙ্গালী বাবু আমাদিগকে প্রসাদ দিলেন। এই মন্দিরে অতিথিসেবার বন্দোবস্ত আছে। প্রত্যহ অতিথিদের ১০।১২ খানা পাতা পড়ে। উক্ত বাঙ্গালী বাবুটী এখানকার একজন সেবক। আহারান্তে আমরা নিকটবর্ত্তী শ্মশানঘাটের ধারে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর, আমাদের দুইজন তথা হইতে বর্দ্ধমানরাজের গোলাপবাগ্ নামক চিড়িয়াখানা দর্শন করিতে গেলেন। চিড়িয়াখানা হইতে তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে, আমরা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া, গ্রামান্তরে উপস্থিত হইলাম। এই গ্রামটী একেবারে

হিন্দুবর্জ্জিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হিন্দুর মধ্যে বর্দ্ধমান রাজপ্রতিষ্ঠিত একটী ঠাকুরবাটীতে ২।৪ জন চাকর আছে। ঐ ঠাকুরবাটীর মধ্যে ১০৮ মন্দির ও প্রত্যেক মন্দিরে এক একটী শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরগুলি, মধ্যস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণ বেষ্টন করিয়া, যেন ঠাকুরবাটীর প্রাচীরের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। ঠাকুরবাটীর আয়তন ও গঠনপ্রণালী দেখিলে, অতীতের জাঁকযমক ও সমারোহের বিষয় স্মরণ হইয়া, স্বর্গীয় মহাতাপচাঁদের শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অতীতের স্মৃতি মাত্র লইয়াই আজ এখানকার গৌরব। ১০৮ মন্দিরাধিষ্ঠিত শিবলিঙ্গগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, বর্দ্ধমান রাজবংশধরগণের উদাসীনতা ও ধর্ম্মানুরাগ হ্রাসের কথা স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়। পূজাদির জন্য ৯ জন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যাবলি পরিদর্শন করিবার কেহ আছেন বলিয়া বোধ হয় না। সন্ধ্যার সময় দেখিলাম, একজন চাকর আসিয়া ২।৪টী মন্দিরে একবার একটী আলোক দেখাইল মাত্র ও আর একজন একটী কাঁসর বাজাইল। দিবাভাগে ভোগরাগাদির যে কিরূপ ব্যবস্থা, তাহা এই আভাসেই অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইল। যাহা হউক, কোন রকম করিয়া তথায় রাত্রিবাস করিলাম। পরদিন মধ্যাহ্নে, শাঁকো গ্রামে বাবুদের অতিথিশালায় ভিক্ষা করিয়া, উড়ো নামক স্থানে আসিলাম। রাত্রিকালে দুইজন লোক সেখানে আমাদিগকে যত্নসহকারে ভোজন করাইলেন। পরদিন মুষ্টিভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি লইয়া রন্ধন করতঃ, ঠাকুরের ভোগ দিলাম। এই গ্রাম খানিতে বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত এক রকম নাই বলিলেই হয়। গ্রামবাসীরা জমি চাষ করিয়া, সামান্য জীবিকা মাত্র সংস্থান করিয়া, নিজ নিজ গৃহান্তরে বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। বাহিরের কোন খবর জানে না, জানিবার কোন দরকারও মনে করে না। গ্রামস্থ একটী ব্রাহ্মণ বালকের কথা শুনিলাম। ধান্য বপন, ঘর ছাওয়া প্রভৃতি কার্য্যে তিনি এতদূর পটু যে, চাষারাও তাঁহার সমকক্ষ হইতে না পারিয়া, পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া, রাত্রিকালে আমরা আর একটী গ্রামে, এক ক্ষত্রিয়ের বাটীতে অতিথি হই। গৃহস্বামী ও তাহার পুত্র উভয়ে অসুস্থ, পরিবার নিকটে নাই, তথাপি সে সেই রাত্রিতে এবং পরদিন মধ্যাহ্নে, আমাদের তিনজনকে ভিক্ষা দিল। লোকটী হিন্দুস্থানী। ঐ দিনই পানাগড়ে আসিলাম। এতদিন পরে একটী ভক্তের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। ভক্তটী বালক, নাম রামনারায়ণ গোস্বামী। ইহার কথাবার্ত্তায় আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। পরে মগবডাঙ্গা গ্রামে আসিয়া, সেখানকার

শ্রীশ্রীকালীমাতার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বিকালে মেজেডি গ্রামে উপস্থিত হই। কয়েকদিন অতিরিক্ত ভ্রমণে আমার জ্বর হয়, সুতবাং এই গ্রামে আমাদিগকে সপ্তাহাধিক কাল থাকিতে হয়। পানাগড়, সগরডাঙ্গা ও এই গ্রামেব চলিত ভাষা এইরূপ ঢঙের—"লেকৃখা পড়া শিখ্‌খা কি হবেক্ রে বাপ্‌পু ?' আমার অতিরিক্ত জ্বর, তাহাতে বিদেশ ও নিঃসম্বল, কিন্তু ঠাকুবের কি দয়া—কোথা হইতে একজন ডাক্তার বিনা পরিদর্শনীতে আমাকে প্রত্যহ ৩।৪ বাব দেখিয়া যাইতেন এবং ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত কবিতেন। আবাব আমাব সঙ্গীরা ভাবিয়াছিলেন, এই ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহাদের ভিক্ষা দীর্ঘকাল কোথা হইতে সংগ্রহ হইবে ? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অযাচিত হইযা, তাঁহাদিগকে বলিলেন, "যে দিন আপনাদিগকে কেউ নিমন্ত্রণ না কবিবে, আমাদেব দুই বাটীতে দুই জন আহার করিবেন।" এই গ্রামেব নিকটে একটী পিঞ্জরাপুল আছে। ১১ দিন পরে আমি সুস্থ হইলে, আমরা সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া ওণ্ডেল গ্রাম হইযা, শিয়ার-ছোল গ্রামে একটী ঠাকুববাড়ীতে প্রসাদ পাইযা, নন্দী নামক স্থানে আসি। গ্রামখানিতে দরিদ্র লোকেবই বাস। কিছুকাল পূর্ব্বে এই স্থানে কযলাব খনি পাওয়া গিয়াছে এবং কযলা উত্তোলন কার্য্য আবম্ভ হইযা, গ্রামবাসীদের আয কিছু বৃদ্ধি হইযাছে। কিন্তু খনিব কার্য্যে অত্যন্ত পবিশ্রম কবিতে হয, সেজন্য লোকের স্বাস্থ্যও তত ভাল নাই। শিয়ারছোল ও নন্দীগ্রামে সদাব্রত আছে। শিয়ারছোলেব কিছু দূবে ১২৯ নং মাইলষ্টোন্ পাব হইযা, আমবা গ্র্যাণ্ড ট্রঙ্ক রোড্ ছাডিযা দিযা, একটী পাকা বাস্তা ধবি। এই বাস্তা দিযা যাইতেছি, এমন সময়, বাজাবের নিকট একটী স্ত্রীলোক আমাদিগেব গন্তব্য স্থান জিজ্ঞাসা করিল। বাজাবে অনেক লোক একত্র হইযা মদ্যপান কবিতেছিল। এই স্ত্রীলোককে তাহাদেরই একজন মনে কবিযা, আমবা তাহাব কথাব কোন জবাব না দিযা, নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছিলাম। কিন্তু সে পুনঃপুনঃ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—"কাঁহা যাওগে, কাঁহা যাওগে' ? অবশেষে বিরক্ত হইযা বলিলাম, "বৈদ্যনাথ যাইব।" তখন সে আমাদিগেব পথভ্রম হইয়াছে বুঝাইযা, অপেক্ষাকৃত সোজাপথ দেখাইযা দিল এবং বলিল—এই পথ দিযা ৩।৪ দিনেব মধ্যে বৈদ্যনাথ পৌঁছিবেন। আমবা সহসা তাহার কথায় আস্থা স্থাপন না করিযা, অপব কয়েকজন লোককে জিজ্ঞাসা কবায, তাহারাও ঐ কথাই বলিল। অগত্যা বালুকাময, জলপূর্ণ ও প্রস্তরাকীর্ণ উক্ত সোজা বন্যপথ ধবিলাম এবং কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদযে ভাবিলাম, যাহাকে অবজ্ঞা করিতেছিলাম তাহার নিকট হইতেই এই উপকার লাভ হইল।" স্ত্রীলোকটী

ঐরূপে পথ ধরাইয়া না দিলে, কত ফেরে পড়িতে হইত, তাহা বলা যায় না। অমনি ৺বৈদ্যনাথজীকে আবার স্মরণ হওয়ায় ভাবিলাম, 'ভগবন্! তুমি তোমার চতুর্দ্দিকস্থ পথ সকল কণ্টকাকীর্ণ করিয়া, দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যস্থলে বাস করিতেছ; এখানে যেমন, অন্তর রাজ্যেও ঠিক ঐরূপে বিরাজ করিতেছ। নতুবা জীব, সহজে তোমার দর্শন পায় না কেন? দুর্ভেদ্য জলদজালের অন্তরালে লুক্কায়িত সূর্য্যের ন্যায়, মায়ার কঠোর আবরণে তোমার পবিত্র দর্শন লুক্কায়িত কেন? মেঘের মধ্যে সূর্য্যছটার যেমন কখন কখন অনুভব হয়, জগতের ভিতর তোমার আভাসও ঠিক তদ্রূপ। লোকে বলে, নকল ধরিয়া আসলে যাওয়া যায়। কিন্তু, হে আসল, তোমার নকলের ফাঁদ এড়াইতে পারিলে ত তোমাকে পাব! তোমার ধরা দিবার মতলব নয় বলিয়া বুঝি, তোমার নকলের এত প্রভাব, এত শক্তি! হে শক্তিধর! ঐ শক্তি যদি তোমার, তবে উহার এরূপ অযথা প্রয়োগ করিয়া, আমার ন্যায় দুর্ব্বল জীবের বল পরীক্ষা করিতেছ কেন? শুনিতে পাই, দুর্ব্বলের বল তুমি, তবে আর মায়ার ঘোর ঘাতপ্রতিঘাতে আমাকে আর জর্জ্জরিত কর কেন? এ কি তোমার লীলারহস্য, লীলাময়?

পূর্ব্বোক্ত সোজাপথে আসিয়া আমরা পুরাতন চটীতে রাত্রি যাপন করি। পরদিন তথা হইতে মিহিজামাভিমুখে রওনা হইলাম। কিছুদূর যাইলে, একটী সুন্দর উপত্যকা আমাদিগের নয়নগোচর হইল। ইহার একপার্শ্বে এক অতি উচ্চ ভূমির উপর রূপনারায়ণপুর ষ্টেশন নির্ম্মিত হইয়া, গিরিচূড়ার ন্যায় শোভা পাইতেছে, তলদেশে নিম্ন জমির মধ্যে শালবন, মধ্যে মধ্যে গরু চরিতেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় বোধ হইল, প্রকৃতি গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া, সেই বিজন বনপ্রদেশে বিরাজ করিতেছেন। আমরা কিছুক্ষণ সেই বনপ্রদেশে বিশ্রাম করিতে করিতে, বনভূমির সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম। তৎপরে নিকটবর্ত্তী এক হরীতকী বনের মধ্য দিয়া মিহিজামাভিমুখে চলিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু হরীতকীও সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। গ্রামে পৌঁছিয়া আহারাদির পর, বৈকালে দুইজন ভদ্রলোক আমাদিগকে একটী পাহাড়ের উপর বেড়াইতে লইয়া গেলেন। পাহাড়ের উপর নানাবিধ বৃক্ষ আছে, তন্মধ্যে বিল্বই অধিক। সেই পাহাড়ে উঠিয়া, হৃদয়ে এক বিমল আনন্দ উপভোগ করিলাম। মনে হইল, যেন প্রকৃতি দেবী সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত হইয়া, আমাদিগের দৃষ্টি-সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। হৃদয় অনন্তের ভাবে পরিপূরিত হইল। পরদিন প্রাতে রেল রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী কাঁচা পথ দিয়া জামতাড়া আসি, ইহা সাঁওতাল পরগণার অধীন

একটী সবডিবিজন্। এখানে একটী প্রবেশিকা বিদ্যালয় ও ছাত্রনিবাস আছে এবং কয়েকটী প্রবাসী বাঙ্গালী থাকেন। তন্মধ্যে এখানকার রাজার ম্যানেজার, হরিকিষণ বাবু নামক একজন পূর্ব্ববঙ্গীয় ভদ্রলোকের বাড়ী আমরা অতিথি হইলাম। এই ম্যানেজার বাবুর বাটীর নিকট কয়েক বিঘা জমি আমাদিগের মিশন আশ্রম-নির্ম্মাণ জন্য প্রাপ্ত হইয়াছে। এইস্থান বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ, অধিবাসীদিগের সবল দেহের গঠনই তাহার প্রমাণ। মধ্যাহ্ণ আহারাদি করিয়া, তথা হইতে রওণা হইয়া, প্রায় সন্ধ্যার সময় আমরা রামপুরে, জামতাড়ার রাজভ্রাতা, আলাদ সিংহের সহিত দেখা করি। লোকটীর সহিত কথোপকথনে আমরা যথেষ্ট আপ্যায়িত হইলাম। হৃদয়ে ধর্ম্মভাব আছে, বিলাসিতা কাহাকে বলে যেন জানেন্ না। এইরূপ অবস্থাপন্ন লোক সচরাচর যে প্রকার চাল চলনে চলিয়া থাকেন, তাহার কিছুমাত্র দেখিলাম না। বাজারে সাধারণ জনগণের মধ্যে, সামান্য একটী ছোট খাটিয়ায় উপবেশন করিয়া, বিচারাদি কার্য্য করিতে দেখিয়াছিলাম। পরিধানেও একখানি সামান্য বস্ত্র মাত্র ছিল। পরদিন এখান হইতে করণ নামক স্থানে যাইয়া, শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্করের জ্যেষ্ঠতাতের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। তিনি আপন পরিচর্যাদি দিতে দিতে কথায় কথায় বলিলেন যে, একসময়ে তাঁহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল; অনেক ধাক্কা খাইয়া এখন বুঝিয়াছেন—অর্থে সুখ নাই এবং সংসারে সকল স্বার্থপর ভোগের ব্যাপারই ফাঁকা। তিনি ঋগ্বেদ হইতে কিয়দংশ পাঠ করিয়া শুনাইলেন, পরে আহার করাইলেন। এমন সুগন্ধ আতপ তণ্ডুল আমরা ইতিপূর্ব্বে কখন খাইয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। আহারান্তে বিদায় লইয়া, আমরা পাথরোল যাইয়া, তথাকার রাজার কালীবাড়ীর ভিতর একটী মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এখানে আরও অনেকগুলি মন্দির আছে। মায়ের নিত্য পূজা ও ভোগরাগাদির সুবন্দোবস্ত আছে। শনি ও মঙ্গলবারে ১০০ হইতে ২০০ বলি পড়ে। সন্ধ্যার সময় আমরা মায়ের আরতি দর্শন করিলাম। কিছুক্ষণ পরে একজন লোক আসিয়া, আমাদিগকে রাজবাটীতে লইয়া গেল এবং রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিল। রাজার নাম, সরোজ সিং, বয়স ২০।২১ বৎসর হইবে। হৃদয়ে ধর্ম্মভাব আছে। তাঁহার সম্পত্তি এখনও কোর্ট অব ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে আছে। রাত্রে তিনি স্বহস্তে পরিবেষণ করিয়া আমাদিগকে খাওয়াইলেন।

ক্রমশঃ।

ধর্ম্মের জয়।

[শ্রী—]

আজ আর বামাচরণের বাটী আসিতে মন হইতেছে না, আফিস হইতে আসিতে যে দীর্ঘ পথ নিমেষে অতিক্রম করেন, আজ সে পথ আর ফুরাইতেছে না। সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে, রাজপথে গ্যাসের আলো, আকাশে নক্ষত্রের আলো বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বামচরণের অন্ধকার হৃদয়ে তার একটী কিরণও প্রতিফলিত হইতেছে না। আজ বামাচরণের চক্ষে সংসারের সমস্ত আলোক নিভিয়া গিয়াছে। ক্লান্তপদে চলিতে চলিতে বামাচরণ হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, মনে হইল, বাটীর পথ ভুলিয়া অন্য কোথায় যাইতেছেন। নিত্যদৃষ্ট চির পরিচিত সেই চিৎপুর রোড আজ নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে। বামাচরণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। চলিতে চলিতে, ভাবিতে লাগিলেন—"বাড়ী গিয়া মুখ দেখাব কি করে ?"

বামাচরণ নোব্‌ল্ কোম্পানির সওদাগরী আফিসে ক্যাসিয়ারী কর্ম্ম করেন। প্রথম পঞ্চাশ টাকায় ঢুকিয়াছিলেন, কিছুদিন কর্ম্ম করিতে করিতে তাঁহার উপর সাহেবের সুনজর পড়িল, বেতন ক্রমে পঞ্চাশ হইতে ষাটে, ষাট্ হইতে পঁয়ষট্টিতে, পঁয়ষট্টি হইতে পঁচাত্তরে উঠিল। এখন একশত হইয়াছে। ছোট আফিস, আর অধিক উন্নতির আশা নাই। সন্তুষ্ট-চিত্ত বামাচরণ আর অধিক আশাও করেন না। প্রভুর প্রভূত বিশ্বাস, পতিব্রতা পত্নীর অপরিসীম ভালবাসা, পঞ্চমবর্ষীয় পুত্রের স্বর্গীয় প্রীতি পাইয়া বামচরণ পরমানন্দে দিনপাত করেন।

বাটী ফিরিবার সময় বামাচরণ পুত্রের জন্য নিত্য খাবার কিনিয়া আনেন। অভ্যাস বশতঃ, আজও দোকানের সাম্‌নে দাঁড়াইলেন। পরক্ষণেই মনে হইল, তিনি আজ রিক্ত হস্তে ফিরিতেছেন। দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। দোকানী ডাকিয়া বলিল, "বাবু, আজ খোঁকা বাবুর জন্য খাবার নিলেন্ না ?" বামাচরণ পশ্চাতে না চাহিয়া ত্রস্তবেগে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল, দোকানী খোকার প্রিয় খাদ্যগুলি লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিতেছে। আর তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া, আকাশের নক্ষত্র, গ্যাসের আলো ও পথের মানুষ সব হাসিতেছে!

কিছুক্ষণ দ্রুত চলিবার পর, বামাচরণের গতি আপনা আপনি মন্থর হইয়া আসিল। পা যেন আর চলিতে চাহিতেছে না; দেহের ভার বহিতে যেন সে

নিতান্ত অনিচ্ছু। আজ বামাচরণের বুকে বল নাই, হৃদয় ভারে সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

বামাচরণ ধীরে ধীরে অগ্রসর হউন্—এই অবসরে, আমরা পাঠকবর্গকে দু একটা কথা জানাইয়া রাখি।

বামাচরণের উপর যখন ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হন, সেই সময় একদিন ম্লানকান্তি, মলিন-বেশধারী একটী যুবক তাহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়। অতি কাতর-স্বরে রঘুনাথ আত্ম-কাহিনী বিবৃত করিল। খোকা সেইখানে খেলা করিতেছিল, আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইল। বামাচরণ একেবারে গলিয়া গেলেন ও রঘুনাথকে আশ্রয় দিলেন। রঘুনাথ মধ্যবিত ইংরাজী লেখাপড়া জানিত। সাহেবকে বলিয়া আফিসে রঘুনাথের একটী চাকুরি করিয়া দিলেন ও কিসে তাহার উপর সাহেবের বিশেষ কৃপা হয়, সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাই হইল, ক্রমে রঘুনাথ ক্যাসের কার্য্য করিতে লাগিল। অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে, বামাচরণ যখন অনুপস্থিত থাকিতেন, রঘুনাথই তাঁহার কার্য্য চালাইত। ক্রমে পাকা খসড়া হিসাব লেখার ভার রঘুনাথের উপর ন্যস্ত হইল। বেতন ত্রিশ টাকা; ক্যাস্ জিম্মা রহিল বামাচরণের। বামাচরণ রঘুনাথকে সহোদরের ন্যায় স্নেহ করেন, খোকা কাকা বলে, বামাচরণের স্ত্রী, নৃত্যকালী, রঘুনাথকে "ঠাকুর পো" বলিয়া সম্বোধন করেন।

আজ সকালে বামাচরণ আফিসে উপস্থিত হইবা মাত্রেই সাহেব নির্জ্জনে ডাকিয়া বলেন, "ক্যাস্ বই লইয়া আইস।' সাহেব ক্যাস্ বই প্রায়ই দেখিতেন না। আজ আফিসে আসিবা মাত্রেই ক্যাস্ বই দেখিবার কি প্রয়োজন? সাহেবের কথার স্বরও সন্দেহ ব্যঞ্জক। বামাচরণ এই সকল ভাবিতেছেন, সাহেব উচ্চ-কণ্ঠে বলিলেন—"শুনিতে পাইতেছ না? ক্যাস্ বই আন।" বামাচরণ তৎ-ক্ষণাৎ ক্যাস বই আনিলেন। সাহেব ক্যাস্ বই লইয়া, বামাচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ক্যাস্ ঠিক আছে?"

বামাচরণ সাহেবের কার্য্যে ও কথায় আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়াছেন, ঈষৎ রুক্ষ স্বরে উত্তর করিলেন—"অবশ্য, ঠিক আছে, সাহেব ইচ্ছা করিলে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।" সাহেব দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিলেন, ক্যাস্ বই হাতে লইয়া বামাচরণকে বলিলেন—"চল।" ক্যাস্ ঘরে আসিয়া তহবিল মিলাইয়া দেখা হইল—হাজার টাকা কম। বামচরণের মাথা ঘুরিয়া গেল,

একখানি চৌকিতে বসিয়া পড়িলেন। সাহেবও অপর চৌকিতে বসিয়া, টেবিলের উপর ক্যাস্ বই রাখিয়া বলিলেন, "উত্তমরূপে চেক্ কর। রঘুনাথ কোথায়?" রঘুনাথ সেদিন তখনও আসে নাই। রামাচরণ সাহেবের মুখ চাহিয়া ধীর স্বরে বলিলেন—"সাহেব যে কিছু ত্রুটি আমার, রঘুনাথ সম্পূর্ণ নিরপরাধী।" সাহেব বলিলেন—"অবশ্য।"

রামাচরণ নিত্য মজুত তহবিল মিলাইতেন না; দশ বৎসর চাকুরি করিতেছেন, কখনও একপাই গরমিল হয় নাই। লোহার সিন্দুক, তিনি ও রঘুনাথ ব্যতীত, আর কেহ খোলে না। রঘুনাথের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস, রামাচরণ আপনাকে সন্দেহ করিতে পারেন, কিন্তু রঘুনাথকে নয়। খোকার জন্মাবধি রামাচরণের বাড়ী যাবার তাড়ায়, নিত্য বাকিযানের সহিত মজুত তহবিল মিলাইয়া দেখা হয় না। কতক্ষণে বাড়ী যাইয়া তাহাকে দেখিবেন, তাহার মিষ্ট কথা শুনিবেন—নিত্য অপরাহ্নে তাঁহার এই ব্যাকুলতা জন্মিত। "যেখানে চুরির কোন ভয় নাই, সেখানে নিরর্থক টাকা গণিয়া নোট গণিয়া মরি কেন?" রামাচরণ মাসে দুই একদিন মাত্র তহবিল চেক্ করিতেন, তাও রঘুনাথের নিতান্ত জেদে। নিত্য তহবিল মিলান ত হয়ই না অধিকন্তু রঘুনাথের দৈনিক হিসাবের খাতাও নিত্য পরীক্ষা না করিয়া সই করা হয়। সই করিবার সময় কেবল মাত্র জিজ্ঞাসা করেন—"সব ঠিক্ তো?" রঘুনাথ তখনি উত্তর দেয়—"মজুত চেক্ করিয়া দেখুন না।" রামাচরণ অমনি সই করেন। শেষ যে তারিখে তহবিল মিলাইয়াছেন, সেই তারিখ হইতে গতকাল পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিয়া, ভাউচার্ রসিদ মিলাইয়া দেখিলেন, হিসাবের ভুল কোথাও নাই, কিন্তু মজুত তহবিলে হাজার টাকা কম। পরীক্ষা শেষ করিয়া রামাচরণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি দেখিলে?" রামাচরণের মুখ বিবর্ণ, জিহ্বা শুষ্ক, ললাট ঘর্ম্মাক্ত, মাথা হেঁট করিয়া উত্তর করিলেন,—"হাজার টাকা তহবিল গরমিল।"

সাহেব।—"কিরূপ?"

রামাচরণ।—"হাজার টাকার এককেতা নোট জমা দেখিতেছি, কিন্তু তাহা মজুত তহবিলে পাইতেছি না, আর টাকার খরচও নাই।"

সাহেব।—"কোন তারিখে জমা?"

রামাচরণ তারিখ, নাম ইত্যাদি উল্লেখ করিলেন। সাহেব কঠোর স্বরে বলিলেন—"বাবু! দৈনিক বাকিযানে তোমার সহি দেখিতেছি। তহবিল গরমিল তুমি নিশ্চয়ই জানিতে, অথচ এতদিন কোন কথা উল্লেখ কর নাই!"

রামাচরণ কেমন করিয়া স্বীকার করেন—নিত্য মজুত তহবিল চেক্ করা হয় নাই। কোন্ মুখে বলেন, "রঘুনাথ আমার বিশ্বাসী, তাহার হিসাব পরীক্ষা না করিয়াই সই করিয়াছি।" নতশিরে নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

সাহেব—"তোমার কি বলিবার আছে?"

রামাচরণ—নিরুত্তর। দৃঢ় অথচ কাতর স্বরে সাহেব বলিলেন—"বাবু! তোমাকে বড় বিশ্বাস করিতাম," বলিয়া চুপ করিলেন, পরে বলিলেন—"পাঁচশত টাকা তোমার জামিন জমা আছে, যদি বাকী পাঁচশত টাকা দাও, তোমাকে পুলিশে দিব না। আমিই তোমাকে যত্ন করে বড় করেছি, স্বহস্তে গড়েছি, ভাঙ্গতে বড় মমতা হয়, কি বল, টাকা দিতে পারিবে?" রামাচরণ এখনও নিরুত্তর।

বাস্তবিক রামাচরণ সাহেবের শেষ কথাগুলি শুনিতে পান নাই, তাঁহার কর্ণে একটী কথা ধ্বনিত হইতেছিল—"তোমাকে বড় বিশ্বাস করিতাম," "তোমাকে বড় বিশ্বাস করিতাম।" বজ্রকঠোর স্বরে, সাহেব পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"উত্তর দাও না কেন? তুমি কি ক্ষতি পূরণ করিতে চাও না?" রামাচরণ পকেট হইতে মণিব্যাগ বাহির করিয়া সাহেবের হস্তে দিলেন। সাহেব ব্যাগ খুলিয়া দেখিলেন, তাহাতে একশত টাকার একখানি নোট রহিয়াছে। "কেরাণির পকেটে পকেটে একশত টাকার নোট ফেরে। রঘুনাথ সত্যই বলিয়াছে।" পরে রামাচরণকে বলিলেন—"ভাল, ইহাতে সই করিয়া দাও। বাকী টাকার কি হইবে? যদি কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতে পার, আমি তোমায় পীড়ন করিতে ইচ্ছা করিব না।" এই সময়ে রঘুনাথ অফিসে আসিলেন।

রঘুনাথ উত্তর করিল—"সাহেব! আপনি অন্নদাতা পিতা, এ ঘোর বিপদে আপনাকে রক্ষা করিতেই হইবে। সাহেব! হ্যাণ্ডনোট লইয়া রামাচরণ বাবুকে ক্ষমা [illegible] করিতেই হইবে। হ্যাণ্ডনোট আদায়ের সন্দেহ নাই, বসতবাটী আছে, স্ত্রীর গহনা আছে।"

সাহেব।—'ভাল। আমি পতিত ব্যক্তিকে পীড়ন করিতে চাহি না। তোমার জামিনের টাকার স্বত্ব ত্যাগ লিখে দাও, এই একশো নগদ, আর চারিশত টাকার হ্যাণ্ডনোট দাও। সমস্ত টাকা মাপ করিতে পারিতাম, কিন্তু আমি একা কর্ত্তা নই।' সেইরূপ হইল। সাহেব যাহা যাহা বলিলেন, রামাচরণ কলের পুতুলের মত সম্পন্ন করিলেন। সকল কার্য্য শেষ হইলে, সাহেব বলিলেন—"বাবু! তোমাকে আর চাকরিতে রাখিতে পারি না। তোমার ছাড়িতে কষ্ট বোধ হইতেছে কি না

বলিতে পারি না. কিন্তু তোমাকে ছাড়াইতে আমার বড় কষ্ট বোধ হইতেছে। বামাচরণ। আজ দশ বৎসর কোম্পানির নিমক খাইতেছ, কি প্রলোভনে তুমি এই দুষ্কার্য্য করিলে? তোমাকে স্নেহ করিতাম, তোমার বিশ্বাসঘাতকতায় আমি বড় আঘাত পাইয়াছি। বাবু! তোমাকে বড় বিশ্বাস করিতাম, বড় বিশ্বাস করিতাম।"

লোহার সিন্দুক বন্ধ করিয়া সাহেব চাবি লইয়া উঠিয়া গেলেন। কলের পুতুলের মত বামাচরণ চৌকি হইতে উঠিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন আফিসের সমস্ত কর্ম্মচারী তাঁহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছে—"এই বিশ্বাসঘাতক, এই চোর।" আফিস হইতে বহির্গত হইয়া যখন রাস্তায় পড়িলেন, তখন বেলা প্রায় তিনটা। রাজপথে লোক গম্ গম্ করিতেছে। চারিদিকে সাগর গর্জ্জনের ন্যায় জন কোলাহল। বামাচরণের মনে হইল, সেই কোলাহল ভেদ করিয়া, বজ্র-গম্ভীর রবে কে যেন বলিতেছে—"ঐ যায়, ঐ যায়, ঐ বিশ্বাসঘাতক, চোর।" আর সেই সঙ্গে সঙ্গে নীরবে তাঁহার অন্তর বলিতেছে—"তোমায় বড় বিশ্বাস করিতাম. তোমায় বড় বিশ্বাস করিতাম।"

বামাচরণের মনে হইল. যেন তাঁহার নিঃশ্বাস রোধ হইতেছে। বাটীর পথে না চলিয়া, মাঠের দিকে চলিলেন। মাঠে উপস্থিত হইয়া, নির্জ্জন স্থানে একটা বৃক্ষমূলে একখানি বেঞ্চের উপর বসিলেন, মস্তিষ্কের ভিতর যেন একটা প্রবল ঝড় উঠিয়াছে। বামাচরণ ঘোরতর চিন্তামগ্ন, কিন্তু কি ভাবিতেছেন. কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। উঃ। ঐ সূর্য্য পূর্ব্বগগন হইতে পশ্চিমে না যাইতে যাইতে, কি পরিবর্ত্তন। দশ বৎসরের শ্রম, যত্ন, অধ্যবসায়, সাধনা নিমেষে শেষ হইল। হায়। কালে গড়ে, মুহূর্ত্তে ভাঙ্গে। দশ বৎসর ধরিয়া প্রভুর মনে যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, এক মুহূর্ত্তে তাহা ধ্বংস হইল। দশ বৎসর ধরিয়া যে সুনাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা মুহূর্ত্তে বিলুপ্ত হইল। দশবৎসর একান্তে অন্তরের অন্তরে যে আশা পোষণ করিয়াছেন, তাহা মুহূর্ত্তে পুড়িয়া ছাই হইল। সব গেল, রহিল কেবল—নিস্ফল কলঙ্কিত জীবন, হতাশ আর হাহাকার। হায়! গতকাল আফিস হইতে বাটী যাইবার সময়ও কিছু জানিতেন না। আজ পূর্ব্বাহ্নে, আফিসে আসিবার সময়, হাসিমুখে খোকার সহাস মুখকমল চুম্বন করিয়া, হাস্যাননা নৃত্যকালীর কোলে তাহাকে সমর্পণ করিতে করিতে, বলিয়া আসিয়াছেন—"আজ তোমাদের পূজার পোষাক আনিব।" সেইজন্য একশত টাকার নোট লইয়া বাহির হইয়াছিলেন। হরি! হরি! পূজার পোষাকের পরিবর্ত্তে, গৃহে লইয়া

যাইতেছেন— নিরাশ, নিরানন্দ আর অপবাদ। উঃ! এই অল্প সময়ের মধ্যে কি দারুণ পরিবর্ত্তন। বামাচরণের ভয় হইল—কেমন করিয়া গৃহে ফিরিবেন, গৃহে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবেন। এখনি যদি মৃত্যু হয়—বামাচরণ উঠিলেন, ধীরে ধীরে গঙ্গা অভিমুখে চলিলেন। কেল্লার কূল নির্জ্জন—সেইদিকে চলিলেন। অন্তরের তাপে বামাচরণ বাহিরের উত্তাপ বুঝিতে পারেন নাই। মাথা ঘুরিতে লাগিল। গঙ্গাকূলে আসিয়া বসিলেন, চ'খে মুখে মাথায় একটু জল দিলেন। গলিত স্বর্ণের ন্যায় জলরাশি কল কল করিয়া ছুটিতেছে; বামাচরণের মনে হইল, কে যেন তাঁহাকে দেখিয়া খল খল করিয়া হাসিয়া বলিতেছে—"বিশ্বাসঘাতক, চোর। গঙ্গার পবিত্র নীর স্পর্শ করিস্‌নি।" অমনি চারিদিকের পাখী সব 'চোর, চোর' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। মুখে চ'খে মাথায় জল দিতে, শীতল সমীরস্পর্শে, বাম চরণের উত্তপ্ত মস্তিষ্ক কথঞ্চিৎ শীতল হইল—চক্ষে জল আসিল। হৃদয়ের রুদ্ধ সাগর অশ্রুধারে প্রবাহিত হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"মা! সর্ব্বসন্তাপহারিণী। তোমার কোলে আমায় স্থান দাও।" এই সময় বামাচরণ দেখিলেন, দুইজন গোরা বেড়াইতে আসিয়াছে। ভাবিলেন, তাহারা তাঁহার কথাই আন্দোলন করিয়া হাসিতেছে। আস্তে আস্তে উঠিলেন। তখন সূর্য্য অস্ত হইয়াছে, বামাচরণের মনে হইল, আকাশব্যাপী অন্ধকার যেন তাঁহার জীবনের মান, সম্ভ্রম, আশা, ভরসা, সুখ, শান্তি গ্রাস করিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছে—বামাচরণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, 'ত্রিশবৎসর বয়সেই সব ফুরাইল"। রোদনে হৃদয়ের অশান্ত বেগ কথঞ্চিৎ শমিত হইয়াছে, কিন্তু বুকের উপরে যেন পাথর চাপান, আর তাহার অভ্যন্তরে যেন একটা কাতর ক্রন্দন-ধ্বনি উঠিতেছে—"তোমায় বিশ্বাস করিতাম, বড় বিশ্বাস করিতাম।"

বামাচরণ ধীরে ধীরে আবার চিৎপুর রোডে আসিয়া পড়িলেন। মন্দপদে বাটী অভিমুখে চলিলেন।—এই অবস্থায় তাঁহাকে আমরা প্রথম দেখি।

যখন বাটী পঁহুছিলেন, তখন প্রায় প্রহরেক রাত্রি, খোকা তখনও ঘুমায় নাই। পিতার আগমন প্রতীক্ষায় জাগিয়া আছে। নৃত্যকালী আত্মভাব লুকাইয়া, তাহাকে ভুলাইতেছেন—"পোষাক কিনিতে বিলম্ব হইতেছে।" বালক বলিতেছে, "আমি পোতাক পোল্‌বো না।" এমন সময়, চোরের মত বামাচরণ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অন্যদিন প্রাঙ্গণে তাঁহার পদশব্দ পাইয়া খোকা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার কোলে উঠিয়া গলা জড়াইয়া ধরে, নৃত্যকালী বন্ধনশালা হইতে বাহির হইয়া হাস্যাননে সহাস নয়নে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন, কিন্তু মাতা

পুত্র কেহই আজ পদশব্দে তাঁহার আগমনবার্ত্তা পায় নাই—বামাচরণ অপরাধীর মত আত্মগৃহে প্রবেশ করিলেন। খোকা তাঁহার মুখ দেখিয়া আজ আর ছুটিয়া আসিল না। বামাচরণ ভাবিলেন, "পবিত্র শিশু অপবিত্র সংস্পর্শে আসিতে সঙ্কুচিত হইতেছে।"

সতী স্বামীর মুখ দেখিয়াই বুঝিলেন, কোন গভীর মর্ম্মবেদনায় বামাচরণ ব্যথিত। কিন্তু সহসা সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করিয়া, কেবল মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত রাত হোল যে?" বামাচরণ কোন উত্তর না দিয়া একদৃষ্টে ক্ষীণ দীপালোক দেখিতে লাগিলেন। নৃত্যকালী খোকাকে কোল হইতে নামাইয়া, আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, পতিসেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

স্বামীকে শান্ত করিয়া নৃত্যকালী দিনের বিবরণ সব শুনিলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হতাশ কণ্ঠে বামাচরণ বলিলেন, "কর্ম্ম গেছে তার জন্য এক তিল দুঃখ নাই। এক দরজা বন্ধ হাজার দ্বার মুক্ত। হায়! দরিদ্রের একমাত্র সম্বল আমার সুনাম গিয়াছে। যদি বিচারে আমায় সমর্পণ করতো, মাথা পেতে দণ্ড নিতুম্। কিন্তু দয়াদ্র-হৃদয় সাহেব আমায় যা দণ্ড দিয়েছেন, স্বর্গে মর্ত্তে নরকে, বোধ হয়, তার চেয়ে গুরুতর দণ্ড নাই! মর্ম্মভেদী কাতরস্বরে সাহেব আমায় বল্লেন—'তোমায় বড় বিশ্বাস কর্‌তুম। তোমায় ছাড়াতে আমার মনে কষ্ট হচ্ছে।' নৃত্য। আমি অতি হতভাগ্য। এই নরদেবতার বিশ্বাস আমি হারিয়েছি।"

নৃত্য।—"তুমি সাহেবকে কেন কিছু বল্লে না?"

বামা।—"কি বোল্‌বো? আমি নিত্য তহবিল মিলাই নাই, এ কথা কে বিশ্বাস কর্‌বে? বিশ্বাস একবার গেলে আর হয় না।"

নৃত্য।—"ধৈর্য্য ধর, ধর্ম্ম বিচার কর্ব্বেন।"

বামা।—"ধর্ম্ম! কলিকালে অধর্ম্মই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম যদি থাক্‌তো, নিরপরাধীর দণ্ড হো'ত না।"

নৃত্য।—"নিরপরাধী কেন বোল্‌ছ?"

বামাচরণ চমকিয়া উঠিলেন, নৃত্য তাঁহাকে সন্দেহ করিতেছে।

নৃত্য।—"ছিঃ ছিঃ, তুমি আমায় এমন পাপিষ্ঠা মনে করোনা, তোমায় সন্দেহ কর্‌বো।"

বামা।—"তবে কি অপরাধ?"

নৃত্য।—"তুমি নিত্য কেন তহবিল মিলাইতে না? সেত তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তা হোক, টাকার তো পাখা নাই, উড়ে যায় নি! গেল কোথা?"

বামা।—"কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না—হয়ত কাউকে দিয়েছি, লেখাতে ভুল হয়েছে, নয়ত কোন নোটের সঙ্গে ঐ হাজার টাকার নোট বেরিয়ে গিয়েছে।"

নৃত্য।—"সে কথা কেন সাহেবকে বোঝালে না?"

বামা।—"কি বোঝাব? নৃত্য, এ পাজি চাকরি—এতে ভুল বলে কথা নাই—এতে ভুলও চুরি।"

নৃত্য।—'কাউকে তোমার সন্দেহ হয় না?'

বামা।—"কাকে সন্দেহ করবো? আমি আর রঘুনাথ ছাড়া ক্যাসে ত অপর লোক নাই। রঘুনাথ হিসাব রাখে, তহবিল জিম্মা আমার।"

নৃত্য।—"তুমি যেদিন না যেতে, সেদিন কার হাতে তহবিল থাকৃত?"

বামা।—"সেদিন অবশ্য রঘুনাথ আমার কায কর্‌ত। তহবিল তার হাতেই থাকৃত, কিন্তু আমি উপস্থিত হলেই, সে নিজে জেদ করে তহবিল মিল করে বুঝিয়ে দিয়েছে, আর এদানি ত আমার কামাই হয়নি। কাকে সন্দেহ কোর্‌ব? আমাকে, না রঘুনাথকে? আমি আপনাকে আপনি সন্দেহ করিতে পারি, রঘুনাথকে নয়।"

নৃত্য।—"কেন নয়?"

সত্যই ত। কেন নয়? রঘুনাথ বিশ্বাসী? যে বিশ্বাসের পাত্র, সেই ত বিশ্বাস-হন্তা হয়। বামাচরণ রঘুনাথের পূর্ব্ব বিবরণ কিছুই অবগত নন্। কখন জানিবার চেষ্টাও করেন নাই। উদার হৃদয়ে দরিদ্রকে আশ্রয় দিয়াছেন। কেবল আশ্রয় কেন? আদর, যত্ন, স্নেহ, বিশ্বাস সকলই দিয়াছেন। পাছে দরিদ্র রঘুনাথ মনে করে—"আমায় অবিশ্বাস করিয়া হিসাব দেখিতে চাহিতেছেন"—এই ভাবিয়া বামাচরণ রঘুনাথের হিসাব কখন পরীক্ষা করেন নাই। হস্তে অস্ত্র দিয়া যাহাকে হৃদয় পাতিয়া দিয়াছেন, আঘাত করিতে তার কি হাত উঠে? কেন নয়? কেন নয়?—বামাচরণ উত্তর দিতে পারিলেন না। নৃত্যকালীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

সন্তান-বৎসল, স্বভাবতঃ স্বচ্ছন্দ-প্রিয়, উদার, অসন্দিগ্ধচিত্ত—সংসারে যে পদে পদে বিপদ, প্রতিপদক্ষেপে সাবধান সতর্কতার প্রয়োজন—সংসার-অনভিজ্ঞ বামা-

চরণ তাহা বুঝিতেন না, সরল হৃদয় বামাচরণ জানিতেন না—পরোপকারের প্রতিদান—কৃতঘ্নতা, বিশ্বাসের প্রতিদান—তীক্ষ্ণশান ছুরিকা।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বামাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"রঘুনাথ কোথায়?" রঘুনাথ তখনও বাটী আসে নাই। রাত্রি ক্রমে বাড়িতে লাগিল। চিন্তাহীন শিশু সুখে ঘুমাইতেছে, কাল কি হইবে, সে চিন্তা তাহার নাই। চিন্তাকুল বামাচরণ ভাবিতেছেন,—"কাল লোকের কাছে কেমন করিয়া মুখ দেখাইব।"

নৃত্যকালী বলিলেন—"রাত হয়েছে, শোও। কি ভাবছ?"

বামা।—"কাল মুখ দেখাব কেমন ক'রে?"

নৃত্য।—"কেন? তুমি ত সত্য সত্য চোর নও।"

বামা।—"কে জানে? কে বিশ্বাস কর্ব্বে?"

নৃত্য।—"ধর্ম্ম জানেন, ধর্ম্ম বিচার কর্ব্বেন।"

ক্রমশঃ।

স্বামি-শিষ্য সংবাদ।

[শ্রীশরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।]

(নীলাম্বর বাবুর বাগানে।)

বেলুড়।

স্বামীজি যে বৎসর ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসেন, সেই বৎসর দক্ষিণেশ্বরে, রাণী রাসমণির কালীবাটীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মোৎসব হয়। কিন্তু নানা কারণে পর বৎসর দক্ষিণেশ্বরে উৎসব বন্ধ হয় এবং যদিও তখন বর্ত্তমান মঠের জমি খরিদ হইয়াছিল, তথাপি সে বৎসর জন্মোৎসব নূতন জমিতে হ'তে পায় নাই। কারণ তখনও মঠের জমি জঙ্গলে পূর্ণ ছিল এবং সমতল ছিল না। তাই সেবার রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব বেলুড়ে দাঁদের ঠাকুরবাড়ীতে হয়। ঐ উৎসবের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ফাল্গুনী ২য়া তিথিতে, নীলাম্বর বাবুর বাগানেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পূজা হয়। স্বামীজি তখন ঐ বাগানেই অবস্থান করিতেছিলেন। এবার জন্মতিথি পূজায় বিপুল আয়োজন। স্বামীজির আদেশ মত ঠাকুর ঘর পরিপাটি দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। স্বামীজি ঘুরে ফিরে সব তদারক্ করে বেড়াচ্ছেন।

জন্মতিথির সুপ্রভাতে সকলেই আনন্দিত। কেবল ঠাকুরের কথা ছাড়া ভক্তদের মুখে আর কোন কথা নাই। স্বামীজি পূজার ঘরের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া, পূজার আয়োজন দর্শন করিতেছেন। স্বামী প্রেমানন্দ এবার পূজক পদে ব্রতী হইয়াছেন।

পূজার তত্ত্বাবধান শেষ করিয়া স্বামীজি শিষ্যকে বলিলেন, "পৈতা এনেছিস ত ?"

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ। আপনার আদেশ মত সব প্রস্তুত। কিন্তু এত পৈতার যোগাড় কেন বুঝিতেছি না।

স্বামীজি। দ্বিজাতি মাত্রেরই উপনয়ন সংস্কারে অধিকার আছে। বেদ স্বয়ং তার প্রমাণ স্থল। আজ ঠাকুরের জন্মদিনে যারা আসবে, তাদের সকলকে পৈতে পরিয়ে দিবি। এরা সব ব্রাত্য (পতিত সংস্কার) হয়ে গেছে। শাস্ত্র বলে, ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই আবার উপনয়ন সংস্কারের অধিকারী হয়। আজ ঠাকুরের শুভ জন্মতিথি—সকলেই তার নাম নিয়ে শুদ্ধ হবে। তাই আজ সমাগত ভক্ত-মণ্ডলীকে পৈতে পরাতে হবে। বুঝ্‌লি ?

শিষ্য। আমি আপনার আদেশ মত ১৫০টী পৈতা সংগ্রহ করে এনেছি। পূজান্তে আপনার অনুমতি অনুসারে সমাগত ভক্তগণকে উহা পরাইয়া দিব।

স্বামীজি। ব্রাহ্মণেতর ভক্তদিগকে এইরূপ গায়ত্রী মন্ত্র (এখানে শিষ্যকে ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজাতীর গায়ত্রী মন্ত্র বলিয়া দিলেন) দিবি। সকলকে ব্রাহ্মণপদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে। ঠাকুরের ভক্তদের তো কথাই নাই, হিন্দু মাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই। ছোঁবনা ছোঁবনা ব'লে, ইহাদিগকে আমরাই হীন করে ফেলেছি। তাই দেশটা হীনতা, ভীরুতা, মূর্খতা ও কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠায় গিয়াছে। এদের তুলতে হবে—অভয় বাণী শুনাতে হবে। বলতে হবে—তোরাও আমাদের মত মানুষ, তোদেরও আমাদের মত সব অধিকার আছে। বুঝ্‌লি ?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজি। এখন যারা পৈতে নেবে, তাদের গঙ্গাস্নান করে আসতে বল্‌। তারপর ঠাকুরকে প্রণাম করে সবাই পৈতে পর্‌বে।

স্বামীজির আদেশ মত সমাগত প্রায় ১০০ ভক্ত ক্রমে গঙ্গাস্নান ক'রে এসে, শিষ্যের নিকট গায়ত্রী মন্ত্র ও পৈতে পরিতে লাগিল। মঠে হুলস্থূল। পৈতা

প'রে ভক্তগণ আবার ঠাকুরকে প্রণাম করিল এবং স্বামীজির পাদপদ্মে প্রণত হইল। তাদের দেখে স্বামীজির মুখারবিন্দ যেন শতগুণে প্রফুল্ল হইল। এর কিছু পরেই শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ঘোষজা মহাশয় মঠে উপস্থিত হইলেন।

• এইবার স্বামীজির আদেশে সঙ্গীতের উদ্যোগ হইতেছে। মঠের সন্ন্যাসীরা আজ স্বামীজিকে মনের সাধে সাজাইতেছেন। কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল, সর্ব্বাঙ্গে কর্পূরধবল পবিত্র বিভূতি, মস্তকে আপাদলম্বিত জটাভার, বাম হস্তে ত্রিশূল, উভয় বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয়, গলে আজানুলম্বিত ত্রিবলয়ীকৃত বড় রুদ্রাক্ষমালা। ঐ সকল পরিয়া স্বামীজির রূপের যে শোভা হইয়াছে, তাহা বলিয়া ফুরাইবার নহে। সেদিন যে যে সেই মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল—সাক্ষাৎ বালভৈরব স্বামি-শরীরে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্বামীজি নিজেই অন্যান্য সন্ন্যাসীদিগের অঙ্গে বিভূতি মাখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা স্বামীজির চারিদিকে প্রত্যেকেই মূর্ত্তিমান ভৈরবগণরূপে অবস্থান করিয়া, আজ মঠভূমিতে কৈলাসাচলের শোভা বিস্তার করিয়াছেন। সে দৃশ্য স্মরণ করিয়াও আজ নবজন্ম সার্থক বলিয়া জ্ঞান হইতেছে।

স্বামীজি পশ্চিমাস্যে মুক্ত পদ্মাসনে বসিয়া "কূজন্তং রামরামেতি" স্তবটী মধুর মধুর উচ্চারণ করিতেছেন। স্তবান্তে কেবল "রাম রাম শ্রীরাম রাম" এই কথা পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতেছেন। অক্ষরে অক্ষরে যেন সুধা বিগলিত হইতেছে। অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্র, হস্তে তানপূরার সুর বাজিতেছে। আর অবিরাম কেবল 'রাম রাম শ্রীরাম রাম' ধ্বনি ভিন্ন মঠে কিছুই শুনা যাইতেছে না। এইরূপে প্রায় অর্দ্ধাধিক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। কাহারও মুখে কোন কথাটী নাই। স্বামীজির কণ্ঠ নিঃসৃত সেই রাম নাম সুধা সকলেই যেন আজ পান করিয়া মাতোয়ারা হইয়াছেন। শিষ্য ভাবিতেছে, আজ স্বামীজি কি আপন ভাবে (শিবভাবে) মাতোয়ারা হইয়া রাম নাম করিতেছেন। দর্শকগণ যেন "চিত্রার্পিতা-বস্তুইবাবতস্থে"। স্বামীজির মুখের গাম্ভীর্য্য যেন আজ শতগুণে গভীরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্দ্ধ-নিমীলিত-নেত্র-প্রান্তে যেন প্রভাত-সূর্য্যের আভা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। আর গভীর নেশার ঘোরে যেন সেই বিপুল দেহ টলিয়া পড়িতেছে। সে রূপ বর্ণনা করিবার নহে, বুঝাইবার নহে; অনুভূতির বিষয়।

স্তবান্তে স্বামীজি ঘুমের ঘোরে যেন গান গাইতেছেন—'সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই'। বাদক তেমন ভাল ছিল না। স্বামীজির যেন রসভঙ্গ হইতে

লাগিল। তাই সারদানন্দ স্বামীপাদকে গাইতে অনুমতি করিয়া নিজেই পাখোয়াজ ধরিলেন। স্বামী সারদানন্দ প্রথমতঃ "এক রূপ অরূপ নাম বরণ" গানটী গাইলেন। মৃদঙ্গের স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষে গঙ্গা যেন উথলিয়া উঠিল এবং স্বামী সারদানন্দের সুকণ্ঠও সঙ্গে সঙ্গে মধুর আলাপে গৃহ ছাইয়া ফেলিল। তৎপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে সকল গান গাহিতেন, ক্রমে সে গুলি হইতে লাগিল।

এইবারে সহসা স্বামীজি নিজের বেশভূষা খুলিয়া সমাসীন গিরিশ বাবুকে সাদরে ঐ সকল পরাইয়া সাজাইতে লাগিলেন। নিজহস্তে গিরিশ বাবুর বিশাল দেহে ভস্ম মাখাইয়া দিতে লাগিলেন। কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে জটাভার, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ, বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয়। গিরিশ বাবুর সে মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তগণ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্বামীজি বলিতেছেন—"পরমহংসদেব বলিতেন, 'ইনি ভৈরবের অবতার।' আমাদিগের সহিত ইঁহার কোন প্রভেদ নাই।" গিরিশ বাবু নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভায়েরা তাঁকে আজ যেরূপ সাজে সাজাইতেছেন, তাতেই তিনি রাজী। স্বামীজি ও অন্যান্য সন্ন্যাসীরা গিরিশ বাবুকে লইয়া আজ কত আনন্দ করিতেছেন। স্বামীজির আদেশে অবশেষে একখানি গেরুয়া কাপড় আনাইয়া গিরিশ বাবুকে পরান হইল। গিরিশ বাবু কোন আপত্তি করিলেন না। আজ তাঁর গুরুভাইদের ইচ্ছায় তিনি যেন অবাধে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন। স্বামীজি অবশেষে বলিতেছেন—"জি, সি * আজ আমাদিগকে ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) কথা শুনাইবেন, তোরা সব স্থির হয়ে বোস।" গিরিশ বাবুর মুখে কোন কথা নাই। স্বামীজির মুখপানে তাকাইয়া যেন সেই অনিন্দিত রূপ রাশি পান করিতেছেন অথবা যাঁহার জন্মোৎসবে আজ সকলে মিলিত হইয়াছেন, তাঁহার লীলা দর্শনে, তাঁহার সাক্ষাৎ পার্ষদগণের আনন্দ দর্শনে, যেন তিনিও আনন্দে জড়বৎ হইয়াছেন। অবশেষে গিরিশ বাবু বলিতেছেন—"দয়াময় ঠাকুরের কথা আমি আর কি বলিব? তবে কামকাঞ্চনত্যাগী তোমাদের ন্যায় বালসন্ন্যাসীদের সঙ্গে যে তিনি এ অধমকে একাসনে বসিতে অধিকার দিয়াছেন, এতেই তাঁর অপার করুণা অনুভব করি।" কথাগুলি বলিতে বলিতে গিরিশ বাবুর যেন কণ্ঠরোধ হইতেছে।

স্বামীজি এবারে হিন্দি গান ধরিয়াছেন। "বৈঁইয়া না পাকাড়ো মেরা নরম কলাইয়াঁ" ইত্যাদি। শিষ্য সঙ্গীত-বিদ্যায় একেবারে পণ্ডিত, তাই ঐ সকল

* গিরিশবাবুকে স্বামীজি 'জি, সি,' বলিয়া ডাকিতেন।

গানের এক কথাও বুঝিতে পারিল না, কেবল স্বামীজির মুখপানে অনিমিষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এইবার প্রথম পূজা শেষ হইয়াছে—ভক্তগণকে জলযোগ করিবার জন্য ডাকা হইয়াছে। জলযোগ সাঙ্গ হইবার পর স্বামীজি নীচের বৈঠকখানার ঘরে বসিয়াছেন। অসংখ্য ভক্ত তাঁহাকে ঘিরে বসিয়াছে। একটী নবীন উপবীতধারী গৃহস্থকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজি বলছেন—"তোরা হচ্ছিস্ দ্বিজাতি, বহুকাল থেকে ব্রাত্য হয়ে গিছিলি। আজ থেকে আবার দ্বিজাতি হলি। প্রত্যহ গায়ত্রী মন্ত্র অন্ততঃ একশ বার জপ্‌বি, বুঝ্‌লি।" গৃহস্থটী "যে আজ্ঞে" বলিয়া স্বামীজির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। ইতিমধ্যে মহেন্দ্র মাষ্টার মহাশয় উপস্থিত হইলেন। স্বামীজি মাষ্টার মহাশয়কে দেখেই "এই মাষ্টার মশায় যে ?" বলিয়া আপ্যায়িত করিতেছেন। মহেন্দ্র বাবু প্রণাম করিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়া যেন স্বামীজির সেই অনিন্দিত রূপরাশি পান করিতেছেন। স্বামীজি বসিতে বলায় জড়সড় ভাবে এক কোণে উপবিষ্ট হইলেন।

স্বামীজি। মাষ্টার মশায়, আজ ঠাকুরের জন্মদিন। ঠাকুরের কথা আজ আমাদের কিছু শুনাতে হবে।

মাষ্টার মশায় মৃদুহাস্যে অবনত মস্তকে আছেন। কোন কথাই কহিতেছেন না। ইতিমধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদ থেকে ৮।১০ সের ওজনের দুটী পান্তুয়া লইয়া মঠে উপস্থিত হইয়াছেন। পান্তুয়া দেখিতে সকলে ছুটিয়াছেন। স্বামীজিকে দেখান হ'লে পর স্বামীজি বলিলেন—"ঠাকুর ঘরে নিয়ে যা।"

স্বামীজি অখণ্ডানন্দকে উদ্দেশ করিয়া শিষ্যকে বলিতেছেন—"দেখ ছিস কেমন কর্ম্মবীর। ভয়, মৃত্যু এ সব এর জ্ঞান নাই, এক রোকে কর্ম্ম ক'রে যাচ্ছে—বহু জন হিতায়, বহু জন সুখায়।"

শিষ্য। মশায়, কত তপস্যার বলে ঐ শক্তি এসেছে।

স্বামীজি। তপস্যার ফলে শক্তি আসে। আবার পরার্থে কর্ম্ম ক'লেই তপস্যা করা হয়। কর্ম্ম-যোগীরা কর্ম্মটাকেই তপস্যার অঙ্গ বলে। তপস্যা করিতে করিতে যেমন পরহিতেচ্ছা বলবতী হয়ে কর্ম্ম করায়, পরের জন্য কায কর্‌তে কর্‌তে তেমনি পরাতপস্যার ফল হয়, পরমাত্মার দর্শন ঘটে।

শিষ্য। পরের জন্য প্রথমেই প্রাণ দিয়ে কার্য্য কর্‌তে কয় জন পারে ? মনের সে উদারতা আস্‌বে কেন, যাতে আত্মসুখেচ্ছা বলি দিয়ে জীব পরার্থে জীবন দিবে ?

স্বামীজি। তপস্যাতেই বা কয় জনের মন যায়? এই কামকাঞ্চনের আকর্ষণে কয় জনই বা ভগবান্ লাভে আকাঙ্ক্ষা করে? তোর তপস্যাও যেমন কঠিন, নিষ্কাম কর্ম্মও সেইরূপ। কিন্তু যারা পরহিতে কার্য্য ক'রে যায়, তাদের বিরুদ্ধে তোর কিছু বল্‌বার অধিকার নাই। তোর তপস্যা ভাল লাগে ক'রে যা, আর এক জনের কর্ম্ম ভাল লেগেছে—তাকে তোর বল্‌বার অধিকার কি? তুই বুঝি বুঝে রেখেছিস্—কর্ম্মটা আর তপস্যা নয়।

শিষ্য। আমি তপস্যা অর্থে অন্যরূপ বুঝেছিলাম। এখন বুঝ্‌লাম।

স্বামীজি।' যেমন সাধন ভজন অভ্যাস কর্‌তে করতে তাতে রোক্ হয়, তেমনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কায করতে কর্‌তে হৃদয় ক্রমে খুলে যায়। ক্রমে কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, বুঝ্‌লি? বলি—একবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরের সেবা ক'রে দেখ্ না, ক্রমে তপস্যার ফল লাভ হয় কি না। পরার্থ কর্ম্মের ফলে মনের আঁক বাঁক ভেঙ্গে যায় মানুষ ক্রমে অকপট হয়। ক্রমে পর হিতে প্রাণ দিতে উন্মুখ হয়।

শিষ্য। পর হিতে প্রয়োজন।

স্বামীজি। নিজ হিতের জন্য। এই দেহটা, যাতে 'আমি' অভিমান করে বসে আছিস, এই দেহটা পরের জন্য ভাবতে গেলে এই আমিত্বটাও ভুলে যেতে হয়। অন্তিমে বিদেহ বুদ্ধি আসে। তুই যত একাগ্রতার সহিত পরের ভাবনা ভাববি, ততই আপনাকে ভুলে যাবি। যখন এইরূপ কর্ম্মে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয়ে আসবে, তখন তোরই আত্মা সর্ব্ব জীবে সর্ব্ব ঘটে বিরাজমান দেখতে পাবি। তাই পরের হিতসাধন হচ্ছে আপনার আত্মার বিকাশের একটা উপায়, একটা পথ।' এও, জানবি, এক প্রকারের ঈশ্বর সাধন। ইহার উদ্দেশ্যও হচ্ছে—আত্মবিকাশ। জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সাধনা দ্বারা যেমন আত্মবিকাশ হয়, পরার্থে কর্ম্ম দ্বারাও ঠিক তাই হয়।

শিষ্য। আমি যদি দিন রাত পরের ভাবনাই কর্‌ব, তবে আত্মচিন্তা কর্‌ব কখন? একটা ভাব নিয়ে পড়ে থাকলে অভাবরূপী আত্মার কিরূপে সাক্ষাৎকার হবে?

স্বামীজি। আত্মজ্ঞান লাভই সকল সাধনার, সকল পথের মুখ্য উদ্দেশ্য। তুই যদি কর্ম্মফলে চিত্তশুদ্ধি লাভ ক'রে, সর্ব্বজীবে আত্মদর্শন ক'রে, সেবাপর হোস্ ত আত্মদর্শনের বাকী কি রইল? আত্মদর্শন মানে কি জড়ের মত, এই দেয়াল বা কাঠের মত, ধ্যানস্থ হয়ে ব'সে থাকা?

শিষ্য। সমাধি মানে ত তাই। সর্ব্ব বৃত্তি ও কর্ম্মের নিরোধই ত আত্মার স্ব-স্বরূপাবস্থান।

স্বামীজি। ও অবস্থা ত আর সহজে লাভ হয় না। কদাচিৎ কাহার হলেও অধিক কাল স্থায়ী হয় না। তখন সে কি নিয়ে থাক্‌বে বল্? সেই অবস্থার পর সে ভূতে ভূতে আত্মদর্শন ক'রে অভিন্ন জ্ঞানে সেবাপর হ'য়ে, প্রারব্ধ ক্ষয় করে। এই অবস্থাটাকেই তোদের শাস্ত্রকাররা জীবন্মুক্তি অবস্থা বলে গেছেন।

শিষ্য। তবেই হচ্ছে যে, জীবন্মুক্তি অবস্থা লাভ না কর্‌লে ঠিক্ ঠিক পরার্থে কায হয় না।

স্বামীজি। আবার পরার্থে সেবাপর হ'তে হ'তে জীবন্মুক্তি অবস্থা ঘটে; বুঝ্‌লি, উভয়ই সত্যি।

শিষ্য এতক্ষণে বুঝিয়া স্থির হইল, আর কোন প্রশ্নই করিল না। স্বামীজি বল্‌লেন—"আর কিছু থাকে ত বল্‌না। তোদের মত ছেলেকে এ সব বুঝিয়ে সুখ হয়।" শিষ্য নির্ব্বাক্ হইয়া বল্‌লে—"আমার আর কিছু বল্‌বার নাই।"

স্বামীজি বল্‌লেন—"আজ ঠাকুরের জন্মতিথি, তাঁর ভক্তদের মুখে তাঁর কথা শোন্।" এইরূপ বলিতে বলিতে, কিন্নর-কণ্ঠে স্বামীজি গান ধরিলেন—

"দুঃখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছ আলো করে।
কেরে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর ঘরে॥" ইত্যাদি।

ভক্তেরা সকলে তাঁহার সঙ্গে ঐ গান গাইতে লাগিলেন। গিরিশ বাবুও গানে যোগ দিলেন। "তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে"—পদটী বার বার গাওয়া হইতে লাগিল। গান থেমে গেলে স্বামীজি মহেন্দ্র মাষ্টার মহাশয়কে কিছু গাইতে জিদ্ করিতে লাগিলেন। অগত্যা মাষ্টার মহাশয় গাইলেন,—"মজ্‌লো আমার মন ভ্রমরা কালী পদ নীলকমলে" ইত্যাদি। তারপর স্বামী সারদানন্দ ভক্তদের অনুরোধে গাহিতে লাগিলেন—"আগণন ভুবনভার ধারী" ইত্যাদি। এইবার তিথি পূজার নিয়মানুযায়ী একটী জীবিত মৎস্য জলে ছাড়া হইবে। তাই গান ভঙ্গ হইল। বাদ্যোদ্যমে মাছ গঙ্গায় ছাড়া হইল। স্বামী প্রেমানন্দ হলুদের রঙ সকলের গায়ে ছড়াইয়া দিলেন। তৎপরে মহা প্রসাদের ধূম। শিষ্যও সে প্রসাদের আহ্লাদে মাতিয়া যুক্তি তর্ক হারাইয়া প্রসাদ পেতে বসিল।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষমোচন কার্য্য।

মুর্শিদাবাদ জেলার মহুলা ও সোমপাড়া নামক স্থানে দুর্ভিক্ষমোচন কার্য্য পূর্ব্ববৎই চলিতেছে। উভয় কেন্দ্রে ২১টী করিয়া গ্রামে সাহায্য দেওয়া হইতেছে। প্রথম কেন্দ্র হইতে ২৮০ জন এবং দ্বিতীয় কেন্দ্র হইতে ৩৮৮ জন নিয়মিতভাবে সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে। সেখানকার সেবকেরা লিখিতেছেন যে, আগামী কার্ত্তিক মাস অবধি এই প্রকারে সাহায্য করা নিতান্ত আবশ্যক।

পুরী জেলার ফতেপুর কেন্দ্র হইতে ৩১ শে আগষ্ট তারিখে যে পত্র লিখিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। ইহাতে পাঠকগণ সেখানকার লোকের কিরূপ অবস্থা সম্যক্ বিদিত হইবেন।

"ইতিমধ্যে এখানে ভয়ানক বর্ষা হইয়া গিয়াছে। উহা গত বুধবার বিকাল বেলা হইতে শুক্রবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত হইয়াছিল। আগাগোড়া সমস্ত জমি ডুবিয়া গিয়া লোকের মহা অনিষ্ঠ হইয়াছে। ধান গাছ সমুদায়ই পচিবার উপক্রম হইয়াছে। আর যে জমিতে বোয়া হইয়াছিল এই প্রবল বর্ষায় সে সমুদায় উঠিয়া গিয়া, শুধু জলপূর্ণ মাঠে পরিণত হইয়াছে। ক্ষেত হইতে এই জল বাহির করিয়া দিবারও কোন উপায় নাই। কারণ, সম্মুখে প্রবল চিল্কা হ্রদ বিদ্যমান। যে সকল বাঁধ দ্বারা এই সকল জমিকে চিল্কার লোনা জল হইতে রক্ষা করা হইয়াছে, সেই সকল বাঁধের স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়া, লোকের বিপদের উপর বিপদ উপস্থিত করিয়াছে। ভবিষ্যতের শস্য সম্বন্ধে সকলেই সন্দেহ করিতেছে।"

এই কেন্দ্র হইতে ৪৭টী গ্রাম, ৪৩২ পরিবার এবং ৬৯৯ জন লোক সাহায্য পাইতেছে।

তিতিপ কেন্দ্র হইতে ৩৪টী গ্রাম, ২৭৬ পরিবার এবং ৪৬৩ জন লোককে সাহায্য দেওয়া হইতেছে। এখানে অন্ততঃ ১৫ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত এইভাবে সাহায্য দিতে হইবে।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে প্রাপ্তি স্বীকার।

সংশোধিত মোট প্রাপ্তি স্বীকার	১১৫২৫।৶৩ পাই।
কর্ণম্ খাঁ	১২॥০
শ্রীমতী গোলাপ বাসিনি সিংহ	১৲
শ্রীযদুপতি চট্টোপাধ্যায	২০৲
শ্রীবিহারি লাল চট্টোপাধ্যায	২৲
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ দাস	২০৲
শ্রীতারিণি প্রসাদ রায়	২৲
শ্রীপ্রসন্ন কে বাণার্জি	২৲
শ্রীবিজয গোপাল বসু	১৲
জনৈক বন্ধু	১৲
শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ	১৲
শ্রীজয গোবিন্দ গুহ	১৲
জনৈক বন্ধু	১৲
ঐ ঐ	১৲
শ্রীবসন্ত কুমার রায়	১০৲
শ্রীশরৎচন্দ্র বাণার্জি	১৲
চাউল বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত	১১।০
শ্রীহরিদাস দত্ত	৫৲
শ্রীঅবনি চন্দ্র গুহ	১৲
শ্রীহরিচরণ মৌলিক	৩৲
সংগৃহীত	৩৸৬
বেলুড় মঠে ঐ	॥০
কলিকাতা হাইকোর্ট উকিল সম্প্রদায	১৫৲
জনৈক ভক্ত	১০৲
যুবক মণ্ডলি, কলিকাতা	১০৲
শ্রীসাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়	৫৲
মতিরাম বালকৃষ্ণ বেলকার	১০৲
মতিভাই গোপালভাই	১০৲
"কালিদাস," লাহোর	১৲

জে, ভট্টাচার্য্য	১৲
শ্রীশান্ত আবপার	১৸৶০
শ্রীহরিশ্চন্দ্র ঘোষ, পুরি	৫০০৲
কলেক্টর, পুরি	৫০০৲
সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ	১২৫৲
শ্রীধীরেন্দ্র নাথ রায়	১৲
শ্রীঅমৃত লাল দত্ত	৯৲
সীতাভাই	২৲
শ্রীমতী মৈত্রেয়ি, লণ্ডন	১৫৲
জে, লেমান	১০৲
এম্পায়ার ডায়েরি কোং, আমেদাবাদ	১০৲
ডি, কে, নাডু	৫৲
সি, কৃষ্ণন্, দিনদিগাল	২৲
বেদ সনাতন ধর্ম্ম মণ্ডল, আমেদাবাদ।	২৲
জনৈক বাঙ্গালী মহিলা, পোর্টব্লেয়ার	৫০৲
লক্ষণ আয়ার	৩৲
শ্রীশ্রীশচন্দ্র মিত্র	৪৲
শ্রীশশধর সেন	৫৲
স্বামী ত্রিগুণাতীত, আমেরিকা	৯২৲
বি, বসু দেব বর্ম্মন্	৫৲
শ্রীসুধির চন্দ্র মিত্র	৪৲
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দেব সরকার	২৫৲
শ্রীননিলাল পান	৮৲
সি আরুমু খাম	১৫৲
শ্রীমতী জি, কে, বসু	১৬৲
শ্রীকৈলাস চন্দ্র গাঙ্গুলি	৪৸৴০
ফ্রেণ্ডস্ চ্যারিটি ক্লব	৪।৴০
শ্রীচিন্তাহরণ বাণার্জি	১॥৶০
শ্রীকৈলাস চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	২৸০

মোট—১৩১১১৸৶৯ পাই।

সাহায্য প্রেরণের ঠিকানা :—স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া) অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, ৩০নং বসুপাড়া লেন, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা।

সম্পাদক মহাশয়,

অবশ্য আপনি জানেন যে, রামকৃষ্ণ মিশনের পুরী জিলার অন্তর্গত দুর্ভিক্ষ-মোচন কেন্দ্রে আমি এ বৎসর কিছুকাল চাউল বিতরণাদি করি। দুর্ভিক্ষের অন্নকষ্ট দেখিবার ইতিপূর্ব্বে আর আমার সুযোগ হয় নাই ;—এই আমার প্রথম হাতে খড়ি। চারিদিকে দু মুঠা পেটের অন্নের জন্য লোক হাহাকার করিতেছে—এ দৃশ্যের ভিতর থাকিয়া নিজে পেট ভরিয়া ভাত খাওয়াটা বিষম পাপ বলিয়া মনে হইত এবং মুদ্রা রাক্ষসের নিম্নলিখিত গল্পটী মনে পড়িত। ভাবিতাম—আমাদের দেশে অধুনা যে অন্ন রহিয়াছে, তাহা ঐ নাটকে লিখিত 'এক সরা ছাতুর' মত। উহা ভক্ষণে তাঁহাদেরই অধিকার আছে, যাঁহারা এই ভীষণ অন্নকষ্ট-রূপ রাক্ষসকে সপরিবারে বিনাশের জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ উক্ত গল্পটীর প্রায়ই আলোচনা করিয়া, সতীর্থদিগকে নিজ নিজ জীবনোদ্দেশ্য সাধনে, ঐরূপ দৃঢ় সংকল্প হইতে বলিতেন। উদ্বোধনের গ্রাহকগণের অনেকে হয়ত ঐ গল্পটী জানেন না এবং জানিলেও উহার পুনরাবৃত্তিতে সুখ বোধ করিবেন, এজন্য উহা সংক্ষেপে লিখিয়া পাঠাইলাম। পত্রিকার এক প্রান্তে স্থান দিলে কৃতার্থ হইব। ইতি—

আপনার অনুগত,

ব্রহ্মচারী—

এক সরা ছাতু।

পুরাকালে পাটলিপুত্র নগরে, মহারাজ নন্দ নামে, এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। শকটার নামে তাঁহার এক সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, রাজনীতি-বিশারদ মন্ত্রী ছিল। প্রজারা এই মন্ত্রীর সুশাসনে সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। বৃদ্ধ মন্ত্রী, মহারাজ নন্দের পিতার সময় হইতেই, সচিব পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাজেই, মহারাজ নন্দকে অনেক সময় বৃদ্ধ শকটারের কথায়, নিজের ইচ্ছামত প্রজাপীড়ন ও যৌবন-সুলভ ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি হইতে নিবৃত্ত হইতে হইত। এই রূপে যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই যেন রাজা বৃদ্ধ মন্ত্রীকে নিজের প্রবল কণ্টক

স্বরূপ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি করেন, প্রজারা মন্ত্রী শকটারকে তাঁহাপেক্ষা অধিক সম্মান দিত। সুতরাং রাজা, আপন সুখের বিঘ্ন স্বরূপ শকটারকে বিনাপরাধে কোনরূপ শাস্তি দিয়া, নিজের প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিতেন না। কিন্তু রাজা যদি বিরূপ হইয়া অধীনস্থ ব্যক্তির ছিদ্র অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে সে ব্যক্তি আর কত দিন নির্দ্দোষী থাকিতে পারে? বলা বাহুল্য, রাজানুগ্রহ লাভের আশায় অনেকেই বৃদ্ধ মন্ত্রীর অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল এবং তাহাদের চক্রান্তে শীঘ্রই তাহার নামে এক কুৎসিত অপবাদ রটনা হইল। সেই ছলে রাজা, সাত পুত্র এবং পত্নীর সহিত শকটারকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন এবং যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিতে লাগিলেন। কথিত আছে, রাজাজ্ঞায় মন্ত্রী ও তাহার পরিবারবর্গের জীবন ধারণের জন্য প্রতি দিন এক সরা পরিমিত ছাতু ও এক সরা জল মাত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

শকটার, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া রাজারই সমুদয় চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া, তাহার উপর জাতক্রোধ হইল এবং কোনরূপে ইহার প্রতিশোধ লইতেই হইবে, এই বিষয়ে স্থিরসংকল্প হইয়া, পুত্রদিগকে সম্বোধিয়া কহিল—"বৎসগণ! রাজা আমাদিগের যে আহার বিধান করিয়াছেন, তাহাতে সকলের কথা দূরে থাক্, একজনও জীবন ধারণ করিতে পারিব কি না, সন্দেহ। অতএব তোমাদের মধ্যে যে এই দুরাচার রাজা নন্দের বংশ উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হইতে পারিবে, সেই ইহা ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ কর।"

পুত্রেরা বলিল—"পিতঃ! প্রবল রাজ শত্রুর বিপক্ষতাচরণ করিতে হইলে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন। আমাদিগের বিবেচনায় আপনিই ঐ দুরূহ কার্য্য সাধনে সক্ষম। আপনি ব্যতীত আমাদের আর কেহই ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। অতএব আপনিই ইহা ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করুন।"

শকটারের হৃদয় তখন ভীষণ প্রতিহিংসানলে দগ্ধ হইতেছে। সে ভাবিয়া দেখিল, পুত্রেরা যথার্থ কথাই বলিয়াছে। আবার ভাবিল—পিতা হইয়া পুত্রদের মৃত্যুই বা কেমন করিয়া দেখি। যাক্ প্রতিহিংসা, আমরা সকলেই মরি। আবার ভাবিল—এই সকল দুর্ব্বল স্নেহের পুত্তলিকে যে মারিল, তাহাকে না মারিয়া যদি মরি, তাহা হইলে নরকেও আমার স্থান হইবে না। এইরূপ নানা তোলাপাড় করিয়া অবশেষে সে ভীষণ কঠোরতায় হৃদয়কে বাঁধিয়া, সেই অণুমাত্র ছাতু ও জল পান করিয়া অতি কষ্টে কাল যাপন করিতে লাগিল। স্ত্রীপুত্রেরা অনাহারে তাহার সমক্ষে একে একে জীবন পরিত্যাগ করিল। কিন্তু শকটারের হৃদয়ে তখন

প্রতিহিংসা পিশাচ স্বযং বর্ত্তমান। ঐ সকল মৃত্যুতে সে কঠোর হইতে কঠোবতব হইযা ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিল।

অতুল ঐশ্বর্য্যেব অধিপতি হইলে, কাহাব না চিত্তে বিভ্রম উপস্থিত হয? মহাবাজ নন্দ এখন নিষ্কণ্টক হইযা বাসনাসক্ত ও নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইযা উঠিলেন। প্রজাবর্গ মহা অশান্তিতে দিন যাপন কবিতে লাগিল এবং অনেক সমযে নির্দ্দোষী প্রজাসকল বাজশক্তি দ্বাবা বিশেষ পীড়িত হইতে লাগিল। বাজা নন্দ যাহাকে শকটাবেব পদে নিযুক্ত কবিযাছিলেন, তিনি সহস্র চেষ্টাতেও রাজাব মতি গতি ফিবাইতে পাবিলেন না। অগত্যা নির্দ্দোষী ব্যক্তিদেব, যতদব সাধ্য, অত্যাচাবেব হস্ত হইতে বক্ষা কবিতে সচেষ্ট বহিলেন। তিনি অল্পদিন মধ্যেই বুঝিতে পাবিলেন যে, শকটাবকে বিনাদোষে কাবাগাবে আবদ্ধ বাখা হইযাছে এবং কিসে তাহাকে কাবামুক্ত কবিতে পাবেন, তাহাব উপায চিন্তা কবিতে লাগিলেন।

কথিত আছে, একদিন মহাবাজ নন্দ নব সচিব বাক্ষসকে সঙ্গে লইযা নগব হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহাবা গঙ্গাতীবে ভ্রমণ কবিতেছেন এমন সমষ বাজা জল হইতে উত্থিত পঞ্চাঙ্গুলিবিশিষ্ট একখানি হস্ত দেখিতে পাইলেন এবং কৌতূহল বশতঃ বাক্ষসকে উহাব তত্ত্ব বলিতে আদেশ কবিলেন। তখন বাক্ষস সেই হস্তেব দিকে স্বীয অঙ্গুলিদ্বয দেখাইবামাত্র, উহা অন্তর্হিত হইযা গেল। ইহা দেখিযা বাজা বিস্মিত হইলেন ও পুনর্ব্বাব মন্ত্রীকে এ ব্যাপাবেব গূঢ বহস্য জিজ্ঞাসা কবিলেন। অমাত্য বলিলেন—'বাজন! হস্ত স্বীয পঞ্চাঙ্গুলী দেখাইযা এই সঙ্কেত কবিল যে, এই জগতে পাঁচ জনে মিলিযা কোন কর্ম্ম সম্পন্ন কবিতে না পাবে? আমিও স্বীয অঙ্গুলিদ্বয দেখাইযা তাহাব এই উত্তব দিলাম যে, যদি দুই জনে এক মতাবলম্বী হয, তবে তাহাদেবও কিছুই অসাধ্য থাকে না।" মহাবাজ নন্দ এই উত্তব শুনিযা পবম সন্তোষ লাভ কবিযা কহিলেন—"মন্ত্রী! তোমাব উত্তবে পবম আনন্দিত হইলাম। অতএব অদ্য আমি তোমাকেও আনন্দিত কবিতে ইচ্ছা কবি। তোমাব এখন কি অভিলাষ আছে বল, আমি তাহা নিশ্চয পূর্ণ কবিব।" বুদ্ধিমান অমাত্য এই অভাবনীয সুযোগ পাইযা বলিলেন—"আমাব অভিলাষ এই যে, মহাবাজ অনুগ্রহ কবিযা বৃদ্ধ সচিব শকটাবকে কাবামুক্ত কবেন।" বলা বাহুল্য, অমাত্যেব অভিলাষ পূর্ণ কবিযা বাজা তৎক্ষণাৎ শকটারকে কাবামুক্তিব অনুমতি দিলেন এবং কিছুদিন পবে তাহাকে পুনরায সহকাবী অমাত্যেব পদে নিযুক্ত কবিলেন।

এইরূপে মন্ত্রীর বুদ্ধিমত্তায় রাজা অনেক সময় অন্যায় প্রজাপীড়ন পাপ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে সব বলিতে হইলে গল্পটী বাড়িয়া যায় এবং এই গল্পের প্রধান চরিত্র শকটারের সহিতও ঐ সকলের কোন সম্বন্ধ নাই। অতএব আসুন পাঠক, আমরা এক্ষণে মহারাজ নন্দ ও অমাত্য রাক্ষসকে ছাড়িয়া শকটারের অনুসরণ করি।

বৃদ্ধ শকটার কিন্তু কারামুক্ত হইয়া নিজের প্রতিজ্ঞা ভুলিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার চক্ষের সমক্ষে তাহার প্রাণসম প্রিয়তম স্ত্রীপুত্রগণের অনশন-মৃত্যুতে তাহার প্রতিজ্ঞা আরও দৃঢ়তর হইয়াছিল। সে দিবারাত্র কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিল যে, প্রবল পরাক্রান্ত নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন কিসে হয়। এইরূপে অনন্যচিত্ত হইয়া কিসে নিজ অভিপ্রায় সাধনের উপযুক্ত ব্যক্তি পাইতে পারে, তাহারই জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল।

একদিন সে পাটলিপুত্র হইতে রাজগৃহাভিমুখে যাইতেছে, এমন সময় দেখিল, এক কৃষ্ণকায়, দীর্ঘবপুঃ, বলিষ্ঠ, ব্রাহ্মণ যুবক পথে বসিয়া ভূমি খনন করিতেছে। তাহা দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—'বিপ্র, আপনি ভূমি খনন করিতেছেন কেন? আপনার নাম কি?" ব্রাহ্মণ বলিল—"কুশমূলে আমার পদতল ক্ষত হইয়াছে। শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে—রোগ ও শত্রু অতি ক্ষুদ্র হইলেও তাহার প্রতি উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কর্ম নহে। এজন্য কুশ সকল আমূল ধ্বংস করিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমার নাম চাণক্য।" এই কথা শুনিয়া শকটার ভাবিল—এই কোপনস্বভাব ক্রূরপ্রকৃতি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারাই আমি দুরাচার নন্দের বধ সাধন করিতে পারিব, ইনিই আমার অভীষ্ট সাধনের উপযুক্ত সহায় হইবেন।

এই স্থির করিয়া শকটার চাণক্যকে বলিল—"ব্রাহ্মণ, আগামী ত্রয়োদশীতে নন্দরাজের গৃহে শ্রাদ্ধ হইবে। আপনি যদি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে তথায় নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করিতে পাইবেন এবং আপনাকে লক্ষ মুদ্রা দক্ষিণা দেওয়াইব। অতএব আমার সঙ্গে আসুন।" এই বলিয়া তাহাকে নিজ ভবনে লইয়া গেল। শ্রাদ্ধ দিবসে শকটার ব্রাহ্মণকে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিল। রাজাও শ্রদ্ধা সহকারে তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। চাণক্য শ্রাদ্ধ-ভোক্তার আসনে উপবেশন করিয়াছে, এমন সময়ে শ্রাদ্ধ-ভোজী সুবন্ধু নামে অপর এক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন—'সুবন্ধুই উপযুক্ত পাত্র, ইনিই শ্রাদ্ধ-ভোজন করিবার নিমিত্ত

আসন গ্রহণ করুন। অন্য ব্রাহ্মণের প্রয়োজন নাই, তিনি স্বস্থানে গমন করুন।"

এই কথা শুনিয়া চাণক্য প্রত্যাখ্যান জনিত অপমানে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া শিখা উন্মোচন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিল—"অদ্য হইতে সপ্তম দিবসের মধ্যে আমি নৃপাধমকে বধ করিয়া তবে শিখা বন্ধন করিব।" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ক্রোধান্ধ চাণক্য সে স্থান পরিত্যাগ করিল। শকটার চাণক্যকে নিজ আলয়ে স্থান দিল এবং চাণক্যের সাহায্যে নন্দের বধ সাধন করিয়া, চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, বৃহস্পতিসদৃশ বুদ্ধিমান চাণক্যকে তাঁহার মন্ত্রী করিয়া দিল। এইরূপে বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহা চরিতার্থ করিয়া, শকটার আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিল বটে, কিন্তু নিদারুণ পুত্রশোকানল প্রদীপ্ত হওয়ায়, আর গৃহে অবস্থিতি করিতে পারিল না। অবিলম্বে সংসারাশ্রম বিসর্জ্জন দিয়া, বন গমন পূর্ব্বক, তপস্যায় মনোনিবেশ করিল।

দেশহিতৈষণা।

[শ্রীবিপিন বিহারী গঙ্গোপাধ্যায়।]

কোন সময় ৺কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের সহিত পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ হয়। সেই সময় পাল মহাশয় রামকৃষ্ণদেবকে বলেন—"মহাশয় দেশটা বৈরাগ্য বৈরাগ্য ক'রে উৎসন্ন গেল, যাহাতে সকলের দেশের কাযে মন যায়, লোকের উপকার করে, এরূপ উপদেশ আপনি দিন।" তদুত্তরে পরমহংসদেব বলেন—"কৃষ্ণদাস, তুমি লোকের উপকার করবে। তোমার শক্তি কতটুকু? বড় জোর না হয় দুই একটা হাঁসপাতাল বা স্কুল তৈয়ার ক'রে দেবে, নয়ত একটা ডাক্তারখানা করবে। ঈশ্বরের কার্য্য, তিনি কর্‌ছেন, তুমি কি কর্‌তে পার? গঙ্গায় কাঁকড়ার বাচ্ছা হয়, দেখেছ? এ অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তুমি ঐরূপ একটী ক্ষুদ্র প্রাণী। 'আমি লোকের উপকার করবো'—এ কথা মনে কর্‌লে পাপ হয়।"

* খৃঃ ১৯০৮, ২২শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতিতে পঠিত।

যে সময় ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্যতার বিদ্যুৎ আলোকে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে, যে সময় ইউরোপবাসীর কার্য্যকলাপ অনুকরণ করিয়া ভারতবর্ষকে উন্নত করিবার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিষম আগ্রহ দেখা যাইতেছে, যে সময় পাশ্চাত্য মনীষিবৃন্দের (তাঁহাদের নিজ নিজ দেশের ও জাতির অভিজ্ঞতার ফল-স্বরূপ) উপদেশরাজীর প্রতি ভারতবাসী সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে এবং তাহাকেই ধ্রুবতারা জ্ঞানে ভারতের জটিল সমস্যা সকলের মীমাংসা করিতে উন্মত্তের ন্যায় চলিতেছে, যে সময় দেশের কায করা আমাদের একমাত্র উন্নতির উপায় ও তাহাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—এই নূতন পাশ্চাত্য শিক্ষাসম্ভূত ভাব সমগ্র প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে, ইহকাল-সর্ব্বস্ব জাতির ঐহিক সুখসচ্ছন্দ দেখিয়া তাহাদের মূলমন্ত্র গ্রহণ করিয়া যখন ভারতবর্ষে একটী নূতন জাতি গঠনের চেষ্টা হইতেছে, সেই সময়েই ভারতবর্ষে এই অদ্ভুত ব্যাপার।

পার্থিব শিক্ষা অনভিজ্ঞ, কামকাঞ্চনত্যাগী, দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভৎসনা করিয়া বলিতেছেন—"লোকের উপকার করিব, একথা মনে করিলে পাপ হয়।" ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। বাস্তবিক আমরা আজ সন্ধিস্থলে উপস্থিত। কোন পথ অবলম্বনে আমাদের প্রত্যেকের ও দেশের বাস্তবিক কল্যাণ—দায়িত্বজ্ঞানপূর্ণ হিন্দুর আজ বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়াছে। ইহা শুধু চিন্তার বিষয় নহে, আমাদের কার্য্যের উপর, সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে, আমাদের কার্য্য আমাদের জাতির উন্নতি বা ধ্বংসের কারণ হইবে। তাই ভোগস্পৃহাশূন্য, কামকাঞ্চনত্যাগী, অহেতুক কৃপাসিন্ধু পরমহংসদেবের কথা অবহেলা না করিয়া, স্থিরচিত্তে আমাদের এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করা উচিত। বিদ্যাদর্পে দর্পিত না হইয়া, নিজ নিজ কল্যাণ হৃদয়ে রাখিয়া, সাধুবাক্যের মর্ম্ম গ্রহণে চেষ্টিত হওয়া, বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি, তাহা আপনাদের কাছে নিবেদন করিতেছি, যদি ভ্রমে পতিত হইয়া থাকি, সংশোধন করিয়া দিয়া কৃতার্থ করিবেন।

ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ে আমাদের ভাব-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কতকগুলি ভাব আমাদের মঙ্গলপ্রদ ও কতকগুলি ভাব আমাদিগকে অসার করিয়া ফেলিতেছে। ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই, স্বদেশহিতৈষণার ভাব সকলের মধ্যে আসিয়াছে। পাঠ্যাবস্থায় বালক পর্য্যন্ত ভারতবাসীর চিন্তায় আকুল হইবার প্রয়াস পায়। স্বদেশহিতৈষী হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা শিক্ষিত

যুবকের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশহিতৈষণা জিনিষটা কি, বা স্বদেশ-হিতৈষী কাহাকে বলে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিলে, পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তি বহুগবেষণাপূর্ণ উপদেশ দিবেন, পাশ্চাত্য দেশের বহু বহু বিজ্ঞ ব্যক্তির পুস্তকাদি হইতে কত শত উদ্ধৃত অংশ (extract) শুনাইয়া দিবেন ও বলিবেন, ইহাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত কি না? অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত যাহারা, তাহারা কাজেই তাঁহাদের অনুসরণ করা ছাড়া, অন্য পথ দেখিতে পায় না। এতদিন ত এই ভাবেই কার্য্য চলিয়া আসিতেছিল। আজ কিন্তু অনেকে এই পথের উপর সন্দিহান হইয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত এই স্বদেশ-হিতৈষণা তরঙ্গে বিনা বিচারে গা ভাসাইয়া দিয়া এখন ভাবিতে হইতেছে, ইহা আমাদিগকে গন্তব্য স্থলে লইয়া যাইবে কিম্বা ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া আমাদের জাতীয় জীবনতরী বানচাল হইয়া যাইবে। সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে—উপায় নাই। সন্দেহের মীমাংসার প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সন্দেহের মীমাংসা হওয়া দূরে থাকুক, যতই চিন্তা করিতে যাই, সন্দেহ আরও বাড়িয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় স্বদেশহিতৈষণা বুঝিয়াছি, স্বদেশহিতৈষী হইতে হইবে—একথাও বুঝিয়াছি ও তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কি করিতে হইবে, তাহা জানি না। দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে বুঝিয়াছি, কিন্তু কেমন করিয়া জীবন দান করিব ও তাহার ফলে কি হইবে ভাবিতে গেলে কিছুই স্থির করিতে পারি না। স্বদেশহিতৈষী যাঁহারা এতকাল এই ভাব প্রচার করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে, সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠে। দেখিতে পাই, যে ব্যক্তি ধর্ম্মে অবিশ্বাসী, সমাজদ্রোহী, অখাদ্যখাদক, সেও স্বদেশহিতৈষী। পুরুষানুগত ক্রিয়াকলাপে শ্রদ্ধা নাই, নিজ বংশমর্য্যাদার সম্মান রাখিতে যত্নপর নন, পাড়াপ্রতিবাসীর মঙ্গলামঙ্গলের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই, আপনার বংশ, জাতি কুল মান কিছুরই তাঁহার কাছে কোন মূল্য নাই, কিম্বা এ সকলের ভালমন্দ বিচার করিয়া শ্রেয়পথ অবলম্বনের কোন চেষ্টাও দেখা যায় না, অথচ সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি স্বদেশহিতৈষী, দেশের জন্য জীবন দিতে পারেন। এ স্থলে দেশ অর্থে কি কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। দেশ কি কোন একটা আকাশ-কুসুম? কিম্বা আমাদের সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি আচার, ব্যবহার—এই সমস্তের সমষ্টি? মোহবশে এতদিন বুঝিতে পারি নাই যে, ইংরাজী শিক্ষিত স্বদেশহিতৈষার শক্তি কেবল বক্তৃতায় আবদ্ধ। যিনি পাড়ার কর্ত্তা নহেন, সমাজের চালক নহেন, ধর্ম্মের শিক্ষক নহেন, তিনি

কিন্তু দেশের নেতা—ইহা একটী অদ্ভুত প্রহেলিকা ভিন্ন কিছুই নহে। কি আশ্চর্য্য, যাঁহার সমাজের কোন রীতি নীতির পরিবর্ত্তন করিবার সামর্থ নাই, প্রচলিত কদাচারের পরিবর্ত্তে, সদাচার স্থাপনের প্রয়াসে, যিনি কেবলমাত্র উপহাসাস্পদ হয়েন, আমাদের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের জন্য কোন বিষয়ে তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য নহে, কিন্তু দেশের জন্য তাহার কথায় আবালবৃদ্ধবনিতা খেপিয়া উঠিবে, তাঁহার অঙ্গুলিহেলনে সমস্ত দেশ উঠিবে বসিবে—এই স্বপ্নে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই আচ্ছন্ন! তাই স্বপ্নের ঘোর কাটিলে কার্য্যকালে ঠিক বিপরীত অবস্থা নয়নগোচর হয়। জীবনে হতাশ আসিয়া উপস্থিত হয়। কার্য্যক্ষেত্রে কাহারও দর্শন নাই। বড় আশায় বুক বাঁধিয়া জীবন মরণের নেতা জ্ঞানে যখন প্রকৃত কার্য্যের উদ্যোগ হয় তখন আর কাহাকেও পাওয়া যাইবে না। নেতার নেতৃত্ব কাৰ্য্যস্থলে নয়। বিপদ্‌কালে নেতার বাক্যস্ফুরণ নাই। সংসার ক্ষেত্রের ভীষণ পরীক্ষাস্থলে নেতার উপস্থিতির প্রয়োজন নাই। কোথায় স্বার্থত্যাগ, কোথায় সমবেদনা, কোথায় ভ্রাতৃভাব, কোথায় দেশহিতে জীবন পণ? কই, কই সে আদর্শ কোথায়? সে স্বদেশহিতৈষী কৈ, যাঁহার নির্ভীক প্রশান্ত মূর্ত্তি হৃদয়ে ধরিয়া, যাঁহার আশীর্ব্বাদ একমাত্র সম্বল লইয়া, এই বিপদসঙ্কুল কার্য্যক্ষেত্রে নির্ভয়ে চলিয়া যাইব? কই সে স্বদেশহিতৈষী, যাঁহার দেশহিতব্রতে, জীবনব্যাপী কঠোর তপস্যার ফলে, মৃত প্রাণে জীবনী শক্তি সঞ্চার হইবে, যাঁহার কৃপায় হেলায় সংসার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব? কই, কিছুই নাই, ফাঁকা বাক্য লইয়া, বৃথা বিষয়ের আলোচনা করিয়া, জীবন আরও অকর্ম্মণ্য হইতে চলিল। আমাদের বাক্যে ও কার্য্যে মিল নাই, মন মুখ এক নহে। এ অবস্থায় কি আশা করা যাইতে পারে? তাই কি স্বামী বিবেকানন্দ গভীর দুঃখে বলিয়াছিলেন—

"তোমাদের বাড়ী ঘর দুয়ার মিউসিয়ম, তোমাদের আচার, ব্যবহার, চাল, চলন দেখলেও বোধ হয়, যেন ঠানদিদির মুখে গল্প শুনছি। তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও, ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্রশালিকার ছবি দেখে এলুম। এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা, তোমরা, ভারতের উচ্চবর্ণেরা। তোমরা ভূত কাল, লঙ্‌ লুঙ্‌ লিট্‌ সব এক সঙ্গে। বর্ত্তমান কালে, তোমাদের দেখ্‌ছি বলে, যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণতা জনিত দুঃস্বপ্ন।"

—পরিব্রাজক

হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করিয়া, সমগ্র দেশের প্রকৃত অবস্থা দেখিয়া, স্বামীজি এই দুর্দ্দশার কথা আমাদের জানাইয়াছেন। দেশহিতে যাঁহার হৃদয় প্রকৃত চালিত, পরসুখকল্পনা যিনি একদিনের জন্যে করিয়াছেন, প্রতিবেশীর সমৃদ্ধিতে যিনি স্বপ্নেও একদিন আনন্দ করিয়াছেন, স্বামীজি অঙ্কিত দেশের এই ভীষণ অবস্থার ছবির মর্ম্ম বুঝিতে তাঁহার বেশী ক্লেশ হইবে না। একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখুন দেশের প্রকৃত অবস্থা কি। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে পড়িয়া আমরা আজ মনুষ্যপদবাচ্য হইতে কত দূরে পড়িয়াছি, পাশ্চাত্য আলোক আসিয়া আমাদের সোনার ছবি ঝলসাইয়া দিয়াছে। প্রকৃত অবস্থা দেখিয়া কেমন করিয়া বলিব—আমরা স্বদেশহিতৈষী হইবার আশা রাখি।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমাদিগকে কেবল দাম্ভিক করিয়াছে, বিনয়ী করে নাই। কুক্ষণে ইংরাজী শিখিয়া —নেতা হইতে হয়—শিখিয়াছি, গুরুপদে শিষ্যত্ব গ্রহণে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন একেবারে ভুলিয়াছি, পাশ্চাত্য দেশের ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীরগণের জীবন কথা সর্ব্বদাই কীর্ত্তন করিতে শিখিয়াছি, আমাদের দেশের অবতার ও মহাপুরুষগণের লীলাগাথা অসার ও অপদার্থ বলিয়া বুঝিয়াছি। আবাস স্থল আর ধর্ম্ম উপার্জ্জনের স্থান নহে, ভোগ বিলাস পূর্ণ করিবার আমোদ ভূমি মাত্র; দেবপূজার বিমল আনন্দে অট্টালিকা শ্রীমন্দিরে পরিণত নয়, পাঁচ ইয়ারের পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্যের স্থান মাত্র, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণে পুরবাসীর লালসা নাই, সাধুর পদধূলিতে প্রাসাদ পবিত্রিকৃত নহে, উৎসবদিনে গৃহপ্রাঙ্গণ শত প্রতিবেশীর আনন্দ স্থান নহে, স্বার্থপর হৃদয়ে স্বার্থপূর্ণ ধর্ম্মকর্ম্মহীন সঙ্গী লইয়া ধর্ম্মনিন্দিত বিলাস সাগরে ভাসমান।—এই ত অবস্থা, এই অবস্থায় পড়িয়া আমরা দেশের উন্নতি করিবার আশা হৃদয়ে রাখি। কোন সৎকার্য্যে কিছু চাঁদা দিয়া, স্বদেশহিতৈষী হইয়াছি বলিয়া, গর্ব্বে স্ফীত হই। গড্ডলিকা-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া কোথায় ভাসিয়া যাইতেছি, কে বলিতে পারে? পরিণাম কি, কে জানে? কিন্তু যে দিকে চাহিয়া দেখা যায় কেবল নিরাশা আসিয়া, হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে।

ক্রমশঃ।

অন্বয়। হে ভরতর্ষভ। ইদানীং ত্রিবিধং সুখং মে শৃণু, যত্র অভ্যাসাৎ রমতে (যত্র) দুঃখান্তং নিগচ্ছতি চ, যৎ তদগ্রে বিষমিব পরিণামে অমৃতোপমম্ তৎ আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্। ৩৬—৩৭।

মূলানুবাদ। হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে ত্রিবিধ সুখ কি আমার নিকটে তাহা শ্রবণ কর। অভ্যাসবশতঃই যে সুখে আসক্তি হয়, যে সুখ হইলে দুঃখের অন্তকে পাওয়া যায়, যে সুখ প্রথমে বিষের ন্যায় প্রতীত হইলেও পরিণামে অমৃতের ন্যায় হয়, সেই স্বীয় বুদ্ধির প্রসন্নতার ফলস্বরূপ সুখই সাত্ত্বিক সুখ। ৩৬—৩৭।

ভাষ্য। গুণভেদেন ক্রিয়াণাং কারকাণাং চ ত্রিধা ভেদ উক্তঃ, অথেদানীং ফলস্য চ সুখস্য ত্রিধা ভেদ উচ্যতে। সুখং তু ইদানীং ত্রিবিধং শৃণু সমাধানং কুরু ইত্যেতৎ। মে মম ভরতর্ষভ। অভ্যাসাৎ পরিচয়াদাবৃত্তে রমতে রতিং প্রতিপদ্যতে যত্র যস্মিন্ সুখানুভবে দুঃখান্তং চ দুঃখাবসানং দুঃখোপশমং চ নিগচ্ছতি নিশ্চয়েন প্রাপ্নোতি। যদিতি—যৎ তৎ সুখং অগ্রে পূর্ব্বং প্রথমসন্নিপাতে জ্ঞানবৈরাগ্যধ্যানসমাধ্যারম্ভে অত্যন্তায়াসপূর্ব্বকত্বাৎ বিষমিব দুঃখাত্মকং ভবতি, পরিণামে জ্ঞানবৈরাগ্যাদিপরিপাকজং সুখমমৃতোপমং তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং বিদ্বদ্ভিরাত্মনো বুদ্ধিঃ আত্মবুদ্ধিঃ, আত্মবুদ্ধেঃ প্রসাদো নৈর্ম্মল্যং সলিলবৎ স্বচ্ছতা ততো জাতমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ আত্মবিষয়া বা আত্মালম্বনা বা বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিঃ তৎপ্রসাদপ্রকর্ষাদ্বা জাতমিত্যেৎ তস্মাৎ সাত্ত্বিকং তৎ। ৩৬—৩৭।

ভাষ্যানুবাদ। ক্রিয়া এবং কারক সমূহের সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের ভেদবশতঃ তিন প্রকার ভেদ হয়—ইহা বলা হইয়াছে, এইক্ষণে সুখরূপ যে ফল তাহাও তিন প্রকার ইহাই বলা হইতেছে। এখন ত্রিবিধ সুখ বিষয়ে যাহা বলিতেছি তাহা শুন অর্থাৎ (শুনিবার জন্য) চিত্তকে সমাহিত কর ইহাই তাৎপর্য্য। অভ্যাস বশতঃ যে সুখে লোক রত হয় অর্থাৎ প্রীতিকে লাভ করে এবং যে সুখের অনুভব হইলে দুঃখের অন্তকে প্রাপ্ত হয়, দুখান্ত শব্দের অর্থ দুঃখের অবসান দুঃখের উপশম (ইত্যাদি), (সেই দুঃখের অবসান কেমন ভাবে পায়?) নিশ্চয়ের সহিতই পায়। যৎ ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ—"অগ্রে" প্রথম সন্নিপাতকালে যে সুখ বিষের ন্যায় অর্থাৎ দুঃখময় বলিয়া প্রতীত হয়, অর্থাৎ জ্ঞান বৈরাগ্য ধ্যান ও সমাধির আরম্ভকালে অত্যন্ত আয়াস স্বীকার করিতে হয় বলিয়াই প্রথমতঃ যে সুখ দুখাত্মক বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু, "পরিণামে" জ্ঞানও বৈরাগ্যের পরিপাক হইলে, যাহা অমৃতের ন্যায় প্রতীত হয়, পণ্ডিতগণ সেই সুখকে

সাত্ত্বিক সুখ বলিয়া থাকেন। (সেই সুখ কিরূপ?) "আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ" আত্মার বুদ্ধি এই অর্থে আত্মবুদ্ধি এই শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। আত্মবুদ্ধির প্রসাদ অর্থাৎ নির্ম্মলতা বা জলের ন্যায় স্বচ্ছতা, তাহা হইলে যে সুখ উৎপন্ন হয় তাহাকেই আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ সুখ বলা যায়। অথবা আত্মবিষয়িণী বা আত্মালম্বনা যে বুদ্ধি তাহাই এখানে আত্মবুদ্ধি শব্দের অর্থ, সেই আত্মবুদ্ধির প্রসাদাতিশয় হইলে যে সুখ হয়, তাহাই সাত্ত্বিক সুখ। ৩৬—৩৭।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়। যৎ তৎ অগ্রে অমৃতোপমং পরিণামে বিষমিব, বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ (জায়তে চ) তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্‌। ৩৮।

মূলানুবাদ। যে সুখ বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের পরস্পর সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়, যে সুখ প্রথমে অমৃতের ন্যায় (প্রিয়) কিন্তু পরিণামে বিষের ন্যায় (অপ্রিয়) হয়, সেই সুখকে রাজস সুখ বলা যায়। ৩৮।

ভাষ্য। বিষয়েতি। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যৎ তৎ সুখং জায়তে, অগ্রে প্রথমক্ষণে অমৃতোপমম্‌ অমৃতসমং পরিণামে বিষমিব বলবীর্য্যরূপপ্রজ্ঞামেধাধনোৎসাহহানিহেতুত্বাৎ অধর্ম্মতজ্জনিতনরকাদিহেতুত্বাচ্চ পরিণামে তদুপভোগবিপরিণামান্তে বিষমিব, তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্‌। ৩৮।

ভাষ্যানুবাদ। বিষয় ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে যে সুখ হয়, যে সুখ "অগ্রে" প্রথমক্ষণে "অমৃতোপম" অমৃতের ন্যায় (প্রতীত হয়), কিন্তু পরিণামে বিষের ন্যায় হয়, অর্থাৎ বল, বীর্য্য, রূপ, মেধা, ধন ও উৎসাহকে বিনষ্ট করে—এবং অধর্ম্ম ও অধর্ম্মজনিত নরকাদিরূপ দুঃখের কারণ হয়, এই কারণে যে সুখের ভোগের পরই উহা বিষের ন্যায় প্রতীত হয়, সেই সুখই রাজস সুখ বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকে। ৩৮।

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্‌ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়। যৎ নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং অগ্রে অনুবন্ধে চ আত্মনঃ মোহনং তৎ তামসং সুখমুদাহৃতম্‌। ৩৯।

মূলানুবাদ। যাহা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে উত্থিত হয়, যাহা পূর্ব্বে এবং পরে আত্মমোহকর, তাহাই তামস সুখ বলিয়া উদাহৃত হয়। ৩৯।

ভাষ্য। যদগ্রে চেতি। যদগ্রে চ অনুবন্ধে চ অবসানোত্তরকালে সুখং মোহনং মোহকরম্ আত্মনো নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং নিদ্রা চ আলস্যং চ প্রমাদশ্চ ইত্যেতেভ্যঃ সমুত্তিষ্ঠতি ইতি—নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্। ৩৯।

ভাষ্যানুবাদ। "যদগ্রে চ" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। যাহা প্রথমে এবং "অনুবন্ধে"—অবসানে, "মোহন"—আত্মার মোহকর, এবং যাহা "নিদ্রালস্য প্রমাদোত্থ" নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদ এই তিনটী হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকে নিদ্রালস্য প্রমাদোত্থ কহা যায়। তাহাই তামস সুখ বলিয়া উদাহৃত। ৩৯।

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভিগুণৈঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়। পৃথিব্যাং দিবি বা দেবেষু তৎ সত্ত্বং নাস্তি যৎ এভিঃ প্রকৃতিজৈঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ মুক্তম্। ৪০।

মূলানুবাদ। পৃথিবীতে কিম্বা স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এমন কোন প্রাণীই বিদ্যমান নাই, যাহা এই প্রকৃতিজ তিনটী গুণ হইতে বিমুক্ত (হইয়া থাকিতে পারে)। ৪০।

ভাষ্য। অথেদানীং প্রকরণোপসংহারার্থঃ শ্লোক আরভ্যতে, ন তদস্তি তন্নাস্তি, পৃথিব্যাং বা মনুষ্যাদি সত্ত্বং প্রাণিজাতং অন্যদ্বা অপ্রাণিজাতং দিবি দেবেষু বা পুনঃ সত্ত্বং প্রকৃতিজৈঃ প্রকৃতিতো জাতৈরেভিঃ ত্রিভিগুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ মুক্তং পরিত্যক্তং যৎস্যাদ্ ভবেৎ ন তদস্তীতি পূর্ব্বেণ সংবন্ধঃ। ৪০।

ভাষ্যানুবাদ। ইহার পর এক্ষণে যে প্রকরণ চলিতেছিল, তাহার উপসংহারার্থ শ্লোক আরম্ভ করা যাইতেছে। তাহা নাই পৃথিবীতে অর্থাৎ মনুষ্যাদিপ্রাণিসমূহ অথবা অন্য কোন প্রাণহীন বস্তু, কিংবা স্বর্গে ও দেবতাগণের মধ্যে ও এমন কোন প্রাণী—যাহা এই তিনটী প্রকৃতিজাত গুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকিতে পারে। "এমন কোন বস্তু নাই" এই পূর্ব্ব বাক্যটীর সহিত ইহার সম্বন্ধ। ৪০।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগুর্ণৈঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়। হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ কর্ম্মাণি স্বভাব-প্রভবৈগুর্ণৈঃ প্রবিভক্তানি। ৪১।

মূলানুবাদ। হে পরন্তপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণের—কর্ম্ম সমূহ স্বভাবপ্রভবগুণ-নিবহেরদ্বারা প্রবিভক্ত হইয়া থাকে। ৪১।

ভাষ্য। সর্ব্বঃ সংসারঃ ক্রিয়াকারকফললক্ষণঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মকঃ অবিদ্যাপরিকল্পিতঃ সমূলোঽনর্থ উক্তঃ বৃক্ষরূপকল্পনয়া চ উর্দ্ধমূলমিত্যাদিনা, তং চ অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং ইতি চোক্তং। তত্র চ সর্ব্বস্য ত্রিগুণাত্মকত্বাৎ সংসারকারণনিবৃত্ত্যনুপপত্তৌ প্রাপ্তায়াং যথা তন্নি-বৃত্তিঃ স্যাৎ তথা বক্তব্যং, সর্ব্বশ্চ গীতাশাস্ত্রার্থ উপসংহর্ত্তব্য, এতাবানেব চ সর্ব্বোবেদস্মৃত্যর্থঃ পুরুষার্থমিচ্ছদ্ভিঃ অনুষ্ঠেয় ইত্যেবমর্থং চ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশামিত্যাদিরারভ্যতে। ব্রাহ্মণাশ্চ ক্ষত্রিয়াশ্চ বিশশ্চ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশঃ তেষাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ শূদ্রাণমসমাসকরণমেকজাতিত্বে সতি বেদেঽন-ধিকারাৎ। হে পরন্তপ কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি, ইতরেতর বিভাগেন ব্যবস্থাপিতানি কেন? স্বভাবপ্রভবৈগুর্ণৈঃ স্বভাব ঈশ্বরস্য প্রকৃতি স্ত্রিগুণাত্মিকা মায়া সা প্রভবো যেষাং গুণানাং তে স্বভাবপ্রভবাঃ তৈঃ। শমাদীনি কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি ব্রাহ্মণাদীনাম্। অথবা ব্রাহ্মণস্বভাবস্য সত্ত্বগুণঃ প্রভবঃ কারণং, তথা ক্ষত্রিয়-স্বভাবস্য সত্ত্বোপসর্জনং রজঃ প্রভবঃ, বৈশ্যস্বভাবস্য তমউপসর্জ্জনং রজঃ প্রভবঃ, শূদ্রস্বভাবস্য রজঃ উপসর্জ্জনং তমঃ প্রভবঃ প্রশান্ত্যৈশ্বর্য্যেহামূঢ়তাস্বভাব-দর্শনাচ্চতুর্ণাম্। অথবা জন্মান্তরকৃতসংস্কারঃ প্রাণিনাং বর্ত্তমানজন্মনি স্বকার্য্যাভি-মুখত্বেনাভিব্যক্তঃ স্বভাবঃ স প্রভবো যেষাং গুণানাং তে স্বভাবপ্রভবা গুণাঃ। গুণপ্রাদুর্ভাবস্য নিষ্কারণত্বানুপপত্তেঃ। স্বভাবঃ কারণমিতি কারণবিশেষোপাদানম্। এবং স্বভাবপ্রভবৈঃ প্রকৃতিপ্রভবৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিগুর্ণৈঃ স্বকার্য্যানুরূপেণ শমাদীনি কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি। ননু শাস্ত্রপ্রবিভক্তানি শাস্ত্রেণ বিহিতানি ব্রাহ্মণা-দীনাং শমাদীনি কর্ম্মাণি, কথমুচ্যতে সত্ত্বাদিগুণপ্রবিভক্তানীতি। নৈষ দোষঃ, শাস্ত্রেণাপি ব্রাহ্মণাদীনাং সত্ত্বাদিগুণবিশেষাপেক্ষয়ৈব শমাদীনি কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি ন গুণানপেক্ষয়েবেতি শাস্ত্রপ্রবিভক্তান্যপি কর্ম্মাণি গুণপ্রবিভক্তানীতি উচ্যন্তে। ৪১।

ভাষ্যানুবাদ। ক্রিয়া, কারক এবং ফল এই তিনটীর দ্বারা লক্ষণাক্রান্ত সকল সংসারই সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণময় এবং অবিদ্যা দ্বারা পরিকল্পিত। এই সংসারই

মূলের সহিত অনর্থ স্বরূপ, ইহা "ঊর্দ্ধমূলং" ইত্যাদি শ্লোকে বৃক্ষরূপকল্পনাদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই এই সংসার রূপ বৃক্ষকে অসঙ্গরূপ দৃঢ় শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া পরে সেই ব্রহ্মপদের অন্বেষণ করিতে হইবে, ইহাও বলা হইয়াছে। তাহা হইলে এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, সকল সংসার যদি ত্রিগুণাত্মক হয় তাহা হইলে সেই সংসারের যাহা কারণ তাহারও নিবৃত্তি অনুপপন্ন হইয়া পড়িতেছে—এই আশঙ্কার পরিহারার্থ যেরূপে সংসারকারণের নিবৃত্তি হইতে পারে, তাহা বলিতে হইবে, এবং গীতা শাস্ত্রের যাহা কিছু প্রতিপাদ্য অর্থ তাহারও উপসংহার করিতে হইবে, এবং গীতাশাস্ত্রে যাহা বলা হইল, তাহাই সকল বেদের ও স্মৃতির মুখ্য প্রতিপাদ্য অর্থ, তাহাও বলিতে হইবে, এবং যাহারা পুরুষার্থ (অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) ইচ্ছা করে তাহাদের সকলের পক্ষেই (এই গীতা প্রতিপাদ্য) বেদের ও স্মৃতির সার অর্থের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, এই কয়টী বিষয় বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং" ইত্যাদি শ্লোকের আরম্ভ করা হইতেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিনটী বর্ণকে বুঝাইবার জন্য "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং" এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে বুঝাইবার জন্য একটী সমস্তপদ প্রযুক্ত হইয়াছে আর শূদ্রগণকে বুঝাইবার জন্য একটী অসমস্ত পৃথক্‌পদ প্রযুক্ত হইয়াছে ইহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ভিন্ন অন্য অন্য সকল মনুষ্যই শূদ্র জাতির সমান ধর্ম্মা—এবং তাহাদের মধ্যে কাহারও বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই। হে পরন্তপ কর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহ প্রবিভক্ত হইয়াছে অর্থাৎ পৃথক পৃথক্ স্বরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কাহা দ্বারা প্রবিভক্ত হইয়াছে?—স্বভাব প্রভবগুণ সমূহের দ্বারা। স্বভাব শব্দের অর্থ ঈশ্বরের প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, সেই মায়া হইতে যে গুণ সমূহ উৎপন্ন হয়, তাহারাই স্বভাবপ্রভবগুণ, সেই স্বভাব-প্রভব গুণ সমূহের দ্বারাই ব্রাহ্মণাদিবর্ণের শমদমাদি কর্ম্মসমূহ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। অথবা ব্রাহ্মণের স্বভাবের সত্ত্বগুণই প্রভব অর্থাৎ কারণ—সেইরূপ ক্ষত্রিয় স্বভাবের প্রভব (কারণ) সত্ত্বোপসর্জ্জন রজোগুণ, (সত্ত্বোপসর্জ্জন অর্থাৎ সত্ত্বগুণ অপ্রধানভাবে মিলিত হইয়া যে রজোগুণের কার্য্যে সহায়তা করে সেই রজোগুণকে সত্ত্বোপসর্জ্জন রজোগুণ কহা যায়।) বৈশ্য স্বভাবের প্রভব (কারণ) রজোগুণ (কিন্তু ঐ রজোগুণ সত্ত্বোপসর্জ্জন নহে, কিন্তু) তম উপসর্জ্জন। তদ্রূপ শূদ্র স্বভাবের প্রভব (কারণ) রজউপসর্জ্জন তমোগুণ। ব্রাহ্মণাদি চারিটী বর্ণের যথাক্রমে প্রশান্তি, ঐশ্বর্য্য, প্রবৃত্তি ও মূঢ়তা রূপ

স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই, এই প্রকার অর্থ করিতে হইয়াছে। অথবা—পূর্ব্বজন্মে কৃত ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম রূপ সংস্কার বর্ত্তমান জন্মে প্রাণীগণের নিজ নিজ ফল প্রসব করিতে উদ্যত হইয়া থাকে, এই ফলপ্রসবোন্মুখ সংস্কারই স্বভাব শব্দের অর্থ সেই স্বভাব হইতে যে সকল গুণ উৎপন্ন হয় তাহারাই স্বভাব-প্রভব-গুণ। (এইরূপ কল্পনা করিবার হেতু এই যে) প্রাণীগণের গুণ প্রাদুর্ভাব, বিনা কারণে হইতে পারে না, এই কারণেই স্বভাব কারণ, এই বলিয়া বিশেষ কারণের উপাদান করা হইয়াছে। এই প্রকার (আরও ব্যাখ্যান্তর হইতে পারে যথা) স্বভাব শব্দের অর্থ প্রকৃতি, সেই প্রকৃতি হইতে প্রাদুর্ভূত যে সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ তিনটী গুণ, সেই তিনটী গুণের দ্বারাই ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের স্ব স্ব কার্য্যানুরূপ শমাদি গুণ প্রবিভক্ত হইয়াছে। এক্ষণে শঙ্কা হইতে পারে যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের শমাদিগুণ শাস্ত্রদ্বারাই বিহিত হইয়াছে, এবং শাস্ত্র দ্বারাই পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহাই যদি হইল, তবে কেন বলা হইতেছে যে স্বভাব প্রভবগুণের দ্বারা প্রবিভক্ত হইয়াছে। ইহাতে কোন প্রকার দোষ হয় নাই, কারণ, শাস্ত্রে যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের শমাদি কর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে, তাহা ও তাহাদের সত্ত্ব প্রভৃতি গুণের প্রতি অপেক্ষা করিয়াই করা হইয়াছে, ঐ সত্ত্বাদিগুণের প্রতি অপেক্ষা না করিয়া যে শমাদি কর্ম্মের বিভাগ করা হইয়াছে ইহা কথনই সম্ভব পর নহে, এই কারণেই—শম দমাদি কর্ম্মসমূহ শাস্ত্রদ্বারা বিভক্ত হইলেও গুণ প্রবিভক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।৪১।

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়। শমঃ দমঃ তপঃ শৌচং ক্ষান্তিঃ আর্জ্জবম্ এব জ্ঞানং বিজ্ঞানম্ আস্তিক্যং চ স্বভাবজং ব্রহ্মকর্ম্ম। ৪২।

মূলানুবাদ। শম দম তপঃ শৌচ ক্ষমা সারল্য জ্ঞান বিজ্ঞান এবং আস্তিক্য ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম। ৪২।

ভাষ্য। কানি পুনস্তানি কর্ম্মাণি ইতি উচ্যন্তে—শমো দমশ্চ যথা ব্যাখ্যাতার্থৌ, তপো যথোক্তং শারীরাদি, শৌচং ব্যাখ্যাতং, ক্ষান্তিঃ ক্ষমা, আর্জ্জবং ঋজুতৈব চ, জ্ঞানং, বিজ্ঞানং, আস্তিক্যং অস্তিভাবঃ শ্রদ্দধানতা আগমার্থেষু, "ব্রহ্ম-

কর্ম্ম” ব্রাহ্মণজাতেঃ কর্ম্ম ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্। যদুক্তং স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ প্রবিভক্তানীতি তদেবোক্তং স্বভাবজমিতি। ৪২।

ভাষ্যানুবাদ। সে সকল কর্ম্ম কি? তাহাই বলা হইতেছে—শম এবং দম কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তপস্যা শারীরাদি, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শৌচ কি তাহাও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ক্ষান্তি শব্দের অর্থ ক্ষমা, আর্জ্জব শব্দের অর্থ ঋজুতাই। জ্ঞান ও বিজ্ঞান (কি তাহাও বলা হইয়াছে) এবং "আস্তিক্য" অস্তিবুদ্ধি অর্থাৎ শাস্ত্রার্থে শ্রদ্ধা। এই কয়টী ব্রহ্মকর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতির স্বভাবজ কর্ম্ম, স্বভাব প্রভব গুণ সমূহ দ্বারা কর্ম্ম সকল প্রবিভক্ত হইয়াছে, এই যে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাই স্বভাবজ এই শব্দের দ্বারা এখানে ব্যক্ত করা হইতেছে। ৪২।

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়। শৌর্য্যং তেজঃ ধৃতিঃ দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপি অপলায়নং দানং ঈশ্বরভাবঃ চ স্বভাবজং ক্ষত্রকর্ম্ম। ৪৩।

মূলানুবাদ। শৌর্য্য, তেজঃ ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে পলায়ন না করা, দান এবং ঈশ্বরভাব (প্রভুত্ব) এই কয়টী ক্ষত্রিয় জাতির স্বাভাবিক কর্ম্ম। ৪৩।

ভাষ্য। শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং শূরস্য ভাবঃ, তেজঃ প্রাগল্ভ্যং, ধৃতির্ধারণং সর্ব্বাবস্থাসু অনবসাদো ভবতি যয়া ধৃত্যা উত্তম্ভিতস্য। দাক্ষ্যং দক্ষস্য ভাবঃ সহসা প্রত্যুৎপন্নেষু কার্য্যেষু অব্যামোহেন প্রবৃত্তিঃ, যুদ্ধেচাপি অপলায়নং অপরাঙ্মুখী-ভাবঃ শত্রুভ্যঃ। দানং দেয়েষু মুক্তহস্ততা। ঈশ্বরভাবশ্চেশ্বরস্য ভাবঃ প্রভুশক্তি-প্রকটীকরণং ঈশিতব্যান্ প্রতি। ক্ষত্রকর্ম্ম ক্ষত্রিয়জাতেঃ বিহিতং কর্ম্ম ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্। ৪৩।

ভাষ্যানুবাদ। শৌর্য্যং ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ। "শৌর্য্য" শূরের ভাব। "তেজঃ" প্রাগল্‌ভতা। "ধৃতি" ধারণ, সকল অবস্থাতেই যাহার দ্বারা উত্তম্ভিত (উৎসাহিত) হইয়া লোক অবসন্ন হয় না। "দাক্ষ্য" দক্ষেরভাব অর্থাৎ হঠাৎ কার্য্য উপস্থিত হইলে অব্যাকুলভাবে প্রবৃত্তি। "যুদ্ধে অপলায়ন" অর্থাৎ শত্রু-গণ হইতে পরাঙ্মুখ না হওয়া। "দান" দেয়বস্তু সমূহে মুক্তহস্ততা। "ঈশ্বর-ভাব" ঈশ্বরের ভাব অর্থাৎ যাহারা অধীন তাহাদের নিকট নিজের প্রভুশক্তির

প্রকাশ করা। এই কয়টী "ক্ষত্রকর্ম্ম" ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষে বিহিত স্বভাবজ কর্ম্ম। ৪৩।

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ।

অন্বয়। কৃষি গৌরক্ষ্য বাণিজ্যং স্বভাবজং বৈশ্য কর্ম্ম। শূদ্রস্যাপি পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম স্বভাবজং। ৪৪।

মূলানুবাদ। কৃষি গোরক্ষা এবং বাণিজ্য-বৈশ্যের স্বভাবজ কর্ম্ম। শূদ্র জাতির স্বভাবজ কর্ম্ম পরিচর্য্যা। ৪৪।

ভাষ্য। কৃষীতি। "কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং" কৃষিশ্চ গৌরক্ষ্যং চ বাণিজ্যঞ্চ, কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং কৃষিঃ ভূমের্বিলেখনং গৌরক্ষ্যং গা রক্ষতীতি গোরক্ষস্তস্তাবো গৌরক্ষ্যং পাশুপাল্যং, বাণিজ্যং বণিক্‌কর্ম্ম ক্রয়বিক্রয়াদিলক্ষণং বৈশ্যকর্ম্ম বৈশ্যজাতেঃ কর্ম্ম বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্। পরিচর্য্যাত্মকং শুশ্রূষা স্বভাবং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্। ৪৪।

ভাষ্যানুবাদ। কৃষীত্যাদি শ্লোকের অর্থ। "কৃষি গৌরক্ষ্য বাণিজ্যং" কৃষি, গৌরক্ষ্য এবং বাণিজ্য এই তিনটী পদ লইয়া "কৃষি গৌরক্ষ্য বাণিজ্য" এই সমাস হইয়াছে। কৃষি শব্দের অর্থ ভূমি কর্ষণ। গো সমূহকে রক্ষা করার নাম গোরক্ষ, গোরক্ষের ভাব গৌরক্ষ্য অর্থাৎ পশু পালন, এবং "বাণিজ্য" বণিকের কর্ম্ম ক্রয় এবং বিক্রয় প্রভৃতি, এই কয়টী "বৈশ্যকর্ম্ম" অর্থাৎ বৈশ্য জাতির স্বভাবজ কর্ম্ম। শূদ্রের স্বভাবজ কর্ম্ম "পরিচর্য্যাত্মক" শুশ্রূষা স্বরূপ। ৪৪।

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্ব কর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়। নরঃ স্বে স্বে কর্ম্মণি অভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে। স্ব কর্ম্মনিরতঃ যথা সিদ্ধিং বিন্দতি তং শৃণু। ৪৫।

মূলানুবাদ। মনুষ্য নিজ নিজ কর্ম্মে নিরত হইয়া সংসিদ্ধি লাভ করে। মানব স্বকর্ম্ম নিরত হইয়া যেরূপে সিদ্ধি লাভ করে, তাহা শুন। ৪৫।

ভাষ্য। এতেষাং জাতিবিহিতানাং কর্ম্মণাং সম্যগনুষ্ঠিতানাং স্বর্গপ্রাপ্তিঃ ফলং স্বভাবতো বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশজাতিকুলধর্ম্মায়ুঃশ্রুতবৃত্তবিত্তসুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ পুরাণে চ বর্ণিনামাশ্রমিণাঞ্চ লোকফলভেদবিশেষস্মরণাৎ। কারণান্তরাত্ত্বিদং বক্ষ্যমাণম্ ফলাং। স্বে স্বে যথোক্তলক্ষণভেদে কর্ম্মণি অভিরতঃ তৎপরঃ সংসিদ্ধিং স্বকর্ম্মানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে সতি কায়েন্দ্রিয়াণাং জ্ঞাননিষ্ঠা যোগ্যতালক্ষণাং লভতে প্রাপ্নোতি নরোঽধিকৃতঃ পুরুষঃ। কিং স্বকর্ম্মানুষ্ঠানত এব সাক্ষাৎ সংসিদ্ধিঃ। ন, কথং তর্হি স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা যেন প্রকারেণ বিন্দতি তচ্ছৃণু। ৪৫।

ভাষ্যানুবাদ। এই সকল জাতি বিহিত কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান হইলে স্বভাবতঃ স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। বর্ণ সমূহ, আশ্রম সমূহও যদি স্বকর্ম্মনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে তাহারা মরণের পর কর্ম্মফল অনুভব করে এবং পরে ভুক্তাবশেষ কর্ম্মের ফল স্বরূপে, দেশ বিশেষে, বিশিষ্ট কুলে জন্ম, ধর্ম্ম, আয়ুঃ, বিদ্যা, চরিত্র সুখ ও বুদ্ধিকে লাভ করে এইরূপ লোক বিশেষে বিশেষ বিশেষ ফল লাভের বিষয় স্মৃতিশাস্ত্রে এবং পুরাণশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অন্য প্র[illegible] হইতে কিন্তু বক্ষ্যমাণ ফল হইয়া থাকে (তাহাই বলিতেছেন যে [illegible] (যাহার স্বরূপ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে অভিরত অর্থা[illegible] ত পর হইয়া [illegible] নর সংসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে, স্ব স্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে কারে[illegible] শরীর এবং ইন্দ্রিয় সমুহের অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে যে জ্ঞান নি[illegible]র যোগ্যতা হ[illegible] সেই যোগ্যতাই সংসিদ্ধি। তবে কি স্বকর্ম্মের অনু[illegible]ন করিলেই সংসিদ্ধি হয়। তাহা নহে, তবে কি প্রকারে হয়? যে প্রকারে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, তাহা বলিতেছি) শ্রবণ কর। ৪৫।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬॥

অন্বয়। যতঃ ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ যেন ইদং সর্ব্বং ততম্ তং স্বকর্ম্মণা অভ্যর্চ্চ্য মানবঃ সিদ্ধিং বিন্দতি। ৪৬।

মূলানুবাদ। যাঁহা হইতে প্রাণীগণের প্রবৃত্তি হয়, এই সমস্ত [illegible] যাঁহা দ্বারা ব্যাপ্ত, স্বকর্ম্মের দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিয়া মানব সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ৪৬।

ভাষ্য। যত ইতি। যতো যস্মাৎ প্রবৃত্তিরুৎপত্তিঃ চেষ্টা বা, যস্মাদন্তর্যামিণ ঈশ্বরাদ্ ভূতানাং প্রাণিনাং স্যাৎ, যেন ঈশ্বরেণ সর্ব্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তং স্ব কর্ম্মণা পূর্ব্বোক্তেন প্রতিবর্ণং তমীশ্বরম্ অভ্যর্চ্চ্য পূজয়িত্বা আরাধ্য কেবলং জ্ঞান-নিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণাং সিদ্ধিং বিন্দতি মানবোমনুষ্যঃ। ৪৬।

ভাষ্যানুবাদ। "যত" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। যতঃ এই শব্দটীর অর্থ যাহা হইতে, ভূতগণের প্রাণিগণের "প্রবৃত্তি" উৎপত্তি, অথবা চেষ্টা যে অন্তর্যামী পুরুষ ঈশ্বর হইতে হইয়া থাকে যে ঈশ্বরের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ "তত" ব্যাপ্ত, পূর্ব্বে বর্ণভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া কথিত নিজ কর্ম্মের দ্বারা, সেই ঈশ্বরের অভ্যর্চ্চনা অর্থাৎ পূজা বা আরাধনা করিয়া— 'মানব' মনুষ্য "সিদ্ধি" জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪৬।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়। স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ বিগুণঃ স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্ স্বভাব নিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং ন আপ্নোতি। ৪৭।

মূলানুবাদ। পরধর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হওয়া অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানও শ্রেয়ঃ। (কারণ) স্বভাব নিয়ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া (মানব) পাপকে প্রাপ্ত হয় না। ৪৭।

ভাষ্য। যত এবমতঃ—শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ স্বোধর্ম্মঃ স্বধর্ম্মো বিগুণোঽপি ইত্যপি শব্দোদ্রষ্টব্যঃ, পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বভাবনিয়তং স্বভাবেন নিয়তম্, যদুক্তং স্বভাবজমিতি তদেবোক্তং স্বভাবনিয়তমিতি। যথা বিষজাতস্যেব কৃমের্বিষং ন দোষকরং তথা স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষং পাপং। ৪৭।

ভাষ্যানুবাদ। যে হেতু এই প্রকার এই জন্য—স্বধর্ম্ম বিগুণ হইলেও (এখানে অপি শব্দটী না থাকিলেও তাহা আছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে অপি শব্দের অর্থ "ও") সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে "শ্রেয়ান্" প্রশস্যতর। স্বভাবের দ্বারা নিয়ত এই অর্থে "স্বভাব নিয়ত" এই শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে, পূর্ব্বে স্বভাবজ শব্দটী যে অর্থ বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে এখানে "স্বভাব নিয়ত" এই শব্দটী ও সেই অর্থকেই বুঝাইতেছে। যেমন বিষজাত

কৃমির পক্ষে বিষ দোষজনক নহে সেইরূপ স্বভাব নিয়ত কর্ম্ম করিলে মানব "কিল্বিষ" পাপকে প্রাপ্ত হয় না। ৪৭।

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮॥

অন্বয়। হে কৌন্তেয়! সদোষমপি সহজং কর্ম্ম ন ত্যজেৎ হি (যস্মাৎ) ধূমেন অগ্নিরিব সর্ব্বারম্ভা দোষেণ আবৃতাঃ। ৪৮।

মূলানুবাদ। হে কুন্তীনন্দন স্বভাবজ কর্ম্ম সদোষ হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিবে না, কারণ ধূমের দ্বারা যেমন অগ্নি আবৃত হয় সেইরূপ সকল কর্ম্মই দোষের দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। ৪৮।

ভাষ্য। স্বভাব নিয়তং কর্ম্মকুর্ব্বাণো বিষজাত ইব কৃমিঃ কিল্বিষং নাপ্নোতি ইত্যুক্তম্। পরধর্ম্মশ্চ ভয়াবহ ইতি। অনাত্মজ্ঞশ্চ ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি অকর্ম্ম-কৃত্তিষ্ঠতি ইতি অতঃ সহজং সহ জন্মনৈব উৎপন্নং সহজং কিং তৎ কর্ম্ম, কৌন্তেয় সদোষমপি ত্রিগুণত্বাৎ ত্যজেৎ। সর্ব্বারম্ভা আরভ্যন্তে ইত্যারম্ভাঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ইত্যেতৎ প্রকরণাৎ। যে কেচিদারম্ভাঃ স্বধর্ম্মাঃ পরধর্ম্মাশ্চ তে সর্ব্বে হি যস্মাৎ ত্রিগুণাত্মকত্বমত্র হেতুঃ, ত্রিগুণাত্মকত্বাৎ দোষেণ ধূমেন সহজেন অগ্নিরিব আবৃতাঃ। সহজস্য কর্ম্মণঃ স্বধর্ম্মাখ্যস্য পরিত্যাগেন পরধর্ম্মানুষ্ঠানেঽপি দোষান্নৈব মুচ্যতে। ভয়াবহশ্চ পরধর্ম্মঃ। ন চ শক্যতে অশেষতঃ ত্যক্তুমজ্ঞেন কর্ম্ম যতস্তস্মাৎ ন ত্যজেদিত্যর্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ। বিষজাত কৃমির ন্যায় স্বভাব নিয়ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পাপকে প্রাপ্ত হয় না ইহা বলা হইয়াছে। পরধর্ম্ম ভয়াবহ ইহাও বলা হইয়াছে। এবং পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। এই জন্যই (আবার বলিতেছেন যে) "সহজ"—জন্মের সহিত যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই সহজ। কি তাহা?—কর্ম্ম, হে কৌন্তের ঐ কর্ম্ম ত্রিগুণত্ব নিবন্ধন সদোষ হইলেও ত্যাগ করিবে না। যাহার আরম্ভ করা যায় তাহাই এই স্থানে আরম্ভ শব্দের অর্থ। 'সর্ব্বারম্ভ' অর্থাৎ সকল কর্ম্ম। কর্ম্মের প্রকরণ চলিতেছে বলিয়া (এই স্থলে আরম্ভ শব্দের অর্থ কর্ম্মই গ্রহণ করিতে হইবে) যত প্রকার আরম্ভ আছে, অর্থাৎ স্বধর্ম্ম বা পরধর্ম্ম সমূহ, তাহা সকলই সহজ ধূমের দ্বারা অগ্নির ন্যায়, দোষের দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে, সকল কর্ম্মই

যখন ত্রিগুণাত্মক তখন সেই ত্রিগুণাত্মকত্বরূপ হেতু আছে বলিয়া উহারা সকলেই সদোষ। সহজ কর্ম্মের অর্থাৎ স্বধর্ম্মের পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও দোষ হইতে মুক্তিলাভ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, অথচ পরধর্ম্ম ভয়াবহ। একেবারে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করা অজ্ঞের পক্ষে সম্ভব পর নহে এই কারণে সহজ কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবে না ইহাই অর্থ।

ভাষ্য। কিমশেষতঃ ত্যক্তুম্ অশক্যং কর্ম্মেতি ন ত্যজেৎ কিং বা সহজস্য কর্ম্মণস্ত্যাগে দোষো ভবতীতি। কিঞ্চাতো যদি তাবদশেষতঃ ত্যক্তুমশক্যমিতি ন ত্যাজ্যং সহজং কর্ম্ম এবং তর্হি অশেষতঃ ত্যাগে গুণ এব স্যাদিতি সিদ্ধং ভবতি। সত্যমেবং অশেষতস্ত্যাগ এব নোপপদ্যতে ইতি চেৎ কিং নিত্য-প্রচলিতাত্মকঃ পুরুষঃ যথা সাংখ্যানং গুণাঃ, কিং বা ক্রিয়ৈব কারকং যথা বৌদ্ধানাং পঞ্চ স্কন্ধাঃ ক্ষণবিধ্বংসিনঃ, উভয়থাপি কর্ম্মণোঽশেষতঃ ত্যাগো ন ভবতি। অথ তৃতীয়োঽপি পক্ষঃ যদা করোতি তদা সক্রিয়ং বস্তু যদা ন করোতি তদা নিষ্ক্রিয়ং বস্তু তদেব। তত্রৈবং সতি শক্যং কর্ম্ম অশেষতঃ ত্যক্তুম্। অয়ং তু অস্মিন্ তৃতীয়ে পক্ষে বিশেষো ন নিত্যপ্রচলিতং বস্তু নাপি ক্রিয়ৈব কারকং কিং তর্হি ব্যবস্থিতে দ্রব্যে অবিদ্যমানা ক্রিয়া উৎপদ্যতে বিদ্যমানা চ বিনশ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ। (এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতেছে যে) অশেষভবে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না, এই কারণেই কি পরিত্যাগ করিবে না, এই প্রকার বলা হইতেছে? অথবা সহজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে দোষ হয়, এই কারণে উহা পরিত্যাগ করিবে না, ইহা বলা হইতেছে? এই যে দুই প্রকার শঙ্কা করা যাইতেছে ইহাতে ফল কি?—(প্রথম শঙ্কার ফল হইতেছে যে) যদি অশেষতঃ কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারা অসম্ভব বলিয়া সহজ কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবে না, এই রূপ (অভিপ্রায়) হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে অশেষ কর্ম্ম পরিত্যাগ করাও গুণের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, এই রূপই সিদ্ধ হইয়া পড়ে। সত্য এইরূপ হইতে পারে, কিন্তু অশেষতঃ কর্ম্মত্যাগই উপপন্ন হইতে পারে না (কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে কেহই কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণ কালের জন্য থাকিতে পারে না, সুতরাং একেবারে সকল কর্ম্ম ছাড়িবে, ইহা কি প্রকারে উপপন্ন হইবে?) ইহার উপর বক্তব্য এই যে, তবে কি ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে সাংখ্য মতে যেমন গুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) সমূহ সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল, সেই প্রকার আত্মাও কি সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল কিংবা বৌদ্ধগণের মতে যেমন (রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা সংজ্ঞা ও সংস্কার রূপ) পঞ্চ স্কন্ধ ক্ষণবিধ্বংসী কারণ, (তাহাদের

মতে) ক্রিয়াই কারক (ক্রিয়া ছাড়া কারক না থাকিলে কোন বস্তুই স্থায়ি হইতে পারে না, এই জন্য পঞ্চ স্কন্ধ রূপ যে তাহাও কতকগুলি ক্রিয়ার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নহে, সুতরাং তাহাও ক্ষণবিধ্বংসী) সেই প্রকার আত্মাও কি ক্ষণবিধ্বংসী? অথবা এই দুই প্রকার পক্ষ ছাড়া আর একটী তৃতীয় পক্ষ আছে, সেই পক্ষে (এইরূপ স্বীকৃত হইয়াছে যে) বস্তু (স্থায়ি হইলেও) যখন কোন কার্য্য করে, তখন তাহা সক্রিয়, যে সময় তাহা কোন কার্য্য করে না, তখন তাহাকেই নিষ্ক্রিয় বলা যাইতে পারে, এই প্রকার যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে, অশেষতঃ কর্ম্ম পরিত্যাগ করা সম্ভবপর হইয়া উঠে। কিন্তু তৃতীয় পক্ষে এই বিশেষ যে, এই মতে আত্মরূপ বস্তু নিত্য প্রচলিতও নহে এবং ক্রিয়াই যে কারক তাহা নহে, (ক্রিয়া ছাড়া স্থায়ি কারকও বিদ্যমান আছে) এই তৃতীয় মতে জিজ্ঞাস্য এই যে, তবে কি ইহাই অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, ব্যবস্থিত বস্তুতে, (স্বতঃ সিদ্ধ ভাবে) বিদ্যমান না থাকিয়াও সময় বিশেষে, ক্রিয়া উৎপন্ন হয় এবং পরে বিনাশ ও পাইয়া থাকে?।

ভাষ্য। শুদ্ধং দ্রব্যং শক্তিমৎ অবতিষ্ঠতে ইত্যেবমাহুঃ কাণাদাস্তদেব চ কারকমিত্যস্মিন্ পক্ষে কো দোষ ইতি। অয়মেব তু দোষঃ, যতস্ত্বভাগবতং মতমিদম্। কথং জ্ঞায়তে, যত আহ ভগবান্ "নাসতো বিদ্যতে ভাব" ইত্যাদি। কাণাদানাং হি অসতো ভাবঃ সতশ্চাভাব ইতীদং মতম্। অভাগবতত্বেঽপি ন্যায়বচ্চেৎ কো দোষ ইতি চেৎ। উচ্যতে, দোষবত্ত্বিদং সর্ব্বপ্রমাণবিরোধাৎ। কথং? যদি তাবদ্দ্ব্যণুকাদি দ্রব্যং প্রাগুৎপত্তেরত্যন্তমেব অসৎ উৎপন্নং চ স্থিতং কঞ্চিৎকালং, পুনরত্যন্তমেবাসত্ত্বং আপদ্যতে। তথা চ সতি অসদেব সজ্জায়তে অভাবো ভাবো ভবতি ভাবশ্চাভাব ইতি।

ভাষ্যানুবাদ। শুদ্ধ (নির্ব্বিকার) দ্রব্য (বিকারানুকূল-) শক্তিমৎ হইয়া অবস্থিতি করে, এইরূপ কণাদ মতানুযায়ী দার্শনিক গণ বলিয়া থাকেন। (তাঁহাদের মতে) সেই শুদ্ধ ও শক্তিমদ্ দ্রব্যই কারক হইয়া থাকে। এই প্রকার মতে কি দোষ আছে? ইহাই দোষ যে ইহা ভগবানের অভিমত নহে। কিসে জানা গেল? (যে ইহা ভগবানের মত নহে) যে হেতু ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন "অসতের উৎপত্তি হইতে পারে না" ইত্যাদি। কণাদ মতানুযায়ী দার্শনিক গণের ইহা মত যে অসতের উৎপত্তি হয় এবং সতের ও বিনাশ হয়। ভগবানের অভিমত নাই হইল, তাহাতে ক্ষতি কি? এই মতটী যুক্তি সঙ্গত যদি হয় (তাহা হইলে কেন ইহাকে গ্রহণ করা যাইবে না?) ইহার উপর বক্তব্য

এই যে, এই মতটী সদোষ, কারণ, ইহা সর্ব্ব প্রমাণ বিরুদ্ধ, কি প্রকারে? যদি দ্ব্যণুক প্রভৃতি কার্য্যদ্রব্য উৎপত্তির পূর্ব্বে একেবারে অসৎ হয়, এবং উৎপন্ন হইয়া কিছুকালেরজন্য সৎ হয়, পরে আবার অত্যন্ত অসত্ত্বকে প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে (এই আপত্তি হয় যে) অসৎ সৎ হয়, অর্থাৎ অভাব ভাব হয়, এবং ভাব অভাব হয়।

ভাষ্য। তত্রাভাবো জায়মানঃ প্রাগুৎপত্তেঃ শশবিষাণকল্পঃ সমবায্যসমবায়ি-নিমিত্তাখ্যং কারণমপেক্ষ্য জায়তে ইতি। ন চৈবং অভাব উৎপদ্যতে কারণং বা অপেক্ষতে ইতি শক্যং বক্তুম্ অসতাং শশবিষাণাদীনামদর্শনাৎ। ভাবাত্মকাশ্চেদ্ ঘটাদয় উৎপদ্যমানাঃ কিঞ্চিৎ অভিব্যক্তিমাত্রকারণমপেক্ষ্য উৎপদ্যন্তে ইতি শক্যং প্রতিপত্তুম্। কিঞ্চাসতশ্চ সদ্‌ভাবে সতশ্চাসদ্ভাবে ন ক্বচিৎ প্রমাণ-প্রমেয়ব্যবহারে বিশ্বাসঃ কস্যচিৎ স্যাৎ। সৎ সদেব অসৎ অসদেব ইতি নিশ্চয়ানুপপত্তেঃ।

ভাষ্যানুবাদ। এইরূপ সেই কাণাদমতে (ইহাও অঙ্গীকার করিতে হইবে যে) উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অভাব, সুতরাং শশবিষাণ স্বরূপ হইলেও যখন উৎপন্ন হইতে থাকে, তখন সমবায়ি অসমবায়ি এবং নিমিত্ত কারণকে অপেক্ষা করিয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা কিন্তু কিছুতেই সম্ভব নহে যে অভাবের উৎপত্তি হয় বা তাহা কারণকে অপেক্ষা করে, কারণ, শশশৃঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে বা কারণকে অপেক্ষা করিতেছে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে ইহা যদি অঙ্গীকার কর যে ঘট প্রভৃতি কার্য্য সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে, কেবল সময় বিশেষে আবির্ভূত হইয়া থাকে, এবং আবির্ভাব বা অভিব্যক্তির প্রতি যাহা কারণ, তাহারই অপেক্ষা করিযা আবির্ভূত হইয়া থাকে এইমাত্র, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করা যাইতে পারে। আরও একটী কথা এই যে, অসৎ যদি সৎ হয় কিংবা সৎ যদি অসৎ হয়, তাহা হইলে কোন প্রকার প্রমাণ ও প্রমেয় ব্যবহারের প্রতি কাহারও বিশ্বাস থাকিতে পারে না। সৎ সৎই, অসৎ অসৎই, এই প্রকার নিশ্চয়ও অনুপপন্ন হইয়া পড়ে।

ভাষ্য। কিঞ্চ উৎপদ্যতে ইতি, দ্ব্যণুকাদের্দ্রব্যস্য স্বকারণসত্তাসম্বন্ধমাহুঃ। প্রাগুৎপত্তেশ্চাসৎ পশ্চাৎ স্বকারণব্যাপারমপেক্ষ্য স্বকারণৈঃ পরমাণুভিঃ সত্তয়া চ সমবায়লক্ষণেন সম্বন্ধেন সম্বধ্যতে, সম্বন্ধং সৎকারণসমবেতং সদ্ভবতি। তত্র বক্তব্যং কথমসতঃ সৎকারণং ভবেৎ? সম্বন্ধো বা কেনচিৎ। নহি বন্ধ্যাপুত্রস্য সতা সম্বন্ধো বা কারণং বা কেনচিৎ প্রমাণতঃ

কল্পয়িতুং শক্যং। নন্বু নৈব বৈশেষিকৈঃ অভাবস্য সংবন্ধঃ কল্প্যতে দ্ব্যণুকাদীনাং হি দ্রব্যাণাং স্বকারণেন সমবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধঃ সত্যয়েব উচ্যতে ইতি। ন সম্বন্ধাৎ প্রাক্ সত্ত্বানভ্যুপগমাৎ। নহি বৈশেষিকৈঃ কুলালদণ্ডচক্রাদিব্যাপারাৎ প্রাগ্ ঘটাদীনাং অস্তিত্ব মিষ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ। আরও (দেখিতে হইবে যে) বস্তু উৎপন্ন হইতেছে ইহার অর্থ কি? বৈশেষিকগণ বলিয়া থাকেন যে ইহার এই উত্তর যে দ্ব্যণুকাদি কার্য্যদ্রব্য নিজ কারণ পরমাণু এবং সত্তার সহিত সম্বন্ধ হইতেছে। অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যদ্রব্য অসৎ হইলেও তাহা নিজকারণের ব্যাপার কে অপেক্ষা করিয়া, নিজ কারণ পরমাণুর সহিত এবং নিজের সত্তার সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়েছে, ঐ সম্বন্ধেরনাম সমবায়, এইভাবেই উৎপন্ন দ্রব্য নিজ সমবায়ি কারণে সমবেত হইয়া থাকে (ইহাকেই লোকে উৎপত্তি কহিয়া থাকে)। বৈশেষিকগণের এই প্রকার সিদ্ধান্তের উপর বক্তব্য এই যে,—যাহা অসৎ তাহার কারণ সৎ হইবে কি প্রকারে? এবং তাহার সহিত অন্য কোন বস্তুর সম্বন্ধই বা হইবে কিরূপে? বন্ধ্যা পুত্রের কারণ আছে বা বন্ধ্যাপুত্রের সহিত কাহারও সম্বন্ধ আছে ইহা কেহই প্রমাণের সাহায্যে কল্পনা করিতে পারে না। যদি বল বৈশেষিকগণ যে অভাবের সহিত কাহারও সম্বন্ধ কল্পনা করেন তাহা নহে, তাঁহারা বলেন যে দ্ব্যণুকাদি কার্য্য দ্রব্য সৎ, তাহাদের সহিতই কারণ দ্রব্যের সমবায় রূপ সম্বন্ধ কল্পিত হইয়া থাকে। ইহা ও ঠিক নহে, কারণ, কারণ দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ হইবার পুর্ব্বে কার্য্য দ্রব্যের সত্তা বৈশেষকগণ একেবারেই স্বীকার করেন না। কুম্ভকার দণ্ড ও চক্র প্রভৃতির ব্যাপারের পুর্ব্বে ঘটাদি কার্য্য দ্রব্যের অস্তিত্ব আছে ইহা ত বৈশিষকগণ স্বীকার করেন না।

ভাষ্য। ন চ মৃদ এব ঘটাদ্যাকারপ্রাপ্তিমিচ্ছন্তি। ততশ্চাসত এব সম্বন্ধঃ পারিশেষ্যাদিষ্টো ভবতি। নন্বসতোঽপি সমবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধো ন বিরুদ্ধঃ। ন বন্ধ্যাপুত্রাদীনাং অদর্শনাৎ। ঘটাদেরেব প্রাগভাবস্য স্বকারণসম্বন্ধো ভবতি, ন বন্ধ্যাপুত্রদেরভাবস্য, তুল্যত্বেঽপি ইতি বিশেষোঽভাবস্য বক্তব্যঃ। একস্যাভাবঃ দ্বয়োরভাবঃ সর্ব্বস্যাভাবঃ প্রাগভাবঃ প্রধ্বংসাভাবঃ ইতরেতরাভাবঃ অত্যান্তাভাব ইতি লক্ষণতো ন কেনচিদ্বিশেষো দর্শয়িতুং শক্যঃ। অসতি চ বিশেষে ঘটস্য প্রাগভাব এব কুলালাদিভিঃ ঘটভাবমাপদ্যতে সম্বধ্যতে চ ভাবেন কপালাখ্যেন স্বকারণেন সর্ব্বব্যবহারযোগ্যশ্চ ভবতি, নতু ঘটস্যৈব প্রধ্বংসাভাবঃ অভাবত্বে সত্যপি ইতি প্রধ্বংসাদ্যভাবানাং ন কচিদ্ ব্যবহারযোগ্যত্বং প্রাগভাবস্যৈব

দ্ব্যণুকাদি দ্রব্যাখ্যস্য উৎপত্ত্যাদি ব্যবহারার্হত্বং ইত্যেতদসমঞ্জসমভাবত্বা-বিশেষাৎ অত্যন্তপ্রধ্বংসাভাবয়োরিব।

ভাষ্যানুবাদ। বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন না যে, মাটীই ঘটাদি আকারকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের মতে পরিশেষে ইহাই স্থির হইতেছে যে, অসতেরই সম্বন্ধ হইয়া থাকে। যদি বল অসতের সহিত সতের (অন্য কোন সম্বন্ধ ঘটিতে না পারিলেও) সমবায় রূপ সম্বন্ধ হইতে পারে। তাহাও ঠিক্ নহে, বন্ধ্যা পুত্রের কাহার ও সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। আরও দেখিতে হইবে যে (বৈশেষিকগণের মতে দেখা যায় যে) উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটাদির যে অভাব থাকে তাহার সহিত তাহার কারণের সম্বন্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু বন্ধ্যা পুত্রের অভাব অভাব হইলেও তাহার কারণের সহিত সম্বন্ধ হয় না, এই অভাবের মধ্যে বিশেষ অঙ্গীকার করা হইতেছে তাহা কিরূপ, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। একের অভাব দুইয়ের অভাব, সকলের অভাব, প্রাগভাব প্রধ্বংসাভাব, অন্যোন্যাভাব ও অত্যন্তাভাব এই অভাব কয়টীর মধ্যে পরস্পর লক্ষণ গত বা স্বরূপগত কোন বিশেষ কেহই দেখাইতে পারেন না। বিশেষ যদি না থাকে তবে এক ঘটের প্রাগভাব কুম্ভকারাদির প্রযত্নের সাহায্যে ঘটভাবকে প্রাপ্ত হয় এবং ভাব বস্তু যে কারণ রূপ কপাল দ্রব্য তাহার সহিত সম্বন্ধও হইয়া থাকে এবং সর্ব্ব ব্যবহারেরও যোগ্য হয়, কিন্তু ঘটেরই প্রধ্বংসাভাব অভাব হইলেও ঐরূপ হইতে পারে না। অর্থাৎ প্রধ্বংসভাব প্রভৃতি অভাবগুলি ব্যবহার যোগ্য হয় না। প্রাগভাবই দ্ব্যণুকাদি দ্রব্যনামে প্রথিত হইয়া উৎপত্তি প্রভৃতি ব্যবহারের যোগ্য হয় এই প্রকার কল্পনা নিতান্ত অসঙ্গত, প্রধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব যেমন অভাব, সেইরূপ প্রাগভাব ও অভাব ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার বিশেষ থাকা সম্ভব পর নহে।

ভাষ্য। ননু নেবাস্মভিঃ প্রাগভাবস্য ভাবাপত্তিরুচ্যতে। ভাবস্যৈব হি তর্হি ভাবাপত্তিঃ যথা ঘটস্য ঘটাপত্তিঃ—পটস্য বা পটাপত্তিঃ। এতদপি অভাবস্য ভাবাপত্তিবদেব প্রমাণবিরুদ্ধম্। সাংখ্যস্যাপি যঃ পরিণামপক্ষঃ সোঽপ্য-পূর্ব্বধর্ম্মোৎপত্তি বিনাশাঙ্গীকরণাৎ বৈশেষিক পক্ষাৎ ন বিশিষ্যতে। অভিব্যক্তি-তিরোভাবাঙ্গীকরণেঽপি অভিব্যক্তিতিরোভাবয়ো বিদ্যমানত্বাবিদ্যমানত্ব-নিরূপণে পূর্ব্ববদেব প্রমাণবিরোধঃ। এতেন কারণস্যৈব সংস্থানমুৎপত্ত্যাদি ইত্যেদপি প্রত্যুক্তম্।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত

শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্।] [পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

কুচবিহারের মহারাজের সহিত কেশব আপনার কন্যার বিবাহ দেওয়ায়, আজ কয়েক বৎসর তাঁহার অনেকগুলি স্বাধীনচেতা ভক্ত, তাঁহার দল ছাড়িয়া একটী ভিন্ন দলের সৃষ্টি করতঃ, তাহার নাম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ রাখিয়াছেন। এই বিবাহের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কেশব প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের নেতারা কন্যার বিবাহের বয়সের একটী সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। এখন কেশব তাঁহার আপনার কন্যাকে তদপেক্ষা অল্প বয়সে বিবাহ দিতে নানাকারণে বাধ্য হইলেন। তজ্জন্যই সমাজে এই দলাদলি উপস্থিত হয় এবং দলভুক্ত লোকেরা কেশবের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বিরুদ্ধ দল—উভয়পক্ষই আসা যাওয়া করিতেন এবং বিরুদ্ধ পক্ষীয়েরা কেশবের ঐ ব্যবহার স্বার্থপরতাদুষ্ট বলিতে ত্রুটি করিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট একদিন কেশব উপস্থিত আছেন, এমন সময় অপর পক্ষীয়েরা ঐ ঘটনার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলে তিনি বলিলেন—"কেশব। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—ভগবানের হাত। তুমি ঐ সম্বন্ধে আইন কর্‌তে গেলে কেন? আর তুমি লোক চিনে দলে নিতে পার না? উপরে উপরে দেখ্‌লে লোকগুলি সব একই রকম। কিন্তু ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলে দেখিবে, উহাদের কেহ সত্বগুণী, কেহ রজোগুণী, আবার কেহবা তমোগুণী; যেমন পুলি পিটে, উপরে সকলগুলি একই রকম, কিন্তু কারুর মধ্যে কলাইয়ের পুর, কারুর মধ্যে নারিকেলের পুর, আবার কারুর মধ্যে ক্ষীরের পুর। তুমি যাকে পেয়েছ, তাকেই দলে নিয়েছ; তাতেই ত তোমার দল ভেঙ্গে গেল।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেশবকে বড়ই ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার সঙ্গে বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন। সাধারণ সমাজের প্রায় সকলেই রামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট। প্রবাদ আছে, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মহাভক্ত শ্রীঅদ্বৈত গোস্বামী সাধন বলে অবগত হইয়াছিলেন যে, শ্রীভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হইবেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া, হরিনাম প্রচারের একজন প্রধান সহায় হন। অদ্বৈত

প্রভু ইতিপূর্ব্বে বেদান্তবাদী ছিলেন এবং জ্ঞান বিচারেই কাল কাটাইতেন; কিন্তু মহাপ্রভুর কৃপায় অবশেষে তাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধা ভক্তির উদয় হওয়ায়, পরে তিনি জ্ঞান ভক্তি উভয়েরই আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিলেন। বিজয় সেই অদ্বৈত-বংশোদ্ভব; তাই রামকৃষ্ণদেব তাঁহার পার্ষদ ভক্তদের বলিলেন, "দেখ, বিজয়টী বেশ, প্রভুবংশে জন্ম, একটু নেড়ে চেড়ে দিলেই এখনি চৈতন্য হয়।" ভক্তেরা সকলে বলিলেন—"হাঁ মশাই। উঁহার মত 'মন মুখ এক' লোক দেখা যায় না। দিন না একটু নেড়ে চেড়ে।"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন—"তা মার ইচ্ছা হলেই হবে, এখানে এলে গেলেই হবে।" তাই তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে আসিতে বলিয়াছেন। কিন্তু বিজয়ের সাংসারিক অবস্থা বড়ই মন্দ, অতিকষ্টে দিনপাত হয়। ঐ কারণে সমাজে একটী চাকরি স্বীকার করিয়াছেন, অনেক খাটিতে হয়, এজন্য সময়াভাব; তারপর অর্থাভাবের জন্যও গাড়ী বা নৌকা ভাড়া করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ইচ্ছামত আসিতে পারেন না। বিজয় কিন্তু কিছুদিন না আসিলেই রামকৃষ্ণদেব তাঁহার কোন ভক্তকে দিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিতেন এবং অনেক সময়ে তাঁহার যাতায়াতের যোগাড় করিয়া দিতেন। ব্রাহ্মসমাজের অনেকে রামকৃষ্ণদেবের উপদেশগুলি নিজের মত 'ন্যাজা মুড়া বাদ দিয়া' লইতেন, বিজয় কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপর এতই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহার প্রত্যেক কথাই ক্রমে সত্য বলিয়া মানিতে লাগিলেন ও তাহার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান করিতেও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব হইতেই বিজয় বড় সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। যাহা সত্য বলিয়া একবার বিশ্বাস হইত, তাহার জন্য প্রাণ পণ করিতেন। বলা বাহুল্য, ঐজন্যই তিনি বংশগৌরবে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হইয়াছিলেন। এখনও শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ বাক্য সকল বিজয়ের দিন দিন যত সত্য বলিয়া ধারণা হইতে লাগিল, ততই তাঁহার জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। রামকৃষ্ণদেবও এই সময়ে কখন কখন কলিকাতায় যাইয়া বিজয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।

"আজ অনেক দিন হ'ল, বিজয় আসেনি। তার জন্যে মনটা কেমন হয়েছে, তাকে বড়ই দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়েছে। বলরাম, তুমি তাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে এস। আস্‌বে?" রামকৃষ্ণদেব একদিন বলরামকে এই কথা বলিবামাত্র তিনি সম্মত হইলেন এবং পরদিন বিজয়কে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন। সকলে রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে, নানা কথার পর বদ্ধ জীবের কথা পড়িল। ঠাকুর বলিলেন—"যারা বদ্ধ জীব, তাদের কোন মতেই চৈতন্য

হয় না। সংসারে এত দুঃখ কষ্ট পায়, তবু একটুও হুঁষ হয় না। আবার কোন রকমে যদি সংসার থেকে একটু দূরে গিয়ে পড়ে ত মাগ ছেলের জন্য হেদিয়ে মরে। যেমন গুয়ের পোকা, বিষ্ঠাতেই বেশ থাকে ও আনন্দ পায়; ভাতের হাঁড়ীতে রাখ্‌লে মরে যায়।"

বিজয়ের অন্তঃকরণে ঐ কথায় মহা আঘাত লাগিল, ভাবিলেন—"তবে কি হবে? বদ্ধ জীবের কি কোন উপায় নেই?" ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মশাই বদ্ধ জীবের তবে ভগবান্ লাভ কেমন ক'রে হবে?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন—'তীব্র বৈরাগ্য হলে, কামকাঞ্চনের হাত এড়াবে, তবে ঈশ্বরের কৃপা হবে। সাধন ভজন হবে এখন, আজ না হয় কাল হবে—এ হ'ল মন্দ বৈরাগ্য। যার প্রাণ একেবারে ব্যাকুল হয়ে ভগবানের দিকে ছোটে, কোন বাধা মানে না, ভগবান্ লাভের জন্য অস্থির হয়, মাগ ছেলে সংসার যেন কাল সাপ দেখে, কেবল ঈশ্বরের জন্য লালায়িত, আর কিছুই চায় না—তারই তীব্র বৈরাগ্য। কেমন জান, এক সময় অনাবৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু চাষারা চাষ দিতে ছাড়ে নি। জল হয় না, কি করে—সবাই খাল কেটে নদী থেকে জল আনবার চেষ্টা করছে। সবাই রোজ একটু একটু কাটে। একজন ভাব্‌লে আজই খালে নদীতে যোগ করে দেব, নইলে কাল যদি মরে যাই, ছেলে-গুলো সব ত না খেয়ে মরে যাবে। এই ভেবে সে এক নাগাড়ে কেটে চল্‌ল। এদিকে বেলা অনেক হ'ল, তার গিন্নি মেয়েকে দিয়ে মাঠে তেল পাঠিয়ে চাষাকে নাইতে বোলে পাঠালে। মেয়েটা চাষার এক ধমক্ খেয়ে পালালো। গিন্নী বেজায় বেলা হ'ল দেখে মনে করলে, যাই মিন্‌সেকে আমিই একবার বুঝিয়ে বলি, ভাল জ্বালা, আজ আবার কি ঘাড়ে ভূত চাপ্‌লো। আমি হাঁড়ী নিয়ে আর কত কাল বসে থাক্‌ব? একটা বিবেচনাও কি নেই যে, হ্যাঁ, খেয়ে নিয়ে কাজ করি? কাজের বাঁপরে নিজের খিদে তেষ্টা নেই বলে কি সবার তাই? মাগী আপনার মনে বক্‌তে বক্‌তে এসে মিন্‌সেকে ব'ল্লে, 'বলি হ্যাঁগা, ভাতগুলো যে কড় কড়িয়ে গেল, নেয়ে খেয়ে—।' মিন্‌সে, 'তবেরে হারাম-জাদি,' বোলে কোদাল উঁচিয়ে তাড়া ক'র্লে। মাগী দৌড়। মিন্‌সে অমনি আবার মাটী কাট্‌তে লেগে গেল, তার আর কোনদিকে হুঁষ নেই। সন্ধের একটু আগে নদীর সঙ্গে যোগ ক'র্লে, আর অমনি কুল কুল করে খাল দিয়ে ক্ষেতে জল আস্‌তে লাগ্‌লো। চাষা তখন মহানন্দে একদৃষ্টে হাঁসতে হাঁসতে জলের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মাগীকে বল্লে, 'নে, এখন তেল দে।'

তারপর তেল মেখে, নেয়ে, খেয়ে. ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুতে লাগ্‌লো।—এরই নাম তীব্র বৈরাগ্য। ভগবান্ লাভ আজই কব্‌বো, এখনি কোরে তবে আর কাজ।"

ঠাকুব একটু পরেই আবার বলিতে লাগিলেন—"আব একটা গল্প শোন্। একজনের স্ত্রী একদিন তার স্বামীকে বল্লে, 'দাদা আজ কদিন থেকে সংসাব ত্যাগ করে সন্নিসী হবার চেষ্টা কর্‌ছে, খাওযা কমিযেছে, মাটিতে শোয, বউযের সঙ্গে ভাল করে কথা কয না। তাই বড় ভাবনা হযেছে।' তাব স্বামী বল্লে, 'দূর ক্ষেপী, সে যাবে না, মিছে কথা, সন্ন্যাসী কি অমন কোবে হয?' স্ত্রী বল্লে, 'ওগো, না, সে যে কাপড ছুবিযেছে, সব ঠিক করেছে, নিশ্চয যাবে। তোমাব যেমন কথা, অমন কোবে হয না ত কেমন কোরে হয?' তার স্বামী বল্লে, 'কেমন কোবে হয, দেখ্‌বি? এই এমনি কোরে হয'—বলে নিজের পবা কাপড় খানি ছিঁডে কোপ্‌নি ক'বে পোবে বেবিযে গেল, আব এল না।—এব নাম তীব্র বৈরাগ্য। সন্ন্যাসী হবাব কথা শুনেই অমনি চৈতন্য হ'ল, অমনি সব ত্যাগ কোবে চলে গেল।" প্রভুব কথায ব্রহ্মচাবী ভক্তদের যেমন আনন্দ হইতে লাগিল, তেমনি বিজযেব মজ্জায মজ্জায এই কথাগুলি বসিতে লাগিল।

সেদিন বামকৃষ্ণদেব তাঁহাব একটী অনুবক্ত ভক্তেব শোক সংবাদে বডই ব্যথিত হইযাছিলেন। এঁডিযাদহ নিবাসী বিষ্ণুনামধাবী জনৈক যুবক, বযঃক্রম আন্দাজ কুড়ি বৎসব, বামকৃষ্ণদেবকে বড়ই ভক্তি কবিতেন এবং সদা সর্ব্বদা তাঁহাব নিকট থাকিতে ভাল বাসিতেন। পাঠ্যাবস্থায, বিদ্যালযে না যাইযা বামকৃষ্ণদেবেব নিকট যাইতেন বলিযা, তাহাব পিতা মাতা তাহাকে অতিশয ভর্ৎসনা ও উৎপীডন কবিতেন। বালক এই লাঞ্ছনাব সমস্ত কথা রামকৃষ্ণদেবকে বলিতেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিলেও এই জন্য তাহাকে তাঁহাব নিকট কম কম আসিতে বলিতেন। বিষ্ণু কিন্তু সে কথা শুনিতেন না, বলিতেন—"মশাই আমাব সংসাব ভাল লাগে না, সদাই পালাই পালাই মনে হয, আপনার কাছে না এলে যাই কোথা?" জ্বালায় যন্ত্রণায বিষ্ণু গৃহ হইতে কিছুদিনেব জন্য পশ্চিমাঞ্চলে কোন এক আত্মীযেব নিকট যাইযা থাকিলেন। তথায় বনে, জঙ্গলে, পর্ব্বতে, প্রান্তবে বিচবণ কবিতেন, আর নির্জ্জনে সাধন ভজন করিতেন। কিছুকাল পরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাব পিতা মাতা তাঁহাব তীব্র বৈরাগ্যের ভাব বুঝিতে না পাবিযা, আবাব তাঁহাকে লেখা পড়া, চাকুরি

বাকৃরির জন্য পীড়ন করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহাদের অত্যাচার অসহ্য হওয়াতে বিষ্ণু কহিলেন—"দেখ, তোমাদের আচরণে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়াছি। এই দেহটা তোমাদের—তাই এত অত্যাচার? আচ্ছা"—এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত দেখা করিতে আসিলেন কিন্তু কোন কথা ভাঙ্গিলেন না। কেবল বলিযাছিলেন "বোধ হয়, আব আমি আপনাব নিকট আসিতে পারিব না।" কিছুদিন পরেই সংবাদ আসিল—'বিষ্ণু গলায ছুরি দিযাছে।' আজ বিষ্ণুর এইরূপে দেহত্যাগের সংবাদ পাইযা অবধি রামকৃষ্ণদেব, অতি বিমর্ষভাবে মধ্যে মধ্যে বিষ্ণুর অশেষ গুণের কথা বলিযা, শোক প্রকাশ কবিতেছেন। ইতিমধ্যে জনৈক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসিলেন—"মহাশয আত্মহত্যা ত মহা পাপ—সকলেই এই কথা বলে। এ ছেলেটী যদি এমন ভাল ত আত্মহত্যা কব্‌লে কেন?"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন—"হঁ্যা, আত্মহত্যা মহা পাপ, ঐ পাপে ফিরে ফিরে আস্‌তে হয, আর কতই যন্ত্রণা ভোগ কবতে হয। তবে কি জান, মাটির ছাঁচ বা মুচিটায ততক্ষণ দবকাব, যতক্ষণ না একটা গড়ন ঢালাই কোরে নেওয়া হয়। ঢালাই কাজ হযে গেলে, কাবিকব ছাঁচ ভেঙ্গে গড়নটা বার কোবে নেয। ঈশ্বর লাভ বা জ্ঞান হবাব জন্যই শবীবটাব দবকাব, ঈশ্বব লাভ হযে গেলে যে কোন বকমে শবীবটা গেলেও আব দোষ হয না। বিষ্ণুব হযত পূর্ব্বজন্মে সব করা ছিল, একটু আধটু বাকী ছিল, তা এ জন্মে কবে গেল। পূর্ব্বজন্মটাও মান্‌তে হয। একজন একটু সাধন ভজন কব্‌লেই অনেক এগিযে যায, আবার একজন অনেক কোবে একটু আধটু পায। একজন শবসাধন কব্‌ছিল। একটা জঙ্গলে মড়াব উপব বসে জপ কর্‌তে কর্‌তে ভয পেলে, আর অমনি তাকে বাঘে নিযে গেল। একটু দূবে একজন বেড়াতে বেড়াতে এই ঘটনা দেখে মনে করলে—'বাঃ, এমন সুযোগ ছাড়া হবে না।' সে শবের উপব বসে জপ আরম্ভ কব্‌লে, আর একটু জপ কর্‌তেই মাব কৃপা হ'ল। দর্শন দিযে মা বল্লেন—আমি তোমাব উপর সন্তুষ্ট হযেছি, বব নেও।' সে বল্লে—'মা, এ বড় আশ্চর্য্য কথা। ও লোকটা এত পরিশ্রম কবে তোমায আরাধনা কর্‌লে, তাকে বাঘে নিয়ে গেল। আর আমি সাধন ভজন কিছুই জানিনি, একবার মাত্র তোমায ডাক্‌তেই তোমাব কৃপা হল! এব মানে কি আগে আমায় বল, তারপর বর দিও।' মা বল্লেন—"ওরে অমন কত জন্ম তুই সাধন ভজন কবিছিস্‌, কত বিঘ্ন হয়েছে, কত জন্ম জন্মান্তর আমায ডেকেছিস্‌, দেখা পাস্‌নি। সেই পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলেই আজ আমার দেখা পেলি।"

সকলেই মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন। বিজয় প্রশ্ন করিলেন—"মশাই, ঈশ্বর লাভের উপায় কি? তাঁর কৃপা কেমন করে লাভ হয়?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন—"প্রেম ভক্তি হলেই হয়। জপ তপ, সাধন ভজন, স্মরণ মনন, সব প্রেম ভক্তি হবে বলেই করতে হয়। এক ডাকে তাঁর দেখা পেলুম না বলে হতাশ হওয়া উচিত নয়। খানদানী চাষা যদি দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি হয়, তবুও চাষ ছাড়ে না। বিষয় বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে হবে না। বারুদে একটুও জল থাকলে, আর তাতে আগুন লাগে না। তেমনি আলে একটী গর্ত্ত থাকলে ক্ষেতে যত জল ছেঁচনা, সব বেরিয়ে যায়, একটুও থাকে না। চিত্তশুদ্ধি হওয়া চাই, কর্ম্ম করে। তাঁর নাম জপ করতে করতে চিত্ত-শুদ্ধি হয়। তখন তাঁর নাম করলেই রোমাঞ্চ হয়, চক্ষে জল আসে। ক্রমে তাঁর দর্শন পায়।"

সন্ধ্যা হইল। সকলে বিদায় হইলেন।

বিজয়ের মনে বৈরাগ্যের ভাব বাড়িতে লাগিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের চাকরি গ্রহণ করিয়া অনেক কাজে কর্ম্মে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। দিনের পর দিন যতই যাইতে লাগিল, ততই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন তাঁহার কর্ম্ম-বন্ধন শতগুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়েছে। সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সংসার কোলাহল হইতে দূরে নির্জ্জনে বসিয়া, ঈশ্বরারাধনা করিবার পিপাসা ততই বলবতী হইতে লাগিল। আবার এদিকে পরিবারবর্গের কোন একটা উপায় না করিয়া সংসার পরিত্যাগই বা কেমন করিয়া করেন? এইরূপ মানসিক অবস্থায় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচার কার্য্যের ভার লইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ৺গয়াধামে গমন করিলেন।

একদিন রামকৃষ্ণদেবের ব্রহ্মচারী ভক্তেরা প্রায় সকলেই তাঁহার কাছে আছেন—এমন সময়ে কেশব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেশবের সঙ্গে নানা কথা বার্ত্তার পরে রামকৃষ্ণদেব বলিলেন—"ও কেশব, তুমি কেমন বক্তৃতা দেও, বড় শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে। এইখেনে তুমি কিছু বল, শুনি।"

কেশব বলিলেন—"মশাই, আমি ত বলেছি—আমি আপনার দুই একটী উপদেশ নিয়ে তারই উপর কিছু বলি। এখানে আপনার কাছে কি বলব? আমি ত কামার দোকানে ছুঁচ বেচতে আসিনি। আপনার উপদেশ শুনতেই আসি। আপনি বলুন, আমি শুনি।"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন—"তা নয়, কেশব, তুমি কেমন বল তাই শোন্‌বার বড় ইচ্ছে হয়েছে। আজ কিছু বল।" এই প্রকার জিদ করিলে কেশব অগত্যা বক্তৃতা দিতে উদ্যত হইলেন। সকলে ঘাটের চাঁদনিতে গমন করিলেন, কেশব বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন ঃ—

"আমরা দেখিতেছি, এইখানে প্রেম-নদীতে ভগবানের পাদ-পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, আমরা সেই পাদ-পদ্ম অবলম্বন করিয়া প্রেমের স্রোতে ভাসিয়া যাইব।"—এইরূপে আরম্ভ করিয়া একটী সুন্দর বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতান্তে রামকৃষ্ণদেব আনন্দে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ও কেশব, নদীতে যে পদ্ম হয় না; স্রোতের জলে কি পদ্ম জন্মায়? সরোবরে জন্মায়। তুমি প্রেম-নদী না বলে প্রেম-সরোবর বল্লে ঠিক হোতো।"

কলিকাতায় নন্দনবাগান নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মভক্ত এই সময়ে রামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিতেন। তাঁহার বাটীতে ব্রাহ্মোৎসব উপলক্ষে একদিন রামকৃষ্ণ-দেবকে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য রামকৃষ্ণদেব রাখালকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যার পর তাঁহার বাটীতে গমন করিলেন। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইলে কেহই তাঁহার আদর অভ্যর্থনা করিলেন না। তাঁহারা যাইয়া এক পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। সঙ্গীতাদির পর ভোজনার্থ সকলকে আহার করিতে ডাকা হইল, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব ও রাখালকে কেহই ডাকিলেন না। ইহা দেখিয়া রাখাল বলিলেন—"চলুন মশাই, আমরা চলে যাই, এখানে বড় সুবিধে নয়।"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন—"এত রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে কি খাবি? সমস্ত রাত কি উপোষ করে থাক্‌বি?"

রাখালের রামকৃষ্ণগত প্রাণ। এখানে তাঁহার অনুরূপ খাতির যত্ন হইতেছে না দেখিয়া প্রথম হইতেই বিরক্ত হইয়াছেন, আবার সকলকে ভোজনে আহ্বান করা হইল, কিন্তু তাঁহাদিগকে কেহ আহার করিতে ডাকিল না—কাজেই রাখালের আর সহ্য হইল না। তিনি বলিলেন—"হ্যাঁ মশাই, উপোষ করেই থাক্‌ব, তার ভয় কি? আপনি চলুন, যাই।"

বালকের ন্যায় অভিমান-শূন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন—"তুই উপোষ কর্‌গে যা, আমি পার্‌ব না। আমি নিমন্ত্রণে এসেছি—লুচি খাবো, তবে যাবো।"

রাখাল বলিলেন—"আপনার জন্য সেখানে কিছু না কিছু কি যোগাড় হবে না? আপনি চলুন।" রামকৃষ্ণদেব কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। রাখাল কাজেই ক্ষুণ্ণ হইলেন।

তখন রামকৃষ্ণদেব হাসিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন—"নারে, আমি তা বলছিনি। কি জানিস্, সাধু সন্ন্যাসী গেরস্থের বাড়ী থেকে অভুক্ত ফিরে গেলে গেরস্থের বড় অকল্যাণ হয়। তাই আমি কিছু না খেয়ে যাব না।" এই বলিয়া তিনি বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"ওগো আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে, তোমরা আমায় কিছু খেতে দেও।" বলিতে বলিতে পঙ্‌ক্তির এক প্রান্তে আসিয়া যেখানে সকলের জুতা পড়িয়া আছে সেইখানে আসিলে, একজন স্ত্রীলোক দুইখানি পাতা পাতিয়া তাহাতে কয়েকখানি লুচি দিয়া গেলেন। রামকৃষ্ণদেব রাখালকে বলিলেন—"ওরে দেখিস, আমাদের জুতগুলো যেন হারায় না। সাবধান, লুচি খেতে যেন জুত খোয়াস্ নি।" রাখাল জুতা সাবধানে নিকটে রাখিয়া অনিচ্ছাসত্বেও অগত্যা তাঁহার সহিত ভোজনে বসিলেন। এদিকে লুচি এলো ত তরকারি আর আসেই না। রাখালও তত ক্ষুণ্ণ হইতেছেন। কাজেই রামকৃষ্ণদেব কেবল লবন সংযোগে কয়েকখানি লুচি খাইয়া হৃষ্টচিত্তে রাখালকে বলিলেন—"এখন যাহা হউক কিছু খাওয়া হয়েছে, এখন চল্।" এই বলিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।

কেশব সভা সমিতি করিয়া, বক্তৃতা দ্বারা, ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলে, উত্তর ভারতের অনেক স্থানে ধর্ম্মালোচনার একটা ঢেউ উঠিল। কলিকাতার ত কথাই নাই—কলিকাতার অনেক ঘরে ঘরে যুবকবৃন্দের মধ্যে কেশবের মতানুযায়ী ধর্ম্মচর্চ্চার একটা প্রবল স্রোত বহিতে থাকিল। প্রায় প্রত্যেক পল্লিতে, প্রত্যেক বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণী সমূহে, ঐরূপে এক একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির চর্চ্চা হইল। আবার কেশবের ব্রাহ্মসমাজ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব্ব উক্তি ও ধর্ম্মভাব নানারূপে প্রসৃত হইয়া ছাত্রমণ্ডলীকে রামকৃষ্ণদেবের প্রতি আকৃষ্ট করিতে লাগিল। শশী ও শরৎ এই স্রোতে পড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হয়। শশী—শরতের পিতৃব্য পুত্র। উভয়েই চাঁপাতলায়, একই বাটীতে থাকিত। শশী কেশব বাবুর বিদ্যালয়, আলবর্ট স্কুলে পড়িত। কাজেই কেশবের বক্তৃতা ও প্রচার কার্য্য ইহাদের দেখিবার ও জানিবার বিশেষ সুবিধা ছিল। আবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ইহারা আলবর্ট স্কুলের বালক-

দিগের দ্বারা গঠিত একটী সমিতির সভ্য হইয়াছিল। এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব একদিন কেশবের সমাজমন্দিরে সহসা আসিয়া উপস্থিত হন এবং সরল মধুর ভাষায় ঈশ্বর বিষয়ে আলাপ করিয়া সমাগত সকলকে মুগ্ধ করেন। শুনিয়াছি, তাঁহার আগমনে কেশব বেদী ছাড়িয়া দেন এবং উপাসকদিগকে তাঁহার কথাই শুনিতে বলেন। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতার লোকে ঈশ্বরীয় প্রেমে বাহ্যজ্ঞান হারাণর কথা জানিতই না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐরূপ হইতে দেখিয়া সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া গিয়াছিল। আলবর্ট বিদ্যালয়ের পূর্ব্বোক্ত সমিতির কয়েকজন বালক সে দিন সমাজে উপস্থিত ছিল। তাহারাও অবাক্ হইয়া ঐ মহাপুরুষের ভাবাদি দর্শন করিয়া ভক্তিপ্রেমে বিগলিত হইয়াছিল এবং স্থির করিয়াছিল যে, সমিতির বাৎসরিক প্রতিষ্ঠার দিনে তাহারা সকলে মিলিয়া নৌকারোহণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার অমৃতময়ী বাণী শুনিবে। ঐ বালকদিগের নিকট হইতেই শশী ও শরৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয় জানিতে পারিল এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য মনস্থ করিল। শশী সে বৎসর এফ এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে এবং শরৎ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এফ এ পড়িতেছে। সমিতির সাংবৎসরিক উৎসবের দিন সমাগত হইলে তাহারাও সমিতির যুবকদের সহিত মিলিত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করিল। দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিৎ পরে তাহারা যখন তথায় উপস্থিত হইল, তখন রামকৃষ্ণদেব আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন। সুতরাং সকলে মিলিয়া পঞ্চবটীর তলে উপস্থিত হইয়া বৃক্ষারোহণ, দৌড়াদৌড়ি প্রভৃতি খেলাধূলায় কিছুক্ষণ কাটাইলে, পরে নিকটবর্ত্তী দোকান হইতে মুড়ী কিনিয়া আনিয়া জলযোগ করিয়া প্রায় ৩টার সময় রামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিল। দেখিল, রামকৃষ্ণদেবের নিকট তখন দুই তিন জন মাত্র লোক বসিয়াছে এবং তিনি ছোট চৌকিখানির উপর বসিয়া রহিয়াছেন। তাহারা সকলে পূর্ব্বের দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বালকদিগকে সহাস্যমুখে নিকটে আসিতে বলিলেন এবং তাহাদের বসিবার জন্য নিকটস্থ একজন সেবককে একখানি মাদুর পাতিয়া দিতে বলিলেন। সকলে উপবেশন করিলে তিনি তাহাদের নামধামাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহাদের কেশবের সমাজে যাওয়া আসা আছে জানিয়া সুখী হইলেন। বলিলেন—"হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গতে হয়। চারাগাছে বেড়া দিয়ে রাখ্‌তে হয়, নইলে ছাগল গরুতে মুড়িয়ে নষ্ট করে। ইট বা টালি যদি কোন ছাপ শুদ্ধ পোড়ান হয় ত পোড়াবার পর সে ছাপ আর কিছুতেই ওঠে না। সেইরূপ ভগবানে ভক্তি-

লাভ ক'রে একটু পেকে যদি তোমরা সংসারে ঢোক, তা হ'লে সে ভক্তি চিরকাল থাক্‌বে ও তোমাদের কামকাঞ্চন একেবারে সংসারে ডুবিয়ে ফেল্‌তে পার্‌বে না। এখনকার বাপ মায়েরা ছেলেবেলায় বালকদের বে দিয়ে তাদের সর্ব্বনাশ করে দেয়। ইস্কুল থেকে ছেলে যখন লেখা পড়া শিখে বেরুলো, তখন সে প্রায়ই তিন চারিটী ছেলের বাপ। সে গুলিকে খাওয়াবার জন্যে কাজেই তাকে টাকা টাকা করে ছুটে বেড়াতে হোলো। তারপর হয়ত অনেক চেষ্টায় একটী ৩০।৪০ টাকার চাকরি জুট্‌লো—ঐ কটী টাকার ভিতর সে তাদেরই বা খাওয়ায় কি আর নিজেই বা খায় কি? কাজেই রোজগারের চিন্তায় সে ব্যতিব্যস্ত। ধর্ম্ম, ঈশ্বর চিন্তা সে করে কি কোরে?" একজন বালক, তাঁহার ঐ কথায় বলিয়া উঠিল—"তবে কি, মশাই, বিবাহ করা অন্যায়?—ভগবানের ইচ্ছা নয়?" তদুত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহাকে "মুক্তি ও তাহার সাধন" নামে বইখানি সন্‌দান হইতে পাড়িয়া আনিতে বলিলেন। বই আনা হইলে আবার বলিলেন—"অমুক পৃষ্ঠায় অমুক স্থান পড়"। বালক পুস্তক খুলিয়া দেখিল—গ্রন্থকার যিশুর এবং তচ্ছিষ্য পলের বিবাহ সম্বন্ধীয় মত ঐস্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। লেখা আছে—"বিবাহ সকলের জন্য নহে। ভগবান কাহাকেও জন্ম-নপুংসক করিয়াছেন, আবার কেহবা ঈশ্বরপ্রেমে তন্ময় হইয়া নপুংসকের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন,—বিবাহ ইহাদের উভয়ের জন্যই নহে। কিন্তু বিবাহ করিবার প্রবল বাসনা যাহাদের আছে, তাহাদের পক্ষে বিবাহ আবশ্যক। তাহাদের বাসনাগ্নিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরা অপেক্ষা বিবাহ করাই উচিত।" পাঠ শেষ হইলে, রামকৃষ্ণদেব বলিলেন—"বিবাহই সকল বন্ধনের মূল।" শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অপর একজন দেখিল যে, রামকৃষ্ণদেব বিবাহের আদৌ প্রশ্রয় দেন না। বোধ হয়, সে তখন অবিবাহিত, অথচ মনে সে ইচ্ছা বলবৎ বিদ্যমান। সে থাকিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কি, মশাই, বিবাহ করা ভগবদিচ্ছানুমোদিত নয়? লোকে বিবাহ না করিলে ভগবানের সৃষ্টিই বা কেমনে থাক্‌বে?"

রামকৃষ্ণদেব হাস্য করিতে করিতে বলিলেন—"তা কেন হে, যার ইচ্ছা হবে, সে খুব বিয়ে কোর্‌বে। ও একটা কথা আমাদের মধ্যে হ'য়ে গেল। আমার কথা আমি বলে যাচ্ছি, তুমি নেজা মুড়ো বাদ দিয়ে নাও না হে।" এইরূপ নানা ঈশ্বরীয় কথার পর বালকেরা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিল। শশী ও শরৎ ভাবিল—"এইবার থেকে এঁর কাছেই আসব। ধর্ম্ম কর্ম্ম যদি শিখতে হয়, তবে এঁর কাছে আসাই ঠিক।" এই

ভাবিয়া তাহারা দুই জনেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট অবকাশ মত আগমন করিতে লাগিল বটে, কিন্তু পরস্পর মনোভাব গোপন রাখায়, আর একত্রে আসা বহুদিন ঘটিল না।

• এদিকে দেবেন্দ্র রোগমুক্ত হইয়া নিজ গৃহেই থাকেন। ঈশ্বরলাভের জন্য আর তেমন তীব্র পিপাসা নাই, তবে তাহা একেবারে বিলুপ্তও হয় নাই। রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইযাই পীড়াগ্রস্ত হওয়াতে, মনে কেমন একটা আতঙ্ক হইয়াছে, সেজন্যই আর তাঁহার কাছে যাইবেন না, স্থির করিয়াছেন। দেহ পুনরায় সবল হইলে, যদি কখন মনে হইত—যাই একবার দক্ষিণেশ্বরে, অমনি আপনাকে আপনি বুঝাইতেন,—"সেখানে গেলে বুঝি তিনি চতুর্ভুজ ভগবান্ দেখিয়ে দেবেন? এইত গিয়াছিলে, কেমন ভগবান দেখে এলে? তার চেয়ে যা বয় সয়, তাই করনা কেন? ব্রাহ্মণের ছেলে, নিঃসম্বল ত নও, গায়ত্রী জপটাই বেশ করে কর না কেন?" এইরূপ স্থির করিয়া নিষ্ঠা পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ আরম্ভ করিলেন। ক্রমে উহাতে এমন নেশা হোলো যে, এক একদিন সমস্ত রাত্রিই গায়ত্রী জপ করেন। কিন্তু 'উল্টা সমঝ্‌লি রাম' হোলো। জপের ফলে যত মন হইতে ভয় ইত্যাদি সঙ্কোচভাব দূর হইয়া যাইতে লাগিল, ততই মনে উঠিতে লাগিল,—"ভগবানকে লাভ করিতে হইলে গুরু চাই, যে গুরু ভগবানকে সাক্ষাৎ দেখিয়াছেন এবং জানেন, এমন গুরু চাই।" আবার সেই পুরাতন, গুরু অন্বেষণের পিপাসা প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের কাছে আর যাওয়া হইবে না, স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেখানে গেলেন না। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, একদিন বৈকাল বেলা কর্ম্মস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে, এক বন্ধুর বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বৈঠকখানায় কেহই নাই। ভাবিলেন, একটু অপেক্ষা করি, এখনি কেহ না কেহ আসিবে। এই ভাবিয়া দেবেন্দ্র বসিলেন এবং একখানি বঙ্গবাসী সংবাদ পত্র পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া, তাহা লইয়া পড়িতে লাগিলেন। যে সংবাদের উপর প্রথমেই তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, তাহা এই মর্ম্মে—"অদ্য বৈকালে বাগবাজার বসু পাড়ায় শ্রীযুক্ত বলরাম বসুর বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভক্তদিগের সহিত মিলিত হইবেন।" পাঠমাত্র তাঁহার সেখানে উপস্থিত হইতে প্রবল ইচ্ছা হইল। রামকৃষ্ণদেবের কাছে আর যাইবেন না, ইত্যাদি এত যে মনকে ইতিপূর্ব্বে বুঝাইয়াছিলেন, সে সব যেন কোথায় ভাসিয়া গেল এবং কে যেন তাঁহাকে ঐস্থানে লইয়া যাইবার জন্য টানিতেছে, এইরূপ অনুভব

হইতে লাগিল। আর থাকিতে পারিলেন না। বেলা প্রায় অতীত, তখনই বাগ-বাজার যাত্রা করিলেন। ঠিক সন্ধ্যার সময় খুঁজিয়া খুঁজিয়া বলরাম বসুর বাটী উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—অসীম জনতা, রামকৃষ্ণদেব যেন বাহ্যশূন্য, উদ্দাম নৃত্য করিতেছেন। উপস্থিত সকলের কেহবা কীর্ত্তন গাহিতেছে, কেহবা তাঁহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিতেছে, আবার কেহবা বসিয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহাদের প্রতি তাকাইয়া হৃদয় পবিত্র করিতেছে, সকলেই যেন এক অপূর্ব্ব প্রেম তরঙ্গে পড়িয়া আত্মহারা। দেবেন্দ্র ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া উহা দেখিলেন। রামকৃষ্ণ দেবের নিকট যাইতে ইচ্ছা হইতে লাগিল কিন্তু কেমন একটা লজ্জা বাধা দিতে লাগিল, কারণ, অনেক দিন যান নাই এবং আর যাইবেনও না, মনে করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিবেন? দেবেন্দ্র 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবে নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন। আবার, রামকৃষ্ণদেব কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে প্রেমে বালকের ন্যায় অদৃষ্টপূর্ব্বভাবে নৃত্য করিতেছেন, মনও তাঁহার সহিত উল্লাসে নৃত্যশীল হইয়া অপূর্ব্বভাবে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কত-ক্ষণ পরে রামকৃষ্ণদেব ভাব সম্বরণ করিলেন। কীর্ত্তন বন্ধ হইল। সকলে যাইয়া অমনি তাঁহার পদধূলি লইতে লাগিলেন। তখনও শ্রীরামকৃষ্ণ যেন ভাবের ঘোরে আছেন, কোন কথা কহিতেছেন না। দেবেন্দ্র ভাবিলেন—"এই সুযোগ, এইবার পদধূলি গ্রহণ করি। এ ভিড়ে, আর ওঁর এরূপ অবস্থায়, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না।" অগ্রসর হইয়া ভীড় ঠেলিয়া, তাঁহার পদযুগল স্পর্শ করিবামাত্র, রামকৃষ্ণদেব তাঁহার পৃষ্ঠদেশে আদরে হাত দিয়া বলিলেন—"কে হে, তুমি যে আর যাও না? কেমন আছ? তোমার কথা প্রায়ই ভাবি। তুমি আর যাও না কেন?" দেবেন্দ্র মহা অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—'মশাই বড় অসুখ করেছিল।" রামকৃষ্ণদেব বলিলেন—'তুমি আবার যেও ওখনে যেও। যাবে ত?" কাজেই দেবেন্দ্র বলিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ যাব, যাব বৈকি।" দেবেন্দ্র সে কথায় অন্যথা করিতে পারিলেন না এবং তদবধি অবসর মত তাঁহার নিকট গমনাগমন করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ।

স্বামি-শিষ্য সংবাদ।

[শ্রীশরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।]

স্বামীজি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিবার পর, কিছুকাল গত হইয়াছে। আলমবাজার হইতে বেলুড়ে, নীলাম্বর বাবুর বাগানবাটী ভাড়া করিয়া, মঠ উঠাইয়া আনা হইয়াছে। বর্ত্তমান মঠের জমিও খরিদ হইয়াছে। স্বামীজি আজ নূতন মঠের জমিতে যজ্ঞ করিয়া ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করিবেন। শিষ্য পূর্ব্বরাত্র হইতেই মঠে আছে। ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা দর্শন করিবে—বাসনা।

প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া, স্বামীজি ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। শিষ্য সঙ্গে আছে। ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া, স্বামীজি পূজকের আসনে বসিয়াছেন। এইবার পুষ্পপাত্রে যতগুলি ফুল বিল্বপত্র ছিল, সব দুইহাতে একেবারে তুলিয়া লইলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীপাদুকায় অঞ্জলি দিয়া, ধ্যানস্থ হইলেন—অপূর্ব্ব দর্শন। সেই ধর্ম্ম-প্রভা-বিভাসিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল কান্তিতে ঠাকুর ঘর যেন অদ্ভুত আলোকে পূর্ণ হইয়াছে। প্রেমানন্দ ও অন্যান্য স্বামিপাদগণ ঠাকুর ঘরের দোরে দাঁড়াইয়া আছেন।

এইবার ধ্যানাবসানে মঠভূমিতে যাইবার আয়োজন হইতেছে। তাম্র-নির্ম্মিত কৌটায় রক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণের ভস্মাস্থি, স্বামীজি, দক্ষিণ স্কন্ধে লইয়া, অগ্রগামী হইলেন। শিষ্যও অন্যান্য সন্ন্যাসিগণসহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। শঙ্খ-ঘণ্টা-রোলে তটভূমি মুখরিতা হওয়ায়, ভাগীরথী, যেন ঢল ঢল হাবভাবে, নৃত্য করিতে লাগিলেন। যেতে যেতে স্বামীজি শিষ্যকে বলিতেছেন—"দ্যাখ্, ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে ক'রে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব। তা গাছতলাই কি, আর কুটিরই কি।' সেই আজ্ঞার জোরে, আজ আমি তাঁকে কাঁধে ক'রে, নূতন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। জানবি, যতকাল চন্দ্র সূর্য্য আছেন, ততকাল ঠাকুর ঐ স্থানে স্থির হয়ে থাকবেন।"

শিষ্য।—ঠাকুর কখন্ আপনাকে এ কথা বলেছিলেন?

স্বামীজি।—ওদের মুখে শুনিস নি? কাশীপুরের বাগানে।

শিষ্য।—ও:! সেই সময় বুঝি ঠাকুরের গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী ভক্তদের ভিতর সেবাধিকার লইয়া দলাদলি হইয়াছিল?

স্বামীজি।—হাঁ, তবে 'দলাদলি' ঠিক নয়, একটু মন কসাকসি হয়েছিল। জানবি, যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত, যাঁরা তাঁর কৃপা লাভ ক'রেছে, তা গেরস্থই হোক্

আর সন্ন্যাসীই হোক্, তাদের ভিতর দল ফল নাই, থাক্‌তেই পারে না। তবে ওরূপ একটু আধটু মন কসাকসির কারণ কি, তা জানিস্? সকল মানুষেই আপন আপন বুদ্ধির রঙ্গে ঠাকুরকে রঙ্গিয়ে, এক এক জনে এক এক রকম দেখে ও বোঝে। তিনি যেন মহাসূর্য্য। আর আমরা যেন প্রত্যেকে এক এক রকম রঙ্গিন কাঁচ চোখে দিয়ে, সেই এক সূর্য্যকে, নানা রঙ্গবিশিষ্ট দেখ্‌ছি। অবশ্য একথাও ঠিক যে, কালে এই থেকেই দলের সৃষ্টি হয়। তবে যারা সৌভাগ্যক্রমে অবতার পুরুষের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসে, তাদের জীবৎকালে ঐরূপ দল ফল হয় না। সেই আত্মারাম পুরুষের আলোতে তাদের চোক্ ঝলসে যায়, অহঙ্কার, অভিমান, হীনবুদ্ধি, সব ভেসে যায়। কাজেই 'দল ফল' কর্‌বার তাদের অবসর হয় না। কেবল যে যার নিজের ভাবে তাঁকে হৃদয়ের পূজা দেয়।

শিষ্য।—বুঝ্‌লাম, ঠাকুরের ভক্তেরা সকলেই তাঁকে ভগবান বলে জান্‌লেও সেই এক ভগবানের স্বরূপ তারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখে, আর সেজন্যই তাদের শিষ্য প্রশিষ্যেরা কালে গণ্ডির ভিতরে পড়ে, ছোট ছোট দল বা সম্প্রদায় বানায়।

স্বামীজি।—হাঁ, কালে সম্প্রদায় হবেই। তোর সব অবতারেরই দ্যাখ্ না। চৈতন্যদেবের এখন দু তিন শ সম্প্রদায় হয়েছে। যিশুর হাজার হাজার মত বেরিয়েছে। কিন্তু সকলেই সেই এক চৈতন্যদেব ব যিশুকে মানে।

শিষ্য।—তবে রামকৃষ্ণ মতেও কালে বোধ হয় বহু সম্প্রদায় দাঁড়াইবে।

স্বামীজি।—হবে বই কি? তবে আমাদের এই যে মঠ হচ্ছে, তাতে সকল মতের সকল ভাবের সামঞ্জস্য থাক্‌বে। ঠাকুরের যেমন উদার মত ছিল, এটী ঠিক সেই ভাবের কেন্দ্র স্থান হবে। এখান থেকে যে মহা সমন্বয়ের উদ্ভিন্ন ছটা বেরুবে, তাতে জগৎ প্লাবিত হয়ে যাবে। এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে হইতে সকলে মঠভূমিতে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজি স্কন্ধস্থিত কৌটাটী জমিতে বিস্তীর্ণ আসনোপরি নামাইয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অপর সকলেও ঐরূপে প্রণাম করিলেন।

তৎপরে স্বামীজি পূজায় বসিলেন। পূজান্তে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, হোম করিলেন এবং সন্ন্যাসী ভ্রাতৃগণের সহায়ে, স্বহস্তে পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া, ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। সে দিন ঐ স্থানে তিনি কয়েকটী গৃহস্থকে দীক্ষা

দান করেন এবং দুটী যুবককে সন্ন্যাস দীক্ষাও দেন। গৃহস্থদের মধ্যে দার্জ্জিলিঙ্গের মহেন্দ্র বাবু—অন্যতম। দীক্ষান্তে সমাগত গৃহীদিগকে তিনি দূরে যাইবার আদেশ করিয়াছিলেন। কারণ, যে দুটী যুবককে সন্ন্যাস দেন, তাহাদিগকে বেদের 'প্রৈষ' মন্ত্র শুনাইতে হইবে। গৃহীদিগের উহা শুনিবার অধিকার নাই। কাজেই শিষ্যও অন্যান্য গৃহীদের সঙ্গে দূরে বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিল। সেদিন সন্ন্যাস দীক্ষা দেখিতে দেখিতে শ্রীভগবানের জন্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়ার একান্ত প্রয়োজন হৃদয়ে অনুভব করিয়া এবং স্বয়ং তদ্দীক্ষা গ্রহণে অসমর্থ বুঝিয়া, বিশেষ ক্ষুণ্ণ ও অবসন্ন হইয়াছিল। সন্ন্যাসদান সমাধা হইলে, স্বামীজি আবার সাদরে গৃহীদের আহ্বান করিলেন এবং সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করুন, যেন মহাযুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া, ইহাকে সর্ব্বধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়-কেন্দ্র করিয়া রাখেন।" সকলেই করযোড়ে ঐরূপ প্রার্থনা করিলেন। পূজান্তে স্বামীজি শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন—"ঠাকুরের এই কৌটা ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আমাদের (সন্ন্যাসীদের) কাহারও আর অধিকার নাই; কারণ, আজ আমরা ঠাকুরকে এখানে বসাইয়াছি। অতএব তুই মাথায় ক'রে ঠাকুরের এই কৌটা তুলে মঠে (নীলাম্বর বাবুর বাগানে) নিয়ে চল।" শিষ্য কৌটা স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া, আবার বলিলেন—"ভয় নাই, কর্, আমার আজ্ঞা।" শিষ্য তখন অতি আনন্দিত চিত্তে স্বামীজির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, কৌটা মাথায় তুলিয়া লইল এবং আজ গুরু আজ্ঞায় ঐ কৌটার স্পর্শাধিকার লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতে করিতে চলিল। অগ্রে শিষ্য, পশ্চাতে স্বামীজি, তারপর অন্যান্য সকলে আসিতে লাগিলেন। শিষ্য যেন ছায়াময় স্বপ্নরাজ্যে বিচরমান। ভাবিতেছে, শ্রীগুরুর কৃপায় আজ ভুভারহারী ভগবানকে কি সত্য সত্যই স্পর্শ করিলাম।—পথিমধ্যে স্বামীজি তাহাকে বলিতেছেন—'দেখিস, সাবধান, ঠাকুর আজ তোর মস্তকে উঠিয়া তোকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। যেন আজ হ'তে আর কোন অনিত্য বিষয়ে মন দিস্‌নে।' একটী ছোট সাঁকোর কাছে স্বামীজি শিষ্যকে বল্‌ছেন—'দেখিস, এবার খুব সাবধান, খুব সতর্কে যাবি।'

এইরূপে নির্ব্বিঘ্নে মঠে উপস্থিত হইয়া সকলেই আনন্দ করিতে লাগিলেন। স্বামীজি শিষ্যকে এখন কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছেন—'দ্যাখ্, ঠাকুরের ইচ্ছায় আজ তাঁর ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হ'ল। ব'রো বছরের চিন্তা, আজ আমার মাথা থেকে

নামলো। আমার মনে কি হচ্ছে, জানিস্? এই মঠ হ'বে বিদ্যা ও সাধনার কেন্দ্র-স্থান। তোদের মত ধার্ম্মিক গৃহস্থেরা ইহার চারিদিককার জমিতে ঘরবাড়ী করে থাকবে, আর মাঝখানে ত্যাগী সন্ন্যাসীরা থাকবে। আর মঠের ঐ দক্ষিণের জমিটায় ইংলণ্ড ও এমেরিকার ভক্তদের থাকবার ঘর দোর হ'বে। এরূপ হ'লে কেমন হয় বল্ দেখি?"

শিষ্য।—মশায়, আপনার এ অদ্ভুত কল্পনা।

স্বামীজি।—কল্পনা কিরে? সময়ে সব হবে। আমিত সবে এই পত্তন করে দিচ্ছি। এর পর আর কত কি হবে। আমি কতক ক'রে যাব। আর তোদের ভেতর নানা idea (মতলব) দিয়ে যাব। তোরা পরে সে সব work out (কাজে পরিণত) করবি। বুঝ্লি?

শিষ্য।—আজ্ঞে হাঁ; সকল বিষয়ে চোক্ খুলে দিতে আপনার মত আর কাহাকেও দেখিনি। আমরা শাস্ত্রের কতকগুলি বড় বড় principle (মীমাংসা) পড়ে রেখেছি মাত্র। কিন্তু কি ক'রে যে সেগুলি practical fieldএ দাঁড় করান যায়, প্রতি নিয়ত কাজে লাগান যায়, তা এরূপে কখনো ভ'বতে জানতুম না।

স্বামীজি।—কেবল পড়লে কি হবে? শাস্ত্রের কথাগুলি আগে বুঝ্তে হবে। তারপর জীবনে সে গুলিকে ফলাতে হবে। বুঝ্লি? একেই বলে practical religion

এইরূপ নানাপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল এবং কথায় কথায় শঙ্করাচার্য্যের কথা উঠিল। শিষ্য শ্রীশঙ্করের বড় পক্ষপাতী। এমন কি গোঁড়া বলাও যায়। অন্য কোন দর্শনের মত তাহার যুক্তিযুক্ত বলিয়াই বোধ হয় না। শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতমতকে সে সর্ব্ব দর্শনের মুকুটমণি বলিয়া জ্ঞান করিত এবং শ্রীশঙ্করের কোন কথায় কেহ কোনরূপ দোষার্পণ করিলে, তাহার হৃদয় যেন সর্পদষ্ট হইত। স্বামীজি উহা জানিতেন এবং কেহ কোন মতের গোঁড়া হয়, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। কোন বিষয়ের গোঁড়ামি দেখিলেই তিনি উহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিতেন এবং অজস্র অমোঘ যুক্তির আঘাতে ঐ গোঁড়ামির সঙ্কীর্ণ বাঁধ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতেন।

স্বামীজি।—শঙ্করের ক্ষুরধার বুদ্ধি—বিচারক বটে, পণ্ডিত বটে, কিন্তু তাঁর উদারতাটা বড় গভীর নয়, হৃদয়টাও সেই রকম। আবার ব্রাহ্মণ অভিমানটুকু খুব ছিল। যেন বেশ একটী দক্ষিণি ভট্‌চার্য্যি। আমার বোধ হয়, তিনি তাহাই ছিলেন। তুই যে দেখ্ছি, তাঁর বড় গোঁড়া হয়েছিস্! ব্রাহ্মণেতর জাতের

ব্রহ্মজ্ঞান হবে না, একথা তোর ভাষ্যকার বেদান্ত-ভাষ্যে কেমন সমর্থন ক'রে গেছেন। বলিহারী বিচার। বিদুরের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—তার পূর্ব্বজন্মের ব্রাহ্মণ শরীরের ফলে সে ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছিল। বলি, আজ কাল যদি ঐরূপ কোন শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তবে কি তোর শঙ্করের মতে মত দিয়ে বলতে হবে যে, সে পূর্ব্ব জন্মে ব্রাহ্মণ ছিল, তাই হয়েছে? এত ব্রাহ্মণত্বের টানাটানিতে কাজ কিবে বাবা। বেদ তো ত্রৈবর্ণিক মাত্রকেই বেদপাঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী করেছে। মাঝথেকে তোর শঙ্কর এসে বেদের উপর কি অদ্ভুত বিদ্যাই ফলিয়েছেন।

শিষ্য।—মহাশয়, শঙ্কর ত সাক্ষাৎ শিব। তাঁর সিদ্ধান্তে দোষারোপ চলে কি?

স্বামীজি।—আমরাই বা কম কিসে? তোর শঙ্করের এতটুকু হৃদয় ছিলনা। হাজার হাজার বৌদ্ধ শ্রমণকে আগুনে পুড়িয়ে মারলেন রাজাগুলোকে বশ করে আর তর্কে হারিয়ে!! আহাম্মুক বৌদ্ধগুলোও কিনা তর্কে হার মেনে আগুনে পুড়ে মরে গেলো' শঙ্করের ঐরূপ কার্য্যকে fanaticism ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? কিন্তু ত্যাখ্ বুদ্ধদেবের হৃদয়। 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' নিজ জীবন পর্য্যন্ত দান কল্লেন। দেখ্ দেখি কি উদারতা—কি দয়া।

শিষ্য।—বুদ্ধের ও ভাবটাকেও কি fanaticism বলা যেতে পারে না? একটা পশুর জন্য কিনা নিজের গলা দিতে গেলেন।

স্বামীজি।—কিন্তু ও fanaticismএ জগতের জীবের বহু কল্যাণ হ'লো। কত আশ্রম কত School কত College কত public Hospital কত পশুশালা স্থাপন, কত স্থাপত্য বিদ্যার বিকাশ। বুদ্ধদেব জন্মাবার আগে তোদের দেশে ছিল কিরে? তাল পাতার পুঁথিতে বাঁধা কতকগুলি ধর্ম্মতত্ত্ব, তাও অল্প কয়েকজনের জানা ছিল মাত্র। ভগবান্ বুদ্ধদেব সেগুলি Practical fieldএ আনলেন। তিনিই যথার্থ বেদান্তের স্ফুরণমূর্ত্তি। বুঝ্লি?

শিষ্য।—হাঁ, বুদ্ধদেব কতকগুলি জীবহিতকর কার্য্য করে গেছেন বটে; কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভেঙ্গে দিয়ে ভারতে হিন্দু ধর্ম্মের বিপ্লব ঘটিয়ে গিয়াছেন। ফল এই হ'ল that religion was driven out from the land of its birth.

স্বামীজি।—সে কি তাঁর teachingএর দোষে না তাঁর followers এর দোষে বৌদ্ধধর্ম্মের এমন দুর্দ্দশা হ'ল? বেশী philosophic হ'য়ে তাদের heart

এর উদারতা কমে গেল। তারপর ক্রমে বামাচারের ব্যভিচার ঢুকে বৌদ্ধধর্ম্ম মরে গেল।

শিষ্য।—বৌদ্ধধর্ম্মে বামাচার ঢুকেছিল কখন?

স্বামীজি।—জানিস্ নি? ওরে অমন বীভৎস বামাচার এখনকার কোন তন্ত্রে নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটী প্রধান কেন্দ্র যাহা এখন তোদের 'জগন্নাথ ক্ষেত্র'—তার মন্দিরের গায়ে খোদা বীভৎস মূর্ত্তিগুলি একবার গিয়ে দেখে এলেই জান্তে পার্‌বি—তোর তন্ত্র হার মেনে গিয়েছিল কি না?

শিষ্য।—বলেন কি মশায়? 'পুরুষোত্তম ক্ষেত্র'—পুরাণাদি মুখে যাহার অপার মহিমার কথা অবগত হওয়া যায়, সে কি তবে কথার কথা?

স্বামীজি।—কথার কথা হবে কেনরে বাপ? এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই যে নিত্য আত্মা ভগবানের বিরাট্ ধাম। রামানুজ ও চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় থেকে পুরু-ষোত্তম ক্ষেত্রটী বৈষ্ণবদের দখলে এসেছে। উহা ঐ সকল মহাপুরুষদের শক্তি বিকাশের স্থল মাত্র।

শিষ্য।—তবে যে শাস্ত্রমুখে তীর্থাদির মহিমা অবগত হওয়া যায়, তার মানে কি?

স্বামীজি।—তাও সত্যি। তবে যে যেমন, তার তেমনি আদর্শ চাই—আত্মার বিকাশের জন্য। তীর্থাদি আশ্রয় ক'রে কালে আত্মার বিকাশ হ'তে পারে। তবে ইহা নিশ্চয়, এই মানব-দেহের চেয়ে আর কোন প্রধান তীর্থ নাই। এখানে আত্মার যেমন বিকাশ, এমন আর কোথাও নাই। ঐ যে জগন্নাথের রথ, তাও এই দেহরথের স্থূল রূপক (concrete form) মাত্র। এই দেহরথের আরোহী আত্মাকে দর্শন কত্তে হবে। পড়েছিস না—"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" ইত্যাদি।

শিষ্য।—আজ্ঞে হাঁ। উপনিষদেও আছে—"মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে।" এই বামনরূপী আত্মদর্শনই ঠিক জগন্নাথ দর্শন।

স্বামীজি।—নিশ্চয়। এই আত্মদর্শনের নামই জগন্নাথ দর্শন। ঐ যে বলে, "রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" এর মানে হচ্ছে তোর ভেতরে যে আত্মা আছেন, যাঁকে উপেক্ষা ক'রে তুই কিম্ভূতকিমাকার এই দেহরূপ জড়পিণ্ডটাকে আমি বলে ধরে নিচ্ছিস, তাঁকে দর্শন কত্তে পার্‌লে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। যদি কাঠের দোলায় ঠাকুর দেখে জীবের মুক্তি হতো

তা হলে বছরে বছরে কোটি জীবের মুক্তি হ'যে যেত, আজ কাল আবার রেলে যাওয়ার যে সুযোগ।

শিষ্য।—মশায়, গোঁড়া ভক্ত আপনার একথা শুন্‌লে তাড়া ক'রে আস্‌বে।

স্বামীজি।—অনেকে ত কচ্ছে। তাতে আর আমার কি হবে। তবে ঐরূপ ভক্তের জগন্নাথকে ত আমি 'কিছু নয় বা মিথ্যা' বল্‌ছি না। এক শ্রেণীর লোক আছে যারা ঐ মূর্ত্তি অবলম্বনে উচ্চ হতে ক্রমে উচ্চতর তত্ত্বে উঠে যায় অতএব ঐ মূর্ত্তিকে আশ্রয় ক'রে শ্রীভগবানের বিশেষ শক্তি প্রকাশিত রহিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

শিষ্য।—তা হ'লে কি এই বুঝ্‌তে হবে যে, মূর্খ ও বুদ্ধিমানদের ধর্ম্ম আলাহিদা ?

স্বামীজি।—তাই ত, নহিলে তোর শাস্ত্রেই বা এত অধিকারী নির্দ্দেশের হাঙ্গামা কেন ? সবই truth, তবে relative truth different in degrees. মানুষ যা কিছু সত্য বলে জানে, সে সকলই ঐরূপ, কোনটী অল্প সত্য, কোনটী তার চেয়ে অধিক সত্য, নিত্য সত্য কেবল এক ভগবান্।

শিষ্য।—আপনার সূর্য্যের photographএর দৃষ্টান্তের মত, নয় ?

স্বামীজি।—হাঁ। এই আত্মা জড়ের ভিতর একেবারে ঘুমুচ্ছেন, জীবনামধারী মানুষের ভিতর আবার তিনিই কিঞ্চিৎ conscious (জাগ্রত) হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ শঙ্করাদিতে আবার ঐ আত্মাই super-conscious stageএ অর্থাৎ পূর্ণভাবে জাগ্রত হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এর উপরে উপরেও অবস্থা আছে, যা ভাবে বা ভাষায় বলা যায় না "অবাঙ্‌মনসগোচরম্"।

শিষ্য।—মশায়, ভক্ত সম্প্রদায় বলে ভগবানের সহিত একটা ভাব বা সম্বন্ধ পাতিয়ে সাধনা কর্‌তে হয়। তারা এই আত্মার মহিমাদি কিছুই বোঝে না, বলে কিনা ওগুলি ছেড়ে সর্ব্বদা তাবে থাকে।

স্বামীজি।—তারা যা বলে তা তাদের পক্ষে সত্য। ঐরূপ কর্‌তে কর্‌তে তাদের ভিতরও একদিন ব্রহ্ম জেগে উঠ্‌বেন। আমাদেরও এ আর এক রকম ভাব। আমরা সংসার ত্যাগ করেছি, সংসারের সম্বন্ধের যেমন মা বাপ, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদির কোন একটী ভগবানে আরোপ করে সাধনা করা আমাদের ভাব কেমন করে হ'বে ? ও সব আমাদের কাছে সংকীর্ণ বলে মনে হয়। অবশ্য সর্ব্বভাবাতীত ভগবানের উপাসনা ও ভাত বড় কঠিন। কিন্তু

অমৃত পাই না বলে কি বিষ খেতে যাব? এই আত্মার কথা সর্ব্বদা বল্‌বি, শুন্‌বি, বিচার কর্‌বি। ঐরূপ কর্‌তে কর্‌তে দেখ্‌বি কালে সিঙ্গি—ব্রহ্ম জেগে উঠ্‌বেন। ঐ সব ভাব খেয়ালের পারে চলে যাবি। ঐ শোন্, কঠোপনিষদে যম কি বল্‌ছেন—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

বলিতে বলিতে মঠে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিল। স্বামী সমভিব্যাহারে শিষ্যও, প্রসাদ গ্রহণে বসিল।

পদব্রজে কাশীযাত্রা।

পরিব্রাজক।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

প্রভাতে আমরা ৺বৈদ্যনাথ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। রাস্তা অতি খারাপ, অনেকস্থলে আলের উপর দিয়া যাইতে হইয়াছিল। একটী গ্রামে ভিক্ষা করিয়া কিছু চিঁড়া ও গুড় পাইলাম—বেলা প্রায় ২।০ টার সময় ৺বৈদ্যনাথে উপস্থিত হইলাম। প্রথমেই বাবার মন্দিরে আসিয়া দেখিলাম, দ্বার বন্ধ; কাজেই আর একটী মন্দিরে যাইয়া বসিলাম। রাত্রে গোটাকয়েক পেঁড়া ভিক্ষা পাইয়াছিলাম তদবলম্বনে রাত্রিটুকু কাটাইব মনে করিতেছিলাম, এমন সময় একটী লোক বলিল, এখানকার পাণ্ডারা পঞ্চায়েত করিয়া সাধুভোজন করায়। খানিকপরে পাণ্ডাদিগের সহিত দেখা হইল। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের মঠের লোক বলিয়া পরিচয় পাইয়া একজন পাণ্ডা প্রত্যেক পাণ্ডার নিকট হইতে ২।১ পয়সা চাঁদা সংগ্রহ করতঃ শিবগঙ্গার তীরে আমাদিগকে উদর পূর্ণ করিয়া ভোজন করাইল। পরে একটী পাণ্ডার ধর্ম্মশালায় আমরা রাত্রিযাপন করিলাম। পরদিন একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ী থাকিবার যোগাড় হইয়া গেল। কয়েকদিন ধরিয়া আমরা বাবাকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন ও পূজাদি করিয়া তৎপরে ৺গয়াধামাভিমুখে রহনা হইলাম।

রাস্তায় প্রথম দিন আমরা মাধবপুর গ্রামে একটী জমিদারের কাছারীতে রাত্রিযাপন করি, পর দিন বামদা হইয়া বেটিয়া গ্রামে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় পৌছি। পূর্ব্ব রাত্রিতে আহারাদি না হওয়ায় বামদার একজন মিসনরির নিকট ভিক্ষা চাহিয়া-

ছিলাম—সে বলিল, "আমি দুর্ব্বলদিগকে ভিক্ষা দিয়া থাকি, সবলদিগকে দিই না।" আমরা পয়সার কোন সম্পর্ক রাখিনা শুনিয়া সে বলিল, আমি খৃষ্টান তোমরা ত আমার খাবার খাইবে না। আমরা বলিলাম, লোক দিয়া কোন দোকান হইতে আমাদিগের উপযোগী আহার্য্য দিলে খাইতে পারি কিন্তু সে তাহাতে সম্মত হইল না। অগত্যা আমরা বাম্‌দার দোকান হইতে ভিক্ষা করিয়া কিছু ছাতু লইয়া লবণ সংযোগে উদর পূর্ত্তি করিয়া বেটিয়ায় উপস্থিত হই। রাস্তায় আমাদিগকে অনেকগুলি পাহাড় অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। পাহাড়গুলি চারিদিকে বেষ্টিত থাকিয়া সেই স্থানটীকে যেন একটী দুর্গের ন্যায় করিয়াছে। প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য ও নিস্তব্ধতা এখানে স্বতঃই হৃদয়ে স্থিরতাব ভাব আনিয়া দেয়। বেটিয়াবাসীরা সকলেই নিঃস্ব, কায়ক্লেশে কোনরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে মাত্র। সুতরাং কোন সাধু দ্বারে আসিলে কিছু প্রাপ্তির আশায় আসিয়া থাকিবে মনে করিয়া গৃহমধ্যে কেহ থাকিলেও সাড়া দেয় না। আমরা পানীয় জলের জন্য অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু তাহারও সন্ধান পাইলাম না। অতঃপর কিছু দূরবর্ত্তী একটী কূপে যাইয়া স্নানাদি সমাপনান্তে নওয়াডি নামক গ্রামে যাইলাম। দেখিলাম, তথায় অনেকগুলি বাঙ্গালী আছেন। এখানে একজন মাড়োয়ারী সাধু সেবা করিয়া থাকেন। সে দিন তাঁহার নিকটই ভিক্ষা করিলাম।

পরদিন আহারান্তে আমরা গিধোড় আসি। এখানকার রাজবংশীয়েরা পুরুষানুক্রমে মহারাজ বাহাদুর উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান রাজা K. C. I. E. উপাধি বিশিষ্ট এবং খুব ধার্ম্মিক সদাচারপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান। প্রত্যহ শিবপূজা করিয়া থাকেন ও দেবালয়ে সোমবার দিন আসিয়া ৩।৪ ঘণ্টা পূজা করিয়া থাকেন। দেবালয়টীর ভিতর তিনটী মন্দির আছে,—একটীতে শিবলিঙ্গ, দ্বিতীয়টীতে হরপার্ব্বতী ও তৃতীয়টীতে জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি বিদ্যমান। প্রত্যহ পূজাদি বেশ হইয়া থাকে। সাধু বৈষ্ণবদিগের সদাব্রত দিবারও বিধান আছে। রাজা প্রত্যহ বিকালে দেবালয়ে আসিয়া সমাগত সাধু বৈষ্ণবদিগের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। প্রথম দর্শনে আমরা ইঁহাকে রাজা বলিয়া চিনিতে পারি নাই। পরে যখন তরবারিধারী প্রহরী বেষ্টিত হইয়া যাইতেছেন এবং সাধু বৈষ্ণব প্রভৃতিরা আপন আপন অভাব অভিযোগ তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিতেছে দেখিলাম, তখন তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্থির করিলাম। তিনি আমাদিগের পরিচয় গ্রহণ করিলেন। দেখিলাম, ইঁহার পরিধানে একখানি সাধারণ ধুতি, গাত্রে একটী সাদা চাপকান, হস্তে ছড়ি, মস্তকে একটী সাদা টুপি এবং পদযুগলে কাষ্ঠপাদুকা। ইঁহার অনন্যসাধারণ

গুণের বিষয় শুনিয়া ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিলাম। শুনিলাম, পৈত্রিক সম্পত্তিকে ঋণজাল হইতে মুক্ত করিয়া ইনি নিজ শক্তি ও উদ্যমে রাজ্যের আয় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি করিয়াছেন। ৺শারদীয় পূজার সময় এখানে একটী দীর্ঘকালব্যাপী মেলা হইয়া থাকে, চতুর্দ্দিকস্থ সাঁওতালেরা সমবেত হইয়া নৃত্য গীতাদি করে ও প্রসাদ গ্রহণ করে, সাধু ফকিরদিগের ত কথাই নাই। এই উপলক্ষে অনেক টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। জানিলাম, এই রাজার পূর্ব্বপুরুষদিগের একজন সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজ রাজকে দুইটী হস্তী দিয়াছিলেন এবং উত্তেজিত সাঁওতালদিগকে নিরস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া বড়লাট কুর্জ্জন সাহেব বর্ত্তমান রাজাকে K. C. I. E. উপাধি দিয়াছেন। গত দিল্লীর দরবারে নিমন্ত্রিত হইয়া ইনি একটী পোষাক উপহার পাইয়াছিলেন। এখানকার লোকের মুখে শুনিলাম যে, বড়লাট উক্ত পোষাক উপহারের জন্য ৩০ হাজার টাকা জমা দিবার আদেশ করায় রাজা বাহাদুর নিজের স্বল্প আয়ের ওজর করিয়া নির্ভীক চিত্তে প্রত্যাখ্যান করতঃ ৩ হাজার টাকা মাত্র জমা দিয়া তন্মূল্যের পোষাক উপহার গ্রহণ করেন। এই রাজ্যের একদিকের সীমান্ত প্রদেশে পাহাড় মধ্যে বিস্তর ব্যাঘ্র ভল্লুক আছে। সাঁওতালগণ পুরস্কারের লোভে ঐ সকল হিংস্র জন্তু শীকার করিয়া মধ্যে মধ্যে রাজসরকারে আনয়ন করে। আমরা একটী পিঞ্জরে দুইটী জীবিত ব্যাঘ্র দেখিয়াছিলাম। হায়েনার উৎপাতও এখানে কম নহে। এখানে কুলির মজুরি দৈনিক ৴১০ আনা, টাকায় ৴২॥০ সের ঘৃত। রাজার ৪টী হস্তী আছে, তন্মধ্যে একটী অধিকাংশ সময়ে বামদায় থাকে। কাছারি হইতে প্রত্যহ হস্তীদের জন্য প্রচুর পরিমাণে আটা দেওয়া হয়। কথিত আছে, একজন মাহুত তাহা হইতে কিছু কিছু স্থানান্তরিত করিত। একটী হাতি নাকি একদিন তাহা টের পাইয়া দুর্ভাগ্য মাহুতের লীলা শেষ করিয়া দেয়। এখানে একটী মজার জনশ্রুতি আছে। একজন পাদরি সাহেব এখানে গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া কোন সময়ে অনেক মূর্খ সাঁওতালকে আঁধার হইতে আলোকে আনিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে ঐ স্থানে বিসূচিকা রোগের আবির্ভাব হইলে উপশম মানসে ঐ সকল নবীনালোক প্রাপ্ত সাঁওতালেরা শীতলা দেবীর প্রতিমা করিয়া পূজা করিতে লাগিল। এই খবর পাইয়া পাদরী মহোদয় উর্দ্ধশ্বাসে তথায় আসিলেন এবং শিষ্যদিগকে অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত হইতে দেখিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শিষ্যেরা বলিল, "যীশু অন্ধকার হইতে আলোকে আনেন বটে কিন্তু এ বিষম বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে এক মাত্র শীতলা মায়ীই সক্ষম।" পাদরী সাহেব তাহাদিগের ভ্রম

বুঝাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে সকলে উত্যক্ত হইয়া ধনুক লইয়া আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলে পাদরী সাহেব নিজেই চতুর্দ্দিকে আঁধার দেখিয়া পলায়ন করিলেন।

রাজপরিবারের সকলেই সদাচারপরায়ণ, কোন কোন বিষয়ে এই আচারনিষ্ঠা আবার অতিমাত্রায় পরিণত হইয়াছে। যেমন রাজকুমারদিগের বিদ্যাভ্যাস জন্য একজন ইংরাজ মাষ্টার নিযুক্ত ছিলেন। কুমারগণ প্রত্যহই শিক্ষক মহাশয়ের নিকট হইতে পাঠাভ্যাস করিয়া আসিয়া বহির্ব্বাটীতে স্নান করিয়া নূতন পরিচ্ছদ পরিধান না করিয়া অন্তঃপুরে যান না। স্বয়ং রাজাও কোন কারণে ইংরাজদিগের সংস্রবে আসিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম প্রতিপালন করেন। রাজা মিতব্যয়ী হইলেও কৃপণ নহেন। ইনি স্বধর্ম্মপরায়ণ এবং দানশীল। তীর্থদর্শনে যাইয়া কেবলমাত্র রৌপ্য দিয়া তুলাদানের সংকল্প করিয়াছিলেন এবং ঐ সমস্ত পাণ্ডাকে দান করিয়াছিলেন।

এখান হইতে আমরা নবীনগড়ে আসিয়া রাত্রি যাপন করি। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া লক্ষ্মীসরাই আসিয়া একটী দেবালয়ে প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। দেখিলাম, লক্ষ্মীসরাই হইতে ডিঃ বোর্ডের যে রাস্তা গিয়াছে, তাহা একেবারে জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দিক্ জলমগ্ন, পথ ঘাট সব ডুবিয়া গিয়াছে। অগত্যা আমরা রেল রাস্তার লাইনের ধার দিয়া সিরারি ষ্টেশনে আসিলাম। চতুর্দ্দিকের ৪।৫ মাইল বিস্তৃত মাঠ জলমগ্ন হইয়া সমুদ্রের আকার ধারণ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ২।১ খানি গ্রাম দ্বীপের ন্যায় ভাসিতেছে। লোকের দুর্দ্দশার সীমা দেখিলাম না। তাহার উপর চোরের উৎপাতে রাত্রে সুনিদ্রা হয় না। লোক সকল প্রাণের দায়ে ত্রস্ত। একদিন চোরেরা ষ্টেশন হইতে দুইখানি মালগাড়ী কিছু দূরে ঠেলিয়া লইয়া গিয়া মাল বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হয়। আমরা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া সমপুরায় আসি এবং আহারাদি করিয়া কাশীচকে রাত্রি যাপন করি। পরদিন ওয়ারেসলিগঞ্জে আসিয়া ভিক্ষার অন্বেষণ করিতেছি, এমন সময়ে ঠাকুরের ইচ্ছায় একেবারে ৪টী বাটী হইতে আহ্বান আসিল। আমরা স্নানাদি করিয়া ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট ভিক্ষা লইলাম। আহারান্তে রওনা হইয়াছি, এমন সময় একজন পুলিসের লোক আমাদিগের পরিচয়াদি লিখিয়া লইল। তথা হইতে নোয়াদা আসিয়া রাত্রি যাপন করি। পরদিন প্রত্যুষে জেনেইয়া গ্রামে একটী ঠাকুরবাটীতে প্রসাদ পাই, এই ঠাকুর-বাড়ীতে সদাব্রত আছে। তথা হইতে রওনা হইয়া সন্ধ্যার সময় অজ্ঞাতনাম

কোন গ্রামের একটী শিবালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করি। রাত্রিতে কয়েকটী দোকানে ভিক্ষা করিয়া কিছু ছাতু মিষ্ট লবণ ও লঙ্কার যোগাড় হইল।

পরদিন প্রায় ১৫ মাইল হাঁটিয়া বেলা ১০।১১ টার সময় ৺গয়াধামে উপস্থিত হইলাম। গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া জলমাত্র পান করিয়া দিবাভাগ এক স্থানে বসিয়া কাটাইলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পাহাড়ী জিউর মন্দিরে আসিলে তথাকার ম্যানেজার জনৈক বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাদিগের অবস্থা শুনিয়া একটু একটু সরবত খাওয়াইলেন এবং রাত্রিতে আহারের যোগাড় করিয়া দিলেন। পরদিন একটী ছত্রে আহার করিয়া বুদ্ধগয়ায় যাই। এখানে মোহ-ন্তের একজন চেলা আমাদিগের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। পরদিন মোহন্তের সহিত সাক্ষাৎ ও বাক্যালাপ করি। পরিচয়ে তিনি আমা-দিগের বিবেকানন্দ স্বামীজিউর সহিত সম্পর্ক আছে জানিয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন। আমরাও তাঁহার ব্যবহারে আপ্যায়িত হইলাম। তিনি অত্যন্ত অমায়িক নম্রপ্রকৃতি এবং আপন ভাবে আছেন। আশ্রমে ১০।১৫টী ঘোড়া ৩।৪টী উষ্ট্র ও ১টী হাতী দেখিলাম, তদ্ভিন্ন অসংখ্য গরুও আছে। বুদ্ধদেবের মন্দিরে যাইয়া প্রণাম করিলাম। বোধিবৃক্ষ ও সুবর্ণপাতমণ্ডিত চন্দনকাষ্ঠ-নির্ম্মিত বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তিটীও দর্শন করিলাম। এই প্রতিমূর্ত্তিটী নাকি জাপান হইতে প্রেরিত হইয়াছে। এখানে থাকিবার সময় মধ্যে মধ্যে ফল্গু নদীতটে একটী মনোহর স্থানে বৈকালে গিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতাম। তখন আশ্বিন মাস। অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর বক্ষে ৩।৪ হাত জল দেখিতে পাইলাম। এইরূপে ৪।৫ রাত্রি ৺বুদ্ধগয়ায় অবস্থিতির পর আমরা মোহান্তের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেলাম। তিনি প্রথমে সম্মত হইলেন না। বলিলেন, ৺শারদীয়া পূজার পর যাইবেন। তখনও পূজার প্রায় ১৫।২০ দিন বাকি। আমরা বারান্তরে আসিয়া কিছুকাল কাটাইব বলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, তিনি আমাদিগের কম্বল গেরুয়া বস্ত্র প্রভৃতি কোন পদার্থের কিছু আবশ্যক আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমাদের ঐ সকলের প্রয়োজন নাই জানিয়া আমা-দের তিন জনকে তিন খানি মৃগচর্ম্ম আনাইয়া দিলেন। কিন্তু ঐ চর্ম্মগুলি অত্যন্ত ভারী দেখিয়া আমরা তন্মধ্য হইতে বাছিয়া একখানি মাত্র গ্রহণ করিলাম। মোহান্ত নিকটস্থিত একটী সাধুকে ইঙ্গিত করিয়া আমাদিগকে বিদায় দিলেন। আমরা আসিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত সাধুটী আমাদিগের হাতে ৬৲ টাকা রাহা খরচ বলিয়া দিলেন। আমরা নিঃসম্বলে পদব্রজে ভ্রমণ

করিব, এজন্য উহা লইতে চাহিলাম না। পরে তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয দর্শনে উহা লইয়া, বারাণসীস্থ অদ্বৈত আশ্রমে, ঠাকুর সেবার জন্য, পাঠাইয়া দিলাম।

আহারাদি সমাপনান্তে আমরা ৺গয়াধামে পুনরায় আসিলাম। দক্ষিণ কটক-বাসী শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ, এখানে আমাদিগকে বিশেষ যত্ন সহকারে, তাঁহার আবাসে রাখিলেন এবং বলিলেন—আপনাদিগের মিশনের কেহ এখানে আসিলে, আমি ২।১ দিন স্থান দিতে সক্ষম হইব। ইনি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। শ্রাদ্ধ পিণ্ডদান প্রভৃতি কার্য্যে পৌরহিত্য করেন এবং আগন্তুক যাত্রীদিগকে যত্ন সহকারে রাখিয়া, তীর্থ কার্য্যাদি করাইয়া দেন। ইঁহার ব্যবসায়ের ভাব নাই। ন্যায্য খরচ এবং সাধ্যমত যে যাহা দেয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট। গয়ালী পাণ্ডাদিগের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ জন্য আমরা, গয়া করণেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে, ইঁহার নিকট আসিতে অনুরোধ করি। পরদিন সকালে ব্রহ্মযোনি নামক পাহাড়ে আরোহণ করি। পাহাড়টী খুব উচ্চ, প্রায় ৪০০।৪৫০টী অধিরোহণী দিয়া উপরে উঠিতে হয়। উপরে একটী পুষ্করিণী ও থাকিবার গৃহও আছে। একটী বিল্ববৃক্ষ ও ২।১টী আতাগাছও দেখিলাম। তথা হইতে অবতরণ করিয়া, ফল্গু নদীতে স্নান করতঃ, ৺বিষ্ণুপদ পূজা করিলাম। এই চরণ দর্শন করিয়া,—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের নেত্রবারি ধারাকারে প্রবাহিত হইয়াছিল—এই কথা স্মরণ হওয়ায়, হৃদয়ে এক অপূর্ব্বভাবের উদয় হইতে লাগিল। পরে অক্ষয়বট দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলাম।

সেইদিন আহারান্তে ৺গয়াধাম পরিত্যাগ করি। কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই প্রবল বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। বৃষ্টির একটু বিরাম হইলে আমরা ৺কাশীধামাভিমুখে যাত্রা করিলাম। রাত্রিকালে রাজপুর নামক স্থানের এক শিবালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শিবালয়টী বৃহৎ, সম্মুখে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। সে রাত্রি এই স্থানেই কাটাইলাম। এখানে ঠাকুর সেবার কোনই বন্দোবস্ত নাই। পরে জানিলাম, এই শিবালয়টী টীকারি রাজার। টীকারির বর্ত্তমান রাজা, নাকি জনৈক শ্বেতাঙ্গিনীর প্রেমে মজিয়া, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন।

এখান হইতে বাহির হইয়া আমরা, মধ্যাহ্নকালে আহেয়াপুরে আসিয়া, তত্রত্য একটী অবস্থাপন্ন পরিবারে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হই। উক্ত পরিবারের প্রায় সাত, আট ঘর একত্রে অবস্থিত। দেখিবাই বোধ হইল, যেন একটী মুল পরিবার

হইতে ঐ কয় ঘরের উৎপত্তি। ইঁহারা হিন্দুস্থানী, ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব। ইঁহারা আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া, আমাদের অতিথি সৎকার করিবেন, অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, আমাদিগের এক জনকে এক বাটীতে ও অপর দুই জনকে অপর বাটীতে থাকিতে হইল। এই দ্বিতীয় ব্যক্তি নিঃসন্তান। বয়স ৫০।৫৫ হইবে; বিষয় সম্পত্তিও যথেষ্ট আছে। আমাদিগের মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন হইলে তিনি তাঁহার বৈঠকখানার বারাণ্ডায় বিশ্রামের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। খানিক পরে, আমাকে ডাকিয়া গৃহস্বামী পার্শ্ববর্ত্তী একটী গৃহে লইয়া গেলেন এবং আমাকে নানা কথায় ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কতকগুলি টাকাও আমার সম্মুখে আনিয়া, আমাকে লইবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। আমি তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করায়, বলিলেন— 'আমার সন্তানাদি কিছুই নাই, তুমি এখানে একটী মঠ স্থাপন করিয়া বাস কর।' আমি তাহাতে সম্মত না হওয়ায়, অন্ততঃ সেই রাত্রি তথায় থাকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন এবং তন্ত্রোক্ত বিধান মত পূজাদি করিবার প্রস্তাব করিয়া, তত্রস্থ রাণীর সহিত দেখা করিয়া, কথাবার্ত্তাদি কহিবারও অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি রাণীমার সহিত দেখা করিবার কোনই আবশ্যক বিবেচনা করি না বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলাম। মনমধ্যে নানা প্রকার ভয়, সন্দেহ ও দুরভিসন্ধির বিষয় আন্দোলিত হওয়ায়, তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া গুরু ভাইটীকে সঙ্গে লইয়া, সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। মহামায়া এ আবার কি বিড়ম্বনায় ফেলিবার জন্য ফাঁদ পাতিতেছেন ভাবিয়া, শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করিতে লাগিলাম। আবার ভাবিলাম, আমরা তিন জন গুরুভাই একত্রে আছি, তত্রাচ যখন একজনকে এইরূপ পরীক্ষায় পড়িতে হইল, তখন না জানি, যাঁহারা একাকী বিচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের আত্মরক্ষার্থ কত মানসিক বলের প্রয়োজন।

এই স্থান হইতে নির্গত হইয়া, আমরা বৈকালে ৩।৪ ক্রোশ দূরে একজন মোহান্তের আশ্রমে আসি। মোহান্ত আশ্রয় দানে বিরক্তি প্রকাশ করিলে— আমরা অমনি দত্রিজি গ্রামে ভোলি ভকত নামে, এক ধর্ম্মাত্মার নিকট আসিয়া, রাত্রি যাপন করি। সন্ধ্যার সময় উক্ত মহাত্মা, ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া, ভগবান্ রামচন্দ্রের গুণানুকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সকলে মিলিয়া সমস্বরে 'জয় রঘুনন্দন, দশরথ-তনয়, সীতাপতি, রামচন্দ্র' বলিয়া প্রাণ খুলিয়া, অতীব ভক্তি সহকারে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন বাস্তবিকই আমরা ক্ষণকালের জন্য পথশ্রম ভুলিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরে আরাত্রিক আরম্ভ হইলে,

আমরাও তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করিয়া দর্শন করিতে লাগিলাম। পরে ভোগান্তে আমাদিগকে ডাকিয়া প্রসাদ দান করিলেন। আমরাও তৃপ্তির সহিত প্রসাদ গ্রহণ করিয়া, শয়ন করিলাম। প্রত্যুষে বিদায় গ্রহণ করিয়া, কিয়দ্দূর আসিয়া, পুন্‌পুন্ নদী পার হইলাম। এইখানে স্নানাদি সমাপনান্তর ভিক্ষালব্ধ কিছু খাবার দ্বারা জলযোগ করিয়া, খানিক বিশ্রাম করিলাম, পরে সন্ধ্যার সময় দাউদ নগরে উপস্থিত হইলাম। এই নগর শোন নদের তীরে। ইহা একটী বৃহৎ জনপূর্ণ বাণিজ্যবহুল স্থান। এখানে একটী ব্রাহ্মণের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া রাত্রি যাপন করি।

সকালে শোন নদের তীরে আসিলাম। বালুকাময় নদসৈকত, প্রস্থে এক মাইলের উপর হইবে, বলিয়া বোধ হইল। তবে জল তখন খুব কম। নদগর্ভের অধিকাংশই চড়া। শুনিলাম, বর্ষাকালে এখানে জলের বেগ এত প্রবল হয় যে, খেয়াপার হইতে প্রায় সমস্ত দিন লাগিয়া যায়। এখানে আমরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিলাম। বেলা ৯টার সময় ২।১ খানি নৌকা পারে যাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু আমাদের নিকট পয়সা না থাকায়, কেহ পার করিয়া দিতে স্বীকার করিল না। আমরা আমাদের পরিধেয় কাপড় (গেরুয়া) একখানি দিতে চাহিলাম, তাহাও কেহ গ্রহণ করিয়া পার করিতে রাজী হইল না। অগত্যা আমরা হতাশ হইয়া বসিয়া থাকিলাম। অবশেষে তাহারা যখন বুঝিল যে, সত্য-সত্যই আমরা নিঃসম্বল, তখন একজন দয়া করিয়া পার করিয়া দিল। পর-পারে পৌঁছিয়া নছীবগঞ্জ গ্রামে একটী শর্করা ব্যবসায়ীর আতিথ্য গ্রহণ করিলাম এবং সন্ধ্যার সময় 'ডিহিরি অন সোন' নামক ষ্টেশনে আসিলাম। এখানে একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন। পরদিন পুনরায় গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে আসিয়া আমরা ৩৩৯ নং মাইলষ্টোন দেখিতে পাইলাম। ঐ দিন সাসিরামে আসিয়া আমরা রাত্রি যাপন করি। প্রত্যুষে বাহির হইয়া, মধ্যাহ্ন-কালে জাহানাবাদের নিকট একটী গ্রামে ভিক্ষা করিয়া, বৈকালে একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাটী আসিয়া রাত্রি যাপন করিলাম। পরদিন চলিতে চলিতে পথি-মধ্যে ট্রাঙ্ক রোড পরিদর্শনকারী একজন ভদ্র লোকের সহিত আলাপ হয়। তিনিই সেদিন আমাদিগকে যত্নের সহিত ভিক্ষা দান করেন। মধ্যাহ্নে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া দুর্গাবতী ষ্টেশনে আসিয়া বসিয়া আছি, এমন সময় উক্ত বাবুটী কার্য্যোপলক্ষে ঐ স্থানে আসিয়া আমাদিগকে আবার দেখিতে পাইলেন এবং সেরাত্রি তাঁহার বাঙ্গালায় থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

পরদিন কর্ম্মনাশা নদী পার হইলাম। নদীবক্ষে একটী বৃহৎ সেতু আছে এবং সেই সেতুর উপর লেখা আছে যে, যাঁহারা এই পথ দিয়া তীর্থাদি দর্শনে যান, নদী জল স্পর্শে পাছে তাঁহাদের পুণ্যকর্ম্ম নষ্ট হয়, সেজন্যই এই সেতু নির্ম্মিত হইল। সেতু পার হইযা একস্থানে ভিক্ষা করণান্তর আমবা বৈকালে মেজো-যার ষ্টেশনে আসিলাম। একটী ভদ্রলোক এখানে আমাদিগেব পরিচযাদি গ্রহণ করেন এবং কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীপবমহংসদেব এবং পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ স্বামীর পবিত্র জীবনকথা আমাদিগেব নিকট হইতে কিছু শুনিয়া, অত্যন্ত তৃপ্ত হইলেন। ইনিই ষ্টেশন মাষ্টাবকে বলিযা আমাদিগের আহারাদির যোগাড় কবিযা দিলেন। তথায বাত্রিযাপন কবিযা, পরদিন মোগলসরাই হইযা ৺ কাশীধাম।

বেলা ১০।১১টার সময ভাগীবথী বক্ষস্থিত পুল পাব হইলাম। পুলেব উপব হইতেই বিশ্বেশ্বরেব বিশাল পুরী দর্শন করিযা, উদ্দেশ্যে বিশ্বনাথকে প্রণাম করিলাম। দেখিলাম, তরঙ্গিণী তীরে ক্রোশাধিক পরিমিত স্থান পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাকারেব অট্টালিকা, সোপানাবলি, উচ্চচূড মন্দিব ও অভ্রভেদী স্তম্ভসকল সারি সারি সজ্জিত হইযা দণ্ডাযমান। মনে হইল ঐ সকল সুবম্য হর্ম্ম্যরাজি, যেন রূপোন্মত্তা নাবিকুলেব ন্যায, সহর্ষে জাহ্নবী-জলে আপন আপন প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেছে। স্রোতস্বিনীও যেন ঐ মৃদু স্নিগ্ধ ছবি হৃদযে ধারণ কবিযা, আপনাকে সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিতেছে এবং আদবেব সহিত উহাকে নাচাইতেছে। তবঙ্গিণীব এক কূলে এই অমরালাঞ্ছিত শোভা এবং অপর কূলে সুদূর বিস্তৃত বালুকামণ্ডিত প্রান্তর, যেন হর্ষ-শোক, জীবন-মৃত্যু, প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-সমাকুল অনিত্য মানব-জীবনেব অভিনয, চিত্রপটে প্রদর্শন কবিতেছে। দুই একখানি নৌকা, যাত্রিপূর্ণ হইযা, স্রোতভরে আপনা আপনি পুলেব দিকে আসিতেছে এবং যাত্রী সকলের সোৎসুখ দৃষ্টি তটস্থ হর্ম্ম্যবাজিব উপবেই নিবদ্ধ রহিযাছে। শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনিগণ ২।১ খানি নৌকায ছাদের উপর বসিয়া প্রাচীন কীর্ত্তি সকল দর্শন কবিতে করিতে আসি-তেছেন। পাণ্ডা সকল নদিকূলে এক একটী বৃহৎ ছত্রতলে সমাসীন এবং যাত্রী সকল সসম্ভ্রমে স্নান, আহ্নিক, সংকল্প, পূজা, পাঠ, ইত্যাদি লইযা ব্যস্ত বহিযাছে। কোন কোন পাণ্ডা, স্নানান্তে গৃহগমনোন্মুখ গৃহস্থের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সংকল্প-সূত্র পাঠ কবিতে কবিতে ধাবিত হইযা, ২।১টী পযসা আদায করিবাব চেষ্টা করিতেছে। কেহ কেহ বা, গঙ্গাস্নান ও তত্তীরে দানাদিব মাহাত্ম্য, সাধাবণকে বুঝাইযা দিবাব জন্য, উচ্চৈঃস্বরে পুবাণেব দোহাই দিয়া, স্বরচিত গল্প সকল বর্ণনা

করিতেছে। ক্রমশঃ এই দৃশ্য অতিক্রম করতঃ আমরা ষ্টেশনের অভিমুখে যাইয়া সহরের রাস্তা ধরিলাম। এবং সহরের মধ্য দিয়া বরাবর রামাপুরায় আমাদিগের মিশন-প্রতিষ্ঠিত অনাথাশ্রমে আসিলাম। দেখিলাম, তথায় কয়েকটী রোগী এক একটী শয্যায় শায়িত রহিয়াছে এবং ২।৩টী যুবক তাহাদিগের তত্ত্বাবধারণ জন্য ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতেছেন। আমরা, তথায় মধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়া, অপরাহ্নে অদ্বৈতাশ্রমে গিয়া ঠাকুর ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিলাম। পরে, স্বামী শিবানন্দজীউর চরণ বন্দনা করিয়া, আশ্রমবাসী ২।৩টী ভক্তদিগের প্রেমালিঙ্গন করিয়া, তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলাম।

সমাপ্ত।

ধর্ম্মের জয়।

শ্রী—] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

পরদিন প্রভাত হইল। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে বামাচরণের কলঙ্ক কাহিনী পাড়ার ঘরে ঘরে প্রচার হইল। প্রতিবাসিগণ বলাবলি করিতে লাগিল—"একশো টাকার চাকুরি পরিবার পার্শী শাড়ী প'রে নেমন্তন্ন যান, হাতে ব্রেসলেট, গলায় নেক্‌লেস। এদিকে সাত টাকা চালের মন। আবার ছেলে ঠ্যালাগাড়ী ক'রে বিকেলে হাওয়া খায়। হবে না? ধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচার!!" ইত্যাদি ইত্যাদি।

নোব্‌ল্ কোম্পানির বড় সাহেব বড় সজ্জন ছিলেন। প্রকৃতি, তাঁহাকে দয়া, সরলতা, উদারতা প্রভৃতি যেমন অনেক সদ্‌গুণে ভূষিত করিয়াছিলেন, তেমনই একটী দোষও দিয়াছিলেন—সাহেব বড় কাণপাতলা। পরদিন রঘুনাথকে ডাকিয়া বলিলেন—"রঘুনাথ। তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

বড় সাহেবের বাঙ্গালায় জন্ম, চমৎকার বাঙ্গলা বলিতে পারেন।

রঘুনাথ বলিল—"সাহেব। আপনার সন্তোষই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। হুজুর। বামাচরণ বাবুকে আমি অনেক মিনতি করিয়াছি, তাঁহার পরিবার আমার কাছে নিত্য কাঁদেন, আমি সহ্য করিতে পারি না। তাই জনসন সাহেবের সহিত পরামর্শ করিতেছিলাম, কেমন করিয়া বামাচরণ বাবুকে কুপথ হইতে নিবৃত্ত করি। জন্‌সন্ যে সকল কথাই হুজুরের কাণে তুলিবেন, তাহা আমি মনে ভাবি নাই!"

সাহেব।—"তুমি উত্তম করিয়াছ; দুরবস্থায় পড়িয়া রামাচরণ যদি শোধরায়, তাহাতে তোমার পুণ্য হইবে।"

রঘু।—"সাহেব! রামাচরণ বাবু হতেই এ চাকুরি পেয়েছি, আমি তাঁর অনিষ্টের হেতু হলেম, এই আমার ক্ষোভ।"

সাহেব।—"ক্ষোভ করিও না—সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তোমার এই কার্য্যের দ্বারা বোধ করি, রামাচরণ সংশোধিত হইবে. অন্ততঃ আমরা সেইরূপ আশা করিব। কেবল রামাচরণের নয়, তুমি আমাদেরও উপকার করিয়াছ, তুমি না প্রকাশ করিলে, হয়ত আরও অধিক অর্থ চুরি করিত। তোমার পুরস্কার-স্বরূপ আমি তোমাকে রামাচরণের কর্ম্ম দিব, কিন্তু জামিন এবার বৃদ্ধি করিব। তোমার হাজার টাকা জমা দিবার সঙ্গতি আছে?"

রঘু।—"হুজুর! আমি অতি দরিদ্র, অনেক কষ্টে হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে, সময় পাইলে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।"

সাহেব।—"উত্তম, একমাস সময় দিলাম। মনে রাখিও, সত্য কথা ও সততার পুরস্কার-স্বরূপ তোমাকে এই কর্ম্ম দিলাম, আপাততঃ তুমি পঞ্চাশ টাকা মাসিক বেতন পাইবে।

সতের সহিত অসতের স্বভাবসিদ্ধ শত্রুতা। অযাচিত আদর, অকৃত্রিম স্নেহ, অসীম বিশ্বাস, আন্তরিক যত্ন লাভ করিয়াও রামাচরণের আশ্রয় রঘুনাথের দিন দিন বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল; ক্রমে তাহার অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, রামাচরণের সর্ব্বনাশ করিব। কিন্তু কি অপরাধে? রঘুনাথ অন্তরের অন্তস্থল পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিল, রামাচরণের তিল মাত্র ত্রুটি পাইল না, নিরন্তর ভাবিতে লাগিল, একবার একটা ছল-ছুতা কিছু পাইলে হয়।

খোকার অসুস্থতা বশতঃ রামাচরণ একদিন আফিসে যাইতে পারেন নাই। রঘুনাথকে ডাকিয়া বলিলেন—"খোকার ভারি জ্বর, আমাকে কিছুতে ছাড়িতেছে না।" খোকা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহে নাই, কি তিনি খোকাকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছুক নহেন, সে কথা আমরা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি না। ফল কথা, রামাচরণের সে দিন আফিসে যাওয়া হয় নাই। নৃত্যকালীকে বলিলেন—"রঘুনাথকে ক্যাসের চাবিটা দাও।" দেবর ভাজ সম্বন্ধ, রঘুনাথ ঈষৎ হাসিয়া ব্যঙ্গের ছলে বলিল—"বউ ঠাকুরুণ, আমায় চাবি দিয়া, বিশ্বাস করিতে চান্ না।"

বামাচরণ হাসিয়া বলিলেন—"সেকি বউ ঠাকুরুণ?" বউ ঠাকুরুণ নিরুত্তর। রঘুনাথ বলিল—"আমি সত্য বল্‌ছি, কি না, বউ ঠাকুরুণই বলুন।"

বামা।—"বউ ঠাকুরুণ, এই বদ ছোক্‌রার কাণ মলে দিন ত?

বউ ঠাকুরুণ নিরুত্তর। রঘুনাথ বলিল—"বউ ঠাকুরুণ ঠিক কথা না বলিলে, আমি চাবি লইব না।" হাসির ভিতরেও রঘুনাথের মুখ একটু ভার। স্বরে—ব্যঙ্গের অন্তরালে, ঈষৎ গাম্ভীর্য্য।

বউ ঠাকুরুণ তথাপি নিরুত্তর। রঘুনাথ, মুখ ভার করিয়া, সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। বামাচরণ ভাবিলেন নৃত্যকালীর ব্যবহারে রঘুনাথ অপমানিত ও ব্যথিত হইয়াছে। খোকার অসুখে মনও বড় প্রসন্ন নাই, রুক্ষস্বরে বলিলেন—"ছি ছি! অকারণ কেন রঘুনাথের মনে কষ্ট দিলে।'

নৃত্যকালী গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন—"চাবি দিতে বলেছ, চাবি দিচ্ছি। আমার বিশ্বাস অবিশ্বাস জেনে কি দরকার?"

রঘুনাথ অন্তরাল হইতে উত্তরটা শুনিয়া গেল। ক্রমে এই অব্যক্ত সন্দেহকে সে মনে মনে অক্ষমনীয় অপরাধে পরিণত করিয়া তুলিল। এই ছুতা ধরিয়া সে বামাচরণের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইল।

নোবল্ কোম্পানির আফিসে বিস্তর হুণ্ডীর কারবার ছিল। ইহা ব্যতীত ব্যাঙ্কিং কার্য্যও হইত। অনেকে তাঁহার কাছে টাকা গচ্ছিত রাখিত। অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা বড় সাহেব সুদ কম দিতেন, কিন্তু সাধারণের তাঁর উপর বেশী বিশ্বাস।

অনুপস্থিতির পর বামাচরণ যে তারিখে আফিসে আসিলেন, রঘুনাথ সেই তারিখে দৈনিক জমাখরচ বহিতে গচ্ছিত হিসাবে এক হাজার টাকা ভুয়া জমা দিল। বড় সাহেবের আদেশে আফিসের লেনা দেনা কারবার, যতদূর সম্ভব নম্বরী নোটে, অর্থাৎ পঞ্চাশ ও তদূর্দ্ধ মূল্যের নোটে, হইত। রঘুনাথ মিথ্যা গচ্ছিতকারীর নাম লিখিল—দিলীপচাদ গোয়েনকা, জমা—এক কেতা, এক হাজার টাকার নোট, নম্বর—ইউ, এ, ৭২।৬৮ ৩৮৯। বলা বাহুল্য, গচ্ছিতকারীর নাম ধাম ও নোটের নম্বর, প্রভৃতি সবই রঘুনাথের কাল্পনিক সৃষ্টি। তাহার মতলব, হিসাবে জমার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া, তহবিল কম দেখান, অর্থাৎ বামাচরণকে চোর প্রতিপন্ন করা। রঘুনাথ একবার মনে করিল—অল্পে অল্পে, দিন দিন, কিছু কিছু সরাই, কিন্তু এই হাতে খড়ি—ভয়ে পারিল না। কি জানি, যদি কোন

দিন বামাচরণ খাতা দেখে, ধরা পড়ে। একদিন একটা সই করিলে বামাচরণ যাহাতে ফাঁদে পড়ে, সেইরূপ মতলব করিল। কার্য্যেও তাহাই হইল।

বামাচরণ নিঃসন্দেহে দৈনিক বাকিযান সই করিয়া দিলেন। অন্যদিন বরং জিজ্ঞাসা করেন—"ভাল করিয়া ঠিক ঠাক্ সব দেখিয়াছ ত।" সেদিন আর কোন কথা বলিলেন না, পাছে, রঘুনাথ বাকিযানের সহিত মজুত তহবিল মিলাইবার জন্য জেদ করে। কাল খোকার জ্বর হইয়াছিল, সকালে সুস্থ ছিল সত্য, কিন্তু এবেলা কেমন আছে? বামাচরণ গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত, তাড়াতাড়ি সই করিয়া দিলেন।

আফিসে জনসন্ নামে একজন ফিরিঙ্গী কর্ম্ম করিত, বামাচরণের উপর মনে মনে সে নিতান্ত অসন্তুষ্ট। সে মধ্যে মধ্যে হাঁওলাত চাহিত। বেতনের অধিক কাহাকে হাওলাত দিবার হুকুম ছিল না। বামাচরণ দিতেন না বলিয়া জনসন্ ব্যাজার। রঘুনাথ তাহার সহিত মিত্রতা করিল। একদিন কথায় কথায় কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ করিয়া গোপনে জনসন্কে বলিল—"বামাচরণ অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে, সে ঘোর জুয়াড়ি হইয়াছে।" জনসন্ও কৃত্রিম সহানুভূতি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"টহবিল ভঙ্গ করিয়াছে না কি?" রঘুনাথ সে কথার কোন উত্তর দিল না, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। জনসন্ও তৎক্ষণাৎ বড় সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিল। রঘুনাথ বুঝিল, তাহার মতলব সিদ্ধির আর বেশী বিলম্ব নাই।

বড় সাহেবের কামরায় গিয়া জনসন্ বলিল—"মাষ্টার নোব্‌ল্ সার, আপনাকে গোপনে একটা কথা বলিতে পারি কি?"

"অবশ্য।"

"মাষ্টার নোব্‌ল সার, আপনি অতি মহৎ। আমি প্রত্যহ এ কথা জেনি (জনসনের গৃহিণী) ও অন্য সকলকে বলি। পৃথিবীতে কুকুর আছে, বিড়াল আছে, গাধা আছে, গরু আছে, ঘোড়াও আছে, কিন্তু মানুষ যদি থাকে ত সে আপনি, মাষ্টার নোব্‌ল্ সার।"

অনেক কষ্টে মাষ্টার নোব্‌ল্ সার বামাচরণের কাহিনী অবগত হইলেন। কাণ-পাতলা, কথাটা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। স্থির হইল, বামাচরণ চলিয়া গেলে, গোপনে রঘুনাথকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন। সেইরূপই হইল। রঘুনাথের উদ্দেশ্য ছিল—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, বামাচরণের বিরুদ্ধে সে, কোনও কথা

বলিবে না, তাহা সিদ্ধ হইল। রঘুনাথ গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিতে প্রথম নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। ক্রমে ভয় দেখাইয়া, অভয় দিয়া, বড় সাহেব সকল কথা অবগত হইলেন। রঘুনাথ সেলাম দিয়া বলিল—"সাহেব! রোগীর মুখেই রোগ ব্যক্ত হইবে, আপনি বাকিয়ালের সহিত মজুদ চেক্ করুন।" ইহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, পাঠক অবগত।

বড়বাজারে একজন মাড়োয়ারীর বাড়িতে ছেলে পড়াইবার অছিলা করিয়া, রঘুনাথ, নিত্য জুয়া খেলিত। এখন আর কোন ছলের আবশ্যক নাই, রঘুনাথ বামাচরণের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আলাদা বাসা করিয়াছে। তাহার পুঁজী বেশী ছিল না, মোটে চারি পাঁচ শত টাকা। একবার মনে করিল—"আপাততঃ ঐ টাকাটা জমা দিয়া সাহেবের নিকট কিছু বেশী সময় প্রার্থনা করি। কিন্তু তা হ'লে খেলার বেস্ত থাকে না। এই সময় হাজারীর নোট খানা জিতিয়া লইতে পারি।" এই নোটের বিবরণ একটু বলা আবশ্যক। রঘুনাথ যেখানে জুয়া খেলিত, একজন মাড়োয়ারী মাঝে মাঝে সেথায় খেলিতে আসিত। জুয়ার দলে সে হাজারী নামে সুপরিচিত। আসরে নামিয়াই হাজারী পাগড়ীর ভিতর হইতে একখানি হাজার টাকার নোট বাহির করিত, পরে নোট খানির পাট খুলিয়া, বিদ্যুৎ-চমকবৎ সে, একবার মাত্র তাহা জুয়াড়িদলের নয়নসমক্ষে উদ্ভাসিত করিয়া, তৎক্ষণাৎ পাট করিয়া পাগড়ীতে লুকাইত। পাট করিতে করিতে বলিত—"এই নোট যে জিতিয়া লইবে, সে আমার নসিবও লইবে।"

এদিকে সাহেব জামিনের টাকার জন্য তাগাদা করিতে আরম্ভ করিলেন। রঘুনাথ বলিল—"সাহেব, আমি পূর্ব্ব কেশিয়ারের অর্দ্ধেক বেতন পাই, জমা দিতে হইবে দ্বিগুণ। হুজুর, একটু কৃপা করুন।"

সাহেব।—"তুমি আর কত সময় চাও? তিন মাস হইয়া গিয়াছে।"

রঘু।—"সাহেব! আর পনের দিন সময় দিন।"

সাহেব।—"উত্তম। কিন্তু আর বেশী সময় দিতে পারিব না।"

রঘুনাথ দারুণ চিন্তিত হইল। কিন্তু সময় সুপ্রসন্ন হইলে অসাধ্যও সুসাধ্য হয়। সত্য সত্যই রঘুনাথ একদিন হাজারীর নোট জিতিল। ভাবিল—এইবার জোর পড়তা। পরদিন তাড়াতাড়ি আফিসে গিয়া, সেই পয়মন্ত নোট জামিন-স্বরূপ জমা দিল।

দিন যায়, থাকে না, কিন্তু বামাচরণ দিনে দিনে হতাশ হইতে লাগিলেন। "ধর্ম্ম বিচার করবেন'—ব'লে নৃত্যকালী নিত্য আশ্বাস দেন। বামাচরণ প্রতিদিন

প্রভাতে আশান্বিত হইয়া গাত্রোত্থান করেন, সূর্য্যাস্তে সে আশা চলিয়া যায়, সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে নৈরাশ্যের অন্ধকার হৃদয় আচ্ছন্ন করে। এইরূপে দিনের পর দিন [illegible] ক্রমেই বামাচরণের [illegible] দিনের ভাবনা ভাবেন [illegible] পুত্রকে সুখে রাখিবেন। নৃত্য [illegible] খাবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনাগুলি, অবশ্য-পালনীয় কর্ত্তব্যের মত, [illegible] অশনিপাতে বামাচরণের বুদ্ধি-ভ্রংশ হইল। [illegible] সহিত সাক্ষাৎ হয়। মনে ভাবেন, তিনি [illegible] কাছে আসিলে কুণ্ঠিত হ'ন, মুখ তুলি [illegible] সমাজ হইতে, সংসার হইতে আপনাকে আপনি নির্ব্বাসিত করিয়া বামাচরণ সমস্ত দিন একদৃষ্টে শূন্যে চাহিয়া নীরবে বসিয়া থাকেন— যেন হতাশের প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি।

কিন্তু দিনে দিনে দুর্দ্দৈবের পীড়ন যতই বাড়িতে লাগিল, নৃত্যকালীর ততই উজ্জ্বলতর বিকাশ হইতে লাগিল। [illegible] সাধ্বী যেন দেবপ্রভায় প্রভান্বিতা হইয়া উঠিলেন। ঐশ্বর্য্য হরণ করিয়া, অদৃষ্ট, সতীশিরে গৌরব-মুকুট পরাইয়া দিল। সম্পদে রমণী বিলাসিনী, দারিদ্রেই নারীত্বের চরম বিকাশ। দারিদ্র্যের অন্ধকারে, নৃত্যকালী, সন্ধ্যা-তারার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণ বিকীরণ করিতে লাগিলেন।

দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া বামাচরণ যখন হতাশে সংসারের হাল ছাড়িয়া দিলেন, নৃত্য-কালী নবোৎসাহে তাহা আঁটিয়া ধরিয়া বসিলেন। আর এক মত অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া সর্ব্বাগ্রে আফিসের ঋণ পরিশোধ করিলেন। সূচির কারুকার্য্যে নিপুণা, সেই সখের কাজ এখন জীবিকা হইল। সংসারের দিনের কাজ রাত্রে সারিয়া, সূচিকার্য্যের সময় করিয়া লন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল, কিন্তু স্বামী পুত্রের একমাত্র অবলম্বন হইয়া সতীর হৃদয়-বল অটল রহিল। প্রতিবেশিনী, যাহারা দুঃখের দিনে জ্বালাইবার অভিপ্রায়ে আসিত, বিস্মিত-নেত্রে দেখিত—অযতনে, অভূষণে মলিন বসনে নৃত্যের সৌন্দর্য্য যেন দ্বিগুণ ফুটিয়া উঠিয়াছে, রূপ ফাটিয়া পড়িতেছে। জ্বালাইতে আসিয়া, আপনারাই জ্বলিয়া যাইত, পরস্পরে কাণাকাণি করিত—"তবু অংখারে ফেটে [illegible], ওমা, ভাঙ্গে ত মচকায় না।"

বামাচরণের বিরাগ ক্রমে বিদ্বেষে পরিণত হইল। পুত্র-মোহে অন্ধ, নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবহেলা করিয়া, অসতর্কতা বশতঃ বিপদ্ যে তিনি আপনি আহ্বান করিয়া আনিযাছেন, সে কথা তাঁহার মনে হইল না! বামাচরণ ভাবিতে লাগিলেন—"নিরপরাধীর দণ্ড। ধর্ম্মের অবিচার!!"—ভাবিতে ভাবিতে বামাচরণের মনে দারুণ বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল। তাঁহার ধারণা হইল, আজীবন ধর্ম্ম প্রতিপালন করিযা, তিনি নিতান্ত ঠকিযাছেন। ধর্ম্ম—সাধু সন্ন্যাসীর জন্য, গৃহস্থের নয়। ক্রমে তাঁহার মনে দুর্ম্মতি উঠিতে লাগিল।

বাঙাল ব্যাঙ্কে বামাচরণের নামে দশ হাজার টাকা জমা ছিল, তাহার সুদ লওযা হইত না। টাকাটা বাস্তবিক বামাচরণের নয, তাঁহার এক আত্মীয়ের। সেই আত্মীয, বামাচরণ ও নৃত্যকালী ব্যতীত, এ টাকার কথা, ঘুণাক্ষরে আর কেহ জানিত না। ঐ আত্মীয, মৃত্যুঞ্জয বাবু, বেশ সাম্পত্তিপন্ন ছিলেন। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে টাকাটা বামাচরণের নামে বেনামীতে ব্যাঙ্কে জমা রাখিযাছিলেন, তাহা এখন প্রকাশ নাই, আর প্রকাশ হইবার কোন সম্ভাবনাও নাই, কারণ, হঠাৎ মৃত্যুঞ্জযের মৃগী রোগে মৃত্যু হইযাছে। ফলকথা, টাকাটা মৃত্যুঞ্জযের সত্য, আর উহার উপর যে বামাচরণের দারুণ লোভ পড়িযাছে তাহাও সত্য। বামাচরণ ইতস্ততঃ করিতেছেন, একদিন নৃত্যকালী বামাচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মৃত্যুঞ্জয বাবুর বিষয় কে দেখ্‌ছে শুন্‌ছে?" বামাচরণ একটু চমকিযা উঠিলেন, তিনিও দিনরাত মৃত্যুঞ্জয বাবুর বেনামী টাকার কথা ভাবিতেছেন। পরক্ষণেই বলিলেন—"মৃত্যুঞ্জয বাবুর পরীবারের দরখাস্তের প্রার্থনা মত আলিপুরের কালেক্টর সাহেব, নোবল্ সাহেবকে নাবালক পুত্রের অভিভাবক, নিযুক্ত করেছেন। কেন কি হযেছে?"

নৃত্য।—"কিছু হয়নি, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

বামাচরণ মনে করিলেন, বেনামী টাকাটা গাপ্ করিতে নৃত্যকালীরও ইচ্ছা হইযাছে, লজ্জায বলিতে পারিতেছে না। বলিলেন—"কেন জিজ্ঞাসা কোর্‌ছ, বলনা। অমনি খানোকাই কি জিজ্ঞাসা কোর্‌ছ? অবশ্য ভিতরে মানে আছে।"

নৃত্য।—"মানে আর কি, এমন কিছু নয়।"

বামাচরণ।—"তবে? সেই দশ হাজার টাকার কথা বোল্‌ছ? সে টাকা যেমন জমা আছে, থাক, আমি তার কোন উপসত্ব ভোগ কর্‌তে চাইনি, বেনামীও প্রকাশ করতে চাইনি।

বিস্মিত নেত্রে নৃত্যকালী বামাচরণের মুখ পানে চাহিলেন, ভাবিলেন,—“একি আমার পরীক্ষা। না তা'ত নয়।” সবিস্ময়ে বলিলেন—‘তুমি কি বোল্‌ছ? বেনামী প্রকাশ কর্‌তে চাও না, তুমি তার উপসত্ত্ব ভোগ কর্‌বে না, তবে কে ভোগ কর্‌বে, আমি?” নৃত্যকালীর মুখ দেখিয়া, বামাচরণ, কোন কথা স্পষ্ট বলিতে সাহস করিলেন না, ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—‘না, তা না, তুমি কেন?”

নৃত্য।—“তুমি নও, আমি নই। তবে কে, খোকা?”

বামা।—“তাতে আপত্তি কি?”

নৃত্য।—“ওঃ বুঝেছি, তুমি আমার মন বুঝ্‌ছ?”

বামা।—“মন বোঝা কি?”

নৃত্য।—‘তবে ঠাট্টা?”

বামা।—“শোন নৃত্য। মন বোঝা নয়, ঠাট্টা নয়, আমি এ টাকার কথা প্রকাশ কর্‌ব না। বিশ্বাসঘাতক? সে ত হয়েইছি, সকলে জেনেছে, আমি ক্যাশ্ ভেঙ্গেছি।”

নৃত্য।—“সকলে জানুক্, তোমার মন জানে, তুমি নির্দ্দোষ, ধর্ম্ম জানেন, তুমি নিরপরাধ।”

বামা।—“ওঃ ধর্ম্ম, ধর্ম্ম দয়াময়। অতি ন্যায়বান॥ যারা তাঁর সেবা করে, তাদের স্ত্রীলোকের অন্নদাস হ'য়ে থাক্‌তে হয়। আর যারা তাঁর মস্তকে পদাঘাত করে, তারা পরম সুখী। ধর্ম্মের ভয় আমায় দেখাইও না, ধর্ম্মের ভয় আর আমার নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের বেনামী স্বীকার কর্‌ব না—স্থির নিশ্চয়। আর কিছুর জন্য না হোক্, ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ কর্‌ব ব'লে।”

নৃত্য।—“তুমি কি বোল্‌ছ? শোন, চাক্‌রি গিয়েছে, চারদিকে বদ্‌নাম, তার জন্য এক তিল ভয় করিনি, তোমার কথা শুনে আমার গা শিউরে উঠ্‌ছে। ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ। আমরা যে কষ্ট পাচ্ছি, সে কি ধর্ম্মের দোষ? সুখ-দুঃখ ছাড়া কে? দুদিন দুঃখ পাচ্ছি ব'লে, ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দেবে? ধৈর্য্য ধর, ধর্ম্ম নিশ্চয় বিচার কর্‌বেন। তুমি কি মনে কর—ধর্ম্ম ব্যবসা? ধর্ম্মপথে থাক্‌লে যদি নিশ্চিত জানে—সুখ ঐশ্বর্য্য পাবে, এমন মূর্খ কে আছে যে, অধর্ম্ম করে? একথা ত তুমিই আমায় শিখিয়েছ, আজ কেন আপনি ভুলে যাচ্ছ? আমাদের সব গেছে, অর্থ গেছে, সুনাম গিয়েছে, আছেন মাত্র—ধর্ম্ম। ধর্ম্ম আছেন ব'লে এত সর্ব্বনাশে অন্নহীন হইনি এত কষ্টেও মনে সুখ আছে। ধর্ম্ম

আছেন ব'লে অকূল বিপদ্‌সাগরে কূল পেয়েছি। ধর্ম্ম দীনের বন্ধু, দুর্ব্বলের বল, দরিদ্রের সম্পদ্, এ দুর্দ্দিনে ধর্ম্মই আমাদের একমাত্র সহায়। তোমার পায়ে পড়ি, ধর্ম্ম-নিন্দা কোর না। আমার মাথা খাও, তুমি এ দুর্ম্মতি ত্যাগ কর।"

বামাচরণ—নিরুত্তর।

নৃত্যকালী ব্যাকুল হইয়া বলিতে লাগিলেন—"তুমি চুপ ক'রে আছ কেন? শোন, আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্ম আমার সহায় হ'বেন। আমি কখন তোমায় এ অধর্ম্ম করতে দেব না। তুমি এ টাকার কথা স্বীকার না কর, আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর্‌ব, এ টাকা যা'দের ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য, আমি তাদের বাড়ী যা'ব, সমস্ত ব'লে দেব। তুমি কা'র জন্য অধর্ম্ম কর্‌তে যাচ্ছ? খোকার জন্য? এ অধর্ম্মের অর্থ কি তা'র ভোগ হ'বে? কখন নয়। তোমায় মিনতি করি, পায়ে ধরি—ধৈর্য্য ধর, ধর্ম্মের জয় নিশ্চয় হ'বে। যাও, কালবিলম্ব ক'র না, সর্পকে ঘরে স্থান দিতে নেই, তোমার এ দুর্ম্মতি ত্যাগ কর, এ কাল চিন্তাকে মন থেকে দূর কর। আমার মাথা খাও, মৃত্যুঞ্জয় বাবুর পুত্রের অভিভাবকের কাছে তুমি এখনি বেনামী স্বীকার করে এস।"

অশ্রুধারে সতী পতির পদযুগল সিক্ত করিতে লাগিলেন। লজ্জায়, আত্মঘৃণায় বামাচরণ ধীরে ধীরে মৃত্যুঞ্জয় বাবুর পুত্রের অভিভাবকের নিকট গমন করিলেন।

সাধু বলিয়া নোব্‌ল্ সাহেবের খ্যাতি ছিল, ইতিপূর্ব্বে দুই চারিটী নাবালকের অভিভাবক হইয়া, তাহাদের বিষয় রক্ষা করিয়াছেন। সাহেবের নিজের সন্তানাদি ছিল না। যে নাবালোকের অভিভাবক হইতেন, তাহাকে সন্তান-তুল্য জ্ঞান করিতেন। তাঁহার দয়া, সততা, সৌজন্যের কথা অনেক স্ত্রীলোকও জানিত। মৃত্যুঞ্জয় বাবুর স্ত্রী পূর্ব্বে বামাচরণের মুখে সাহেবের কথা অনেক শুনিয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর যত্ন করিয়া তাঁহাকে পুত্রের অভিভাবক নিযুক্ত করাইলেন। সাহেব উপযুক্ত ম্যানেজার রাখিয়া বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেন।

পদচ্যুত করিয়া সাহেব বামাচরণকে একেবারে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার হাতের লেখা দেখিলে, কি কোনও একটা স্মৃতি-চিহ্ন দেখিলে, দয়া ও ক্ষোভের সঙ্গে বামাচরণের মূর্ত্তি, তাঁহার মনে জাগিয়া উঠে। একা আফিস ঘরে বসিয়া, একদিন বামাচরণের হাতের লেখা দেখিয়া, সাহেব তাঁহারই কথা ভাবিতেছেন, বামাচরণ ধীরে ধীরে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন। সাহেব চমকিয়া উঠিলেন ও স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। বামাচরণের সে বর্ণ নাই, মুখে কালী পড়িয়াছে, চোখের কোণে আরও কালী, শরীর শীর্ণ। উদারচেতা, দয়াদ্র-

হৃদয় সাহেবের বড় দুঃখ হইল। ঈষৎ করুণার স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বামাচরণ। কি প্রয়োজন? তোমার জানা উচিত, তোমার জন্য যাহা করিবার, করিয়াছিলাম। পূর্ব্ব কথা তুলিয়া, তোমাকে আমি তিরস্কার করিতে বা দুঃখ দিতে চাহি না। তোমাকে চাকুরি দিতে আমি অক্ষম, কিন্তু যদি তোমার বড় কষ্ট হইয়া থাকে, বল, আমি সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

অতি বিনীত স্বরে বামাচরণ উত্তর করিলেন—"সাহেব। আপনার মুখে যে দয়ার কথা শুনিলাম, ইহাই আমার যথেষ্ট। আমি অর্থ প্রত্যাশায় আসি নাই; আপনাকে মনিব বলিয়া কখন মনে করি নাই, পিতৃতুল্য জ্ঞান করিতাম, এখনও তাই করি।" রোদনে বামাচরণের স্বর রুদ্ধ হইল, আর কথা কহিতে পারিলেন না। নিরবে কাঁদিতে লাগিলেন। করুণাকম্পিত কণ্ঠে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথাও কি চাকুরি করিতেছ?"

বামাচরণ।—"সাহেব, সুনাম গিয়েছে, চাকুরি আর আমায় কে দেবে?"

সাহেব।—"এখন কি প্রয়োজনে আসিয়াছ?"

বামাচরণ।—"সাহেব। আপনি মৃত মৃত্যুঞ্জয় বাবুর নাবালক পুত্রের অভিভাবক হইয়াছেন, আমার বেনামীতে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে মৃত্যুঞ্জয় বাবুর দশ হাজার টাকা জমা আছে।"

সাহেব, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, বলিলেন—"সে টাকার কথা ত আমি কিছুই শুনি নাই।"

বামাচরণ।—"সে টাকার কথা কেহই অবগত নয়। মৃত্যুঞ্জয় বাবু জানিতেন আর আমি জানি। কেন যে তিনি আমার নামে বেনামী করিয়া টাকা রাখিয়াছিলেন, জানি না। আছে—এই মাত্র জানি। আমি ক্ষমতা-পত্র দিতে আসিয়াছি, আপনি সে টাকা তুলিয়া লইবার বন্দোবস্ত করুন।"

সাহেব বিস্মিত-নেত্রে বামাচরণকে দেখিতে লাগিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন—"এই বিশ্বাসঘাতক। এই চোর!! আমি দারুণ অন্যায় করিয়াছি, নির্দ্দোষীকে দণ্ড দিয়াছি!"

বামাচরণ, বেনামী স্বীকার করিয়া, সাহেবকে নাবালকের পক্ষে টাকা তুলিয়া লইবার ক্ষমতা-পত্র লিখিয়া দিলেন। অতি কোমল স্বরে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"বামাচরণ! বলিলে, তুমি আমাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান কর, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, আমায় সত্য বলিবে? এখন সত্য বলিতে তোমার কোন ক্ষতি নাই কোন ভয়ও নাই।

বামাচরণ।—"সাহেব ভয়ের কথা কেন বলিতেছেন? আপনি অনায়াসে আমাকে পুলিশে দিতে পারিতেন—দেন নাই—আমি প্রকৃত সত্য বলিব। কিন্তু বিশ্বাস করিবে কে?"

সাহেব।—"সেই হাজার টাকা কি তুমি লইয়াছিলে?"

বামাচরণ।—"না।"

স্থির প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ সাহেব বসিয়া রহিলেন; বামাচরণ, সেলাম করিয়া, চলিয়া গেল। সাহেব মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন—এ রহস্য ভেদ করিব।

রঘুনাথের উপর তাঁহার ঘোর সন্দেহ জন্মিল। দৈবাৎ একদিন দেখিলেন—রঘুনাথ, নির্জ্জনে এক মনে বসিয়া, বড়সাহেবের নাম জাল করিতে অভ্যাস করিতেছে। সাহেবের সন্দেহ দৃঢ় হইল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া, হিসাব দেখিতে আরম্ভ করিলেন।

একদিন রঘুনাথকে ডাকিয়া বলিলেন—"রঘুনাথ! দিলিপ চাঁদের সেই গচ্ছিত নোট পাওয়া গিয়াছে।"

রঘুনাথ ভাবিল—সাহেবের কি ভুল হইয়াছে। সে নোটের জন্ম ত রঘুনাথের মস্তিস্কের ভিতর, তাহা সূর্য্যের আলো কখন দেখে নাই। কৃত্রিম আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া, বলিল—"সাহেব। সে নোট যদি পাওয়া গিয়া থাকে, সে আপনার নিতান্ত পুণ্যবলে। কোথায় পাওয়া গেল? কিরূপে?"

বড় সাহেব, সে কথার উত্তর না দিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন—"দিলিপ চাঁদের গচ্ছিত নোটের নম্বর তোমার মনে আছে?"

রঘু।—"না, সাহেব।"

সাহেব।—"দেখ দিকি।"

রঘুনাথ দেখিল—'ইউ, এ, ৭২। ৬৮৩৮৯।'

বড় সাহেব রঘুনাথের হস্তে একখানি নোট দিলেন। সহসা তাহার মস্তক ঘুরিয়া গেল! রঘুনাথ দেখিল—তাহারই প্রদত্ত সেই জামিনের নোট। রঘুনাথ উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিল—"এ জাল, জাল।"

যিনি যাহাই বলুন, ঘটনা সত্য। কখন কখন মনের অজ্ঞাতসারে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হইয়া থাকে (Unconscious Cerebration)। রঘুনাথের অজ্ঞাতসারে তাহার মস্তিষ্ক হাজারী মাড়োয়ারীর নোটের নম্বর পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। নতুবা ক্যাস্ বহিতে কাল্পনিক নম্বর লিখিবার সময়, তাহার মানসপটে, ঐ নম্বর খানকা উদিত হইল কেন? যাহা হউক, সে জটিল তত্ত্বের

আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই; সোজাসুজি—ইহা ধর্ম্মের কল। কলের পুতুল যাহা করে, তাহা সে জানে না। রঘুনাথও জানিত না যে, কাল্পনিক ভাবিয়া, সে সত্য নম্বর লিখিতেছে। তারপর হাজারীর নোট তাহার হাতে আসে! দৈবাধীন!—তখনও সে জানে না যে, ঐ নোটই তাহাকে একদিন নিজের ফাঁদে ফেলিবে। দৈব, যেরূপ ঘটনার সূচনা করেন, সমাপ্তিও তদনুযায়ী হয়। জুয়ায় জিতিয়া হাজারীর নোট রঘুনাথের করগত না হইলে, ঘটনার গতি ভিন্নরূপ হইত—সন্দেহ নাই। কিন্তু যেরূপ ঘটিয়াছিল, আমরা সেইরূপ লিখিলাম।

বড়সাহেব গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কা'র জাল। তোমার না আমার?"

চলিলেই চল্লিশ বুদ্ধি, না চলিলেই হতবুদ্ধি। হতবুদ্ধি হইয়া, রঘুনাথ নীরবে বসিয়া রহিল। একবার ভাবিল—'একটা কিছু মিথ্যা উত্তর দিই।' আবার ভাবিল—'না, অনুসন্ধানে সত্য প্রকাশ হইবেই হইবে।' নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিল।

বড়সাহেব ইতিপূর্ব্বে রামাচরণের নিকট পত্র ও গাড়ী পাঠাইয়াছিলেন। অবিলম্বে তিনি আসিলেন।

বড়সাহেব, আফিসের সর্ব্বজন-সমক্ষে, সমস্ত বিবরণ বলিলেন। রামাচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'রঘুনাথ সম্বন্ধে কি করিতে বল?"

রামা।—"সাহেব। জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত হওয়াই ইহার যথার্থ দণ্ড। রঘুনাথের প্রথম অপরাধ ক্ষমা করিয়া, চরিত্র সংশোধনের সুযোগ দিব।

রঘুনাথ প্রস্থান করিল। রামাচরণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরবে পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

জন্‌সন্ বলিল—"মাষ্টার নোবল্ সার। পৃথিবীর ভিতর বিস্তর বোকা আছে—তাদের শ্রেষ্ঠ রঘুনাথ, বিস্তর ভাগ্যবান্ আছে—তাদের শ্রেষ্ঠ রামাচরণ, বিস্তর মহৎ-লোক আছে—তাদের শ্রেষ্ঠ আপনি, মাষ্টার নোবল্ সার।"

রামাচরণের প্রতিবাসিগণ বলাবলি করিতে লাগিল—'হবে না। নির্দ্দোষীর নামে কলঙ্ক!! ধর্ম্মের কাছে সূক্ষ্ম বিচার, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সমাপ্ত।

দেশহিতৈষণা।

শ্রীবিপিন বিহারী গঙ্গোপাধ্যায়।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

অটল অধ্যবসায়গুণে তুমি পণ্ডিত হইয়াছ, পাণ্ডিত্যগুণে সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিবার প্রবল ইচ্ছা তোমার হৃদয়ে বর্ত্তমান, তোমার কথা সকলে শুনিবে —এই দারুণ ইচ্ছা তোমার হৃদয়কে উত্তেজিত করিতেছে কিন্তু বিদ্যাহীন তোমার কৃপায় বিজ্ঞ হইবে,—এ সাধ কখনও কর নাই, অথচ স্বদেশহিতৈষী বলিয়া তোমার স্পর্দ্ধা আছে! সৌভাগ্যবলে অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছ, ধন-মদে সমাজের নেতৃত্ব করিবার সাধ, তোমার আজ্ঞাধীন কেন সকলে নয়—এই বিষম পীড়াগ্রস্থ, কিন্তু বোঝ নাই যে, তোমার অর্থে দুঃখীর অভাব মোচন হয় না, বহু সংকর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া পিতৃপিতামহগণের আশীর্ব্বাদ লাভ কর নাই, আর্ত্তের আশ্রয়-দাতা নও, প্রজাপালক নও, গরীবের পিতামাতার স্থল অধিকার কর নাই, অথচ স্বদেশহিতৈষী বলিয়া গণ্য হবার—তোমার প্রবল চেষ্টা দেখা যায়! তুমি বাগ্মী, বক্তৃতায় ভগবদ্ভক্তি উদ্দীপিত নয়, পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরব-গাথা সর্ব্বদা স্মরণ-পথে আনীত নয়, হিন্দুর কর্ত্তব্য, হিন্দুর আদর্শ বোঝান তোমার বক্তৃতার মর্ম্ম নহে, পশুবৃত্তিপরায়ণ মানবকে সুপথে চালিত করিয়া দেবহৃদয়ে পরি-ণত করিবার জন্য তোমার জীবনব্যাপী সংগ্রাম নহে, অথচ তুমি স্বদেশহিতৈষীর ভাণ কর। তাই বলিতেছিলাম, স্বদেশহিতৈষী আমাদের স্বদেশী সামগ্রী নহে, নচেৎ এত বীভৎস ব্যাপার নয়ন গোচর হইত না। ইহা ইংরাজী Patrio-tismএর খাঁটী বঙ্গানুবাদ মাত্র। যেমন ইংরাজী খোলস পরিয়া ও গোটাকতক ইংরাজী বুলি আওড়াইয়া সাহেব হইবার সাধ আপনার ঘরে মিঠাইতে হয়, বাহিরে আসিলে কেবলমাত্র অপদস্থ হওয়া অদৃষ্টে লেখা থাকে, তেমনি ইংরাজী অনুকরণে স্বদেশহিতৈষী সাজিয়া দেশোদ্ধার করিব—এই উন্মাদ কল্পনা মনে মনে জল্পনা করাই ভাল, প্রকাশ করিলে কেবল বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়।

উদ্যমশীল যুবক এইস্থানে জিজ্ঞাসা করিবে—তবে আমাদের উপায় কি; স্বদেশহিতৈষী হওয়া যদি আমাদের ভবিষ্যৎ আদর্শ নহে, তাহা হইলে দেশের উন্নতি করিব কি করিয়া? আমরা কি এইরূপ ঘৃণিত জাতি চিরকাল থাকিব? জন্ম-ভূমির অঙ্গ উজ্জ্বল করিয়া ধরাবক্ষে বিচরণ করিবার সাধ, কি আমরা ত্যাগ করিব? আমাদের তরে উঠিবার উপায় কি? কে আমাদের উঠিবার উপায় দেখাইয়া

দিবে? গুরুজ্ঞানে কাহার কথা মূলমন্ত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়া উন্নত হইবার চেষ্টা পাইব? তদুত্তরে আমার প্রথম বক্তব্য এই—'আমরা' কাহারা? দেশের কথা কহিতে হইলেই সকলেই "আমরা" কথাটী ব্যবহার করিয়া থাকি এবং সেইজন্য আড়ম্বরের বেশ সুবিধাও হইয়া থাকে। এক্ষণে দেখা যাউক, 'আমরা' কাহারা? আমি ত ইহার সদুত্তর দিতে পারগ নহি. বিশেষ চিন্তা করিয়া আমি ইহার মর্ম্মোদ্ধার করিতে পারি নাই। এই 'আমরা' কাহারা? কাহার জন্য আমরা স্বদেশহিতৈষী হইতে বসিয়াছি? কাহার অভাব মোচনের জন্য আমাদের দেশে স্বদেশহিতৈষিতারূপ প্রবল বায়ু আসিয়া সকলকে আন্দোলিত করিয়াছে? স্বদেশহিতৈষিতা আকাশকুসুম নহে। কাহার দেশ এবং কাহার জন্য—এটী বেশ করিয়া আমাদের বুঝিতে হইবে। কার্য্যক্ষেত্র দেখিয়া যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে এই বুঝিয়াছি যে, আমরা আমাদেরই স্বার্থের জন্য স্বদেশহিতৈষী নাম ধারণ করিয়াছি। ইহা কি সত্য নহে যে, আমাদের অভাব, অভিযোগ, মর্ম্মপীড়া, সমস্তই শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ে আবদ্ধ? ইহা কি সত্য নহে যে, যখনই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উন্নতির পথে বাধা উপস্থিত, তখনই স্বদেশহিতৈষিতা বেশ করিয়া ফুটিয়া উঠে? ইহা কি সত্য নহে, যখনই ধনী সম্প্রদায়ের অর্থহানি হইবার সম্ভাবনা, তখনই তিনিও একবার স্বদেশহিতৈষীর দলে আসিয়া বাহার দেন? ইহা যদি সত্য হয় যে, আমাদের ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত সুবিধা অসুবিধা লইয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে আস্ফালন করিয়া থাকি; ইহা যদি সত্য হয় যে, আমাদের অর্থাৎ ভদ্র ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য আমরা প্রাণপণ করিতেছি এবং সেই কার্য্যে বাধা পাইলে দেশের লোক জড় করিয়া ও দেশের কাজের ধুয়া ধরিয়া উন্মত্তের ন্যায় সকলকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে বলিব যে, আমরা মানুষের চোকে ধূলা দিতে কৃতকার্য্য হইয়াছি, কিন্তু ঈশ্বরকে ঠকাইতে পারি নাই। আমরা এতই হীন স্বার্থে পরিচালিত যে, দেশের প্রকৃত অবস্থা দেখিবার অবকাশ পর্য্যন্ত আমাদের নাই। কত শত শতাব্দী ধরিয়া ভীষণ দুঃখরাশি ভারতের জনসাধারণের জীবনসঙ্গী হইয়াছে এবং তাহারই ফলে গভীর অন্ধকার আসিয়া ভারত গগন আচ্ছন্ন করিয়া, ভারতবাসীর জীবন অন্ধকারময় করিয়া তুলিয়াছে,—এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া কাহার প্রাণ জীবনের সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছে? লক্ষ লক্ষ লোক, একমুষ্টি অন্নের জন্য হা হা করিয়া, শৃগাল কুকুরের অধম হইয়া জীবনভার বহন করিতেছে, এই দৃশ্য নয়নগোচর করিয়া সুখসেব্য অন্নব্যঞ্জন মুখে তুলিবার সময় কাহার নয়ন বারিধারায় আপ্লুত হইতেছে? সভ্যতার মাতৃ-

ভূমি ভারতবর্ষে আজ যে কোটি কোটি ভারতবাসী অশিক্ষিত থাকিয়া পশুর ন্যায় অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া সমস্ত সভ্য জগতের ঘৃণার কারণ হইয়াছে, এ চিন্তায় কে উন্মাদ হইতে বসিয়াছে? না, কেহই না; ভারতের পতিতের, ভারতের দরিদ্রের, ভারতের মূর্খের—কেহই নাই, কেহই নাই। তাহার বন্ধু নাই, তাহার আশ্রয়-দাতা নাই, তাহার জন্য এক বিন্দু অশ্রুজল ফেলে, এমন কেহ নাই। যে মরিতেছে, সে মরুক, যে মূর্খ আছে, সে তাহাই থাকুক, ভারবাহী পশুর ন্যায় জীবন ধারণ করুক, তাহাতে আমার কি? আমরা, আমাদের (অর্থাৎ শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ের) উন্নতি চাই, উচ্চ পদস্থ হইতে চাই, অর্থোপার্জ্জনের নূতন নূতন পথ আবিষ্কার করিতে চাই। কিন্তু হয়ত মৃত্যু পর্য্যন্ত বলিতে ছাড়িব না যে, আমরা দেশহিতৈষিতার জন্য প্রাণপণ করিতেছি। এ বিষয় যতই ভাবা যায়, ততই মনুষ্য-জন্মে ধিক্কার জন্মে। মনে হয়, পশু-জন্ম হইলে অন্ততঃ এই কপটতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ হইত। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে আসিয়া Patriotism সম্বন্ধে আমাদের যে ভর্ৎসনা বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত—

"লোকে স্বদেশহিতৈষিতার কথা বলিয়া থাকে। আমিও স্বদেশহিতৈষিতায় বিশ্বাসী। স্বদেশহিতৈষিতা সম্বন্ধে আমারও একটী আদর্শ আছে। মহৎকার্য্য করিতে হইলে তিনটী জিনিষের আবশ্যক হয়। প্রথমতঃ, হৃদয়বত্তা, আন্তরিকতা আবশ্যক। বুদ্ধি, বিচারশক্তি আমাদিগকে কতটুকু সাহায্য করিতে পারে? উহারা আমাদিগকে কয়েকপদ অগ্রসর করে মাত্র, কিন্তু হৃদয়দ্বার দিয়াই মহাশক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে,—জগতের সকল রহস্যই প্রেমিকের নিকট উন্মুক্ত। হে ভাবী সংস্কারকগণ, হে ভাবী স্বদেশ-হিতৈষিগণ! তোমারা হৃদয়বান্ হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধরগণ পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ যে, কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে এবং কোটি কোটি ব্যক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অর্দ্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগণকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে?

এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের দুর্দ্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নাম যশ, স্ত্রীপুত্র বিষয়সম্পত্তি, এমন কি, শরীর পর্য্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের একপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও তোমরা প্রথম সোপানে স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ।”

—ভারতে বিবেকানন্দ।

বহুদিন পূর্ব্বে তিরস্কার ছলে, স্বামীজি, আমাদের উপদেশ এই দিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা সে কথায় কর্ণপাত করি নাই। কেনই বা করিব? আমরা ত দেশের কল্যাণ চাহি না। স্বামীজি যে যন্ত্রণা মাথায় লইয়া বেড়াইয়াছিলেন, আমরা সে যন্ত্রণাকে কাছে আসিতেও দিই না। এই স্বার্থপরতার পরিণাম কি, বিধাতাই জানেন। গভীর দুঃখসাগরে যে আমাদের ডুবিতে হইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? দয়াময় জগদীশ্বর আমাদের মার্জ্জনা করুন। তাঁহার কৃপা ব্যতীত আমাদের বিদেশী মোহ কাটিবে বলিয়া বোধ হয় না। শৈশবে মাতৃ অঙ্কে শুইয়া শুনিয়াছিলাম, কে একজন দীনবন্ধু আছে, বিপদে পড়িলে যে দীনবন্ধুকে ডাকে, দীনবন্ধু তাহাকে রক্ষা করেন। সংসার-তরঙ্গে পড়িয়া সে শিক্ষা ভুলিয়াছি, পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদিগকে সে শিক্ষা ভুলাইয়াছে। বাল্যকালে পুরাণে শুনিয়াছিলাম যে, যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন সাধুর পরিত্রাণের জন্য ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য ভগবান পৃথিবীতে আগমন করেন। স্বার্থপর পাশ্চাত্য শিক্ষা সে শিক্ষাকেও হৃদয়ে স্থান পাইতে দেয় নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য আদর্শ, পাশ্চাত্য ভাব, আমাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আমরা স্বদেশী হইয়াছি বলিয়া অহঙ্কার করি, কিন্তু মোহ আমাদিগকে বুঝিতে দেয় নাই যে, ইহাও পাশ্চাত্য স্বদেশী। স্বদেশী আদর্শ, স্বদেশী শিক্ষা, স্বদেশী কার্য্যানুষ্ঠান হইতে বহুদূরে পড়িয়া রহিয়াছি। আমরা প্রকৃত পাশ্চাত্যের চেলা, স্বদেশী গুরুর আজ্ঞাবাহী হইবার প্রবৃত্তি আমাদের এখনও হয় নাই। যে পাশ্চাত্য জাতির নিকট হইতে বর্ত্তমান দেশহিতৈষণা শিখিয়া, আদর্শজ্ঞানে জীবন উৎসর্গ করিতেছি, স্বামীজি সেই পাশ্চাত্য জাতি সকলের ভিতরেই সেই আদর্শ কতদূর কার্য্যকরী হইয়াছে, তাহার রহস্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমাদের চোক্ খুলিবে কি? স্বামীজি বলিয়াছেন—

"রাজনীতির নামে যে চোরের দল, দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউ-রোপী দেশে খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে, সে দল আমাদের দেশে নাই! সে ঘুষের ধূম, সে দিনে ডাকাতি, যা পাশ্চাত্য দেশে হয়, রামচন্দ্র! যদি ভেতরের কথা দেখতে, ত মানুষের উপর হতাশ হয়ে যেতে। 'গোরস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠ্ বিকা। সতীকে না মিলে ধুতি, কস্‌বিন পেহনে খাসা।' যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মুটোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠ্‌ছে, শুষ্‌ছে, তার পর সেপাই করে দেশদেশান্তরে মর্‌তে পাঠাচ্ছে,—জিত হলে, তাঁদের ঘর ভরে ধনধান্য আস্‌বে, আর প্রজাগুলো ত সেই খানেই মারা গেল,—হে রাম! চম্‌কে যেও না, ভাঁওতায় ভুল না।"

——প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলে তাহাদের দেশের এই অবস্থা। ইহাদের অনুকরণ করিতে গেলে আমরা যে কিম্ভূত কিমাকার জাতিতে পরিণত হইব—ইহাতে কি সন্দেহ আছে? বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে, আমরা 'দেশ, দেশ' করিয়া কতই না আন্দোলন করিতেছি কিন্তু দেশটা একবার ভাল করিয়া দেখিলাম না। আমার দেশে কি ছিল, কি হয়, কি হইবে, এ বিষয় একবার ভাবিলাম না। কেমন করিয়া পাশ্চাত্য জাতির মত হইব—এই ভাবনায় বাতুল হইতে বসিয়াছি। তাই সকল সময়েই আদর্শ ধরিবার জন্য, কখন Italy, কখন England, কখন Ireland প্রভৃতি দেশ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে যাই। কিন্তু যদি একবার দেশের আদর্শের প্রতি দেখিতে চেষ্টা পাইতাম, তাহা হইলে বুঝিতেবিলম্ব হইত না যে, এ সকল পাশ্চাত্য জাতির আদর্শ, আমাদের আদর্শের নিকট অতি হীন, অতি মলিন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের দেশে দেশহিতৈষণা বলিয়া কোন কথা নাই। লোকের উপকার করিব, এ অহঙ্কার, অনার্য্যভাবাপন্ন। হিন্দুর বিশ্বাস—ভারতবর্ষ শ্রীভগবানের বিশেষ লীলাক্ষেত্র। প্রভুর লীলা ভারতবর্ষ বারবার দেখিয়াছে ও দেখিবে। অন্যান্য দেশ সে ভাগ্যে বঞ্চিত। প্রয়োজন বশে শ্রীভগবান এদেশে নানা বেশে আগমন করেন। তিনিই আমাদের কর্ণধার। তাঁহার একটী নাম দীননাথ। তিনিই বারবার নানা বিপদপাত হইতে কখন সন্ন্যাসী বেশে, কখন বা রণবেশে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। সন্ধি-স্থল উপস্থিত হইলে দীননাথ কখনও স্থির থাকিতে পারেন না। বারবার তাঁর আগমনে ভারতবাসীর এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে, এ বিশ্বাসহারা আমরা কখন যেন না হই। 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' যখন দীননাথ মানবশরীর ধারণ

করিয়া আগমন করেন, মহাপুরুষ, সাধু, সন্ন্যাসী প্রভৃতি দেবদেহধারী মানবগণ তাঁহার আজ্ঞাবাহী ভৃত্য হইয়া কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপ দেন। ইঁহাদেরই কার্য্য-কলাপ ভারতবর্ষকে মহিমামণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। বিদেশী ভাবাপন্ন দেশ-হিতৈষির ধারণা—'অবতার যদি আগমন করেন ত ধর্ম্ম রক্ষার জন্যই আগমন করেন, সাধু ভক্তেরা ধর্ম্ম কর্ম্ম লইয়া থাকেন, পার্থিব কার্য্যকলাপের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক কি? পার্থিব বিষয়ে আমরা যাহা ভাল বুঝিয়াছি, তাহাই করিব।' তাঁহারা মনে করেন, ধর্ম্ম একটা গাছের ফলবিশেষ। মহাপুরুষগণ সেই ফল লইয়া থাকেন। যাহাদের সেই ফল খাইবার বাসনা, তাহারা তাঁহাদের কাছে যাক্। আমরা কিন্তু ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়াছি যে, তিনি আমাদের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধন করেন। কল্যাণ—ঐহিক, পারত্রিক। কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার ন্যায় কর্ম্মী এ পর্য্যন্ত জগতে কেহ হয় নাই। দ্বাপরে যখন ক্ষত্রিয়কুল অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল, প্রজাকুল তাহাদের তাড়নায় আকুল হইয়াছিল, ভারতের সর্ব্বত্রই অশান্তি, সেই সময়েই পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের আগমন। তিনি প্রবল কর্ম্মসমুদ্রে আজীবন ভাসিয়াছেন। একমাত্র লক্ষ্য, কিসে ভারতে শান্তি স্থাপন হয়, দীন প্রজা সুখে থাকে। যখন সকল উপায় ব্যর্থ হইল, তখন দেখিলেন যে, সমস্ত ক্ষত্রিয়-কুল ধ্বংস না হইয়া গেলে, আর মঙ্গল নাই। তাই কুরুক্ষেত্রে মহাসমরের আয়োজন। সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসাইলেন; ভারতে শান্তি স্থাপন হইল। শেষে নিজ বংশ পর্য্যন্ত নির্ম্মূল করিলেন, পাছে, তাহা যুধিষ্ঠিরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। তাঁহার নিজ স্বার্থ কিছুই নাই। সমস্তই তিনি করিতেছেন, তিনিই সকল কার্য্যের নেতা, অথচ তিনি কিছুই চাহেন না। কেবল দীন প্রজার কল্যাণ দেখিতেছেন। ইহাই আমাদের আদর্শ। পবিত্রাতা ও ভগবান্ বলিয়া ভারতবাসী আজও সেজন্য শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতেছে। ইহা জানিয়াও কি বলিব যে, আমাদের পার্থিব বিপ্লব হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ আগমন করেন না? ধন্য স্বদেশী কবি। যিনি, সেই পরম পুরুষের উজ্জ্বল ছবি, নিম্নলিখিত ভাষায় আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রে মহাসমর আয়োজনের সময় শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন:—

জাননা—জাননা, কৃশোদরি,
যে অনলে জ্বলে প্রাণ মম;
তাই কহ
ব্যথা দিতে করি কথা আলোচনা।

সবলে, জান না—
দিন দিন পলে পলে কত সহি!
উন্মত্ত প্রভাবে দুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়দল
নিত্য নিত্য করে বল পরস্পরে,—

দীন প্রজা বিকল বিগ্রহে,
কার' শস্য দহে শরানলে,
কার' গৃহ চুর রথ-সঞ্চালনে,
কষ্টার্জ্জিত ধন নিত্য দেয বণব্যয়ে,
জায়া পুত্র অন্নবিনা মরে,
সন্তানে না পাঠাইলে রণে,
নৃপ-কোপে সর্ব্বনাশ তার;
বলাৎকার—সুন্দরী দেখিলে,—
প্রমাণ বুঝহ জযদ্রথ-আচরণে।
হীনবল দীন স্বামী, পিতা কি করিবে?
রক্ষক ভক্ষক,—
নীরবে দারুণ জ্বালা সহে,
কারে নাহি কহে,
উষ্ণশ্বাস সমীরণ বহে,
সে তাপে হৃদয় দহে মোর।
দীন আমি, দীন সহ সম-ব্যথা মম,—
বদ্ধ কারাগারে,
দীন পিতা জননী আমার,
বেদনা ব্যথিতা,
তবু সন্তান কামনা
নাহি করে অভাগিনী।
জাগিছে প্রহরী,
পুত্রে ধরি তখনি বধিবে
যমদূত নৃশংস কংসের দাস—
আশাশূণ্য কারাগার দ্বারে,
কারাগার জন্মস্থান মম;
ঘোরতর বারি বরিষণ,
অশনি নিঃস্বন,
ঘোরবাত স্বনস্বনী প্রলয় দুর্য্যোগ,
কংসচর অসংশয়ে নিদ্রাগত যাহে,
দীনের নন্দন,
দীন ক্ষীণ কোলে আসিনু যমুনা পার
দীন বৃন্দাবনে
দেখিলাম দীনহীনগণে,
দীন নন্দ, দীন মা যশোদা,
দীন বাল্যসখা, দীনা সহচরীগণে,
দীন গোপাল বালক,—
বুঝিযাছি দীনের বেদনা।
শুন গতি, জ্বালিব অনল,
দুরন্ত ক্ষত্রিয় দল বল
জ্বালাইব সে আগুনে,
ধর্ম্মরাজ্য করিব স্থাপনা,—
তুমি সখী, পার্থ সখা, সে কার্য্যে আমার।
পঞ্চজনে একই বন্ধনে
বাঁধিতে জনম তব,
উৎসবে, ব্যসনে,
তিল মাত্র না হও বিস্মৃত,
বীরাঙ্গনা,—
পঞ্চজনে উত্তেজনা ভার তব।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষ মোচন কার্য্য।

পুরী ও মুর্শিদাবাদ জিলার কার্য্য বন্ধ করা হইতেছে, সেইজন্য রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানাইতেছেন যে, দুর্ভিক্ষ মোচন ফণ্ডে আর কাহারও অর্থাদি সাহায্য পাঠাইবার আবশ্যক নাই।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে প্রাপ্তি স্বীকার।

আশ্বিনের উদ্বোধনে স্বীকৃত	১৩১১১ ৸৶৯ পাই
চারু চন্দ্র ঘোষ	৫৲
কেদার নাথ ঘোষ	৫৲
শ্রীমাধব চট্টোপাধ্যায়	৫৲
যদু নাথ ঘোষের স্ত্রী	৫৲
ভারত সঙ্গীত সমাজ	১০৲
গোপাল চন্দ্র দাস	৪৶০
তারা নাথ দাস	২৲
মাঃ অমৃত লাল দত্ত	৪।৶৩
পূর্ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	২৲
মাঃ বিশ্বেশ্বর সেন	৩৲
শিবাজী সমিতি, কলিকাতা	১৶৬
যুবক মণ্ডলী	৫৲
ক্ষুদ্র সংগ্রহ	২।০
যুবক মণ্ডলী, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট	৬৸৶০
বেলুড় মঠে দুর্ভিক্ষ বাক্স হইতে প্রাপ্ত	১৶০
জে ভট্টাচার্য্য	২৲
গৌরাঙ্গ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৮৲
বি, বসু দেব বর্ম্মন্	১০৲
মিস্ কে গ্রেগরি, দার্জ্জিলিঙ্গ	৫০০৲
হিরানন্দ টি লাহা	৫৲
শ্রাবনী উপবীত সংস্কার	১১৲
রাজকুমারী শ্রীমতী কৃষ্ণরমণী দাসী, শোভাবাজার রাজবাটী	১০৪৲
শ্রীমতী সৌদামিনী দাসী	২৲
সম্পাদক, ফেমিন ফণ্ড	
ইডেন্ হিন্দু হোষ্টেল	১০৲
কুমুদ বন্ধু গুহ	১০৲
টি এন্ কুমারস্বামী পিলে	২৪।০
সুধির কে দেব সরকার	১২॥০
সি, আকমু খাঁ	১১॥০
হরি চরণ দাস	১৲
রজনী কান্ত দাস	১৲
অমৃত লাল দত্ত	২।৴০
শিতল দাস রায়	৩৲
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণাশ্রিত যুবকগণ কর্ত্তৃক ঢাকা জন্মাষ্টমি উপলক্ষে সংগৃহিত	৪৫৲
চাউল বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত	৫৮৸৶৬
মেহেলটা সেবক সমিতি	৫৲
পূর্ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	২৲
অজ্ঞাত	৫৲
উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়	১০৲
মোক্ষদা দেবী	১৲
হরি পদ ভড়	১০৲
মাঃ নিতাই চাঁদ দত্ত	৫।/৬
শ্রীশ চন্দ্র মতিলাল	১৲
রণেন্দ্র কৃষ্ণ নাগ	৫৲
প্রেমানন্দ দাস গুপ্ত, বরিশাল	১৫৲
শান্তিরাম ঘোষ	৩০৲
হিতসাধিনি সমিতি, ধলঘাট	১১৲
বাঁকুড়া বান্ধব সমিতি	১৬৸/০
এ, জে, আলনবাচ	২০৲
দূর্গা প্রসাদ পাল	২৲
জবব চন্দ্র মিশ্র	১৲
নিত্যানন্দ দাস	১৲
পঞ্চানন দত্ত	১৲
শ্রীধর পাট্টনায়ক	১৲
নারায়ণ চন্দ্র মিত্র	১৲
অম্বিকা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
কুসুম কুমার	১৲
গোপী নাথ দাস	১৲
রাধা কৃষ্ণ মহান্তি	১৲
বিপিন বিহারী রায়	১৲
অচ্যুতানন্দ মহান্তি	১৲
গোকুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৲
শ্রীমতী নির্ম্মলিনি বসু	১৲
শ্রীমতী উর্ম্মিলা সুন্দরী সরকার	৬।০
মোট—	১৪১৫৪৸৶৬ পাই

আমরা ধন্যবাদের সহিত মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোংর নিকট হইতে পুরী জিলার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে ৬ বোতল এডওয়ার্ডস্ টনিক প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

ভাষ্যানুবাদ। যদি বল, "আমরা ইহা বলিতে চাহি না যে, প্রাগভাব ভাব-রূপে উৎপন্ন হয়," তাহাও ঠিক নহে, কারণ, তাহা হইলে তোমাদিগকে অঙ্গীকার করিতে হয় যে, ভাবেরই ভাবাপত্তি (অর্থাৎ যাহা সিদ্ধ আছে, তাহারই উৎপত্তি) হয়, যেমন ঘটের ঘটাপত্তি বা পটের পটাপত্তি, ইহাও অভাবের ভাবাপত্তির ন্যায়ই প্রমাণ-বিরুদ্ধ। সাঙ্খ্যগণেরও যে পরিণামপক্ষ, তাহাও বৈশেষিকগণের অঙ্গীকৃত পক্ষ হইতে (বড় একটা) পৃথক্ হইতেছে না, কারণ, সাংখ্য মতে অপূর্ব্ব ধর্ম্মের উৎপত্তি এবং বিনাশ অঙ্গীকার করিতে হয় (বৈশেষিকগণের মতেও অপূর্ব্ব ধর্ম্মীর উৎপত্তি ও বিনাশ অঙ্গীকার করিতে হয়, সুতরাং উভয়মতেই অসতের উৎপত্তি মানিতে হয়)। অভিব্যক্তি এবং তিরোভাব রূপ দুইটী ধর্ম্মের বিদ্যমানতা আছে কি না তাহা নিরূপণ করিতে হইলে পূর্ব্বের ন্যায়ই প্রমাণবিরোধ হয়। এই প্রকার যুক্তির দ্বারা—"কারণেরই সংস্থান বা অবস্থাবিশেষ কার্য্য" এই মতটীও নিরাকৃত হইতেছে।

ভাষ্য। পারিশেষ্যাৎ সদেকমেব বস্তু অবিদ্যয়া উৎপত্তিবিনাশাদিধর্ম্মৈঃ নটবদনেকধা বিকল্প্যতে ইতি ইদং ভাগবতং মতমুক্তং নাসতো বিদ্যতে ভাব ইত্যস্মিন শ্লোকে। সংপ্রত্যয়স্যাব্যভিচারাদ্ ব্যভিচারাচ্চেতরেষাং ইতি। কথং তর্হি আত্মনোঽবিক্রিয়স্য অশেষতঃ কর্ম্মণস্ত্যাগোনোপপদ্যতে ইতি, যদি বস্তুভূতা গুণা যদি বা অবিদ্যাকল্পিতাস্তদ্ধর্ম্ম কর্ম্ম তদা আত্মনি অবিদ্যাধ্যারোপিতমেব ইত্যবিদ্বান ন চি কশ্চিৎ ক্ষণমপি অশেষতঃ ত্যক্তুং শক্নোতি ইত্যুক্তং। বিদ্বাংস্ত পুন বিদ্যয়া অবিদ্যায়াং নিবৃত্তায়াং শক্নোত্যেব অশেষতঃ কর্ম্ম পরিত্যক্তুং, অবিদ্যাধ্যারোপিতস্য শেষানুপপত্তেঃ। ন হি তৈমিরিকদৃষ্ট্যা অধ্যারোপিতস্য দ্বিচন্দ্রাদেস্তিমিরাপগমে শেষোঽবতিষ্ঠতে। এবঞ্চ সতি ইদং বচনং উপপন্নং "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসেত্যাদি" "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।" "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানব" ইতি চ। ৪৮।

ভাষ্যানুবাদ। পরিশেষে স্থির হইতেছে যে, সদ্বস্তু সর্ব্বদা এক এবং একরূপ, উহা এক হইয়াও নটের ন্যায় অবিদ্যাবশতঃ উৎপত্তি ও বিনাশ প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহের দ্বারা নানা প্রকারে বিকল্পিত হইয়া থাকে, ইহাই ভগবানের মত এবং ইহাই "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" ইত্যাদি শ্লোকে প্রকটিত হইয়াছে, কারণ, সকল প্রকার ব্যবহারেই সংপ্রত্যয়ের ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু, সৎপ্রত্যয় ছাড়া অন্য যাহা কিছু ঘটপট প্রভৃতির প্রত্যয়, তাহা সকলই ব্যভিচারী হইয়া থাকে। তাহাই যদি হইল, তবে, আত্মা ত স্বতঃ অবিক্রিয়, সেই আত্মার পক্ষে ত

অশেষতঃ কর্ম্মত্যাগ সম্ভব নহে—এই প্রকার কথন সঙ্গত হইল কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে, গুণসমূহ (সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ) যদি বাস্তবিক সংপদার্থ হয়, কিম্বা অবিদ্যা দ্বারা পরিকল্পিত হয়, উভয়মতেই কর্ম্ম যে গুণের ধর্ম্ম তাহা স্থির। তাহাই যদি হইল, তবে ইহাই স্থির যে, কর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত ধর্ম্ম (স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে) সুতরাং যে অবিদ্বান্ তাহার পক্ষে (অজ্ঞানবশতঃ কর্ম্ম সর্ব্বদাই আত্মাতে আরোপিত হয় বলিয়া) ক্ষণকালেরও জন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ হইতে পারে না, ইহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু যে বিদ্বান্, জ্ঞানোদয় বশতঃ অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে, সে সকল প্রকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। কারণ, জ্ঞানোদয় হইলে যখন অবিদ্যা নিবৃত্ত হয়, তখন অবিদ্যার বা তাহার কার্য্যের কিছু শেষ থাকিয়া যাইবে, ইহা ত আর সম্ভবপর নহে। যেমন তিমির নামক নেত্ররোগে পীড়িত ব্যক্তির তিমির রোগ নিবৃত্ত হইলে তাহার আর দ্বিচন্দ্রাদির দর্শন হয় না (সেইরূপ অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে তাহার কার্য্য সংসারও আর থাকে না) এই প্রকার সিদ্ধান্তই যদি ভগবৎসম্মত হয়, তাহা হইলেই "সকল কর্ম্মকেই মনের দ্বারা ত্যাগ করিয়া" "নিজ নিজ কর্ম্মে অভিরত থাকিয়া মানব সংসিদ্ধি লাভ করে" এবং "নিজ কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিয়া মানব সিদ্ধি লাভ করে" ইত্যাদি বচনগুলিও উপপন্ন হইতে পারে। ৪৮।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়। সর্ব্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ সন্ন্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধিং অধিগচ্ছতি। ৪৯।

মূলানুবাদ। সর্ব্বত্র অনাসক্তচেতাঃ জিতেন্দ্রিয় এবং নিস্পৃহ ব্যক্তিই সন্ন্যাসের দ্বারা পরম নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধিকে লাভ করে। ৪৯।

ভাষ্য। যা চ কর্ম্মজা সিদ্ধিরুক্তা জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণা তস্যাঃ ফলভূতা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিঃ জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণা বক্তব্যেতি শ্লোক আরভ্যতে, অসক্তবুদ্ধিঃ অসক্তা সঙ্গরহিতা বুদ্ধিরন্তঃকরণং যস্য সোঽসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র পুত্রদারাদিষু আসক্তি-নিমিত্তেষু জিতাত্মা জিতো বশীকৃত আত্মা অন্তঃকরণং যস্য স জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ বিগতা স্পৃহা দেহজীবিতভোগেষু যস্মাৎ স বিগতস্পৃহঃ য এবংভূত আত্মজ্ঞঃ স নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং নির্গতানি কর্ম্মাণি যস্মাৎ নিষ্ক্রিয়ব্রহ্মাত্মসং-

বোধাৎ স নিষ্কর্ম্মা তস্য ভাবো নৈষ্কর্ম্ম্যং, নৈষ্কর্ম্ম্যং চ তৎ সিদ্ধিশ্চ সা নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধিঃ নৈষ্কর্ম্ম্যস্য বা সিদ্ধিঃ নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণস্য সিদ্ধিঃ নিষ্পত্তিস্তাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং প্রকৃষ্টাং কর্ম্মজসিদ্ধিবিলক্ষণাং সদ্যোমুক্ত্যবস্থানরূপাং সন্ন্যাসেন সম্যগ্‌দর্শনেন তৎপূর্ব্বকেণ বা সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসেন অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। তথা চোক্তং "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্য নৈব কুর্ব্বন্নকারয়ন্নাস্তে" ইতি। ৪৯।

ভাষ্যানুবাদ। জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যতাই কর্ম্মজা সিদ্ধি, ইহা উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সেই কর্ম্মজ সিদ্ধির ফল যে জ্ঞাননিষ্ঠা অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি, তাহাই বলিতে হইবে, এই জন্য এই শ্লোকের আরম্ভ করা হইতেছে। "অসক্তবুদ্ধি" যাহার "বুদ্ধি" অন্তঃকরণ—"অসক্ত"—সঙ্গরহিত, সেই অসক্তবুদ্ধি (কোন বস্তুতে?) পুত্র পত্নী এবং গৃহ প্রভৃতি সকল প্রকার আসক্তি নিমিত্ত ভোগ্য বস্তুতে (ইহাই তাৎপর্য্য) "জিতাত্মা" যে "আত্মা" অন্তঃকরণকে বশীভূত করিতে পারিয়াছে সেই জিতাত্মা, "বিগতস্পৃহ" দেহ জীবন এবং ভোগে যাহার "স্পৃহা" তৃষ্ণা বিগত হইয়াছে, সেই বিগতস্পৃহ। যে এই প্রকার অথচ আত্মতত্ত্বজ্ঞ, সেই নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয়। "আত্মা নির্ব্বিকার এবং ব্রহ্ম" এই প্রকার জ্ঞান হওয়াতে যাহার সকল প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ হইয়াছে, তাহাকে নিষ্কর্ম্মা বলা যায়, নিষ্কর্ম্মার ভাব এই প্রকার অর্থে নৈষ্কর্ম্ম্য এই শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই নৈষ্কর্ম্ম্যই সিদ্ধি এই অর্থটী বুঝাইবার জন্য নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি এই পদটী ব্যবহৃত হয়। অথবা নৈষ্কর্ম্ম্য শব্দের অর্থ নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপে অবস্থিতি, তাহার "সিদ্ধি" নিষ্পত্তি—নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি, সেই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি (কি প্রকার?) "পরমা" প্রকৃষ্টা অর্থাৎ কর্ম্মজনিত যে সিদ্ধি, তাহা হইতে বিলক্ষণ, "সন্ন্যাস" সম্যগ্‌দর্শন অথবা সম্যগ্‌দর্শনের ফল স্বরূপ যে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ তাহাই সন্ন্যাস শব্দের অর্থ, সেই সন্ন্যাসের দ্বারা (আত্মতত্ত্বজ্ঞ) সদ্যোমুক্তিতে অবস্থান স্বরূপ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয় (ইহাই তাৎপর্য্য)। এই গীতাশাস্ত্রে অন্যত্রও ঐরূপই বলা হইয়াছে যে, "মনের দ্বারা সকল কর্ম্মের সন্ন্যাস করিয়া নিজে কিছু না করিয়া বা কাহারও দ্বারা কিছু না করাইয়া (জ্ঞানী) অবস্থান করে"। ৪৯।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।

সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥ ৫০॥

অন্বয়। সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম আপ্নোতি তথা মে নিবোধ। জ্ঞানস্য যা পরা নিষ্ঠা হে কৌন্তেয় (তামপি) সমাসেন মে নিবোধ। ৫০।

মূলানুবাদ। (জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যতা রূপ) সিদ্ধি লাভ করিয়া যে প্রকারে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর এবং জ্ঞানের যাহা পরম প্রকর্ষ তাহাও আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ৫০।

ভাষ্য। পূর্ব্বোক্তেন স্বকর্ম্মানুষ্ঠানেন ঈশ্বরাভ্যর্চ্চনরূপেণ জনিতাং প্রাগুক্ত-লক্ষণাং সিদ্ধিং প্রাপ্তস্য উৎপন্নাত্মবিবেকজ্ঞানস্য কেবলাত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপা নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণা সিদ্ধির্যেন ক্রমেণ ভবতি তদ্বক্তব্যমিত্যাহ সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ স্বকর্ম্মণা ঈশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য তৎপ্রসাদজাং কায়েন্দ্রিয়াণাং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণাং সিদ্ধিং প্রাপ্তং সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি তদনুবাদ উত্তরার্থঃ, কিং তদুত্তরং যদর্থ-মনুবাদ ইত্যুচ্যতে। যথা যেন প্রকারেণ জ্ঞাননিষ্ঠারূপেণ ব্রহ্ম পরমাত্মানমাপ্নোতি তথা তং প্রকারং জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তিক্রমং মে মম বচনান্নিবোধ ত্বং নিশ্চয়েনাবধারয় ইত্যেতৎ। কিং বিস্তরেণ? নেত্যাহ সমাসেনৈব সংক্ষেপেণৈব হে কৌন্তেয়। যথা ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি তথা নিবোধ ইতি অনেন যা প্রতিজ্ঞাতা ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ তামিদংতয়া দর্শয়িতুং আহ নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ইতি। নিষ্ঠা পর্য্যবসানং পরিসমাপ্তিরিত্যেতৎ। কস্য? ব্রহ্মজ্ঞানস্য. যা পরিসমাপ্তিঃ কীদৃশী সা? যাদৃশ-মাত্মজ্ঞানং। কীদৃক্ তৎ? যাদৃশ আত্মা। কীদৃশোঽসৌ? যাদৃশো ভগবতা উক্তঃ, উপনিষদ্বাক্যৈঃ ন্যায়তশ্চ।

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বরার্চ্চনরূপ যে স্বকর্ম্ম, তাহার দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধি লাভ হয়, সেই সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হইয়া বিবেকজ্ঞান লাভের পর কেবলাত্মজ্ঞানরূপ যে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিকে লাভ করিতে পারা যায়, তাহা কি প্রকারে হয়? তাহাই এক্ষণে বলিতে হইবে, এই জন্য বলিতেছেন যে সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ স্বকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিতে করিতে তাঁহারই অনুগ্রহে দেহ এবং ইন্দ্রিয়সমূহের জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতারূপ সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হইয়া। "সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হইয়া" এই যে কথাটী বলা হইল, ইহা পূর্ব্বেও একবার বলা হইলেও পুনর্ব্বার ইহার উপর কিছু নূতন করিয়া বিধান করিবার জন্য অনুবাদ করা হইল (যাহা একবার বলা হইয়াছে, তাহারই পুনঃকথনের নাম অনুবাদ)। ভবিষ্যতে কি বলিবার জন্য এই অনুবাদ করা হইল? তাহাই বলা হইতেছে যে, "যথা" যেরূপে অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তিরূপ ক্রমের সাহায্যে "ব্রহ্ম" পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়, "তথা" সেই জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তিক্রম, তুমি আমার বাক্যের দ্বারা অবগত

হও অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে বুঝিয়া লও, ইহাই তাৎপর্য্য। তাহা কি বিস্তরভাবে বলা হইবে? তাহা নহে। "সমাস" সংক্ষেপেই বলা হইতেছে। হে কৌন্তেয়! যেরূপে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় তাহা বুঝিয়া লও, এই বাক্যের দ্বারা যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি প্রতিজ্ঞাত হইল, তাহাকেই স্পষ্টভাবে দেখাইবার জন্য বলিতেছেন যে "যাহা জ্ঞানের পরম নিষ্ঠা," নিষ্ঠা শব্দের অর্থ পর্য্যবসান বা পরিসমাপ্তি। কাহার (পরিসমাপ্তি)? ব্রহ্মজ্ঞানের যে পরিসমাপ্তি (র কথা বলা হইল) তাহা কি প্রকার? যেরূপ আত্মজ্ঞান (সেইরূপই পরিসমাপ্তি)। তাহাও কিরূপ? আত্মা যে প্রকার। সেই আত্মাই বা কি প্রকার? ভগবান যেরূপ বলিয়াছেন এবং যুক্তিসমূহের দ্বারা ও উপনিষদ্‌বাক্যসমূহের দ্বারা যে ভাবে সিদ্ধ হইয়া থাকে (আত্মা সেইরূপ)।

ভাষ্য। নন্থ বিষয়াকারং জ্ঞানং ন বিষয়ো নাপ্যাকারবান আত্মা ইষ্যতে কচিৎ নন্থ "আদিত্যবর্ণং" "ভারূপঃ" "স্বয়ংজ্যোতিঃ" ইত্যাকারবত্ত্বমাত্মনঃ শ্রূয়তে। ন তমোরূপত্বপ্রতিষেধার্থত্বাত্তেষাং বাক্যানাং। দ্রব্যগুণাদ্যাকারপ্রতিষেধে আত্মনস্তমোরূপত্বে প্রাপ্তে তৎপ্রতিষেধার্থানি আদিত্যবর্ণমিত্যাদিবাক্যানি, অরূপমিতি চ বিশেষতো রূপপ্রতিষেধাৎ। অবিষয়ত্বাচ্চ "ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং" "অশব্দমস্পর্শং" ইত্যাদ্যৈঃ। তস্মাদাত্মাকারং জ্ঞানমিত্যনুপপন্নং। কথং তর্হি আত্মনো জ্ঞানং? সর্ব্বং হি যদ্বিষয়ং জ্ঞানং তত্তদাকারং ভবতি নিরাকারশ্চাত্মা ইত্যুক্তং। জ্ঞানাত্মনোশ্চোভয়ো নিরাকারত্বে কথং তদ্ভাবনানিষ্ঠেতি। ন অত্যন্তনির্ম্মলত্বস্বচ্ছত্বসূক্ষ্মত্বোপপত্তেরাত্মনো, বুদ্ধেশ্চ আত্মসমনৈর্ম্মল্যোপপত্তেরাত্মচৈতন্যাকারভাসত্বোপপত্তিঃ বুদ্ধ্যাভাসং মনঃ তদাভাসানীন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়াভাসশ্চ দেহঃ, অতো লৌকিকৈঃদেহমাত্রএব আত্মদৃষ্টিঃ ক্রিয়তে।

ভাষ্যানুবাদ। এক্ষণে শঙ্কা হইতেছে যে, বিষয়ই জ্ঞানের আকার হইয়া থাকে, আত্মা বিষয় নহে এবং আত্মার আকার আছে, ইহা কাহারও ইষ্ট নহে। যদি বল (উপনিষৎসমূহে) "(আত্মা) আদিত্যবর্ণ" "ভারূপ" এবং "স্বয়ংজ্যোতিঃ" এই সকল বাক্যের দ্বারা আত্মার আকার আছে ইহাও ত শ্রুত হইয়াছে। তাহা ঠিক নহে, কারণ, ঐ সকল বাক্য আত্মার তমোরূপত্বকে প্রতিষেধ করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে, দ্রব্য গুণ প্রভৃতি আকারের প্রতিষেধ হইলে আত্মার তমোরূপত্ব প্রসক্ত হইতে পারে, সেই তমোরূপত্ব প্রসক্তিকে নিরাকরণ করিবার জন্য উপনিষদে আদিত্যবর্ণ ইত্যাদি বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। "অরূপম্" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা আত্মাতে বিশেষ করিয়া সকল প্রকার রূপের

সম্বন্ধ প্রতিষিদ্ধ হইযাছে। আত্মা কোন প্রকার জ্ঞানেরও বিষয় হইতে পারে না। কারণ, উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, "এই আত্মার স্বরূপ চক্ষুতে প্রতিভাত হয় না, কারণ, এই আত্মার স্বরূপকে কেহই চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না" সুতরাং আত্মাকার জ্ঞান হয় এই প্রকার যে বলা হইতেছে, তাহাতে কোন প্রকার উপপত্তি নাই। তবে কিরূপে আত্মার জ্ঞান হইবে?—যাহাকে জ্ঞান প্রকাশিত করে, তাহাই ত সকল জ্ঞানের আকার হইয়া থাকে, আত্মা কিন্তু নিরাকার ইহা পূর্ব্বেই বলা হইযাছে, জ্ঞান এবং আত্মা এই দুইটীই যদি নিরাকার হয়, তাহা হইলে আত্মজ্ঞানের নিষ্ঠা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে?—এই প্রকার শঙ্কাও ঠিক নহে, কারণ, আত্মা অত্যন্ত নির্ম্মল স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম, ইহা শাস্ত্রে উপপত্তির দ্বারা স্থির হইযাছে। বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণও আত্মার ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, এই কারণে আত্মচৈতন্যের আভাস বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, বুদ্ধির যে প্রকার আভাস হয়, মনও তদাভাসবৎ প্রতীত হয় মনের সহিত যুক্ত হওযাতে ইন্দ্রিযসমূহও তদাভাসযুক্ত হয এবং দেহও পরম্পরায়, এইভাবে সেই আত্মচৈতন্যাভাসযুক্ত হয় বলিযা অনুভূত হয। এই কারণে সাধারণতঃ লোকসমূহ দেহেতেই আত্মবুদ্ধি করিযা থাকে।

ভাষ্য। দেহচৈতন্যবাদিনশ্চ লোকায়তিকাঃ চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষ ইত্যাহুঃ। তথা অন্যে ইন্দ্রিয়চৈতন্যবাদিনঃ। অন্যে মনশ্চৈতন্যবাদিনঃ। বুদ্ধিচৈতন্যবাদিনোঽন্যে। ততোঽপ্যন্তরমব্যক্তমব্যাকৃতাখ্যং অবিদ্যাবস্থং আত্মত্বেন প্রতিপন্নাঃ কেচিৎ। সর্ব্বত্র হি বুদ্ধ্যাদিদেহান্তে আত্মচৈতন্যাভাসতা আত্মভ্রান্তিকারণমিত্যত আত্মবিষয়ং জ্ঞানং ন বিধাতব্যং কিং তর্হি নামরূপাদ্যনাত্মাধ্যারোপণনিবৃত্তিরেব কার্য্যা নাত্মচৈতন্যবিজ্ঞানং। অবিদ্যাধ্যারোপিতসর্ব্বপদার্থাকারৈরেব বিশিষ্টতয়া গৃহ্যমাণত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ। দেহেরই ধর্ম্ম চৈতন্য এই প্রকার যাহারা বলিযা থাকে, সেই চার্ব্বাকগণ বলে যে, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। সেইরূপ আর এক দল বলিযা থাকে যে, ইন্দ্রিযসমূহেরই ধর্ম্ম চৈতন্য (সুতরাং ইন্দ্রিযই আত্মা) কেহ কেহ মনকেই চৈতন্যযুক্ত (সুতরাং মনই আত্মা) বলিযা স্বীকার করে। অপর এক দল আছে, যাহারা বুদ্ধিরই চৈতন্য অঙ্গীকার করে। সেই বুদ্ধি হইতেও অভ্যন্তর অব্যক্ত ও নামরূপাকারে অনভিব্যক্ত কোন অবিদ্যাকল্পিত বস্তুকেও কেহ কেহ আত্মা বলিযা স্বীকার করিযা থাকে। কিন্তু এই দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধি পর্য্যন্ত সকল জড়বস্তুতে (বাস্তবিক চৈতন্য না

না থাকিলেও) চৈতন্যাভাসতা থাকা নিবন্ধনই এই সকল বস্তুতে আত্মভ্রান্তি হইয়া থাকে, এই কারণে, শাস্ত্রদ্বারা আত্মবিষয়ক জ্ঞানের বিধান করিবার আবশ্যকতা নাই। তবে কি আবশ্যক? আত্মাতে যে নাম ও রূপের আরোপ হয়, তাহারই নিবৃত্তি করা উচিত। আত্মস্বরূপ চৈতন্যের জ্ঞান করিতে হইবে, এই প্রকার বিধান শাস্ত্র করে না। কারণ, অবিদ্যা দ্বারা আরোপিত সকল পদার্থের আকার-সমূহের সহিত মিলিত হইয়াই সর্ব্বদাই আত্মচৈতন্য প্রকাশিত হইয়া থাকে।

ভাষ্য। অতএব বিজ্ঞানবাদিনো বৌদ্ধা বিজ্ঞানব্যতিরেকেণ বস্ত্বেব নাস্তীতি প্রতিপন্নাঃ প্রমাণান্তরনিরপেক্ষতাং চ, স্বসংবিদিতত্বাভ্যুপগমেন। তস্মাদ-বিদ্যাধ্যারোপণনিবারকরণমাত্রং ব্রহ্মণি কর্ত্তব্যং ন তু ব্রহ্মজ্ঞানে যত্নঃ অত্যন্ত-প্রসিদ্ধত্বাৎ। অবিদ্যাকল্পিতনামরূপবিশেষাকারাপহৃতবুদ্ধিত্বাৎ অত্যন্তপ্রসিদ্ধং সুবিজ্ঞেয়মাসন্নতরমাত্মভূতমপ্যপ্রসিদ্ধং দুর্বিজ্ঞেয়মতিদূরমন্যদিব চ প্রতিভাতি অবিবেকিনাং। বাহ্যাকারনিবৃত্তবুদ্ধীনাং তু লব্ধগুর্ব্বাত্মপ্রসাদানাং নাতঃ পরং সুখং সুপ্রসিদ্ধং সুবিজ্ঞেয়ং স্বাসন্নমস্তি।

ভাষ্যানুবাদ। এই কারণেই বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকে যে, বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত অন্য কোন বাহ্য বস্তু নাই, এবং সেই বিজ্ঞান প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না, তাহা নিজেই নিজস্বরূপকে প্রকাশিত করে। সেই কারণে ব্রহ্মেতে অবিদ্যা দ্বারা অধ্যারোপিত সংসারেরই নিরাকরণ মাত্র কর্ত্তব্য, (স্বয়ংপ্রকাশ) ব্রহ্মকে জানিবার জন্য যত্ন করিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ, ব্রহ্ম (যেহেতু সকলেরই আত্মা সুতরাং প্রত্যেকেরই তাহা) অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, যাহারা অবিবেকী সুতরাং অবিদ্যাকল্পিত নাম ও রূপের নানা আকারে যাহাদের বুদ্ধি অপহৃত, তাহাদের নিকট আত্মতত্ত্ব সুবিজ্ঞাত হইলেও দুর্বিজ্ঞেয়, আসন্নতর হইলেও অতি দূরবর্ত্তি, আত্মভূত হইলেও অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু যাহারা বিবেকী, গুরুকৃপায় যাহাদের আত্মপ্রসাদ লাভ হইয়াছে, তাহাদের নিকটে আত্মতত্ত্ব অপেক্ষা সুখ-স্বরূপ, আসন্নতর এবং সুবিজ্ঞেয় অন্য কোন বস্তুই নাই।

ভাষ্য। তথা চোক্তং "প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং" ইত্যাদি। কেচিত্তু পণ্ডিতম্মন্যা নিরাকারত্বাৎ আত্মবস্তু নোপৈতি বুদ্ধিরতো দুঃসাধ্যা সম্যগ্‌জ্ঞাননিষ্ঠা ইত্যাহুঃ। সত্যমেবং গুরুসম্প্রদায়রহিতানাং অশ্রুতবেদান্তানাং অত্যন্তবহির্বিষয়াসক্ত-বুদ্ধীনাং সম্যক্‌প্রমাণেষকৃতশ্রমাণাং। তদ্বিপরীতানাং তু লৌকিকগ্রাহ্যগ্রাহক-দ্বৈতবস্তুনি সদ্‌বুদ্ধির্নিতরাং দুঃসম্পাদ্যা আত্মচৈতন্যব্যতিরেকেণ বস্ত্বন্তরস্যানু-পলব্ধেঃ। যথা চৈতদেবমেব নান্যথা ইত্যবোচাম। উক্তং চ ভগবতা "যস্যাং

সম্বন্ধ প্রতিষিদ্ধ হইযাছে। আত্মা কোন প্রকার জ্ঞানেরও বিষয হইতে পারে না। কারণ, উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, "এই আত্মার স্বরূপ চক্ষুতে প্রতিভাত হয না, কারণ, এই আত্মার স্বরূপকে কেহই চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায না" সুতরাং আত্মাকার জ্ঞান হয এই প্রকার যে বলা হইতেছে, তাহাতে কোন প্রকার উপপত্তি নাই। তবে কিরূপে আত্মার জ্ঞান হইবে?—যাহাকে জ্ঞান প্রকাশিত করে, তাহাই ত সকল জ্ঞানের আকার হইযা থাকে, আত্মা কিন্তু নিরাকার ইহা পূর্ব্বেই বলা হইযাছে, জ্ঞান এবং আত্মা এই দুইটীই যদি নিরাকার হয, তাহা হইলে আত্মজ্ঞানের নিষ্ঠা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে?—এই প্রকার শঙ্কাও ঠিক নহে, কারণ, আত্মা অত্যন্ত নির্ম্মল স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম, ইহা শাস্ত্রে উপপত্তির দ্বারা স্থির হইযাছে। বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণও আত্মার ন্যায স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, এই কারণে আত্মচৈতন্যের আভাস বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হইযা থাকে, বুদ্ধির যে প্রকার আভাস হয, মনও তদাভাসবৎ প্রতীত হয, মনের সহিত যুক্ত হওযাতে ইন্দ্রিযসমূহও তদাভাসযুক্ত হয এবং দেহও পরম্পরায. এইভাবে সেই আত্মচৈতন্যাভাসযুক্ত হয বলিযা অনুভূত হয। এই কারণে সাধারণতঃ লোকসমূহ দেহেতেই আত্মবুদ্ধি করিযা থাকে।

ভাষ্য। দেহচৈতন্যবাদিনশ্চ লোকাযতিকাঃ চৈতন্যবিশিষ্টঃ কাযঃ পুরুষ ইত্যাহুঃ। তথা অন্যে ইন্দ্রিয়চৈতন্যবাদিনঃ। অন্যে মনশ্চৈতন্যবাদিনঃ। বুদ্ধিচৈতন্যবাদিনোঽন্যে। ততোঽপ্যন্তরব্যক্তমব্যাকৃতাখ্যং অবিদ্যাবস্থং আত্মত্বেন প্রতিপন্নাঃ কেচিৎ। সর্ব্বত্র হি বুদ্ধ্যাদিদেহান্ত আত্মচৈতন্যাভাসতা আত্মভ্রান্তিকারণমিত্যত আত্মবিষয়ং জ্ঞানং ন বিধাতব্যং কিং তর্হি নামরূপাদ্যনাত্মাধ্যারোপণনিবৃত্তিরেব কার্য্যা নাত্মচৈতন্যবিজ্ঞানং। অবিদ্যাধ্যারোপিতসর্ব্বপদার্থাকারৈরেব বিশিষ্টতযা গৃহ্যমাণত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ। দেহেরই ধর্ম্ম চৈতন্য এই প্রকার যাহারা বলিযা থাকে, সেই চার্ব্বাকগণ বলে যে, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। সেইরূপ আর এক দল বলিয়া থাকে যে, ইন্দ্রিযসমূহেরই ধর্ম্ম চৈতন্য (সুতরাং ইন্দ্রিযই আত্মা) কেহ কেহ মনকেই চৈতন্যযুক্ত (সুতরাং মনই আত্মা) বলিযা স্বীকার করে। অপর এক দল আছে, যাহারা বুদ্ধিরই চৈতন্য অঙ্গীকার করে। সেই বুদ্ধি হইতেও অভ্যন্তর অব্যক্ত ও নামরূপাকারে অনভিব্যক্ত কোন অবিদ্যাকল্পিত বস্তুকেও কেহ কেহ আত্মা বলিযা স্বীকার করিযা থাকে। কিন্তু এই দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধি পর্য্যন্ত সকল জড়বস্তুতে (বাস্তবিক চৈতন্য না

না থাকিলেও) চৈতন্যাভাসতা থাকা নিবন্ধনই এই সকল বস্তুতে আত্মভ্রান্তি হইয়া থাকে, এই কারণে, শাস্ত্রদ্বারা আত্মবিষয়ক জ্ঞানের বিধান করিবার আবশ্যকতা নাই। তবে কি আবশ্যক? আত্মাতে যে নাম ও রূপের আরোপ হয়, তাহারই নিবৃত্তি করা উচিত। আত্মস্বরূপ চৈতন্যের জ্ঞান করিতে হইবে, এই প্রকার বিধান শাস্ত্র করে না। কারণ, অবিদ্যা দ্বারা আরোপিত সকল পদার্থের আকার-সমূহের সহিত মিলিত হইয়াই সর্ব্বদাই আত্মচৈতন্য প্রকাশিত হইয়া থাকে।

ভাষ্য। অতএব বিজ্ঞানবাদিনো বৌদ্ধা বিজ্ঞানব্যতিরেকেণ বস্ত্বেব নাস্তীতি প্রতিপন্নাঃ প্রমাণান্তরনিরপেক্ষতাং চ, স্বসংবিদিতত্বাভ্যুপগমেন। তস্মাদ-বিদ্যাধ্যারোপণনিরাকরণমাত্রং ব্রহ্মণি কর্ত্তব্যং ন তু ব্রহ্মজ্ঞানে যত্নঃ অত্যন্ত-প্রসিদ্ধত্বাৎ। অবিদ্যাকল্পিতনামরূপবিশেষাকারাপহৃতবুদ্ধিত্বাৎ অত্যন্তপ্রসিদ্ধং সুবিজ্ঞেয়মাসন্নতরমাত্মভূতমপ্যপ্রসিদ্ধং দুর্বিজ্ঞেয়মতিদূরমন্যদিব চ প্রতিভাতি অবিবেকিনাং। বাহ্যাকারনিবৃত্তবুদ্ধীনাং তু লব্ধগুর্ব্বাত্মপ্রসাদানাং নাতঃ পরং সুখং সুপ্রসিদ্ধং সুবিজ্ঞেয়ং স্বাসন্নমস্তি।

ভাষ্যানুবাদ। এই কারণেই বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকে যে, বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত অন্য কোন বাহ্য বস্তু নাই, এবং সেই বিজ্ঞান প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না তাহা নিজেই নিজস্বরূপকে প্রকাশিত করে। সেই কারণে ব্রহ্মেতে অবিদ্যা দ্বারা অধ্যারোপিত সংসারেরই নিরাকরণ মাত্র কর্ত্তব্য, (স্বয়ংপ্রকাশ) ব্রহ্মকে জানিবার জন্য যত্ন করিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ, ব্রহ্ম (যেহেতু সকলেরই আত্মা সুতরাং প্রত্যেকেরই তাহা) অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, যাহারা অবিবেকী সুতরাং অবিদ্যাকল্পিত নাম ও রূপের নানা আকারে যাহাদের বুদ্ধি অপহৃত, তাহাদের নিকট আত্মতত্ত্ব সুবিজ্ঞাত হইলেও দুর্বিজ্ঞেয়, আসন্নতর হইলেও অতি দূরবর্ত্তি, আত্মভূত হইলেও অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু যাহারা বিবেকী, গুরুকৃপায় যাহাদের আত্মপ্রসাদ লাভ হইয়াছে, তাহাদের নিকটে আত্মতত্ত্ব অপেক্ষা সুখ-স্বরূপ, আসন্নতর এবং সুবিজ্ঞেয় অন্য কোন বস্তুই নাই।

ভাষ্য। তথা চোক্তং "প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং" ইত্যাদি। কেচিত্তু পণ্ডিতম্মন্যা নিরাকারত্বাৎ আত্মবস্তু নোপৈতি বুদ্ধিরতো দুঃসাধ্যা সম্যগ্‌জ্ঞাননিষ্ঠা ইত্যাহুঃ। সত্যমেবং গুরুসম্প্রদায়রহিতানাং অশ্রুতবেদান্তানাং অত্যন্তবহির্বিষয়াসক্ত-বুদ্ধীনাং সম্যক্‌প্রমাণেষকৃতশ্রমাণাং। তদ্বিপরীতানাং তু লৌকিকগ্রাহ্যগ্রাহক-দ্বৈতবস্তুনি সদ্বুদ্ধির্নিতরাং দুঃসম্পাদ্যা আত্মচৈতন্যব্যতিরেকেণ বস্ত্বন্তরস্যানু-পলব্ধেঃ। যথা চৈতদেবমেব নান্যথা ইত্যবোচাম। উক্তং চ ভগবতা "যস্যাং

জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতোমুনেঃ” ইতি। তস্মাৎ বাহ্যাকারভেদবুদ্ধি-নিবৃত্তিরেব আত্মস্বরূপাবলম্বনে কারণম্। ন হ্যাত্মা নাম কস্যচিৎ কদাচিদ-প্রসিদ্ধঃ প্রাপ্যোহেয় উপাদেয়োবা। অপ্রসিদ্ধে হি তস্মিন্নাত্মনি অস্বার্থাঃ সর্ব্বা প্রবৃত্তয়ঃ প্রসজ্যেরন্।

ভাষ্যানুবাদ। ভগবান্‌ও সেইরূপই বলিয়াছেন যে, “(এই আত্মতত্ত্ব) অনায়াসে জ্ঞেয় এবং ইহার জ্ঞান ধর্ম্মজনক।” কতকগুলি পাণ্ডিত্যাভিমানী লোক বলিয়া থাকেন যে, আত্মস্বরূপ বস্তুর কোন আকার নাই—এই কারণে আমাদের বুদ্ধি আত্মাকে বিষয় করিতে পারে না, সুতরাং আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা দুঃসাধ্য। যাহারা গুরুসম্প্রদায়রহিত, যাহারা বেদান্ত শ্রবণ করে নাই, যাহাদের বুদ্ধি বাহ্য বিষয়েই সর্ব্বদা আসক্ত এবং যাহারা সম্যক্ প্রমাণের তত্ত্ব জানিতে যথেষ্ট শ্রম করে নাই, তাহাদের পক্ষে ঐ পণ্ডিতম্মন্যদিগের কথা সত্য বটে। কিন্তু যাহারা ঐ জাতীয় পুরুষ হইতে বিপরীত, তাহাদের পক্ষে লোকসিদ্ধ গ্রাহ্য ও গ্রাহকরূপ দ্বৈত বস্তুতে সদ্‌বুদ্ধিই একান্ত অসম্ভব, কারণ, তাহারা আত্মচৈতন্য ব্যতিরেকে অন্য কোন বস্তুর সত্তাই উপলব্ধি করিতে পারে না। এই মতটী যে প্রকারে এইভাবে ব্যবস্থাপিত হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। ভগবানও বলিয়াছেন, “যে সময় সকল প্রাণীই জাগিয়া থাকে, মননশীল ব্যক্তির পক্ষে তাহাই রাত্রি।” এই কারণে বাহ্য আকারসমূহে যে ভেদবুদ্ধি, তাহার নিবারণই আত্মস্বরূপাবলম্বনের কারণ। আত্মা কোন কালে কাহারও নিকট অজ্ঞাত হইতে পারে না, আত্মা কখনও প্রাপ্য হেয় বা উপাদেয় হইতে পারে না। সেই আত্মা যদি অপ্রসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সকল প্রকার প্রবৃত্তিই অস্বার্থ হইয়া পড়ে।

ভাষ্য। ন চ দেহাদ্যচেতনার্থত্বং শক্যং কল্পয়িতুং। ন চ সুখার্থং সুখং দুঃখার্থং বা দুঃখং আত্মাবগত্যবসানার্থত্বাচ্চ সর্ব্বব্যবহারস্য। তস্মাদ্ যথা স্বদেহস্য পরিচ্ছেদায় ন প্রমাণান্তরাপেক্ষা ততোঽপ্যাত্মনোঽন্তরতমত্বাৎ তদবগতিং প্রতি ন প্রমাণান্তরাপেক্ষা ইতি আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা বিবেকিনাং সুপ্রসিদ্ধা ইতি সিদ্ধিং। যেষামপি নিরাকারং জ্ঞানমপ্রত্যক্ষং তেষামপি জ্ঞানবশৈব জ্ঞেয়াবগতিরিতি জ্ঞান-মত্যন্তং প্রসিদ্ধং সুখাদিবদেব ইত্যভ্যুপগন্তব্যং। জিজ্ঞাসানুপপত্তেশ্চ, অপ্রসিদ্ধং চেজ্‌জ্ঞানং জ্ঞেয়বজ্জিজ্ঞাস্যেত, যথা জ্ঞেয়ং ঘটাদিলক্ষণং জ্ঞানেন জ্ঞাতা ব্যাপ্তু-মিচ্ছতি তথা জ্ঞানমপি জ্ঞানান্তরেণ জ্ঞাতব্যাপ্তুমিচ্ছেৎ। ন চৈতদস্তি। অতো-

হত্যন্তপ্রসিদ্ধং জ্ঞানং জ্ঞাতাপ্যত এব প্রসিদ্ধ ইতি। তস্মাজ্ জ্ঞানে যত্নো ন কর্ত্তব্যঃ কিন্তু অনাত্মবুদ্ধিনিবৃত্তাবেব। তস্মাজ্ জ্ঞাননিষ্ঠা সুসম্পাদ্যা। ৫০।

ভাষ্যানুবাদ। দেহাদি অচেতন বস্তুর স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রবৃত্তি হয়, ইহা বলা যায় না, কারণ, সুখ সুখের জন্য বা দুঃখ দুঃখের জন্য হইতে পারে না। সকল প্রকার ব্যবহারের শেষ ফল হইতেছে আত্মাবগতি, সেই কারণে যেমন নিজের দেহের সত্তা নিশ্চয় করিবার জন্য অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা করিতে হয় না, সেইরূপ দেহ হইতেও অন্তরতম আত্মার অবগতির অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা করিতে হয় না। সুতরাং বিবেকিগণের পক্ষে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা সুপ্রসিদ্ধ, ইহা সিদ্ধ হইতেছে। যাহাদের মতে জ্ঞানের কোন আকার নাই এবং জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাদেরও (বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে) জ্ঞেয় বস্তুর অবগতি জ্ঞানের অধীন, সুতরাং, জ্ঞানও সুখাদির ন্যায় অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। আরও তাহাদের মতে জিজ্ঞাসাও অনুপপন্ন, কারণ (তাহারা যদি বলে) জ্ঞান জ্ঞেয় বস্তুর ন্যায় অপ্রসিদ্ধ থাকে বলিয়া জিজ্ঞাস্য হয়, যেমন ঘট পট প্রভৃতি জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞানরূপ ক্রিয়া দ্বারা ব্যাপ্ত করিতে লোকের ইচ্ছা হয় (এবং সেই ইচ্ছাকে ঘটাদি বস্তুর জিজ্ঞাসা কহে) সেইরূপ জ্ঞানকেও অন্য আর একটী জ্ঞান-রূপ ক্রিয়া দ্বারা ব্যাপ্ত করিবার ইচ্ছা হওয়া আবশ্যক, বাস্তবিক (কিন্তু কেহই তাহা স্বীকার করে না, এইজন্য) এই প্রকার হইতে পারে না। এই কারণে (স্বীকার করিতে হইবে যে) জ্ঞান অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এবং জ্ঞাতাও এই কারণে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। সেই জন্য, জ্ঞানের জন্য যত্ন করিতে হয় না, কিন্তু, অনাত্ম-জ্ঞানের নিবৃত্তির জন্যই যত্ন করা উচিত। সেই কারণে (বিবেকিগণের পক্ষে) জ্ঞাননিষ্ঠা অনায়াসে হইতে পারে। ৫০।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥ ৫১॥

অন্বয়। বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্ত আত্মানং ধৃত্যা নিয়ম্য চ শব্দাদীন বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ। ৫১।

মূলানুবাদ। বিশুদ্ধ বুদ্ধিকে লাভ করিয়া ধৈর্য্যের দ্বারা আত্মাকে নিয়মিত করিয়া শব্দাদি বিষয়সমূহকে ত্যাগ করিয়া রাগ ও দ্বেষকে পরিহার করিয়া (মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়)। ৫১।

ভাষ্য। সেয়ং জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠা কথং কার্য্যা ইতি বুদ্ধ্যা অধ্যবসায়াত্মিকয়া বিশুদ্ধয়া মায়ারহিতয়া যুক্তঃ সম্পন্নঃ ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ আত্মানং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতং নিয়ম্য চ নিয়মনং কৃত্বা বশীকৃত্য শব্দাদীন্ শব্দ আদির্যেষাং তে শব্দাদয়স্তান বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা, সামর্থ্যাৎ শরীরস্থিতিমাত্রান্ কেবলান্ মুক্ত্বা ততোঽধিকান্ সুখার্থান্ ত্যক্ত্বা ইত্যর্থঃ, শরীরস্থিত্যর্থত্বেন প্রাপ্তেষু চ রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ পরিত্যজ্য। ৫১।

ভাষ্যানুবাদ। সেই প্রসিদ্ধ জ্ঞাননিষ্ঠা কি প্রকারে সম্পাদিত হইতে পারে, (তাহাই বলা হইতেছে যে) "বিশুদ্ধ" মায়ারহিত "বুদ্ধি" অধ্যবসায় যুক্ত অর্থাৎ সম্পন্ন হইয়া, "ধৃতি' ধৈর্য্য, তাহার দ্বারা আত্মাকে অর্থাৎ দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়মিত করিয়া অর্থাৎ বশীভূত করিয়া "শব্দাদি" শব্দ হইয়াছে যাহাদের আদি এমন যে সকল বিষয় তাহাই এই স্থলে শব্দাদি শব্দের অর্থ, সেই শব্দাদি বিষয়কে ত্যাগ করিয়া যোগ্যতা বশে (এখানে ধরিয়া লইতে হইবে যে, যাহা দ্বারা শরীরের স্থিতি মাত্র সাধিত হয়, তাহা ছাড়া যে শব্দাদিবিষয়সমূহ তাহাদেরই পরিত্যাগ করিয়া) এবং শরীর স্থিতির জন্য উপস্থিত শব্দাদি বিষয়েও রাগ এবং দ্বেষকে পরিহার করিয়া। ৫১।

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ ৫২॥

অন্বয়। বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ। ৫২।

মূলানুবাদ। নির্জ্জনবাসপ্রিয় মিতাহারী সংযতবাক্ সংযতদেহ ও সংযতমনাঃ নিত্য ধ্যানযোগপর এবং বৈরাগ্যযুক্ত। ৫২।

ভাষ্য। ততঃ বিবিক্তসেবী অরণ্যনদীপুলিনগিরিগুহাদীন্ বিবিক্তান্ দেশান সেবিতুং শীলমস্যেতি বিবিক্তসেবী। লঘ্বাশী লঘ্বশনশীলঃ। বিবিক্তসেবালঘ্বশনয়োঃ—নিদ্রাদিদোষনিবর্ত্তকত্বেন চিত্তপ্রসাদহেতুত্বাদ্ গ্রহণম্। যতবাক্‌কায়মানসঃ বাক্ চ কায়শ্চ মানসং চ যতানি সংযতানি যস্য জ্ঞাননিষ্ঠস্য স জ্ঞাননিষ্ঠোযতিঃ যতবাক্‌কায়মানসঃ স্যাৎ। এবমুপরতসর্ব্বকরণঃ সন্ ধ্যানযোগপরঃ ধ্যানমাত্মস্বরূপচিন্তনং যোগ আত্মবিষয় এব একাগ্রীকরণং তৌ ধ্যানযোগৌ পরত্বেন কর্ত্তব্যৌ যস্য স ধ্যানযোগপরঃ। নিত্যং নিত্যগ্রহণং মন্ত্রজপাদ্যন্যকর্ত্তব্যাভাবপ্রদর্শনার্থং। বৈরাগ্যং বিরাগভাবঃ দৃষ্টাদৃষ্টেষু বিষয়েষু বৈতৃষ্ণ্যং সমুপাশ্রিতঃ সম্যগুপাশ্রিতঃ ইত্যর্থঃ। ৫২।

ভাষ্যানুবাদ। তাহার পর "বিবিক্তসেবী" বিবিক্ত শব্দের অর্থ অরণ্য নদী-পুলিন গিরিগুহা প্রভৃতি নির্জ্জন দেশ, সেই বিবিক্তকে সেবা করা যাহার স্বভাব, তাহাকে বিবিক্তসেবী কহা যায়। "লঘ্বাশী" অল্প আহার করা যাহার স্বভাব, সেই লঘ্বাশী বিবিক্তসেবা এবং মিতাহার নিদ্রাদি দোষের নিবর্ত্তক বলিয়া চিত্তের প্রসাদ-কর, এই কারণে এই দুইটীর গ্রহণ করা হইয়াছে। "যতবাক্‌কায়মানস" যে জ্ঞাননিষ্ঠব্যক্তির বাগিন্দ্রিয় দেহ এবং মানস সংযত, সেই জ্ঞাননিষ্ঠ যতিই যতবাক্‌কায়মানস। এই প্রকারে সকল ইন্দ্রিয়কে নিয়মিত করিয়া—"ধ্যানযোগ-পর," ধ্যান শব্দের অর্থ আত্মস্বরূপ চিন্তন এবং যোগ শব্দের অর্থ আত্মবিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন, এই ধ্যান ও যোগ যাহার পরম কর্ত্তব্য সেই ধ্যান-যোগপর, নিত্য (সর্ব্বদা) নিত্য শব্দের গ্রহণ দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, তাহার পক্ষে মন্ত্রজপ প্রভৃতি অন্য সকল কার্য্যের আবশ্যকতা নাই। "বৈরাগ্য" বিরক্তের ভাব, দৃষ্ট বা অদৃষ্ট ভোগ্য বস্তু সমূহে বিতৃষ্ণা, সেই বৈরাগ্যকে সর্ব্বদা আশ্রয় করিয়া যে থাকে, তাহাকে "বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ" কহা যায়। ৫২।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।

বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূযায় কল্পতে॥ ৫৩॥

অন্বয়। অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তঃ ব্রহ্মভূযায় কল্পতে। ৫৩।

মূলানুবাদ। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ এবং পরিগ্রহকে পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মম এবং শান্ত (যতি) মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৫৩।

ভাষ্য। কিঞ্চ অহঙ্কারং অহঙ্করণং অহঙ্কারঃ দেহেন্দ্রিয়াদিষু—তং, বলং সামর্থ্যং কামরাগাদিযুক্তং নেতরং শরীরাদিসামর্থ্যং স্বাভাবিকত্বেন ত্যাগ-স্যাশক্যত্বাৎ। দর্পো নাম হর্ষানন্তরভাবী ধর্ম্মাতিক্রমহেতুঃ "হৃষ্টো দৃপ্যতি দৃপ্তো ধর্ম্মমতিক্রামতি।" ইতি স্মরণাত্তংচ। কামমিচ্ছাং ক্রোধং দ্বেষং পরিগ্রহং ইন্দ্রিয়-মনোগতদোষপরিত্যাগেঽপি শরীরধারণপ্রসঙ্গেন ধর্ম্মানুষ্ঠাননিমিত্তেন বা বাহ্য-পরিগ্রহঃ প্রাপ্তঃ তং চ বিমুচ্য পরিত্যজ্য পরমহংসপরিব্রাজকঃ ভূত্বা দেহজীবন-মাত্রেঽপি নির্গতমমভাবঃ নির্ম্মমঃ, অতএব শান্তঃ উপরতঃ যঃ সংহৃতায়াসঃ যতিঃ জ্ঞাননিষ্ঠঃ ব্রহ্মভূযায় ব্রহ্মভবনায় কল্পতে সমর্থো ভবতি। ৫৩।

ভাষ্যানুবাদ। আরও—"অহঙ্কার" দেহ এবং ইন্দ্রিয় সমূহের উপর যে আত্ম-জ্ঞান তাহাই অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারকে (পরিত্যাগ করিয়া) "বল" সামর্থ্য অর্থাৎ যে সামর্থ্য কামরাগাদিযুক্ত তাহাই পরিত্যাজ্য, তাহা ছাড়া যে শরীরের সামর্থ্য, তাহা স্বাভাবিক, সুতরাং তাহার ত্যাগ করা অসম্ভব। "দর্প" হর্ষের অনন্তর উদিত যে মনোবৃত্তিবিশেষ ধর্ম্মাতিক্রমের হেতু হয়, তাহাকেই দর্প বলা যায়, কারণ, ধর্ম্ম শাস্ত্রে স্মৃত হইয়াছে যে "হৃষ্ট ব্যক্তির দর্প হয় এবং দর্পযুক্ত হইয়া ধর্ম্মকে অতিক্রমণ করে।" "কাম" ইচ্ছা, "ক্রোধ" দ্বেষ 'পরিগ্রহ" ইন্দ্রিয় এবং মনের দোষ পরিত্যক্ত হইলেও শরীরধারণপ্রসঙ্গে বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য, যদি কোন প্রকার বাহ্য প্রতিগ্রহ আসিয়া পড়ে, তবে তাহাই এই স্থলে পরিগ্রহ শব্দের অর্থ। এইরূপ অহঙ্কার হইতে পরিগ্রহ পর্য্যন্ত কয়টী দোষকে পরিত্যাগ করিয়া পরমহংস পরিব্রাজক হইয়া দেহ ও জীবনধারণোপায়েও মমত্ব বুদ্ধির পরিহার করিয়া "শান্ত" উপরত হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠ যতি "ব্রহ্মভূয়" ব্রহ্মভাবকে লাভ করিতে কল্পিত অর্থাৎ সমর্থ হয়। ৫৩।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি, সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ পরাং মদ্ভক্তিং লভতে। ৫৪।

মূলানুবাদ। ব্রহ্মভূত সুতরাং প্রসন্নাত্মা যতি শোকও করে না এবং কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষাও করে না। সে সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিযুক্ত হইয়া পরমা মদ্ভক্তিকে লাভ করিয়া থাকে। ৫৪।

ভাষ্য। অনেন ক্রমেণ ব্রহ্মভূতঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ প্রসন্নাত্মা লব্ধাধ্যাত্মপ্রসাদঃ ন শোচতি কিঞ্চিদর্থবৈকল্যমাত্মনো বৈগুণ্যং চোদ্দিশ্য ন শোচতি ন সন্তপ্যতে, ন কাঙ্ক্ষতি। ব্রহ্মভূতস্যায়ং স্বভাব অনূদ্যতে ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ইতি। ন হ্যপ্রাপ্তবিষয়াকাঙ্ক্ষা ব্রহ্মবিদ উপপদ্যতে। ন হৃষ্যতীতি বা পাঠঃ। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু আত্মৌপম্যেন সর্ব্বেষু ভূতেষু সুখং বা দুঃখং বা সমমেব পশ্যতি ইত্যর্থঃ। নাত্মসমদর্শনমিহ তস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ ভক্ত্যা মামভিজানাতি ইতি। এবংভূতো জ্ঞাননিষ্ঠো মদ্ভক্তিং ময়ি পরমেশ্বরে ভক্তিং ভজনং পরামুত্তমাং জ্ঞানলক্ষণাং চতুর্থীং লভতে "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং" ইত্যুক্তম্। ৫৪।

ভাষ্যানুবাদ। এইরূপে ক্রমে "ব্রহ্মভূত" ব্রহ্মপ্রাপ্ত (সুতরাং) "প্রসন্নাত্মা" অধ্যাত্মপ্রসাদকে লাভ করিয়া শোক করে না, অর্থাৎ কোন প্রকার অর্থের ক্ষতি বা আত্মার বৈগুণ্যকে উদ্দেশ করিয়া অনুতপ্ত হয় না এবং কোন বস্তুর প্রার্থনাও করে না। শোকও করে না প্রার্থনাও করে না এই কথা দ্বারা ব্রহ্মভূত যতির স্বভাবেরই অনুবাদ করা হইতেছে। কারণ, অপ্রাপ্ত কোন বস্তুরই আকাঙ্ক্ষা ব্রহ্মবিদের হইতেই পারে না। কোন কোন পুস্তকে ন হৃষ্যতি (হৃষ্ট হয় না) এই প্রকারও পাঠ আছে। "সর্ব্বভূতে সম" অর্থাৎ সকল প্রাণীতেই সুখ বা দুঃখকে সমান বলিয়া যে বোধ করে সেই সর্ব্বভূতে সম, সর্ব্বত্র আত্মসমদর্শন এস্থলের তাৎপর্য্যার্থ নহে, কারণ, ভক্তির দ্বারা আমাকে জানিতে পারে ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ঐ বিষয়টী পরেই উক্ত হইবে। এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ যতি "মদ্‌ভক্তি" আমি যে পরমেশ্বর তাহাতে "ভক্তিকে" ভজনকে লাভ করে। এই ভক্তি জ্ঞানরূপা চতুর্থী ভক্তি। কারণ, ভগবান পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, চারি প্রকার ভক্ত আমাকে ভজনা করে ইত্যাদি। ৫৪।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়। তত্ত্বতঃ (অহং) যাবান যশ্চ অস্মি (তং মাং) ভক্ত্যা অভিজানাতি ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা তদনন্তরং বিশতে। ৫৫।

মূলানুবাদ। আমি কি পরিমাণ ও কে তাহা ভক্তি দ্বারা যথার্থ রূপে জানিতে পারে ও তাহার পর আমাকে যথার্থ স্বরূপে বুঝিয়া তাহার অনন্তর পদে অর্থাৎ আমাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ৫৫।

ভাষ্য। ততো জ্ঞানলক্ষণয়া ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ অহং উপাধিকৃত-বিস্তরভেদো যশ্চাহং বিধ্বস্তসর্ব্বোপাধিভেদ উত্তমপুরুষ আকাশকল্পস্তং মামদ্বৈতং চৈতন্যমাত্রৈকরসং অজমজরমমরমভয়নিধনং তত্ত্বতোঽভিজানাতি ততো মাং এবং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং মামেব। নাত্র জ্ঞানানন্তর-প্রবেশক্রিয়ে ভিন্নে বিবক্ষিতে, জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরমিতি। কিং তর্হি ফলান্তরাভাবজ্ঞানমাত্রমেব। ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি ইত্যুক্তত্বাৎ। নমু বিরুদ্ধ-মিদমুক্তং জ্ঞানস্য যা পরা নিষ্ঠা তয়া মামভিজানাতীতি। কথং বিরুদ্ধমিতি চেৎ উচ্যতে যদৈব যস্মিন্ বিষয়ে জ্ঞানমুৎপদ্যতে জ্ঞাতুস্তদৈব তং বিষয়ং অভিজানাতি

জ্ঞাতা, ইতি ন জ্ঞাননিষ্ঠাং জ্ঞানাবৃত্তিলক্ষণাং অপেক্ষতে ইতি। ততশ্চ জ্ঞানেন নাভিজানাতি জ্ঞানাবৃত্ত্যা তু জ্ঞাননিষ্ঠয়া অভিজানাতীতি।

ভাষ্যানুবাদ। তাহার পর সেই জ্ঞানরূপ ভক্তির দ্বারা আমাকে জানিতে পারে (কি ভাবে?) আমি "যাবান্" যত প্রকার উপাধি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কল্পিত এবং আমার যাহা যথার্থ স্বরূপ অর্থাৎ সকল প্রকার উপাধি দ্বারা কল্পিত ভেদের বিধ্বংস আমাতেই হইয়াছে, আমিই উত্তম পুরুষ এবং আকাশকল্প। আমি সেই একমাত্র দ্বৈতবর্জ্জিত, চৈতন্য মাত্রই আমার যথার্থ স্বরূপ, আমার জন্ম নাই জরা নাই মৃত্যু নাই, আমি অভয় ও অবিনাশী—এইভাবে বাস্তব রূপে আমাকে জানিতে পারে। তাহার পর আমাকে এই ভাবে জানিয়া আমাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এখানে জ্ঞান এবং তাহার অনন্তর প্রবেশ এই দুইটী ক্রিয়া যে পরস্পর ভিন্ন ভাবে বিবক্ষিত হইয়াছে, তাহা নহে (এইরূপ শঙ্কা হইবার কারণ এই যে) জানিয়া তাহার পর প্রবেশ করে, এই কথা বলা হইয়াছে। তবে কি? ঐ জ্ঞান-রূপ ক্রিয়ার অন্য কোন ফল নাই, কারণ, এই গীতাতেই বলা হইয়াছে যে,—আমা-কেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও। (অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে বাস্তবিক জীব যদি ভিন্ন না হয় তবে ঈশ্বর ত নিত্য প্রাপ্ত, নিত্য প্রাপ্তকে জানিবার পর পাওয়া যায় ইহা কখনই সম্ভব নহে সুতরাং জ্ঞানকেই এস্থলে প্রবেশ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে) এক্ষণে এইরূপ শঙ্কা হইতেছে যে, এই যে বলা হইল, ইহা নিতান্ত বিরুদ্ধই বলা হইয়াছে (কি বিরুদ্ধ?) জ্ঞানের যে পরানিষ্ঠা সেই নিষ্ঠার দ্বারা আমাকে জানে, এই প্রকার কথন বিরুদ্ধ হইল, কি প্রকারে? ইহার উত্তর এই যে, যখনই যে বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখনই জ্ঞাতা সেই বিষয়কে জানিয়া থাকে। সেই জানি-বার জন্য যে জ্ঞাতার জ্ঞানের আবৃত্তিরূপ জ্ঞাননিষ্ঠাকে অপেক্ষা করিতে হয়—এইরূপ ত কেহই স্বীকার করে না, তাহা হইলে ইহাই হইল যে, জ্ঞানের দ্বারা জানিতে পারে না কিন্তু জ্ঞানের আবৃত্তির দ্বারা জানিতে পারে, এই প্রকার বাক্য সুতরাং বিরুদ্ধই হইয়া পড়িল।

ভাষ্য। নৈষ দোষঃ—জ্ঞানস্য স্বাত্মোৎপত্তিপরিপাকহেতুযুক্তস্য প্রতিপক্ষ-বিহীনস্য যদাত্মানুভবনিশ্চয়াবসানত্বং তস্য নিষ্ঠাশব্দাভিলাপাৎ শাস্ত্রাচার্য্যোপ-দেশেন জ্ঞানোৎপত্তিপরিপাকহেতুং সহকারিকারণং বুদ্ধিবিশুদ্ধ্যাদি অমানি-ত্বাদি চাপেক্ষ্য জনিতস্য ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মৈকত্বজ্ঞানস্য কর্ত্রাদিকারকভেদবুদ্ধি-নিবন্ধনসর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসসহিতস্য স্বাত্মানুভবনিশ্চয়রূপেণ যদবস্থানং সা পরা জ্ঞাননিষ্ঠেত্যুচ্যতে। সেয়ং জ্ঞাননিষ্ঠা আর্ত্তাদিভক্তিত্রয়াপেক্ষয়া পরা চতুর্থী

ভক্তিরিত্যুক্তা। তযা পরয়া ভক্ত্যা ভগবন্তং তত্ত্বতোঽভিজানাতি। যদনন্তরমেবেশ্বরক্ষেত্রজ্ঞভেদবুদ্ধিঃ অশেষতো নিবর্ত্ততে। অতো জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণযা ভক্ত্যা মামভিজানাতীতি বচনং ন বিরুধ্যতে। অত্র চ সর্ব্বং নিবৃত্তিবিধায়ি শাস্ত্রং বেদান্তেতিহাসপুরাণস্মৃতিলক্ষণং অর্থবদ্ ভবতি। "বিদিত্বা ব্যুত্থায অথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি তস্মাং ন্যাসমেষাং তপসামতিরিক্তমাহুঃ ন্যাস এব অত্যরেচয়ং" ইতি "সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং ন্যাসো বেদানিমং চ লোকমমুঞ্চ পরিত্যজ্য" "ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মং চ" ইত্যাদি। ইহ চ দর্শিতানি বাক্যানি। ন চ তেষাং বাক্যানামানর্থক্যং যুক্তং ন চার্থবাদত্বং স্বপ্রকরণস্থত্বাং প্রত্যগাত্মাবিক্রিযস্বরূপনিষ্ঠত্বাচ্চ মোক্ষস্য, ন হি পূর্ব্বসমুদ্রং জিগমিষোঃ প্রাতিলোম্যেন প্রত্যক্‌সমুদ্রং জিগমিষুণা সমানমার্গত্বং সম্ভবতি। প্রত্যগাত্মবিষয়প্রত্যযসন্তানকরণাভিনিবেশশ্চ জ্ঞাননিষ্ঠা। সা চ প্রত্যক্‌সমুদ্রগমনবং কর্ম্মণাঽসহভাবিত্বেন বিরুধ্যতে। পর্ব্বতসর্ষপযোরিবান্তরবান্ বরোধঃ প্রমাণবিদাং নিশ্চিতঃ। তস্মাং সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসেনৈব জ্ঞাননিষ্ঠা কার্য্যা ইতি সিদ্ধম্। ৫৫।

ভাষ্যানুবাদ। এই দোষ হইতে পারে না, জ্ঞানের যাহা উৎপত্তি ও পরিপাকের কারণ, তাহা যদি প্রতিপক্ষবিহীন হয, তাহা হইলে উহা হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয, তাহা আত্মানুভবস্বরূপ নিশ্চযরূপেই পর্য্যবসন্ন হয, এবং সেই নিশ্চয রূপে পরিণতিকেই জ্ঞাননিষ্ঠা বলা যায। বুদ্ধির বিশুদ্ধি ও আচার্য্যোপদেশ জ্ঞানোৎপত্তি এবং জ্ঞান পরিপাকের হেতু অমানিত্ব প্রভৃতিও বুদ্ধিশুদ্ধির সহকারী। এই সকল সহকারি কারণের সহিত মিলিত হইলে আচার্য্যোপদেশ প্রভৃতি—ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানকে উৎপাদন করে। কর্ত্তাদি কারক এবং ক্রিয়াদির ভেদবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হইতে পারে এরূপ যত প্রকার কর্ম্ম আছে, সেই সকল কর্ম্মের সন্ন্যাস যদি ঐ জ্ঞানের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে ঐ জ্ঞানই স্বাত্মানুভবরূপ নিশ্চয রূপে পরিণত হয, এই পরিণত হওযাকেই পরা জ্ঞাননিষ্ঠা বলা যায। আর্ত্ত প্রভৃতির ত্রিবিধ ভক্তি হইতে বিলক্ষণ যে চতুর্থী ভক্তি তাহা এবং এই পরা জ্ঞাননিষ্ঠা একই বস্ত, ইহাই (এই শাস্ত্রে) বলা হইযাছে। সেই পরা ভক্তির দ্বারাই ভগবান্‌কে জানিতে পারা যায়। এই ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হইলে ঈশ্বর হইতে জীব ভিন্ন এই প্রকার ভেদবুদ্ধি একেবারে বিলুপ্ত হয। এই কারণে "জ্ঞাননিষ্ঠারূপ পরা ভক্তির দ্বারা আমাকে জানিতে পারে" এই প্রকার যে ভগবদ্‌বচন তাহা প্রমাণবিরুদ্ধ হইতে পারে না। এই প্রকার সিদ্ধান্ত স্থির হইলে নিবৃত্তিবিধাযক বেদান্ত, ইতিহাস, পুরাণ ও স্মৃতি

প্রভৃতি শাস্ত্রও সার্থক হইয়া থাকে; "জানিয়া এবং গার্হস্থ্য পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্য করিবে।" "সেই কারণে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসই সকল তপস্যা হইতে শ্রেষ্ঠ ইহা (শাস্ত্রকার গণ) বলিয়া থাকেন।" "সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস সকল প্রকার তপস্যা হইতে অতিরিক্ত (প্রধান)।" "সন্ন্যাস (কাহার নাম?) সর্ব্ব কর্ম্মের পরিত্যাগ।" "বেদসকলকে এই লোককে ও পরলোককে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবে।" এই সকল বাক্য এবং এই গীতাশাস্ত্রে দর্শিত এই প্রকার বাক্যসমূহও তাহা হইলে সার্থক হইতে পারে। এই সকল বাক্য এবং প্রদর্শিত শাস্ত্রবচনসমূহের যে কোন অর্থ নাই, ইহা হইতেই পারে না। এই সকল বাক্য যে (কোন প্রকার কার্য্যের প্রশংসা করিবার জন্য) অর্থবাদ রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও নহে, কারণ, এই সকল বাক্য (কোন কর্ম্মবিশেষের প্রকরণে পঠিত হয় নাই) নিজ প্রকরণেই পঠিত হইয়াছে। মোক্ষ যে পরমাত্মার অবিকারি স্বরূপে অবস্থান, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। যে পূর্ব্ব সমুদ্রে যাইতে ইচ্ছা করে, তাহার সহিত প্রতিকূলদিকে পশ্চিম সমুদ্রে গমনোদ্যত ব্যক্তির এক পথে যাওয়া কখনই সম্ভবপর নহে (সেই রূপ মোক্ষবিধায়ক শাস্ত্রীয় বচনগুলির সহিত কর্ম্মবিধায়ক কোন শাস্ত্রের একার্থবোধকতা কখনই সম্ভব নহে.) পরমাত্ম-বিষয়ে অনবরত যাহাতে জ্ঞানধারা প্রবাহিত হয়, তাহারই জন্য যে চেষ্টা তাহাই ত জ্ঞাননিষ্ঠা। ঐ জ্ঞাননিষ্ঠা পশ্চিম সমুদ্র গমন রূপ সুতরাং তাহার সহিত পূর্ব্ব-সমুদ্রগমনরূপ ক্রিয়া একসময়ে এক পুরুষে কখনই হইতে পারেনা সুতরাং জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠা পরস্পর বিরুদ্ধ। পর্ব্বত সর্ষপের মধ্যে যেমন অত্যন্ত বিরোধ, এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠার সহিত কর্ম্মের অত্যন্ত বিরোধ, তাহা সকল প্রামাণিক ব্যক্তিগণের সুবিদিত আছে। সেই কারণে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসের দ্বারাই জ্ঞাননিষ্ঠার উৎপাদন করিতে হইবে। ৫৫।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যাপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ৫৬॥

অন্বয়। সদা মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি মৎপ্রসাদাৎ শাশ্বতং অব্যয়ং পদং প্রাপ্নোতি। ৫৬।

মূলানুবাদ। সর্ব্বদা যে আমাকে বিশেষরূপে আশ্রয় করিয়া থাকে, সে সকল প্রকার কর্ম্ম করিলেও আমার প্রসাদে শাশ্বত ও অব্যয় পদকে প্রাপ্ত হয়। ৫৬।

স্বামি-শিষ্য সংবাদ

[শ্রীশরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।]

আজ ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণের) মহা মহোৎসব— যে উৎসব স্বামীজি (স্বামী বিবেকানন্দ) শেষ দেখিয়া গিয়াছেন। এই উৎসবের পরের আষাঢ় মাসের ২০ শে তারিখে, রাত্রি ৯টা আন্দাজ, তিনি স্বরূপ সম্বরণ করিয়াছিলেন। উৎসবের কিছু পূর্ব্ব হইতে স্বামীজির শরীর অসুস্থ। উপর হইতে নামেন না, চলিতে পারেন না, পা ফুলিয়াছে। ডাক্তারেরা বেশী কথাবার্ত্তা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন।

শিষ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশে সংস্কৃত ভাষায় একটী স্তব রচনা করিয়া, উহা ছাপাইয়া আনিয়াছে। আসিয়াই স্বামিপাদপদ্ম দর্শন করিতে উপরে গিয়াছে। স্বামীজি মেজেতে অর্দ্ধ-শয়িত অবস্থায় আছেন। শিষ্য আসিয়াই স্বামীজির শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ও মস্তকে স্পর্শ করিল এবং আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। স্বামীজি, শিষ্য-রচিত স্তবটী পড়িতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, তাহাকে বলিতেছেন— "খুব আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলিয়ে দে, পা ভারী টাটিয়েছে।" শিষ্য তদনুরূপ করিতে লাগিল।

স্তব পাঠান্তে স্বামীজি হৃষ্টচিত্তে বল্‌লেন—"বেশ হয়েছে।"

হায়! শিষ্য সে সময় জানে না যে, তার রচনার প্রশংসা স্বামীজি আর এ শরীরে করিবেন না!

স্বামীজির শারীরিক অসুস্থাবস্থা এতদূর বাড়িয়াছে দেখিয়া, শিষ্যের মুখ ম্লান হইল এবং বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল।

স্বামীজি শিষ্যের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বল্‌ছেন—"কি ভাব্‌ছিস্? এ শরীরটা জন্মেছে, আবার মরে' যা'বে। তোদের ভেতরে আমার ভাবগুলি কিছু কিছু দিয়ে যেতে পার্‌লেই বুঝ্‌বো, দেহ ধরা সার্থক হয়েছে।"

শিষ্য।—আমরা কি আর আপনার দয়ার উপযুক্ত আধার? তবে নিজগুণে দয়া করে' যা' করে' দিচ্ছেন, তাতেই নিজ্‌কে সৌভাগ্যবান্ মনে হয়।

স্বামীজি।—ত্যাগ হচ্ছে—মূল মন্ত্র। এ মন্ত্রে দীক্ষিত না হ'লে, ব্রহ্মাদিরও উপায় নাই। বুঝ্‌লি?

শিষ্য।—আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু কই এত দিনেও ত সংসার-আসক্তি গেল না। আপনি এ দীন আশ্রিত সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করুন।

স্বামীজি।—ত্যাগ নিশ্চয় আসবে, তবে কি জানিস্?— "কালেনাত্মনি বিন্দতি"— সময় না এলে হয় না। কতকগুলি প্রাগ্‌জন্ম-সংস্কার কেটে গেলেই, ত্যাগ ফুটে বেরোবে।

শিষ্য, স্বামীজির পাদপদ্ম ধারণ করিয়া, অতি কাতরভাবে বলিতেছে—'মশায়, এ দীন দাসকে যেন জন্মে জন্মে এই পাদপদ্মে আশ্রয় দেন। আমার আপনার সঙ্গে থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভেও ইচ্ছে হয় না।"

ঐ কথা শুনিয়া স্বামীজি অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। যেন দূর-দৃষ্টি-চক্রবালে শিষ্যের ভাবী জীবনের ছবি দেখিতেছেন। হঠাৎ বলিতেছেন—"লোকের গুলতোন্ (উৎসবের লোক সমাগম) দেখে কি আর হবে? আজ আমার কাছে থাক্।" আরও বলিলেন—'নিরঞ্জনকে ডেকে দোরে বসিয়ে দে—কেউ যেন আমার কাছে এসে বিরক্ত না করে।" শিষ্য দৌড়ে গিয়ে স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে স্বামীজির আদেশ জানাইলেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ সকল কার্য্য উপেক্ষা করিয়া, মাথায় পাগড়ি ও হাতে লাঠি লইয়া, স্বামীজির ঘরের দরজার সাম্‌নে বসিলেন। যেন মহাকাল ভৈরব মহাদেবের দ্বারী হ'য়ে বসিয়াছেন—তাঁহাকে এমনি দেখাইতে লাগিল।

দোর বন্ধ করিয়া শিষ্য পুনরায় স্বামীজির কাছে আসিল। তাহার মনে আজ আর আনন্দ ধরে না, কারণ, মনের সাধে আজ স্বামীজির সেবা করিবে—এই আশায়। সেবা করিতে করিতে সে মনের যত কথা স্বামীজিকে খুলিয়া বলিতেছে। স্বামীজিও ঈষৎ হাস্য করিয়া, তৎকৃত প্রশ্নাদির ধীরে ধীরে উত্তর দিতেছেন। এইরূপে সেদিন কাটিতে লাগিল।

স্বামীজি।—আমার মনে হয়, এরূপ ভাবে এখন আর ঠাকুরের উৎসব না হইয়া, অন্যভাবে হয় ত বেশ হয়। একদিন নয়, চারি পাঁচ দিন ধরে' উৎসব হবে। ১ম দিন— হয়ত শাস্ত্রাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা হ'ল। ২য় দিন—হয়ত বেদ-বেদান্তাদির বিচার ও মীমাংসা হ'ল। ৩য় দিন—হয়ত question class (প্রশ্নোত্তরের অধিবেশন) হ'ল। তার পরদিন চাই কি lecture (বক্তৃতা) হ'ল শেষ দিনে এখন যেমন মহোৎসব হয়, তেমনি হ'বে। যেমন দুর্গা পূজা ৪ দিন ধরে' হয়—তেম্‌নি। ঐরূপে উৎসব করিলে, শেষ দিন ছাড়া অপর কয়দিন অবশ্য ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলী ভিন্ন হয়ত

আর কেউ আসতে পারবে না। তা নাই বা এল। বহু লোক হ'লেই যে ঠাকুরের প্রচার হ'ল, এমন নহে।

শিষ্য।—আগামিবারে বরং তা'ই করা যা'বে। আপনার ইচ্ছা হ'লে সব হবে।

স্বামীজি।—আর বাবা, ওসবে ইচ্ছে ফিচ্ছে যায় না। এখন থেকে তোরা ওসব্ কর্‌বি।

(শিষ্য তখন জানে না যে, শীঘ্রই স্বামীজি জগতের চক্ষে আপনাকে লুক্কায়িত করিবেন !)

শিষ্য।—মশায়, এবার খুব কীর্ত্তন এসেছে।

কথা শুনিয়া স্বামীজি, দক্ষিণ-ধারের মধ্যের রেলিং ধরিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন ; এবং সমাগত অগণ্য ভক্ত-মণ্ডলীর দিকে শুভদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। অল্পক্ষণ এইরূপে থাকিয়াই বসিলেন—যেন দেহ-ভার বহিতে কষ্ট হ'চ্ছে। শিষ্য আস্তে আস্তে মস্তকে ব্যজন করিতে লাগিল। এখন স্বামীজির বড়ই গরম বোধ হইতে লাগিল, তাই কৌপীন পর্য্যন্ত খুলিয়া একেবারে দিগম্বর হইলেন। সে মূর্ত্তির কথা লিখিবার নহে—ভাবিলে এখনও শিষ্যের অশ্রুপাত হয়।

স্বামীজি।—তোরা হচ্ছিস্ ঠাকুরের লীলার actors (অভিনেতা)। এর পরে—আমাদের কথা ত ছেড়েই দে—তোদেরও লোকে নাম কর্‌বে। জানিস্ ?

শিষ্য।—মশায় কি বল্‌ছেন, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না !

স্বামীজি।—"এই যে সব স্তব লিখ্‌ছিস্, এর পর লোকে, ভক্তি মুক্তি লাভের জন্য, এই সব স্তব পাঠ কর্‌বে।" শিষ্য অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল এবং স্বামীজির অনিন্দিত রূপরাশি অনিমিষে পান করিয়া, নিজকে ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিল। অতঃপর স্বামীজি বল্‌ছেন—"আত্মজ্ঞান লাভই পরম সাধন। গুরুভক্তি হ'লে ঐ জ্ঞান কালে আপনিই ফুটে বেরোবে।"

শিষ্য।—মশায়, ভক্তি হ'ল কই ? আমার মন আপনার পাদপদ্মে জন্মের মত বিকায়ে যা'ক্—এই আশীর্ব্বাদ করুন।

স্বামীজি।—ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে সব হ'বে। তবে সংসার আশ্রমে তোর কোন সুখই হ'বে না।

শিষ্য স্বামীজির ঐ কথায় বিষণ্ণ হইল এবং স্ত্রীপুত্রের কি দশা হইবে, ভাবিতে লাগিল।

শিষ্য।—আপনি যদি দয়া করে বন্ধন কেটে দেন, তবেই উপায়; নতুবা উপায়ান্তর নাই।

স্বামীজি।—'কপাল-মোচন' যিনি দেহ ধারণ করিয়াছিলেন—তাঁর দর্শন পেলিনে! আমাদের শক্তিতে কিছু হয় কিরে, বাপ্?

শিষ্য।—"আমি অত শত বুঝি না। আপনাকে জানি, আপনাকে করে' দিতেই হ'বে।" এই বলে' শিষ্য স্বামীজির পাদপদ্ম কাতরভাবে ধারণ করিল।

স্বামীজি।—অত জোরে ধরিস্নে। পায়ে লাগ্বে যে।

শিষ্য।—আপনি শ্রীমুখের বাণী দিন যেন এই জন্মেই মুক্ত হ'য়ে যাই।

স্বামীজি।—ভয় কি? যখন এসে পড়েছিস্, হ'যে যা'বে।

শিষ্য স্বামীজির পাদপদ্ম ধরে' কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—"এবার আমায় উদ্ধার কর্তে হ'বেই হ'বে।"

স্বামীজি।—কে কা'র উদ্ধার কর্তে পারে? গুরু কেবল কতকগুলি আবরণ দূর করে' দেয়। তারপর আত্মা, আপনার গৌরবে আপনি জ্যোতিষ্মান্ হ'য়ে, সূর্য্যের মত প্রকাশ পায়।

শিষ্য।—তবে শাস্ত্রে কৃপার কথা শুন্তে পাই কেন?

স্বামীজি।—কৃপা মানে কি জানিস্? যিনি আত্ম-সাক্ষাৎকার করেছেন, তাঁর ভিতরে একটা মহাশক্তি খেলে। তাঁকে centre (কেন্দ্র) করে' কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত radius (ব্যাসার্দ্ধ) ল'যে যে একটা circle (বৃত্ত) হয়, সেই circleর (বৃত্তের) ভিতর যারা এসে পড়ে, তা'রা ঐ আত্মবিৎ সাধুর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, অর্থাৎ ঐ সাধুর ভাবে তা'রা অভিভূত হইয়া পড়ে। সুতরাং সাধন ভজন না করিয়াও তা'রা অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ফলের অধিকারী হয়। একে যদি কৃপা বলিস্ ত বল্।

শিষ্য।—এ ছাড়া আর কোন কৃপা নাই কি?

স্বামীজি।—তাও আছে। যখন অবতার আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত, মুমুক্ষু এরাও সব লীলার সহায়তা কর্তে শরীর ধারণ করে' আসে। কোটি জন্মের অন্ধকার কাটিয়ে, একজন্মে মুক্ত করিয়া দেওয়া, কেবল অবতারের হাত—এর মানে—কৃপা, বুঝ্লি?

শিষ্য।—আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু যা'রা তাঁর দর্শন পাইল না, তা'দের উপায় কি?

স্বামীজি।—তা'দের উপায় হচ্ছে—তাঁকে ডাকা। ডেকে ডেকে অনেকে তাঁর দেখা পায়—ঠিক যেন এমনি শরীর। তারাও কৃপা পায়।

শিষ্য।—আপনি ঠাকুরের শরীর যা'বার পর তাঁর দর্শন পেয়েছেন কি?

স্বামীজি।—ঠাকুরের শরীর যা'বার পর, আমি কিছুদিন গাজীপুরে পবাহারী বাবার সঙ্গ করি। ঐ সময় পবাহারী বাবার আশ্রমের অনতিদূরে একটা বাগানে আমি থাকতুম। লোকে ঐটে ভূতের বাগান বলত। আমিত, জানিস্, ব্রহ্মদৈত্তি, ভূত ফুতের ভয় রাখিনি। ঐ বাগানে অনেক নেবু গাছ; বিস্তর ফলত। আমার তখন অত্যন্ত পেটের অসুখ, আবার তা'র উপর সেখানে রুটী ভিন্ন অন্য কিছু ভিক্ষা মিলত না। আর খুব নেবু খেতুম। পবাহারী বাবার কাছে যাতায়াত করে' তাঁকে খুব ভাল লাগ্‌ল। তিনিও আমায় খুব ভালবাস্‌তে লাগ্‌লেন। অবশেষে মনে হ'ল, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এত কাল থেকেও ত কিছু পাইলাম না। এঁর কাছে মন্ত্র নিয়ে এখন কিছুদিন সাধন কর্‌ব। জানিস্‌ত, আমার বাঙ্গালের রোক্। যা' মনে কর্‌ব, তা কর্‌বই! যে দিন দীক্ষা নোবো মনে করেছি, তা'র আগের রাত্রে একটা খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে ভাব্‌ছি, এমন সময় দেখি, ঠাকুর আমার দক্ষিণ পাশে দাঁড়াইয়া, একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে আছেন, যেন বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন! তাঁহার কাছে যাইয়া কিছুই হইল না— এই কথা পূর্ব্বে মনে হওযায, আমিও কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া, তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। এইরূপে বোধ হয় ২।৩ ঘণ্টা গত হয়। তখন কিন্তু আমার মুখে কোন কথা বেরোলো না। তারপর হঠাৎ তিনি অন্তর্দ্ধান হ'লেন। ঠাকুরকে দেখে মন একরকম হ'যে গেল, কাজেই সেদিনের মত দীক্ষা নেবার পণ স্থগিত রাখ্‌তে হ'ল। দুই এক দিন বাদে, আবার পবাহারী বাবার নিকট মন্ত্র নেবার সংকল্প উঠ্‌ল। সেদিন রাত্রেও আবার ঠাকুরের আবির্ভাব হ'ল— ঠিক আগেকাব দিনের মত! এইরূপ উপর্য্যুপরি একুশদিন ঠাকুরের দর্শন পা'বার পর, দীক্ষা নেবার সংকল্প ত্যাগ কর্‌লুম। মনে হ'ল, যখনই মন্ত্র নোবো মনে কর্‌ছি, তখনই যখন এইরূপ দর্শন হচ্ছে, তখন মন্ত্র নিলে অনিষ্ট বৈ ইষ্ট হ'বে না।

শিষ্য।—"ঠাকুরের সঙ্গে কোন কথা হয়েছিল কি?" স্বামীজি সে কথার কোন উত্তর না দিযা নির্ব্বাক হ'য়ে রইলেন। খানিক বাদে শিষ্যকে বল্‌ছেন—"দ্যাখ্‌, ঠাকুরের যারা দর্শন পেয়েছে, তারা ধন্য। "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।" তোরাও তাঁর দর্শন পাবি। যখন এখানে এসে পড়েছিস্‌, তখন তোরা এখানকার লোক্। বুঝ্‌লি?

শিষ্য।—আজ্ঞে হাঁ। আপনি কৃপা কর্‌বেন।

স্বামীজি।—ওরে, 'রামকৃষ্ণ' নাম ধরে' কে যে এসেছিল—কেউ চিন্‌লে না! এই যে তাঁর অন্তরঙ্গ, সাঙ্গ পাঙ্গ—এরাও তাঁর ঠাওর পায়নি। কিছু কিছু মাত্র। পরে বুঝ্‌বে।

শিষ্য।—মশায়, আপনাদিগকে দেখেও আপনাদের ভাব কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। তা ঠাকুর! ঠাকুরকে ত আমার বুদ্ধির বিষয় বলেই বোধ হয় না।

স্বামীজি।—এই যে রাখাল টাখাল, যারা তাঁর সঙ্গে এসেছে—এদেরও ভুল হ'যে যায়। অন্যের কথা আর কি বল্‌ব?

এই কথা হ'চ্ছে, এমন সময় স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দোরে আঘাত করায়, শিষ্য উঠিয়া নিরঞ্জনানন্দ স্বামিপাদকে জিজ্ঞাসা করিল—"কে এসেছে?" স্বামী নিরঞ্জনানন্দ বলিলেন—"ভগ্নী নিবেদিতা ও অপর দু চারিজন ইংরেজ মহিলা।" শিষ্য স্বামীজিকে ঐ কথা বলায়, স্বামীজি বল্লেন—"ঐ আল্‌খাল্লাটা দেত।" তাই দিয়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে, সভ্য ভব্য হ'যে বসিলেন, তৎপরে শিষ্য দোর খুলে দিল। ভগ্নী নিবেদিতা ও অপর ৩।৪জন ইংরেজ মহিলা প্রবেশ করিয়া, মেজেতেই বসিলেন। স্বামীজির শারীরিক কুশলাদি সামান্য কথাবার্ত্তার পরেই তাঁরা চলে গেলেন। স্বামীজি শিষ্যকে বল্‌লেন—"দেখছিস, এরা কেমন সভ্য লোক? বাঙ্গালী হ'লে আমার অসুখ দেখেও আমাকে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা বকা'ত।" শিষ্য আবার দোর বন্ধ করে' স্বামীজিকে তামাক সেজে দিলে।

এখন বেলা প্রায় ২॥০ টা হ'বে। লোকের মহাভিড় হয়েছে। মঠের জমিতে তিল পরিমাণ স্থান নাই। কত কীর্ত্তন, কত প্রসাদ-বিতরণ—তার সীমা নাই! স্বামীজি শিষ্যের মন বুঝিয়া বলিলেন—"একবার নয় দেখে আয়—খুব শীগ্‌গির আস্‌বি।" শিষ্যও আনন্দে বাহির হইয়া, উৎসব দেখ্‌তে গেল। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দোরে পূর্ব্ববৎ বসে' রহিলেন।

প্রায় ১০ মিনিট বাদে শিষ্য ফিরে আসিয়া, স্বামীজিকে উৎসবের ভিড়ের কথা বলিতে লাগিল।

স্বামীজি।—কত লোক হ'বে?

শিষ্য।—"পঞ্চাশ হাজার।" শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামীজি, উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সেই জনসঙ্ঘ দেখিতে লাগিলেন। খানিক বাদে বসে' বল্‌ছেন—"কি বল্‌ছিস্—জোর ৩০ হাজার।"

উৎসবের ভিড় ক্রমে কমিয়া আসিল। বেলা ৪॥০টার সময় স্বামীজির ঘরের দোর জানালা সব খুলে দেওয়া হইল, কিন্তু তাঁর শরীর অসুস্থ থাকায়, কাহাকেও তাঁহার নিকটে যাইতে দেওয়া হইল না।

ভারতের ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

[শ্রীকুমুদ বন্ধু সেন।]

আমাদের ইতিহাস নাই—এই প্রবাদটী অতি শৈশব কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি। ভারতবাসী, যখন পাশ্চাত্যেতিহাসে জাতি সকলের উত্থান, পতন ও পরস্পর সঙ্ঘর্ষের লিপিবদ্ধ বর্ণনা, ইউরোপীয় নরপতিগণের নানা বিচিত্র কাহিনী, সামাজিক ও নৈতিক বিপ্লব এবং রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির বিপলদ্বন্দ্ব পাঠ করিয়া থাকে, তখন ভারতবর্ষের ইতিহাসের কথা স্মরণপথে উদিত হইলে, লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়, বিকলচিত্তে আক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠে—'হায়, আমাদের ইতিহাস নাই।' কিন্তু যখন দেখি, চির-হিমানী-মণ্ডিত অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ, স্তন্য-পীযূষ-বাহিনী নির্ঝরিণী, পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনী, সমুদ্রমেখলিত তটভূমি, নবারুণ-ফুল্ল বিশাল প্রান্তর, সহস্রশীর্ষ তরুরাজি, বিহগ-কাকলী-কূজিত মনোহর লতা-বিতানাদি-মণ্ডিত সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা তাহাদের জন্মভূমি, আবার তাহারি মধ্যে ভারতের অলকাগৌরব মন্দির-শ্রেণী, মেঘস্পর্শী মর্ম্মর-স্তম্ভ ও প্রস্তর-লেখরাজি তখন মনে হয়, সুন্দর প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব লীলাভূমির বাস্তবিক কি ইতিহাস নাই? আবার যখন মনে হয়, মানব-সভ্যতার আদিস্থান—এই পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত, কোটী কোটী ঋষি-বীর-বন্দিত ব্রহ্মাবর্ত্ত, সাধুজন-সেবিত অপূর্ব্ব জ্ঞান-বীরত্বের রঙ্গালয়—এই স্বর্ণপ্রসূ ভারত, তখন অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশ হইতে এই প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হয়—এইখানেই না সনাতন ধর্ম্মের পূর্ণাদর্শ, ঋষিমুখে পুণ্যকণ্ঠে, বৈদিকগান উত্থিত হইয়াছিল? এইখানেই না সরস্বতীর নিভৃত কুঞ্জ হইতে আদিকবি বাল্মীকির বীণা-ঝঙ্কার উঠিয়াছিল? এই স্থানেই না—জগতে যখন অধিকাংশ জাতিই মৃত্তিকাগহ্বরে পশুচর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া, অজ্ঞানতার গাঢ় সুপ্তিতে অভিভূত ছিল, তখন বেদ, উপনিষদ্, গীতা, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য রমণীয় কাব্যের সৃষ্টি

হইয়াছিল? ভারতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিতেই কি এই মহান্ জাতি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল? যথার্থই কি ভারতের ইতিহাস নাই?

ভারতের ইতিহাস আছে, কিন্তু উহা খনির অনন্ত তিমির-গর্ভে লুক্কায়িত মহারত্নের মত রহিয়াছে? ইউরোপীয়েরা যাহাকে "ইতিহাস" আখ্যা প্রদান করে, ঠিক সেইরূপ রাজনৈতিক-ঘটনা-সম্বলিত বিস্তৃত কাহিনী বা উপাখ্যান-গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল কিম্বা আছে, ইহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে "কাশ্মীর-রাজ-তরঙ্গিণী" বা "মিশ্র কারিকা" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, অধুনা যাহাকে ইতিহাস বলা হয়, তাহাও যে আদৌ ছিল না, একথা বলা যায় না।

যেমন তুষার-শুভ্র পর্ব্বত-গাত্র হইতে উৎপন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী সমূহ পরস্পর মিলিত হইয়া, ক্রমে বিপুলকায়া হয় এবং বহু জনপদ, নগর ও গ্রাম সকল বিধৌত ও পূত করিয়া, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের অশেষ কল্যাণসাধন করে, তেমনি শস্যশ্যামলাঞ্চলা ধরিত্রী-বক্ষে ভিন্ন ভিন্ন মানবজাতি, স্ব স্ব জাতীয় ভাবলহরীতে ভাসমান হইয়া, রহস্যজড়িত মানবপ্রকৃতির নব নব তত্ত্ব উদ্ঘাটন ও তত্তৎ অমূল্য চিন্তারাশিদ্বারা সমগ্র মানবজাতির মঙ্গল বিধান পূর্ব্বক মহত্ত্ব-শিখরে আরূঢ় হয় এবং জগতে সর্ব্বদেশব্যাপী বিপুল সভ্যতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে। এই বিষয়টী আমাদের ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

আদিম কাল হইতে মানব, বহিঃপ্রকৃতির সহিত আপনার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রয়াস করিতেছে। এই বিরাট্ প্রকৃতির ধ্যান করিতে করিতে মানুষ, সাধক, কবি, গায়ক, চিত্রকর, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী ও নব নব তত্ত্বের আবিষ্কারকরূপে পরিণত হইতেছে। এই বিরাট্ প্রকৃতির ধ্যান করিতে করিতেই অনন্ত চৈতন্য অখণ্ড জ্ঞান ও ভূমানন্দ স্বরূপের সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়াছে। এই বিরাট্ প্রকৃতির ধ্যান হইতেই অর্ণবপোত, বাষ্পীয়যান, বৈদ্যুতিক শকট ও অন্যান্য অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে মানবজাতি, পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে উপনীত হই-তেছে এবং বন্ধু বা শত্রুভাবে পরস্পর মিলিত হইয়া, ধরিত্রী-শরীরে কতই না নব নব পরিবর্ত্তন নিত্য আনয়ন করিতেছে! এই মহান্ প্রকৃতিরই মহিমা-ধ্যানে শক্তিলাভ করিয়া শিল্পী, ভাস্কর ও কর্ম্মী, দার্শনিক, কবি ও ঈশ্বর প্রেমিক, রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও ব্যবহাররহস্যজ্ঞ প্রভৃতি সকলে মিলিয়া, নানা-ভাবে, নানাছন্দে বিশ্বের মহাসুরে সুর মিলাইয়া, এক বিরাট জয়-গীতির সমু-খানে বিরাট্ প্রকৃতি-শরীরের উপাসনা করিতেছে।

মানব জাতির প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শাখাদ্বয় বাহ্য-প্রকৃতির উপাসনা বিভিন্ন-রূপে করিয়াছে। একটী, অদম্য উৎসাহে, অক্লান্ত পরিশ্রমে, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা সহকারে পঞ্চ মহাভূতের সহিত সংগ্রাম করিয়া, প্রবৃত্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে শারীরিক ভোগের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া, নিজ মাহাত্ম্য স্থাপিত করিয়াছে; অপর জাতি, জ্বলন্ত বৈরাগ্য, কঠোর তপস্যা ও গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া, নিবৃত্তি-পথে সর্ব্ব ভোগবাসনার উৎপত্তি-ভূমি মনকে বশীভূত ও আয়ত্ত করিয়া, নির্ব্বাণ-আনন্দ লাভ পূর্ব্বক এই বিরাট্ প্রকৃতির সহিত মানবাত্মাকে এক অপূর্ব্ব মিলন-সূত্রে গ্রথিত করিয়াছে। তাই প্রতীচ্য জগতের কথা মনে হইলে, ভোগ সুখের নন্দন কানন সদৃশ প্যারিস, বার্লিন, রোম, লণ্ডন, নিউ-ইয়র্ক প্রভৃতি মহানগরীর ছবিসহ অগণ্য তোপ-কামান-সজ্জিত সেনা ও রণতরি, বিরাট্ জনসঙ্ঘের অশিথিল উদ্দাম বাসনা এবং সর্ব্বোপরি ঐশ্বর্য্য ও দারিদ্র্যের দ্বন্দ্ব, এবং প্রজাশক্তি ও রাজশক্তির নিয়ত সংগ্রামের কথা, স্মৃতিপথে উদিত হয়। আর প্রাচ্য জাতির কথা মনে হইলে, মনে পড়ে—মহাপুরুষের পদরেণুতে পবিত্রীকৃত তীর্থরাজি কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, দ্বারকা, অযোধ্যা, কপিলাবস্তু, মক্কা, প্যালেষ্টাইন, মনে পড়ে—ধর্ম্মপ্রিয় সরল বিশ্বাসী শান্তিময় এসিয়া ও ভারতের অধিবাসী, জ্ঞান, ধর্ম্ম, সত্য ও পবিত্রতার আদর্শ-মূর্ত্তি পতিব্রতা সতী রমণী এবং জটাজূটবিমণ্ডিত কৌপীনধারী ঋষিবৃন্দ। পাশ্চাত্য জাতির সাহিত্য, শাস্ত্র, ইতিহাস ও সমাজ তাই রাজনৈতিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, এবং তজ্জন্যই ইউরোপীয় সরস্বতীর বরপুত্রেরা, প্রকৃতির বাহ্য সৌন্দর্য্য ও ভোগ সুখের উপাসক, রণপরায়ণ, বাসনা-পূর্ণ নবচরিত্রগুলিই যথাযথ অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ও তৎকরণেই সমর্থ হইয়াছেন। তাই দেখিতে পাই, খ্রীষ্ট জগতে যীশুর মহান্ আদর্শ লইয়া এই দ্বিসহস্র বৎসরের ভিতর একটী মাত্র মহাকাব্য রচিত হইয়াছে এবং তাহাও ঐ জাতীয় কবিতায় সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে নিঃসন্দেহে স্থাপিত করা যায় না।

আমাদের জাতীয় জীবন-তন্ত্রী আবহমান কাল হইতে ধর্ম্মের পাকা তারে বাঁধা রহিয়াছে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান, কাব্যরাশি ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপাদি, ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। আমাদের পুরাণগুলিতে অসংখ্য ভূপাল-বৃন্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং বংশানুক্রমিক তাঁহাদের নামের সুদীর্ঘ তালিকাও আছে, কিন্তু তন্মধ্যে যাঁহাদের চরিত্র ও বীরত্ব, ত্যাগ ও প্রেমে ভূষিত হইয়া জন সাধারণের শিক্ষণীয় ও আদর্শ স্বরূপ ছিল, তাঁহাদের ক্রিয়া-কলাপই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতে ভরতবংশের ইতিহাস

কীর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে, মহর্ষি বৈশম্পায়ন রাজা জন্মেজয়কে যাহা বলিতেছেন, তদনুসারেই যে আমাদের পুরাণ সকল লিখিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যথা—

ভরতস্যান্ববায়ে হি দেবকল্পা মহৌজসঃ।
বভূবুর্ব্রহ্মকল্পাশ্চ বহবো রাজসত্তমাঃ॥
যেষামপরিমেয়ানি নামধেয়ানি সর্ব্বশঃ।
তেষান্তু তে যথামুখ্যং কীর্ত্তয়িষ্যামি ভারত॥
মহাভাগান্ দেবকল্পান্ সত্যার্জ্জবপরায়ণান্॥

—আদিপর্ব্ব—চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়।

অর্থাৎ "ভরতের বংশে ব্রহ্মাসদৃশ, দেবতুল্য, মহাতেজাঃ বহুসংখ্যক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সমুদয়ের নাম অপরিমেয়। হে ভারত! তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, মহদাশয়, দেব-সদৃশ ও সত্যার্জ্জব-পরায়ণ, তাঁহাদেরই নাম কীর্ত্তন তোমার নিকট করিতেছি।"

এক্ষণে ভারতের ইতিহাস কোথায় পাওয়া যায়, তাহাই বিবেচ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের ইতিহাস খনির অনন্ত তিমির-গর্ভে লুক্কায়িত। এই খনি খনন করিয়া রত্ন উদ্ধার করিতে হইবে। প্রাচীন সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থ-রাশিই—সেই খনি। আমাদের বেদ বেদান্ত উপনিষদ্, আমাদের ষড়্দর্শন ও অষ্টাদশ পুরাণ, আমাদের পাণিনি ও সংহিতা-রাশি, আমাদের আয়ুর্ব্বেদ জ্যোতিষ শাস্ত্র ও ভাষ্য সমূহ, আমাদের রামায়ণ মহাভারত উপপুরাণ কাব্য নাটক আখ্যান প্রভৃতির মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইতিহাসের উজ্জ্বল স্বর্ণ-কণিকাগুলি দেখিতে পাইব।

প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক বংশের যে কুল-পঞ্জিকা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিলে, আমাদের অনেক লুপ্ত রত্ন উদ্ধার হইতে পারিবে। "রাজ-তরঙ্গিণী" "পৃথ্বিরাজ রাসুয়া" প্রভৃতির স্থায় গ্রন্থ যতগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও এই বিষয়ে আমাদের বিশেষ সহায়ক হইবে।

এতদ্ব্যতীত ভারতের হাটে মাঠে ঘাটে যে তাম্রফলক শিলালেখ ছড়াইয়া রহিয়াছে, তীর্থে তীর্থে যে ভগ্নমন্দিরশ্রেণী প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এবং অপ্রকাশিত নানা-হস্ত-লিখিত পুঁথি পুঞ্জিত হইতেছে, ইহাও আমাদের বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য।

বৌদ্ধযুগে উত্তর ভারতে পালি ভাষা প্রচলিত ছিল। ভগবান্ বুদ্ধ, জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া, ঐ চলিত ভাষায় তাঁহার অমূল্য উপদেশরাজি প্রচার করেন এবং তৎপরবর্ত্তি কয়েক শতাব্দিতে ধর্ম্ম ও দর্শন তত্ত্বসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে ঐ ভাষাই প্রযুক্ত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ভারতান্তর্গত অন্য প্রদেশের চলিত ভাষা সম্ভবতঃ নানা অক্ষরে লিখিত হইত। সেজন্য পালি এবং তৎসমসাময়িক চলিত ভাষায় লিখিত পুস্তকরাজি উদ্ধার করিতে পারিলে, অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইতে পারে।

যে সকল কাহিনী ভারতের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, গৃহে গৃহে, লোকের মুখে মুখে আবহমানকাল হইতে রটিত হইয়া আসিতেছে, তাহাও অবহেলা করিবার নহে।

আমাদের জাতকর্ম্ম বিবাহাদি দশবিধ সংস্কারের প্রচলিত প্রথা সকলেও নানা ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহাও বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে। সুদূর অতীত কাল হইতে যে সকল প্রথা আচার ব্যবহার সমাজের উচ্চ ও নিম্নস্তরের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে, তাহাও এক একটী ঐতিহাসিক ঘটনার পরিচায়ক।

উল্লিখিত উপাদান ব্যতীত হূন্, গ্রীক, পাঠান, মোগল প্রভৃতি যে সকল জাতি এ পর্য্যন্ত ভারতাধিকার করিতে আসিয়াছে, তাহাদের কাব্য, ইতিহাস শাস্ত্ররাজির মধ্যেও আমাদের ইতিহাসের কিছু কিছু অংশ বিকীর্ণ রহিয়াছে।

পূর্ব্বকথিত ঐ সমস্ত উপাদানগুলিকে মূল ভিত্তি করিয়া, আমাদের ভাবে ভারতের ইতিহাস বর্ত্তমানকালে সঙ্কলন করিতে হইবে। বিদেশী লিখিত ভারতের ইতিহাস যথার্থ ইতিহাস নহে; কেননা, তাঁহারা তাঁহাদের ভাবে সর্ব্বকালে আমাদের ইতিহাস উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের জাতীয় প্রাণটা আবহমানকাল হইতে কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে তাঁহারা চেষ্টা করেন নাই। রাজ্যশাসনে প্রজার অধিকার, মন্ত্রিসভায় প্রজা-প্রতিনিধির প্রতিবাদ প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাবসমূহ ঐ সকল উপাদানের ভিতর আমাদের পুরাবৃত্তে বিশেষভাবে লক্ষিত না হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মবিপ্লব, পৌরোহিত্য শক্তির সহিত রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির দ্বন্দ্ব-প্রসূত পরিবর্ত্তন, নীচ জাতির মধ্য হইতে মহাপুরুষের আবির্ভাব ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উপর তাঁহার আধিপত্য, বিস্তরাগত সামাজিক পরিবর্ত্তনরাজি প্রভৃতি যে সকল ঘটনাপরম্পরায় ভারত ও

তদন্তর্গত যাবতীয় লোক বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তৎ-পরিচয় জলন্ত-ভাবে উহাতে-বর্ণিত আছে, দেখিতে পাইব।

এক্ষণে আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের বিচিত্র মহত্ত্ব কল্পনায় বিভোর হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে কালাতিপাত করিব, অথবা তাঁহাদের অনন্ত-প্রসারিত উদার হৃদয়, তাঁহাদের মহান্ চরিত্র, মহদাদর্শ লইয়া জগতের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইব,—ইহাই সম্যক্ আলোচনাব বিষয়।

'কাজ কর, কাজ কব—কর্ম্ম ভিন্ন গতি নাই'—বলিয়া আজ দেশব্যাপী যে চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতেছে,—"স্বদেশ," "স্বদেশ," "স্বদেশী," "স্বদেশী"—বলিয়া উত্তেজিত হইয়া ইউরোপীয় প্রণালী অবলম্বনে ইউরোপীয় আদর্শকে আক্রমণ করিবার আজ আমরা যে চেষ্টা করিতেছি, উহা জাতীয় জীবনের ঈষদুন্মেষ হইতে পারে; কিন্তু ইহাতেই আমাদের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত হইবে না। আমাদের জাতীয় জীবনের নাড়ী কোথায়, কি ভাবে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা লক্ষ্য না রাখিলে আমাদের ব্যাধির প্রতিকার হইবে না।

"ভারতের ইতিহাস" বলিলেই যে আমবা হতাশ-হৃদয়ে মস্তক নত করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করি, তাহার কারণ এই যে, সমগ্র ভারতবাসীর একটা লক্ষ্য যে বহুকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং তল্লক্ষ্যে উপনীত হইবার চেষ্টা ও অধ্যবসায় যে বহুপূর্ব্ব হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে, তদ্বিষযে আমরা একেবারে অনভিজ্ঞ এবং দেশের লোক কেহ ঐ কথা বলিলেও তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে একেবারে নারাজ! বিদেশী জানিযা বা না জানিয়া, বলিয়াছে—"ভারতের ইতিহাস নাই; ভারতের জাতিসমূহ অসভ্য, বর্ব্বর, তাহাদের ভিতর একটা লক্ষ্য নাই এবং তৎপ্রসূত একতা নাই"—আমরাও সরলভাবে উহা ধারণা কবিযা নিশ্চিন্ত আছি। পাশব-বলে বলীয়ান্ বিদেশী আসিয়া চোক রাঙ্গাইয়া বলিল—"ইতিহাস বলিলেই আমবা রাজা, প্রজা, সেনাপতি, মন্ত্রী, আইন, অশান্তি, সংগ্রাম, দাঙ্গা প্রভৃতিব বিস্তৃত কাহিনী বুঝিয়া থাকি, তোরা তা বুঝিস্ না, পরের দেশে ঢুকিযা তাহাদেব ধন ধান্য অপহরণ করিতে পারিস্ না, আঘাত করিলেও জড়ের মত নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ হইয়া থাকিস্, তোদের আবার জাতীয় লক্ষ্য, একতা, ও উদ্যম। আমি কৃপা করিয়া শিখাইব, তবে তোরা কালে উহা বুঝিতে সক্ষম হইবি"—আমরাও ঐ কথায় চকিত হইয়া আজ সহস্রবর্ষ কাল "তথাস্তু" বলিয়া আসিতেছি। যা'ক্ এখন সে কথা। এইটুকু মাত্র আমাদের এখন মনে রাখা আবশ্যক যে, পাশ্চাত্য জাতির ইতিবৃত্তের আখ্যানগুলির প্রধান নায়ক—রাজা, এবং

তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী—প্রজাকুল। সমগ্র জাতি এতদুভয়ের সংঘর্ষবলে পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে এবং উহাদেরই উত্থান পতনে, মিলনদ্বন্দ্বে এবং বিকাশ সংকোচে সমগ্র জাতির ভাগ্য নিহিত। আর যে সকল পাশ্চাত্য জাতির ভিতর উক্ত রাজশক্তিকে প্রজাকুল সম্যক্‌রূপে করায়ত্ত করিয়া, আপন ইঙ্গিতে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাদের ভিতর বানিজ্যাধিগত ধনাধিকারী বৈশ্যকুলই সর্ব্ববিষয়ে নায়কত্ব লাভ করিতেছে। ভারতের জাতীয়তা ঐরূপে কোনকালেই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অনন্ত-কাল-চক্রের কোন এক বিশেষ শুভ মুহূর্ত্তে ধর্ম্মক্ষেত্র ভারত, মনোরম প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ হইয়া, আর্য্য-সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিলেন। ভারত-সন্তান, নয়ন উন্মীলন করিয়া, দেখিলেন—রেবা, দৃষদ্বতী, সিন্ধু, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, প্রভৃতি নদীকুল মৃদু কল নাদে বহিয়া যাইতেছে, শুভ্র তুষার কিরীটী হিমাচল প্রেমে গদ্গদ হইয়া, ধ্যানস্থিমিত-লোচনে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব জগন্নিয়ন্তার উদ্দেশে উর্দ্ধদেশে চাহিয়া রহিয়াছে, নিবিড় অরণ্যানী তরু-লতা-গুল্ম-বিতানে বিবিধ শ্বাপদ বিহঙ্গম প্রভৃতি প্রাণীর আশ্রয়-স্বরূপ হইয়া, পুণ্য তপোবনের আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আর্য্য-সন্তান দেখিলেন—জলে রূপ, স্থলে মোহ, চন্দ্রে দীপ্তি, সূর্য্যে জ্যোতিঃ, বিহঙ্গে গীতি, কুসুমে কান্তি এবং হৃদয়ে প্রীতি। জীবনের সেই শুভদিনে তাঁহার প্রথম অনুভূতি হইল—শৈলে শান্তি, অরণ্যে ছায়া, বৃক্ষে পুষ্টি, কাষ্ঠে আরুণি এবং নদীতে পাবনী শক্তি! স্তব্ধ-হৃদয়ে নদিতীরে দণ্ডায়মান! তাঁহার চক্ষু হইতে তখন মায়ার আবরণ খসিয়া পড়িল; দেখিলেন—সীমাশূন্য, দিক্‌শূন্য, অনন্ত-প্রসারিত-ব্রহ্মাণ্ডাবরণে আবৃতানন্তকান্তি উষা হৈমবতী ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে করিতে তাঁহার মুগ্ধ নেত্রের সম্মুখে দণ্ডায়মান! সে অখণ্ড অরূপ-রূপরাশিতে সমগ্র জগৎ নূতনালোকে উদ্ভাসিত—দেখিলেন, এবং শুনিলেন—সেই সশৈলবনকাননাম্বরা মোহিনীর অশরীরি বাণী—"অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ"। "ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি যঃ শৃণোত্যুক্তম্।"—"আমিই রুদ্রাদি দেব শরীরে শক্তিরূপে বর্ত্তমান; আমার প্রভাবেই সকলে জীবিত থাকে এবং দর্শন শ্রবণাদি সকল কার্য্য সম্পাদন করে।" ভারতের জীবনেতিহাসের সেই নবারুণরাগরঞ্জিত প্রথম উষা! তারপর দিনে দিনে, বৎসরে বৎসরে কত দর্শন, কত ধর্ম্ম, কত অপূর্ব্ব চিন্তায় ভারত পল্লবিত হইল। এইরূপে দিব্যদর্শী ঋষিকুল হইতেই আমাদের ইতিহাসের আরম্ভ। বৈদিক যুগই আমাদের

জাতীয় ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়। পুণ্যময় হিমালয় পাদমূল হইতেই আমাদের জাতীয় জীবন-স্রোত প্রথম প্রবাহিত হয়।

এইরূপে মানব-স্মৃতির অগম্য কালে সৌম্য স্নিগ্ধ তপোবনে যে প্রেমপূর্ণ মহা সাম্যবাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, সমগ্র মানবজাতিকে, সমগ্র প্রাণী-জগতকে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য যুগে যুগে যে মহাপুরুষগণ অবতীর্ণ হন, তাঁহাদের ইতিহাসই আমাদের জাতীয় ইতিহাসের মধ্যমণি। এই মধ্যমণিকে আশ্রয় করিয়া দেব, ঋষি, শিল্পী, বীর, রাজা, প্রজা প্রভৃতি ভারতের সকল মানব একসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে।

কে বলে—আমাদের ইতিহাস নাই? কোন্ জাতি আমাদের মত প্রাচীন ইতিহাসকে পূজা করিতে জানে? কোন্ জাতি অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত রত্নময় সিংহাসনে ইতিহাস গ্রন্থকে আমাদের মত পূজা করিয়াছে? আমাদের মত কোন্ জাতির দীন পর্ণকুটীরবাসীও পুরাতন প্রথা ও গাথাকে বন্দনা করিয়া থাকে? পাশববলোন্মত্ত উদ্দাম প্রবৃত্তি-লীলার সব তারিখাদি আমাদের ইতিহাসে না থাকিতে পারে; কিন্তু পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষগণের প্রভাব কেমন করিয়া ভারতের প্রজাকুলকে ভাবরাজ্যে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরূঢ় করিয়াছে, এবং অদ্যাবধি করিতেছে, তদ্বিবরণ আমাদের নাই, মনে করাও বিষম ভ্রম। আমাদের ইতিহাস যে পাঠ করে, সে উন্নত হয়; যে চিন্তা করে, সে চিন্তাশীল হয়; যে স্মরণ করে, সে কৃতার্থ হয়!

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের উপাদান, চীর-বল্কল-ধারী, কৌপীন-সম্বল বৈদিক ঋষিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া, কপিল, ব্যাস, শুক, শনক, সনাতন, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, নানক, কবীর, তুকারাম, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি ধর্ম্মবীরদিগের জীবনের সহিত জটীলভাবে সম্বদ্ধ, দেখিতে পাইব। কারণ, ভাবতরঙ্গের পর ভাবতরঙ্গ ঐ সকল মহাপুরুষদেরই অবলম্বন করিয়া, ভারতে যুগে যুগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া, বর্ত্তমান ভাবুক হিন্দুর সহায়তা করিয়াছে।

রণভেরীর ভৈরব রবে উন্মত্ত উদ্দাম আশা-বাসনা-তাড়িত গর্ব্বিত নরপতিকুলের রক্তস্রোতে ধরা-প্লাবন-রূপ-কার্য্যে আমাদের জাতীয় বীরত্ব স্ফুরিত হয় নাই, কিন্তু নরশোণিতে মেদিনী পরিপূরিত না করিলেই কি জাতীয় কীর্ত্তি বিঘোষিত হয় না? মানবজাতির মহত্ত্ব কি কেবল ঐ তাণ্ডব-নৃত্যে?

যেখানে বিশ্বের মঙ্গলের জন্য আত্ম-বলিদান, যেখানে সত্য এবং ন্যায়ের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ, যেখানে জরামৃত্যু-প্রপীড়িত জীবগণের কল্যাণের জন্য ব্যথিত-হৃদয়, যৌবনে প্রণয়িনী স্ত্রী, আদরের শিশু পুত্র, স্নেহময় জনকজননী, বিপুল রাজ্যসুখ ত্যাগ করিয়া, গৈরিক কৌপীন ধারণ করিলেন—সেখানে কি বীরত্ব নাই? যেখানে বিশ্বপ্রেমিক সামান্য ছাগ-শিশুর জন্য নিজের প্রাণ দানে অগ্রসর—সেখানে কি বীরত্ব নাই? বল শাক্যসিংহের মত বীর কে? শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় মহাবীর কে? শঙ্করের ন্যায় দিগ্বিজয়ী কে?

তাই বলি, আমাদের ইতিহাস আছে এবং ঐ ইতিহাস এখনকার ছাঁচে ফেলিতে গেলে, পূর্ব্বকথিত উপায় সকল অবলম্বন করিতে হইবে। তাই বলি, আজ প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে, বর্ত্তমান কালোপযোগী আমাদের ইতিহাস আমাদিগকেই জগতে প্রকাশ করিতে হইবে। এ কর্ম্ম অপরে করিবার নহে।

ভারতের রাষ্ট্রীয় শক্তি ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়াই সমাজ-শরীরে সঞ্চারিত হইয়াছে। স্মৃতিকার, বর্ণাশ্রমাচারানুযায়ী জাতি বিভাগ করিয়া প্রত্যেক বিভাগকে পরস্পর বিভিন্ন গুণের অধিকারী করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে লইয়াই সমাজ। উঁহারা প্রত্যেকেই ঐ সমাজের অঙ্গ। স্মৃতিকারের বিধানানুযায়ী উঁহারা স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকে। সমাজের উচ্চ, মধ্য, নিম্ন সকল স্তরেই চতুর্ব্বর্ণ স্মৃতির ব্যবস্থানুযায়ী পরিচালিত। এমন কি মহা দুর্দ্ধর্ষ নরপতিকেও ঐ বিধান অবনত মস্তকে পালন করিতে হয়। রাজা—নীবারের ষষ্ঠ ভাগ গ্রহণ করিয়া, রাজ্যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিবেন। যুদ্ধ বিগ্রহ, শান্তি অশান্তি, দস্যুতস্কর দমন প্রভৃতির ভার—রাজা ও রাজজাতীয় ক্ষত্রিয়ের উপর ন্যস্ত। বৈশ্য—শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি বিস্তার করিবেন, ভূমি কর্ষণ করিয়া, বীজ বপন পূর্ব্বক শস্য উৎপাদন করিয়া, সমগ্র জাতির সেবা করিবেন। শূদ্র—কায়িক শ্রমের দ্বারা শূদ্রেতর জাতির পরিচর্য্যা করিয়া, আপনার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবেন। ব্রাহ্মণ—ধর্ম্ম প্রচার, শিক্ষা বিস্তার এবং সর্ব্বদেশের সর্ব্বজাতির কল্যাণের নিমিত্ত স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিবেন। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক বর্ণের স্ব স্ব কার্য্যের সুবিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনেকানেক নিয়ম সকলও লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক বংশের দুষ্কৃত ও সুকৃতের নিন্দা ও স্তুতির জন্য ব্যক্তিগণ নিয়োজিত হইত। সূতগণ—মহতী সভায় পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া, প্রাতঃস্মরণীয় রাজন্যের ও পুণ্যবান্‌গণের কীর্ত্তি-

সমূহ ঘোষণা করিত। ভারতের জাতীয়তা জাতীয় ইতিহাসের প্রবাহে পুরাকালে এইভাবে বহিত।

পাশ্চাত্য দেশে সমগ্র জাতি রাজার নিগ্রহে বা অনুগ্রহে পরিচালিত হইত। প্রজাগণ দলবদ্ধ হইয়া রাজার স্বেচ্ছাচারিতা দমন করিবার চেষ্টা করিত। নানা ঘাত প্রতিঘাত, নানা দ্বন্দ্বের পর প্রজাকুল, ক্রমশঃ রাজশক্তিকে সংযত ও করায়ত্ত করিয়া অবশেষে আপনাদের ক্ষমতা বা অধিকার বৃদ্ধির জন্য নানা আইন বিধিবদ্ধ করাইতে লাগিল। সুতরাং কোন্ রাজার সময় কোন্ কোন্ আইন বিধিবদ্ধ হইল, কি কি অধিকার প্রজা লাভ করিল, কি কি অধিকার হইতে রাজা বঞ্চিত হইলেন এবং কোন্ কোন্ রাজার আমলে প্রজার কি কি দ্বন্দ্ব বা মিলন হইল প্রভৃতির ইতিহাস রক্ষা করা—পাশ্চাত্য দেশে সমগ্র জাতির অবশ্য কর্ত্তব্য হইল। তাই পাশ্চাত্য দেশে অন্যান্য ঘটনা উপেক্ষা করিয়া, রাজনৈতিক ঘটনা লিপিবদ্ধ হইল। ইউরোপের ইতিহাসের ইহাই মূল সূত্র।

ভারতের যুদ্ধ বিগ্রহ পর্য্যন্ত স্মৃতিকারের ব্যবস্থানুরূপ হওয়া চাই। বালক বৃদ্ধ ও বনিতার উপর কোন অত্যাচার কেহ করিতে পারিবেন না, প্রজার ধানের গোলা বা মরাই কেহ নষ্ট করিতে পারিবেন না। রাজায় রাজায় চতুরঙ্গ সেনা লইয়া যুদ্ধ হউক, প্রজাগণের তাহাতে কিছু আসে যায় না। তাহারা নিশ্চিন্ত মনে ভূমিতে হল কর্ষণ করিতেছে, শিল্প বাণিজ্যের চর্চ্চা করিতেছে, ব্রাহ্মণ যাগ যজ্ঞ করিতেছেন, যুদ্ধবিগ্রহে প্রজার তত হানি হইতেছে না। সুতরাং রাজা রাজড়ার জীবনের দৈনিক ঘটনাবলি বিস্তাররূপে বিবৃত করিয়া ইতিহাস রক্ষায় সমগ্র জাতির আবশ্যক কি? সমগ্র জাতির কল্যাণ যাহাতে নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহার ইতিহাস রক্ষা—ভারতবাসীর একান্ত আবশ্যক। তাই ভারতের ইতিহাস অভিনব প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধাধিকারে সমাজ ভিন্ন ভাবে গঠিত হইল। যে ঋষিবৃন্দ কাষায বল্কল পরিধান করিযাও সমাজের হিতের জন্য সমাজের সেবা করিতেন, মুমুক্ষু হইয়াও যাঁহারা রাজার নিকট আসিয়া রাজনীতি উপদেশ প্রদান করিতেন এবং সমাজ তাঁহাদের অনুশাসন অনুসারে চলিতেছে কি না তাহা পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেন, বৌদ্ধাধিকারে তাঁহাদের কার্য্যকলাপের আমূল পরিবর্ত্তন হইল। উদাসীন ভিক্ষুগণ, জরামরণ-সঙ্কুল সংসারে শ্রীগৌতমের বৈরাগ্যপ্রদ নির্ব্বাণ গাথাই কেবলমাত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। নরপতিগণ, শাক্যসিংহের অপূর্ব্ব জীবনে মুগ্ধ হইয়া, ভিক্ষুসঙ্ঘের পদতলে বসিয়া নির্ব্বাণ কামনা করি-

তেন। কাজেই এই যুগে মহাযোগী শ্রীবুদ্ধদেবের ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্যই রাজশক্তি নিযুক্ত হইল। সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতেই বৌদ্ধ রাজগণ ব্যস্ত হইলেন এবং নব ধর্ম্ম প্রচার করে নানাস্থানে ভিক্ষুসকল প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তখন ক্রমে রাজশক্তির অধীনে সর্ব্ববর্ণ চালিত হইতে লাগিল। এই সময়ে রাজকুলের ইতিহাস বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল।

যে বৌদ্ধ রাজগণ তাম্রফলকরাজি ও পর্ব্বতগাত্রে স্বীয় বংশের কীর্ত্তি-কথা উৎকীর্ণ করিয়া রাখিতেন, তাঁহারা যে নিজেদের রাজত্বকালীন ঘটনাবলি-সম্বলিত ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ সংকলিত করেন নাই, একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বৌদ্ধ রাজগণ 'নীলপত্রে" তাঁহাদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধযুগের ইতিহাস, রাজকুলের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ থাকিলেও, ঠিক ভারতীয় প্রণালী অনুযায়ী লিখিত হইয়াছে অর্থাৎ ধর্ম্মকে মূল ভিত্তি করিয়া বৌদ্ধ রাজগণের কীর্ত্তিগাথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ যুগাবসানে দিগ্বিজয়ী শ্রীশঙ্করাচার্য্য পুনরায় বৈদিক ধর্ম্ম স্থাপন করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার বিজয়শঙ্খে সমগ্র আর্য্যস্থান নিনাদিত হইল।

বৌদ্ধযুগে প্রাচীন ভিত্তি উপেক্ষিত হইয়া যে নূতন ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় জীবন গঠিত হইতেছিল, তাহা বৈদিক ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানে ভাঙ্গিয়া গেল। আবার "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" সমাজে ব্রাহ্মণ্যশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার উপক্রম হইল। মহাবিপ্লব উপস্থিত হইল। বৌদ্ধ ও বৈদিক ধর্ম্মের সংঘর্ষে ভারতের সমগ্র জাতি আন্দোলিত হইল।

বৌদ্ধগণ নানাস্থানে ছিন্নভিন্ন হইয়া নানাদলে বিভক্ত হইল। নূতন বৈদিক-ধর্ম্মাবলম্বিগণ আপনাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য নানাপ্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিল এবং ঐ গৃহবিবাদে ভারতবাসী দিন দিন হীনবীর্য্য হইতে লাগিল। ঐ বিপ্লবের ফলেই একচ্ছত্র সম্রাটের পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ও রাজন্যবর্গে ভারতবর্ষ পূর্ণ হইল। সমাজরক্ষক ভিক্ষু সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণেরা তখন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ঐ সকল ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের স্তুতিকারক হইয়া বেদবহির্ভূত নানাবিধ তামসিক ক্রিয়াকাণ্ডেরও অনুষ্ঠান করিতে লাগিল এবং সমাজ শাসন শিথিল হওয়ায় অশিক্ষিত জনমণ্ডলী ছত্রিশবর্ণে বিভক্ত হইয়া পড়িল। এইরূপে

রাজন্যবর্গের পরস্পর বিবাদে দেশে একপ্রকার অরাজকতার আবির্ভাব হইল। ঠিক সেই মুহূর্তে এক হস্তে তরবার ও অপর হস্তে কোরাণ লইয়া জয়দৃপ্ত ইস্লাম্ 'আল্লা হু আকবর' রবে ভারতে প্রবেশ করিল।

ঐ সময় হইতে কতই না রাষ্ট্রবিপ্লব, তরঙ্গের পর তরঙ্গাঘাত করিয়া ভারত-বর্ষের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঐ সকলের ফলেই ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস অধুনা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সুলতান মামুদের আগমন-কাল হইতে পাঠান রাজকুলের রাজত্বকালের অবসানকাল পর্য্যন্ত প্রাচীন ভারতের অনেক ঐতিহাসিক কীর্ত্তি মুসলমান কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ মুসলমান নরপতিগণের তুষ্টি সম্পাদনার্থ বিধর্ম্মী হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের আলেখ্য মলিন করিয়া আপনাদের বিজাতীয় ভাবে ভারতের রাজনৈতিক ঘটনা বিবৃত করিলেন। তত্রাচ সে সময়ে ভারতের জাতীয় ইতিহাস জাতীয় ভাবে রক্ষা করিবার চেষ্টা অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।

যাঁহারা ভারতের পুরাবৃত্তের যথার্থ আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারাই ভারতের ঐতিহাসিক বিশেষত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। রাজস্থানের ইতিহাস প্রণেতা মহাত্মা টড্ যথার্থই বলিয়াছেন,—

"Those who expect from a people like the Hindus a species of composition of precisely the same character as the historical works of Greece and Rome, commit the very egregious error of overlooking the peculiarities which distinguish the natives of India from all other races and which strongly discriminate their intellectual productions of every kind from those of the west. Their philosophy, their poetry, their architecture, are marked with traits of originality; and the same may be expected to pervade their history, which, like the arts enumerated, took a character from its intimate association with religion of the people."

অর্থাৎ

'যাঁহারা হিন্দুর ন্যায় জাতির নিকট হইতে গ্রীস এবং রোমের ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহের ন্যায় ঐতিহাসিক রচনা প্রত্যাশা করেন, তাঁহারা ভারতবাসীর যে বিশেষ বিশেষ গুণগুলি অন্যান্য জাতি হইতে তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া

রাখিয়াছে এবং তজ্জন্য প্রত্যেক বিষয়ে তাহাদের প্রতিভাপ্রসূত কীর্ত্তিরাজি পাশ্চাত্য কীর্ত্তিকলাপ হইতে এত বিভিন্ন এবং অভিনব বলিয়া বোধ হয়, যে গুলিকে উপেক্ষা করিয়া গুরুতর ভ্রম করিয়া থাকেন। ভারতের দর্শন, ভারতের কবিত্ব, ভারতের স্থাপত্য প্রভৃতি মৌলিকতায় পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ অপূর্ব্ব মৌলিকভাব যে, ভারতের ইতিহাসেও বর্ত্তমান, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। অন্যান্য সকল জাতির ইতিহাসের ন্যায় না হইয়া উহা ভারতের ধর্ম্মের সহিত গাঢ় সম্বন্ধ থাকায়, শিল্প স্থাপত্যাদির ন্যায় ইতিহাসও এক অপূর্ব্ব অভিনব আকার ধারণ করিয়াছিল।"

আমাদের দেশে সামাজিক ঘটনাবলীর ইতিহাস যে বর্ত্তমান আছে, সে বিষয় প্রমাণ করিতে বেশী প্রয়াস পাইতে হইবে না। যে দেশে প্রত্যেক কুল, প্রত্যেক বংশ নিজ নিজ পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকাহিনী অনায়াসে জ্ঞাত হইতে পারে, যে দেশে প্রত্যেক বর্ণ কবে কোন্ দেশে তাহাদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ-গণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং কবে কোন্ দেশে তাঁহারা বাস করিয়াছিলেন, সে কথা বলিতে পারে, যে দেশে মেলবন্ধন কৌলীন্যপ্রথা প্রভৃতির আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে দেশে নরপতিগণের ইতিবৃত্ত যে লিখিত হইত না, ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। যে দেশের প্রতিভামণ্ডিত মস্তিষ্ক হইতে অপূর্ব্ব দর্শন, অপূর্ব্ব কাব্য, অপূর্ব্ব সাহিত্য, অপূর্ব্ব ব্যাকরণ, অপূর্ব্ব স্মৃতি, অপূর্ব্ব শিল্প ও কলাবিজ্ঞান উদ্ভূত হইয়াছে, যে দেশেব প্রতিভামণ্ডিত মস্তিষ্ক কর্ত্তৃক গোত্র বর্ণ কুল প্রভৃতি স্মরণ রাখা নিত্যকর্ত্তব্য মধ্যে ব্যবস্থাপিত হইয়া প্রত্যেক হিন্দুর চিত্তে আদিম পিতৃপুরুষের স্মৃতি উজ্জ্বল রাখিয়াছে, সে দেশে কি কেবল রাজেন্দ্রবৃন্দের বিবরণই লিপিবদ্ধ হয নাই? মনস্বী টড্ সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন যে—

"Is it to be imagined that a nation so highly civilised as the Hindus, amongst whom the exact sciences flourished in perfection, by whom the fine arts, architecture, sculpture, poetry, music were not only cultivated but taught and defined by the nicest and most elaborate rules, were totally unacquainted with the simple art of recording the events of their history, the character of their princes, and the acts of their reigns? Where such trace of *mind* exists, we can hardly

believe that there was a want of competent recorders of events, which synchronical authorities tell us were worthy of commemoration. The cities of Hostinapur and Indraprastha, of Anhulwara and Somnath, the triumphal columns of Delhi and Cheetore, the shrines of Aboo and Girnar, the cave temples of Elephanta and Ellora, are so many attestations of the same fact; nor can we imagine that the age in which these works were erected was without an historian.

অর্থাৎ

"যাহাদের মধ্যে গণিতবিজ্ঞানের চর্চা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, যাহাদের দ্বারা কলাবিদ্যা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, কবিতা এবং সঙ্গীত কেবলমাত্র অনুশীলিত হইত, তাহা নহে পরন্তু ঐ সকল বিদ্যা শিক্ষা দিবার সুন্দর বিধান এবং ব্যক্ত করিবার সুসংস্কৃত ভাষা ও অশেষ নিয়মাবলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, সভ্যতার এতদূর পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত হিন্দু জাতি যে রাজকুলের চরিতাবলি এবং তাঁহাদের রাজত্বকালীন ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া ইতিহাস গঠন করিবার সরল প্রণালী জ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল—একথা কি কখন কল্পনায়ও আনয়ন করা যায়? যেখানে মানসিক শক্তির ঐরূপ মহান্ বিকাশ বর্ত্তমান, সেখানে স্মরণযোগ্য ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিবার উপযুক্ত লেখকের অভাব ছিল, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ, আনহলবরা এবং সোমনাথ প্রভৃতি নগরসমূহ, দিল্লি এবং চিতোরের বিজয়স্তম্ভ, আবু এবং গির্ণারের দেবমন্দিরসমূহ, ইলোরা এবং হস্তিগুহার পর্ব্বতাভ্যন্তরীণ মন্দিরশ্রেণী হিন্দু প্রতিভার নিদর্শন স্বরূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে যুগে ঐ সকল কীর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল, সে যুগে যে ঐতিহাসিকের অভাব ছিল, ইহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না।"

প্রাচীন ভারতে কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ ছিল না, এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বিখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ মনস্যুঁর রেমুসং বলিয়াছিলেন, "প্রাচীন ভারতেতিহাস লিখিবার উপাদানগুলি আবুল ফজল কোথা হইতে পাইলেন?'—"Whence Abul Fazel obtained the materials for his outlines of ancient Hindu History?"

"কাশ্মীর রাজতরঙ্গিণী," "পৃথ্বিরাজ রাসুয়া," 'বিজয় বিলাস," "সূর্য্যপ্রকাশ" (অর্থাৎ সূর্য্যবংশীয় নরপতিবৃন্দের ইতিহাস), 'জগত বিলাস,' "রাজপ্রকাশ,"

"জয় বিলাস," 'মান চরিত্র" ইত্যাদি অনেক ভারতীয় ইতিহাস গ্রন্থের নাম ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রাজপুতনায় জয়সিংহের "কল্পদ্রুমের' কথা বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন। তিনি "কল্পদ্রুমে" অনেকানেক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

অনুসন্ধান করিলে ঐ শ্রেণীর বিস্তর গ্রন্থ আমরা এখনও উদ্ধার করিতে পারি। ভট্ট কবিগণ বা সূতগণ যে কেবল অর্থলোভে ও রাজভয়ে ভীত হইয়া কতকগুলি কল্পনাপূর্ণ মিথ্যা বর্ণনায় রাজনৈতিক ঘটনাবলি ছন্দোবদ্ধ করিয়াছেন, এরূপ আশঙ্কা বা অনুমান করিবার কোন হেতু নাই। আমাদের ভট্টচারণগণ সমসাময়িক ঘটনাগুলি যথার্থ বর্ণনা করিয়া তৎকালীন রাজচরিত্রের মহত্ত্ব ও উদারতা বা ক্রূরতা ও বিলাসিতা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সাধারণের শিক্ষার জন্য ঐ সকল মহৎ বা নিন্দিত কার্য্যগুলিকে অতিশয়োক্তিতে উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই অতিশয়োক্তি বা অলঙ্কার তাঁহাদের স্বতঃপ্রণোদিত উচ্ছ্বাস কিম্বা অর্থলুব্ধ চাটুকারের স্তব, তাহা কে বলিবে? নিরপেক্ষ ইংরাজ ঐতিহাসিক মহাত্মা টড্ ঐ বিষয়ে এই কথা বলিয়াছেন—

"Still, however, their chroniclers dare utter truths, sometimes most unpalatable to their masters. When offended, or actuated by a virtuous indignation against immorality, they are fearless of consequences and woe to the individual who provokes them! Many a resolution has sunk under the lash of their satire, which has condemned to eternal ridicule names that might otherwise have escaped notoriety. The *vis* or poison of the bard is more dreaded by the Rajput than the steel of the foe."

অর্থাৎ

"প্রভুর বিশেষ অপ্রীতিকর হইলেও সময়ে সময়ে চারণগণ নির্ভয়ে সত্য উচ্চারণ করিত। দুষ্ক্রিয়াসক্ত প্রভুর নীচ কার্য্যকলাপে বা অন্য কারণবিশেষে যখন তাহারা ক্রোধে পূর্ণ হইত, তখন তাহারা ফলাফলের ভয় রাখিত না। যে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ঐরূপে তাহাদের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বালিত

করিত, তাহাদের বিশেষরূপে ফলভোগ করিতে হইত। চারণদের বিদ্রূপের কশাঘাতে রাজন্যবর্গের অনেক উচ্ছৃঙ্খলতা দমিত হইয়াছে। কুকার্য্য করিয়া যাহারা দুর্ণামের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিত, তাহারা চারণদের জন্যই অনন্ত কালের নিমিত্ত সংসারে নিন্দিত হইয়া রহিয়াছে। এজন্য শক্রর তীক্ষ্ণ-ধার তরবারি অপেক্ষা চারণগণের লেখনীপ্রসূত বিষকে রাজপুতেরা অধিক ভয় করিত।"

এরূপ নির্ভীকতা ও সততা আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসলেখকদের মধ্যেও সকল সময়ে নয়নগোচর হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে বীর-কেশরীর ভ্রূভঙ্গে সমগ্র পাশ্চাত্যদেশ ভয়ে কম্পান্বিত হইয়াছিল, যাঁহার বীরত্ব-গৌরবে ফরাসী জাতির দেহে নব প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছিল, যে মহাবীরের অদ্ভুত রণকৌশল, অপূর্ব্ব ব্যূহরচনা, আশ্চর্য্য সৈন্যসমাবেশ ও অদৃষ্টপূর্ব্ব রণপাণ্ডিত্যে জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল, সেই প্রথিতযশা বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়নের ইতিহাস লিখিতে গিয়া এই সভ্যযুগে অনেক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকই নীচ জিঘাংসার বশবর্ত্তী হইয়া ঐতিহাসিকের পবিত্র আসন কলঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা কে না জানে? ভারতের ভট্টকবিগণ যে সেই প্রাচীন যুগে অকুতোভয়ে দেশের রাজেন্দ্রবৃন্দের চরিত্র যথাযথ অঙ্কিত করিয়াছেন, ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকা খণ্ডে যে ইংরাজ বুয়ের যুদ্ধ হইয়া গেল, তাহার নিরপেক্ষ সঠিক বৃত্তান্তই কি অদ্যাবধি কেহ অবগত হইতে পারিয়াছেন? অথবা এই প্রাচ্যভূমে বিশালকায় রণোন্মত্ত দুর্দ্ধর্ষ রুষজাতি নবোত্থিত ক্ষুদ্রবপু জাপানীর নিকট জলে স্থলে যে সর্ব্বতোভাবে পরাজিত হইল, তাহারই কি যথার্থ ইতিহাস এ পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে?

অতএব পাশ্চাত্যেরা রাষ্ট্রীয় ইতিহাস রক্ষার যতদূর গৌরব করেন, বাস্তবিক তাহার মূল্য তত অধিক নহে। দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরাজবর্ণিত ঘটনা ফরাসী সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না, ফরাসী জাতির লিখিত বৃত্তান্ত ইংরাজ মিথ্যা বলেন এবং মার্কিনের বর্ণিত ইতিহাস আবার তদুভয় জাতি স্বীকার করেন না। পাশ্চাত্য জাতিসকল পরস্পরের লিপিবদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনাবলির ঐরূপ মূল্য নির্দ্ধারণ করে, একথা ভাবিতে গেলে বর্ত্তমানকালেও ঐতিহাসিক সত্য যথাযথ নির্ণীত হওয়া দুঃসাধ্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

অন্তর্দর্শী ভারতবাসী মনকে জড়রাজ্যের নিত্যনিয়ামক জানিয়া মনোময় ভাবরাজ্যের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিতেই সর্ব্বকাল সচেষ্ট হইয়াছে। যাহা নশ্বর ও ক্ষুদ্র, যাহা অন্তঃকরণকে মলিন ও বিষয়াকৃষ্ট করে, যাহা বীভৎস ও অনুদার, ভারত তাহা চিরকাল উপেক্ষা করিয়াছে; তাই ব্রহ্মপুরাণ বলিতেছেন,—

যস্মিন্ শ্রুতে শ্রুতং সর্ব্বং জ্ঞাতে জ্ঞাতং কৃতে কৃতং।
বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মং সাক্ষাৎকারত্বমেষ্যতি॥
তদ্বৈ সর্ব্বপুরাণাগ্রং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদং।
নানাখ্যানেতিহাসাঢ্যং দশসাহস্রমুচ্যতে॥

যাহা শ্রবণ করিলে সমস্ত শাস্ত্রশ্রবণের ফল হয়, যাহা জানিলে সমস্ত বিষয় জানা যায় এবং যাহা অনুষ্ঠিত হইলে সমস্ত সুকর্ম্মই করা হয়, এমন বর্ণাশ্রমাচার-ধর্ম্ম এই পুরাণ সহায়ে প্রত্যক্ষীভূত হয়। ইহা ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদ, নানা আখ্যান ও ইতিহাস যুক্ত, সর্ব্বপুরাণশ্রেষ্ঠ এবং দশসহস্রশ্লোকান্বিত।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—

সূর্য্যবংশকথা পুণ্যা সোমবংশানুকীর্ত্তনং।
চতুর্থেহংশে মুনিশ্রেষ্ঠ নানারাজকথাচিতং॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ, এই পুরাণের চতুর্থাংশে সূর্য্যবংশের পুণ্যকথা, চন্দ্রবংশের কীর্ত্তি এবং নানা রাজাদিগের কার্য্যকলাপ সন্নিবিষ্ট আছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সূত, শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিতেছেন—

বিস্তরাণি পুরাণানি চেতিহাসশ্চ শৌনক।
সংহিতাঃ পঞ্চরাত্রাণি কথয়ামি যথাগমঃ॥

হে শৌনক! বিস্তর পুরাণ, ইতিহাস, সংহিতা, পঞ্চরাত্র যথাবিধানে তোমাদিগকে বলিতেছি।

অমর কোষে ঐতিহাসিক রচনার নিম্নলিখিত লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষলাভের উপদেশ সমন্বিত পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্ত রচনাকে ইতিহাস বলা হয়।

পূর্ব্বোক্ত বচনসকল হইতে মনে হয় যে, ভারতের ভাবে ভারতের ইতিহাস নিচিত যুগে যুগে সঙ্কলিত হইয়াছিল এবং পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহায়ে উহা আমরাই কালে জ্ঞাত হইয়া জগৎকে জানাইতে পারিব। সেজন্য আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তদ্বিষয়ে যেন আমরা যত্নবান্ হই।

দেশ কাল পাত্র ভেদে সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হওয়া হিন্দুর শাস্ত্রসঙ্গত। সেজন্য বর্ত্তমান যুগে ইতিহাস লিখিবার প্রণালী স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইলেও কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ঐ স্বতন্ত্র প্রণালী অবলম্বনে আমাদের ইতিহাস প্রণয়ন জগতে আমাদেরই করিতে হইবে। ভারতের ইতিহাস নাই, এ কলঙ্ক ক্ষালন করিতে আমরাই সমর্থ, এ বিষয়ে হতাশ হইবার আমাদের কোনই কারণ নাই। কারণ, আমাদের ঐতিহাসিক উপাদানগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে মাত্র। পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাস ত সেদিন হইতে যথার্থভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রথিতনামা ইংরাজ টড্ বলিয়াছেন—

"It must be recollected, moreover, that until a more correct taste was imparted to the literature of England and of France, by the study of the classical models, the chronicles of both these countries and indeed of all the polished nations of Europe, were at a much recent date, as crude, as wild and as barren, as those of the early Rajputs."

অর্থাৎ

'ইহা অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে পর্য্যন্ত না প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন আদর্শ পাঠে ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড অধিকতর বিশুদ্ধ রুচি সম্পন্ন হইয়াছিল, তত্দিন পর্য্যন্ত ঐ উভয়দেশের এবং ইউরোপের অন্যান্য সমস্ত জাতিসমূহের ইতিহাসও প্রাচীন রাজপুত জাতির কাহিনীর ন্যায় অসম্পূর্ণ, বিকৃত এবং উপাদানহীন ছিল এবং উহা অধিক অতীতকালের কথাও নহে।'

সুদূর সমুদ্রপার হইতে বিদেশী আসিয়া আমাদের দেশের পুরাতত্ত্ব উদ্ধার করিবার জন্য কত কঠোর শ্রম, কঠিন সাধনা ও আশ্চর্য্য অধ্যবসায় দেখাইতেছে, তাহা চিন্তা করিলে যুগপৎ বিস্ময় ও প্রশংসা করিবার ইচ্ছার উদ্রেক হয়। ভারতের সামান্য দ্রব্যটীরও প্রতি তাহাদের যে যত্ন, ভারতের আচার ব্যবহার ভাষা ধর্ম্ম জানিবার জন্য তাহাদের যে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়, ভারতের ইতিহাস

উদ্ধারকল্পে তাহারা যেরূপে প্রাণপাত করিতেছে, উহা কতকটা স্বার্থপ্রসূত হইলেও উহাতে তাহাদের মহত্ব ও উদারতা উপলব্ধি হয়। আর আমরা কি করিতেছি? আমরা আমাদের ভাষা জানি না; শাস্ত্র জানি না; দেশের জাতীয় জীবনের প্রবাহ কোন্ দিকে প্রবাহিত হইতেছে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কোন্ দায়িত্বভার আমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহা বুঝি না, বুঝিতেও চাহি না। ইহার মূল কারণ—আমরা আমাদের যথাযথ ইতিহাস জানি না এবং ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া জানিতে সম্যক্ চেষ্টাও করি না।

হে বঙ্গীয় যুবকমণ্ডলী! দলবদ্ধ হইয়া এই পবিত্র ব্রত গ্রহণ কর—ভারতের এ অভাব মোচনে সচেষ্ট হও। যতদিন না তোমরা কঠোর সাধনায় জাতীয় জীবনগঙ্গার পবিত্র ধারা পুরাকালে কোথা দিয়া কি ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে, নিরূপণে সমর্থ হইবে, যতদিন না তোমরা তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের পুরাবৃত্ত উদ্ধার করিতে পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তোমরা তোমাদের অদ্ভুত অতীতের সহিত বর্ত্তমানকে সম্বদ্ধ করিতে পারিবে না, ততদিন পর্য্যন্ত কালসমুদ্রে তোমাদের জাতীয় তরণী জীর্ণ ও মগ্ন রহিবে। একজনের দ্বারা এই ব্রত সাধিত হইবে না, একজনের দ্বারা জাতীয় ইতিহাস উদ্ধৃত হইবে না, একজনের দ্বারা এই বৃহৎ জাতীয় যজ্ঞ নির্ব্বাহিত হইবে না।

সুদূর অতীতের সূচিভেদ্য অন্ধকাররাশির ভিতরেও যে ক্ষীণ তীব্র কিরণরেখা বিমণ্ডিত "মহারত্নরাজি" দৃষ্টিগোচর হইতেছে, দূরাগত বীণা-বিনিন্দিত মোহন তানে তপোদ্দীপ্ত ঋষি ও চারণগণ যত্নদ্বারে অব্যক্ত গম্ভীর আহ্বান আমাদিগকে প্রেরণ করিতেছেন, আমরা কি সে "মহারত্নরাজি" উদ্ধার করিব না? সে বরদ শুভদ পুণ্যদ আহ্বানের কোন সাড়া দিব না?

সেবা ধর্ম্ম।*

[শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেন।]

অণু পরমাণু হইতে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্তর্নিহিত আত্মাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টার ফলেই, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদির উদ্ভব ও

* বিগত ৮ই আগষ্ট (১৯০৮) বিবেকানন্দ সমিতির অধিবেশনে পঠিত।

জীব জগতের সৃষ্টি। ছায়াপথে ভ্রাম্যমান তেজোরাশি আবর্ত্তন বিবর্ত্তন ফলে সূর্য্যাদিরূপে প্রকাশিত। আর সেই আবর্ত্তন বিবর্ত্তনে পতিত জড়াণু ক্রমে জীবাণু (protoplasm) রূপে প্রকাশিত।

আমরা যাহাকে জড় বলিয়া জানি, তাহার কথা ছাড়িয়া দিলেও, দেখিতে পাই, জীব মাত্রেই আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান্। এই চেষ্টাকেই জীবন-সংগ্রাম (struggle for existence) বলা যায়। আর এই জীবন-সংগ্রাম-ফলে জীব যে ভূয়োদর্শন (experience) লাভ করিতেছে, তাহাতে তাহার উত্তরোত্তর জ্ঞানের বিকাশ হইতেছে। এইরূপে সামান্য কীটাণুকীট হইতে, ক্রমশঃ মানবের জন্ম। জ্ঞানলাভই আবার মানবজীবনের লক্ষ্য। জ্ঞানলাভ-চেষ্টাই মানব-জীবনের সমস্ত কর্ম্মের নিয়ামক, সুখলাভেচ্ছা নহে। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"সুখ মানুষের চরম গতি নহে—জ্ঞান। সুখ, আনন্দ, এ সকলের ত শেষ হইয়া যায়। সুখই চরম গতি মনে করা মানুষের ভ্রম। জগতে যত দুঃখ আছে, তাহার কারণ, মানুষ অজ্ঞের মত মনে করে, সুখই আমাদের চরম গতি। কিছু দিন গত হইলে আবার মানুষ দেখিতে পায়, সে সুখের দিকে নয়, জ্ঞানের দিকে ক্রমাগত চলিয়াছে। সুখ দুঃখ উভয়েই তাহার মহা শিক্ষক। সে শুভ হইতে যেমন, অশুভ হইতে তদ্রূপ শিক্ষা পায়।"

——কর্ম্মযোগ।

এখন জ্ঞান লাভ বলিতে আমরা কি বুঝি? অর্থাৎ আমরা কি চাই? আমাদের অভাব মোচনের চেষ্টার ফলে এই বিষম জীবন-সংগ্রাম, এবং তাহার ফলেই জ্ঞান লাভ হয়—অতএব এই অভাব মোচনের ইচ্ছাকেই আমরা জ্ঞান-লাভের ইচ্ছা বলিতে পারি। মোট কথা, আমরা এমন একটা শক্তি চাই, যাহা পাইলে, আমরা ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারি, যাহা পাইলে জগতের আর সমস্ত শক্তি আমাদের করতলগত হয়। আমরা পূর্ণতা লাভ করিতে চাই। আমাদের ভিতর যে পূর্ণস্বরূপ আত্মা বিরাজ করিতেছেন, তাহাই আমাদের যথার্থ স্বরূপ; কারণ, জ্ঞাতভাবে বা অজ্ঞাতভাবে আমরা তাঁহাকেই চাই। আমরা সর্ব্বপ্রকারে সেই আত্মস্বরূপ বা আপনাকেই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

এখন, কিসে আমাদের এই চেষ্টা সহজে সম্পন্ন হয়—কিসে এই জীবন-সংগ্রামের পথ সুগম হয়? জগতের মনীষিগণ, সাধু মহাত্মা ও অগণন ধর্ম্মা-

চার্য্যগণ, সকল দেশের ভিন্ন ভিন্ন যুগের মহাপুরুষগণ ও অবতারেরা—সকলেই ঐ বিষয়ের এক একটী উপায় আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন বা আবিষ্কৃত পথে নিজেরা যাইয়া জগৎকে সেই সেই পথে লক্ষ্যে পৌঁছাইতে বলিয়াছেন। প্রত্যেকেই প্রথমে নিজে কোন এক পথ দিয়া যাইয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া পরে জগৎকে উহা জানাইয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে সেজন্যই নানা মত, নানা পথ পড়িয়া রহিয়াছে—যাঁহার যে পথে ইচ্ছা যাইতে পারেন; প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে শ্রদ্ধার সহিত যাইলে সব পথই সুগম, সব পথেই অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, ইহা তাঁহাদেরই কথা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "যত মত, তত পথ," যে পথে ইচ্ছা যাও, কিন্তু দেখিও যেন "ভাবের ঘরে চুরি না থাকে।"

দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে মানবের প্রকৃতি ও রুচির পরিবর্ত্তন হয়। মহাভারতকার ব্যাসদেব বলেন, 'দানমেকং কলৌ যুগে।' অন্যান্যযুগে তপস্যাদিতে সিদ্ধি লাভ হয় কিন্তু কলিকালে দানই একমাত্র ধর্ম্ম বা পূর্ণতা লাভের উপায়। এই দান শব্দের অর্থ কি? স্বামীজি বলিয়াছেন—

"দান শব্দে কি বুঝায়? ধর্ম্মদানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, তারপর বিদ্যাদান, তারপর প্রাণদান। অন্নবস্ত্র দান সর্ব্বনিকৃষ্ট-দান। যিনি ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করেন, তিনি আত্মাকে অনন্ত জন্মমৃত্যুপ্রবাহ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। যিনি বিদ্যাদান করেন, তিনিও আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের সহায়তা করেন। অন্যান্য দান, এমন কি, প্রাণ দান পর্য্যন্ত তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ।"

—ভারতে বিবেকানন্দ, ৩৭ পৃঃ।

ধর্ম্মদানই শ্রেষ্ঠ দান, তার পর বিদ্যাদান, তার পর প্রাণদান। অন্নদান সর্ব্বনিকৃষ্ট দান। কিন্তু দান, দয়াপ্রসূত। হৃদয় না থাকিলে দান করা যায় না। আর ধর্ম্মদানের অধিকার সকলের ভাগ্যে হয় না। নিষ্কাম, নির্দ্বন্দ্ব মহাত্মাগণেরই উহাতে অধিকার। যাঁহারা স্বার্থশূন্য, যাঁহাদিগকে সুখে দুঃখে বিচলিত করিতে পারে না, তাঁহারাই শুদ্ধ সত্ত্বগুণ সহায়ে ধর্ম্ম স্বরূপ ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন এবং তাঁহারাই জগৎকে ধর্ম্ম দান করিতে পারেন—অন্যের তাহাতে অধিকার নাই। কিন্তু বিদ্যাদান, প্রাণদান ও অন্নদান করিবার জনসাধারণের সকলেরই অল্পাধিক অধিকার আছে।

ভক্তকবি তুলসীদাস বলিয়াছেন, "দয়া ধরম কি মূল হৈ, পাপ মূল অভিমান।" কবি তখন জানিতেন না যে, তাঁহারই স্বজাতি হিন্দুগণ পরে পাশ্চাত্য শিক্ষার

বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া 'দয়া' শব্দেরও বিকৃত অর্থ করিবেন। অমুক দয়ার পাত্র, অতএব তাহাকে দয়া কর, ইত্যাদি রূপ ভাব সম্পূর্ণরূপে অনার্য্য। এরূপ দয়া অভিমানপ্রসূত, ও তাহা ধর্ম্মের মূল না হইয়া বরং পাপের মূল। মহা দীনতার প্রতিমূর্ত্তি, আচণ্ডালে প্রেমবিতরণকারী শ্রীচৈতন্যদেবের জীবে দয়া, জীবের প্রতি অনন্ত ভালবাসার পরিচায়ক—সেখানে অভিমান নাই, আছে কেবল মহা-প্রেম। ভারতবর্ষে পুরাকালে রাজন্যবর্গ দানে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিতেছেন, দেখিতে পাই। কুত্রাপি দেখিতে পাই না যে, তাঁহাদের মনে আধুনিক পরোপকার করা রূপ অভিমান জাগিয়াছে। হিন্দু আমরা ভারতীয় ভাষার মধ্যে যে কি ভাব, তাহাও ভুলিয়া যাইতে বসিযাছি। প্রসঙ্গক্রমে, এখানে একটি কথা বলি। আজ আমরা বিদেশী বস্ত্র, বিদেশী লবণ ও বিদেশী চিনি বর্জ্জন করিয়া স্বদেশী হইতে বদ্ধপরিকর, কিন্তু আমাদের অস্থিমজ্জায় এইরূপ যে সকল বিদেশী ভাব প্রবেশ করিযাছে, তাহা হইতে আমাদের নিজস্ব ভাব-গুলিকে রক্ষা করিবার উপায় আমরা কি করিতেছি?

স্বামীজি বলিতেন যে, আমরা বৈদান্তিক, আমরা দয়া করি না আমরা সেবা করি। পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত আমরা, 'দয়া' বলিলেই, তাহার বিকৃত অর্থ গ্রহণ করি। 'সেবা' শব্দের এখনও বিকৃতি ঘটে নাই।

স্বামীজি তাঁহার 'বর্ত্তমান ভারতের' একস্থলে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের যথাক্রমে বসুন্ধরা ভোগ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বৈষম্যতারতম্যে প্রসূত ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ সনাতন কাল হইতেই সকল সভ্য সমাজে বিদ্যমান আছে। কালপ্রভাবে আবার দেশভেদে ঐ চতুর্ব্বর্ণের কোন কোনটির সংখ্যাধিক্য বা প্রতাপাধিক্য ঘটিতে থাকে, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনায় বোধ হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ব্রাহ্মণাদি চারিজাতি যথাক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করিবে।"

ভূতকালের ইতিহাসতত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া, স্বামীজি ইহার যাথার্থ্যও নিরূপণ করিয়াছেন।

ইতিহাসে যাহাই থাকুক না কেন, ব্রাহ্মণাদির উন্নতির বা অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে, সেবাধর্ম্মের প্রভাব বা অভাবই তাঁহাদিগকে উন্নত বা অবনত করিয়াছে।

সভ্যতার প্রথম উন্মেষে "সমাজনেতৃত্ব ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত হস্তে।" (বর্ত্তমান ভারত, ১৮ পৃঃ) কারণ, "বৈদিক পুরোহিত মন্ত্রবলে বলীয়ান্,

দেবগণ তাঁহার মন্ত্রবলে আহূত হইয়া পান ভোজন গ্রহণ করেন ও যজমানকে অভীপ্সিত ফল প্রদান করেন। ইহলৌকিক মঙ্গলের কামনায় প্রজাবর্গ, রাজন্যবর্গও তাঁহার দ্বারস্থ।"—আবার "দৈববলের উপর মানব-বল কি করিতে পারে? মানব-বলের কেন্দ্রীভূত রাজাও পুরোহিতবর্গের অনুগ্রহপ্রার্থী।" (বর্ত্তমান ভারত, ১ম পৃঃ) ঐ গ্রন্থের আর এক স্থানে স্বামীজি বলিতেছেন, "পৌরোহিত্য শক্তির ভিত্তি বুদ্ধিবলের উপর, বাহুবলের উপর নহে; এজন্য পুরোহিতদিগের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাচর্চ্চার আবির্ভাব। অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জগতের বার্ত্তা ও সহায়তার জন্য সর্ব্ব মানব প্রাণ সদাই ব্যাকুল। সাধারণের সেথায় প্রবেশ অসম্ভব; জড়ব্যূহ ভেদ করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমী অতীন্দ্রিয়দর্শী সত্ত্বগুণপ্রধান পুরুষেরাই সে রাজ্যে গতিবিধি রাখেন, সংবাদ আনেন এবং অন্যকে পথ প্রদর্শন করেন। ইঁহারাই পুরোহিত, মানব সমাজের প্রথম গুরু, নেতা ও পরিচালক।" (বর্ত্তমান ভারত, ২৩ পৃঃ)

এই ধর্ম্মদাতা পুরোহিতই মানব সমাজের প্রথম নেতা, প্রথমে তাঁহারাই পূজা পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের অতুল প্রতাপ। পার্থিব সমস্ত শক্তিই তাঁহার পদানত—এমন কি "মানব শক্তির কেন্দ্রীভূত" রাজশক্তিও তাঁহার "অধ্যাত্মরূপ কশার তাড়নে নিয়মিত।" নির্দ্বন্দ্ব পুরুষের এতদূর ক্ষমতা কিসে হয়? কিসে রাজশক্তিও তাঁহার নিকট হীনপ্রভ? বহুজনের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত-জীবন বলিয়াই তাঁহার এত শক্তি। আমাদের ভিতর যে পূর্ণ স্বরূপ রহিয়াছেন, তাঁহারই বার্ত্তাবহ বলিয়াই পুরোহিতের অখণ্ড প্রতাপ। পুরোহিতের তপোবল, বিদ্যা ও ত্যাগ সমস্তই মানব সেবায় নিয়োজিত বলিয়াই তাঁহার পূজা, তাঁহার মান। এ বিষয়ে স্বামীজি যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"ধনজনমদোন্মত্ত ভূপালবৃন্দের যথেচ্ছাচাররূপ অগ্নিশিখা সকলকেই ভস্ম করিতে সক্ষম, কেবল ধনজনহীন দরিদ্র তপোবলসহায় পুরোহিতের বাণীরূপ জলে সে অগ্নি নির্ব্বাপিত। পুরোহিতপ্রাধান্যে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, পশুত্বের উপর দেবত্বের প্রথম বিজয়, জড়ের উপর চেতনের প্রথম অধিকার বিস্তার, প্রকৃতির ক্রীতদাস জড়পিণ্ডবৎ মনুষ্যদেহের মধ্যে অস্ফুটভাবে যে অধীশ্বরত্ব লুক্কায়িত, তাহার প্রথমবিকাশ। পুরোহিত জড় চৈতন্যের প্রথম বিভাজক, ইহ পরলোকের সংযোগ সহায়, দেব মনুষ্যের বার্ত্তাবহ, রাজা প্রজার মধ্যবর্ত্তী সেতু। বহু কল্যাণের প্রথমাঙ্কুর তাঁহারই তপোবলে, তাঁহারই বিদ্যানিষ্ঠায়, তাঁহারই ত্যাগমন্ত্রে, তাঁহারই প্রাণসিঞ্চনে সমুদ্ভূত; এজন্যই সর্ব্বদেশে

প্রথম পূজা তিনিই পাইয়াছিলেন, এজন্যই তাঁহাদের স্মৃতিও আমাদের পক্ষে পবিত্র।"

(বর্ত্তমান ভারত, ২৪ ও ২৫পৃঃ)

সর্ব্বভূতের কল্যাণে নিয়োজিতপ্রাণ, অতীন্দ্রিয় পদার্থ লাভে পার্থিবলাভালাভে সমদর্শী, স্পৃহাশূন্য পুরুষের নিকট 'পর' বা 'আপন' বলিয়া কিছু নাই। লৌকিক ভাষা ব্যবহার করিলেও, 'দয়া' বা 'দান', 'পর' বা 'আপন' প্রভৃতি সমস্ত শব্দই তাঁহাদের নিকট মহাপ্রেমের ভাবে অথবা সেবার ভাবে গৃহীত হয় নিশ্চয়। কারণ, তাঁহাদের ভিতর অন্যরূপ ভাবের একান্ত অভাব।

এইরূপে যতদিন ধর্ম্মদাতা, সাধারণের কল্যাণে ও সাধারণের সেবায় নিযুক্ত, ততদিন তাঁহার অক্ষুণ্ণ প্রতাপ, সমস্ত শক্তিই তাঁহার ইচ্ছাধীন। যেই তিনি সেবাধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলেন, যেই তাঁহাতে স্বার্থপরতা ঢুকিল, অমনি তাঁহার সমস্ত শক্তি শূন্যে বিলীন হইল। তাঁহার তপোবল, তাঁহার ত্যাগ, স্বার্থপরতায় বিনষ্ট হইল। তাঁহার বিদ্যা—অভ্যাস ও বিতরণের অভাবে গতপ্রাণ হইল। এ বিষয় স্বামীজি তাঁহার 'বর্ত্তমান ভারতে' বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন। প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইবার ভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না।

সর্ব্বকালে সেবাধর্ম্ম যিনিই আশ্রয় করিয়াছেন, তিনিই শক্তিমান হইয়াছেন। কারণ, সেবার দ্বারা বশীভূত হয় না, বোধ হয় এমন পশুও জগতে দুর্ল্লভ—মানবের কা কথা। কালে ক্ষত্রিয়কুলের যে তৎসহায়েই অভ্যুদয় হইয়াছিল, ইহাও সুনিশ্চিত। ক্ষত্রিয় তখন আর্ত্তের ত্রাতা, উৎপীড়কের শাস্তা। ক্ষত্রিয়কুল যতদিন এইরূপে সাধারণের সেবায় রত, ততদিনই তাঁহার প্রতাপ। তিনিই তখন মানব-সমাজের নেতা, তাঁহারই ইচ্ছায় তখন জনসাধারণ চালিত। সাধারণ-সেবায় দত্তজীবন না হইলে, ক্ষত্রিয় কেবল অসির বলে এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারেন না। যে সাধারণ-সেবার ফলে তাঁহার ক্ষত্রিয়-শক্তি বা রাজশক্তি লাভ হইয়াছে, তাহার অভাব হইলেই, শক্তিও শূন্যে অন্তর্হিত হইবে। যখনই রাজশক্তির অধীনস্থ সমস্ত প্রজা জানিতে পারে যে, ঐ শক্তি আর তাহাদের সেবায় নিয়োজিত নহে, স্বার্থসাধনায় রত, তখনই ঐ শক্তির লোপ স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাস ইহার প্রমাণ।

বৈশ্যও যখনি তাঁহার ধন ঐশ্বর্য্য সাধারণ সেবায় নিয়োজিত রাখিলেন, তখনি সমাজশক্তি তাঁহার আয়ত্তে আসিল। ঐরূপেই বৈশ্যকুলের আধিপত্য

ও প্রতাপ আমরা আধুনিক ইউরোপে বিস্তৃত হইতে দেখিতে পাই। এইরূপে পাশ্চাত্যেও যে সকল জাতি মহাশক্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছেন, সে সমস্ত জাতিও সেবার ফলে ঐ শক্তি লাভ করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে যে শক্তির খেলা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি, সেই ব্রিটীশ শক্তি বা ইংরাজ জাতির এত আধিপত্য, এত অভিনব ক্ষমতা, এত প্রতাপ কেন? যে জাতি পরসেবায় রত হইয়া আপনার স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না করিয়া জগৎ হইতে দাসত্বপ্রথা উঠাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, জগতের সমস্ত দাসজাতিকে স্বাধীনতা দিবার জন্য যে জাতি এক সময়ে নিজেদের রক্তপাতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই সেবাপরায়ণ জাতি যে, জগতের সমস্ত শক্তি কালে অধিকার করিয়া বসিবে, তাহার আর বিচিত্র কি?

পৃথিবীর অন্যান্য জাতি সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। যে যতদূর সেবাপরায়ণ হইয়াছে, তাহার ক্ষমতাও তদনুরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে প্রজাপুঞ্জই বাস্তবিক সর্ব্বকালে সকল শক্তির আধার। ইউরোপ বা যেখানেই হউক না কেন, বৈশ্য জাতি এই শক্ত্যাধার হইতে যত বিচ্ছিন্ন হইতেছে অর্থাৎ জনসাধারণের সেবা হইতে বিরত হইতেছে, ততই সে হীনবীর্য্য হইতেছে। এ সম্বন্ধে স্বামীজির কথা আবার উদ্ধৃত করিতেছি।

"সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক বা বাহুবলের দ্বারা বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, ততপরিমাণে তাহা দুর্ব্বল। কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা, যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে ছল বল কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়, তাহারা অচিরেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদূরিত হয়। পৌরোহিত্য-শক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাৎকালিক প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইল, রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়া প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে দুস্তর পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাধারণ প্রজাসহায় বৈশ্যকুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া গেল। এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থ সিদ্ধি করিয়াছে, অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে

আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, এই স্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।"

(বর্ত্তমান ভারত, ৪৯-৫০ পৃঃ)

যাহাদের সেবার ফলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের প্রতাপ, তাহারা শক্তিহীন কেন? স্বামীজি এ প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। "তাহাদের বিদ্যা নাই, আর আছে শূদ্রসাধারণ স্বজাতিদ্বেষ।" আর এক স্থানে বলিতেছেন, "সাধারণ প্রজা, সমস্ত শক্তির আধার হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া, আপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে এবং যতকাল এই ভাব থাকিবে, ততকাল রহিবে।" (বর্ত্তমান ভারত, ৫০ পৃঃ) বিদ্যাহীনতা ও দ্বেষভাবই তাহাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। দ্বেষভাবযুক্ত বলিয়া তাহাদের মধ্যে সেবাভাবের একান্ত অভাব। অথবা তাহারা পরস্পরের সেবায় বিরত বলিয়াই তাহারা দ্বেষভাবযুক্ত। সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই এইরূপ। আর সেই জন্যই ইহাদের দুঃখ দারিদ্র্য। স্বামীজির মহান্ হৃদয় ইহাদের জন্য বরাবর কাঁদিয়াছে।

স্বামীজি বলিতেছেন,—

"শোকসন্তপ্ত বিধবার অশ্রুবিন্দু মোচনে এবং পিতৃ-মাতৃহীন নিঃসহায় অনাথের মুখে এক মুষ্টি অন্ন প্রদান করিতে যে ভগবান্ বা যে ধর্ম্ম অক্ষম, সে ধর্ম্মে বা সেরূপ ভগবানে আমি বিশ্বাস করি না।"

—পত্রাবলি।

আবার যখন ভারতে থাকিয়া জনসাধারণের অন্নাভাব ও বিদ্যাহীনতা দেখিয়াছেন, তখনই ইহাদের সেবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে এই অন্নাভাবের দিনে ইহাদের সেবাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, তাহাও বলিয়াছেন।

"যাহার যেরূপ সাধ্য এক, দুই, ছয় বা দ্বাদশটি ক্ষুধিত ব্যক্তির অন্বেষণ করিয়া তাহাদিগকে সাদরে গৃহে আনিয়া, খাওয়ান, পরান এবং ভগবৎ-প্রতিমাদির যে ভাবে সেবা করা হয়, ইহাদিগেরও সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানে সেই ভাবে সর্ব্বপ্রকারে সভক্তি সেবা করাই—বর্ত্তমানকালে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।"

—ভারতে বিবেকানন্দ।

আর এক স্থানে বিদ্যা ও অন্ন উভয় বস্তুই যথাসাধ্য দান করিয়া তাহাদের সেবা করিতে বলিতেছেন—

"ইহকালে যে ভগবান্ আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, পরকালে তিনি আমাকে অনন্ত সুখে সুখী করিতে সমর্থ এবং করিবেন, একথা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে উন্নত করিতে হইবে, ভারতের দীন দুঃখীদের খাওয়াইতে হইবে এবং তাহাদের ভিতর বিদ্যার বিস্তার করিতে হইবে।"

—পত্রাবলি।

এই বিদ্যাদান ও অন্নদান আমরা সকলেই কম বেশী করিতে পারি। শিক্ষিত জনসাধারণ যদি উহার প্রয়োজনীয়তা না বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বুঝাইবার জন্য মহাজনদিগের কথা ও যুক্তি সহায়ে পুস্তকাদি প্রচার করিয়া তাঁহাদের ঐ ভ্রম সংশোধন করিতে আমরা যত্নবান্ হইতে পারি, অন্যান্য উপায়ও অবলম্বন করিতে পারি। উপায় অনেক আছে, স্বামীজি এ বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছেন, সে সমস্তের এ প্রবন্ধে স্থান হওয়া অসম্ভব। আমাদের কিন্তু এইটুকু জানিয়া রাখা উচিত যে, আমরা শিক্ষিত জনসাধারণের সেবাই করি অথবা অজ্ঞ বলিয়া পরিচিত দরিদ্র জনসাধারণের সেবাই করি, কিম্বা কেবলমাত্র দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, আতুরদের সেবা করি, সকল সেবাই সেবার উদ্দেশ্য ও তারতম্যানুসারে ফলপ্রদ।

ফল কামনা করিয়া সেবা করা সকাম সেবকের কার্য্য। নিষ্কাম সেবকই শ্রেষ্ঠতম সেবক। কারণ, সকাম সেবকের সেবা ব্যক্তিবিশেষে অথবা জাতি-বিশেষে আবদ্ধ; এবং পার্থিব ঐশ্বর্য্য লাভেই তাহার পরিসমাপ্তি। যদি ঐশ্বর্য্য-লাভে বা সমাজশক্তির উপর আধিপত্য লাভ করিয়া সকামী ব্যক্তির সমস্ত অভাব মোচন হইত, যদি তল্লাভে তাহার সমস্ত বাসনার নিবৃত্তি হইয়া পূর্ণতা লাভ হইত, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা হইত, কিন্তু সকাম সেবকের কি কখন ঐভাব আসিতে পারে?

নিষ্কাম সেবকের সেবা কোন জাতি বা ব্যক্তি বিশেষে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। কারণ, তাঁহার কোন কামনা নাই, লাভ লাভের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। সকলের মধ্যে যে অধীশ্বর আছেন, যে পূর্ণস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে সকল স্থানে ও সর্ব্বাবস্থায় উপলব্ধি করিবার জন্যই নিষ্কাম সেবকের সমস্ত আয়োজন ও উদ্যম। যদিও সমস্ত পার্থিব শক্তি তাঁহার পদানত হয়, তথাপি তাঁহার সেদিকে দৃষ্টি নাই। তাঁহাকে জনসাধারণ মানুক বা নাই মানুক, তাঁহাকে পূজা করুক বা তাঁহার উপর অত্যাচার করুক, তাঁহার সে দিকে দৃষ্টি নাই

—সর্ব্বভূতে সেই প্রেম স্বরূপ পূর্ণ স্বরূপকে উপলব্ধি করিবার জন্য, 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' জগতের সেবায় তিনি সদা রত থাকেন।

"হে প্রেমিক, স্বার্থ মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জ্জন।

ভিক্ষুকের কবে বল সুখ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল?
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।

অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
"দাও, দাও" যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।
ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়।

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

—বীরবাণী।

ইহাই নিষ্কাম সেবকের কথা। কিন্তু এরূপ সেবক জগতে নিত্য আসেন না। ইঁহাদের পাদস্পর্শে পৃথিবী ধন্য হয়। ইঁহারা নিত্য আসুন বা নাই আসুন, ইঁহাদেরই অমোঘ বাক্যে জগৎ চলিতেছে। ইঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সর্ব্বসমাজ আপনাদের গঠন করিবার চেষ্টা করে। যেখানে তাহা না করে, সেখানে ঐ সমাজ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

একবার পরমহংসদেব রাণী রাসমণির জামাতা মথুর বাবুর সঙ্গে ভ্রমণকালে তাঁহাকে কতকগুলি ছিন্নবস্ত্র রুক্ষকেশ অতি দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখাইয়া তাহাদের সেবা করিতে বলেন। এই ঘটনাটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি হইতে অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি—

"গ্রাম প্রান্তে একস্থলে বিস্তৃত প্রান্তরে।
অনাথ দরিদ্র দুঃখী লোক্ বাস করে॥
পত্রের কুটীর বাঁধা তাও ঢুলে যায়।
তরুতলস্থিত সেই হেতু রক্ষা পায়॥
অনশনে জীর্ণ শীর্ণ কৃশ কলেবর।
অনায়াসে গণা যায় বুকের পাঁজর॥
পরা শতগ্রন্থিযুক্ত মলিন বসন।
এত খাট, তাও নহে লজ্জা আবরণ॥

মূর্ত্তিমান্ দরিদ্রতা তথা বিদ্যমান।
দেখিয়া দয়াল প্রভু করুণা নিধান॥
ডাক ছাড়ি কাঁদিতে লাগিলা সেইখানে।
এমন কাঙ্গালী কভু না দেখি নয়নে॥
প্রভুর রোদন যত নাহিক অবধি।
সজল আঁখিতে কন শ্যামায় সম্বোধি॥
মা তুমি ভুবনকর্ত্রী তোমার এ রাজ্যে।
হেন দীন হীন দুঃখী ভাল নাহি সাজে॥"

* * * *

ইত্যাদিরূপে, দীনশরণ, জগতের দুঃখে কাতর পরমহংসদেব দরিদ্রদিগের জন্য বিলাপ করিয়া মথুর বাবুকে বলিতেছেন—এখানেও 'পুঁথি' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

"কখন না দেখিয়াছি কাঙ্গালী এমন।
উদর পূরায়ে দেহ অন্নাদি ব্যঞ্জন॥
সকলের দাও বস্ত্র গাত্র আচ্ছাদন।
যতদূর পার কর দুঃখ বিমোচন॥
কি কাঙ্গালী এরা, হেন কোথা ত্রিসংসারে।
বলিতে বলিতে জল দুনয়নে ঝরে॥

* * * *

* * * *

প্রভুর বচন শুনি শ্রীমথুর কয়।
কোথা পাব এত অর্থ, হবে বহুব্যয়॥
দয়াল স্বভাব তুমি দয়ার সাগর।
পর দুঃখে দ্রবে তব করুণ অন্তর॥
এত দরিদ্রের দুঃখ করিতে মোচন।
কোথায় পাইব বাবা রাশি রাশি ধন॥
তুমি নাহি জান বাবা অর্থের মরম।
তাই বল করিবারে বিশাল করম॥

শুনি প্রভু কর্কশে কহিলা আর বার।
জান না এ ত্রিভুবন মায়ের ভাণ্ডার॥
কাহার নাহিক দেখ এক কড়া কড়ি।
যার কাছে ধন সেই মায়ের ভাণ্ডারী॥
মায়ের ভাণ্ডারী মাত্র তুমি একজন।
তাঁর আজ্ঞা কর তুমি ধন বিতরণ॥'

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, ১৩৬-১৩৭ পৃঃ)।

ঠাকুর এখানে শিখাইতেছেন যে, ধন, সঞ্চয়ের জন্য নহে, বিতরণের জন্য, অনাথ দরিদ্রাদির সেবায় নিয়োজিত করিবার জন্য।

অর্থ সমাজের এক প্রধান শক্তি। সেবাকার্য্যেই এই শক্তি নিয়োজিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যে সমাজে এই শক্তির যথার্থ ব্যবহার না হয়, সে সমাজ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্বামীজি বলিয়াছেন,—

"শক্তিসঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকীরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। হৃৎপিণ্ডে রুধিরসঞ্চয় অত্যাবশ্যক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এক কালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্ব্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীকৃত। যদি তাহা না হইতে পায়, সে সমাজশরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"

(বর্ত্তমান ভারত, ৩১-৩২ পৃঃ)।

ঠাকুরের এই কথা—

"জান না এ ত্রিভুবন মায়ের ভাণ্ডার।
কাহার নাহিক দেখ এক কড়া কড়ি।
যার কাছে ধন সেই মায়ের ভাণ্ডারী॥"

প্রত্যেক ধনীর স্মরণ রাখা উচিত। স্বামীজির পূর্ব্বোদ্ধৃত কঠোর সত্যবাণী প্রত্যেক ধনী ও যাঁহার মধ্যে বিদ্যা বা অন্য কোন প্রকার শক্তি কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে, তাঁহারই স্মরণ রাখা উচিত। সমষ্টির কল্যাণে যে ব্যষ্টির কল্যাণ, এ মহাসত্য তাঁহার জানা উচিত। এরূপ অহঙ্কারী স্বার্থগতপ্রাণ ধনী প্রভৃতি অপেক্ষা সকাম সেবক অনেক ভাল। সকাম সেবক মহাজনদিগের

পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই চলিতে চেষ্টা করেন, কেবল তাঁহাদের বাসনা আছে বলিয়া তাঁহাদের শক্তি—সমাজ বা জাতি বিশেষের সেবায় ব্যয়িত। এই প্রকার সেবা করিতে করিতে সর্ব্বদা বিচারবুদ্ধি সঙ্গে রাখিয়া সর্ব্বকর্ম্মের ফলাফল বিচার করিতে করিতে অগ্রসর হইলে সকাম সাধকও কালে নিষ্কাম হইতে পারেন। এ সত্য আমরা ধর্ম্মরাজ্যে সর্ব্বদা দেখিতে পাই। রাজসিংহাসন-লাভেচ্ছু ধ্রুবও পরে নিষ্কাম ভক্ত হয়।

নিষ্কাম সেবকের কথা—'দাও আর ফিরে নাহি চাও।' তাঁহার বিশাল হৃদয় কেবল জগতের জন্য, নিজের জন্য এতটুকুও নহে। তিনি জগতের কল্যা-ণের জন্য বারবার জন্মগ্রহণ করিতে, এমন কি, মহানরকেও যাইতে প্রস্তুত। যে পূর্ণস্বরূপ সর্ব্বত্র বিরাজমান, যে প্রেমস্বরূপ সর্ব্বত্র থাকিয়া জগৎকে চালাই-তেছেন, সেই পূর্ণস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, জীবের মধ্যে অধিকতর বিকশিত বলিয়াই তিনি জীবসেবার জন্য উপদেশ দেন।

"জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

জীব সকলের মধ্যে মনুষ্যে আবার সেই পূর্ণস্বরূপ সমধিক বিকশিত ও এই মনুষ্যশরীরেই ঐ পূর্ণস্বরূপের উপলব্ধি হয়, শাস্ত্রে ইহা বলে। সেই জন্যই স্বামীজি বলিয়াছেন—মানবশরীরই ঈশ্বরাবাসের শ্রেষ্ঠতম মন্দির, সেজন্য উহাতে তাঁহার উপাসনা প্রতিমাদিতে উপাসনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।"

মানব-সেবা হইতে আরম্ভ করিলে তবে আমরা "সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়"-কে বুঝিতে অধিকারী হইবার আশা করিতে পারি। মানবের মধ্যে সাধু, সাধু-দিগের মধ্যে সিদ্ধ, ও সিদ্ধদিগের মধ্যে আবার মহাপুরুষ শ্রেষ্ঠ—ব্রহ্মের বিকাশ অনুসারে। আমরা—ভারতবাসী আমরা—আমাদের জাতীয় আদর্শানুসারে মহাপুরুষ, সিদ্ধ, সাধু ও পরে স্বজাতি ও মানবজাতির সেবায় ব্রতী হইলে আবার আমাদের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া আসিবে, একথা আর কি বলিতে হইবে?

মহাপ্রেম-চালিত হইয়া সকল মহাপুরুষই জগতের, বিশেষতঃ, মানবজাতির সেবায় তাঁহাদের মন প্রাণ শরীর সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা নিষ্কাম, তাঁহাদের কোন স্বার্থ নাই, তথাপি তাঁহারা সেবা হইতে বিরত হন নাই। তাঁহারা সেবাধর্ম্ম আচরণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়া যান। শিক্ষা দিয়া যান যে,

যে অভাব মোচনের জন্য এই ভীষণ জীবন সংগ্রাম; যে শক্তি লাভ করিলে আর সমস্ত শক্তিই করতলগত হয় ও পূর্ণস্বরূপকে লাভ করা যায়, তাহাও সেবাগম্য, সেবা দ্বারা আমাদের তাহা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য হয়।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?"

এই বহুরূপী বিরাটের সেবা দ্বারা আমাদের সমস্ত অভাব মোচন হইয়া সমুদয় আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হয় এবং মানব অনন্ত জ্ঞান ও শান্তির অধিকারী হইয়া পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়।

(প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়, তাহার সার মর্ম্ম এই স্থানে লিখিত হইল।)

সেবার অভাবেই ভারতের এইরূপ দুরবস্থা হইয়াছে। জিহ্বাচ্ছেদ, কাণে গরম শিশা ঢালিয়া দেওয়া ইত্যাদিরূপ অমানুষিক অত্যাচার যাহাদের উপর হইয়াছে, তাহাদের সেবা করাই এখন দরকার, তবেই আমাদের ঠিক ঠিক প্রায়শ্চিত্ত হয়। স্বামীজি বারবার বলিয়াছেন যে, ভারতের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে সেবাই বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু। আর এই সেবাধর্ম্ম আশ্রয় করিলেই ভারতের সর্ব্ব অভাব দূর হইবে।

মূর্ত্তি পূজা, উপাসনা আদিও সেবার মধ্যে গণ্য নিশ্চয়। তবে একটা বিষয় আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। পূর্ণতা লাভ করা বা মুক্তিই আমাদের সর্ব্বকর্ম্মের উদ্দেশ্য—ইহাই আমাদের জাতীয় ভাব। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, পূজাই করি বা যাহাই করি, আমরা আমাদের যে ইষ্টকে এক স্থানেই আজ অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছি, সেই ইষ্টকেই সর্ব্বভূতে আমাদের অনুভব করিতে হইবে। এইরূপ আদর্শ লইয়াই আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।

আজীবন পূজা, ধ্যানাদিতে মনকে ডুবাইয়া রাখা যিনি সম্ভব করিতে পারেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বদা অন্যান্য কর্ম্মও করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভারতে বর্ত্তমানে সেবার অত্যন্ত প্রয়োজন জানিয়াও জনসাধারণের সেবায় যে কেন নিয়োজিত হইবেন না, তাহার কোন কারণ দেখিতে পাই না। আহারাদির চেষ্টায় যাঁহাকে ফিরিতে হইবেই, তিনি যে বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার সময়, দরিদ্র বা পীড়িতের সেবার জন্য, কতকটা কেন না রাখিয়া দিবেন, তাহা বুঝিতে পারিনা। মূর্ত্তি পূজা, মহাপুরুষ সেবা, সাধু সেবা বা ভক্ত সেবা

সমস্তই সেই প্রেমময়কে একস্থানে দেখিবার চেষ্টা। তাঁহাকে সর্ব্বভূতে দেখিতে হইবে—এইটী মনে রাখিতে হইবে।

সেবা সম্বন্ধে স্বামীজি জগতে এক নূতন ভাব দিয়াছেন। "Bread, Bread, I do not believe in a God &c" ইত্যাদি ভাব একেবারে নূতন—তাঁহার অসীম প্রসারিত হৃদয়ের পরিচয়। মুক্তিকেও তুচ্ছ করিয়া পাপী তাপীর সেবার জন্য বারবার জন্ম গ্রহণ করিবার ইচ্ছা, এমন কি, মহানরকেও যাইবার ইচ্ছা—এ ভাবটি জগতে অভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব। "May I be born again and again", "My God the wicked &c" ইত্যাদি ভাব সেবাভাবের চূড়ান্ত পরিণতি। সেবার ঐরূপ উচ্চতম ভাব যিনি হৃদয়ে ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিবেন, তিনি পূজ্য সন্দেহ নাই।

হামিরপুর যাত্রা।

[শ্রীহরিতোষ দত্ত।]

আষাঢ় মাস। মঙ্গল বার। হিন্দুদিগের রথ যাত্রা উৎসব। "সোজা" রথ নহে, "উল্টা" রথ। আকাশ নবীন জলদ পটলে সমাচ্ছন্ন। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হইতেছে, কখন বা বন্ধ হইতেছে। একটু আলোকের আভাস পাওয়া যাইতেছে; আবার অন্ধকার হইতেছে; আবার বারিবর্ষণ। ভগবান্ মরীচিমালী যেন কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া, থাকিয়া থাকিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন! আমি নদিয়া জিলার অন্তর্গত শান্তিপুর গ্রামস্থ নিজবাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ষ্টিমার ষ্টেশনাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথ অতীব কর্দ্দমাক্ত। কোনক্রমে এই ঘোর বৈতরণী অতিক্রম করিয়া ষ্টিমার ঘাটে উপস্থিত হইলাম এবং হুগলির টিকেট লইলাম। মনে মনে কত কি ভাবিতে ভাবিতে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া বাষ্পীয় পোতে পদার্পণ করিলাম। একদৃষ্টে দেশের লোকজন ও প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম।

এইবার ষ্টিমার ছাড়িল। মুহূর্ত্তে পরিচিত স্থান সকল একে একে নয়নপথের বহির্ভূত হইল এবং নূতন নূতন দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। কোথাও শস্য-

শ্যামল প্রান্তর কোথাও হরিৎ পত্র বিভূষিত আম্র নিম্বাদি তরুরাজি সমন্বিত ভূখণ্ড, কোথাও বা নদীকূলে সারি সারি তৃণ কিশলয় রাজি তরঙ্গের সঙ্গে নানা রঙ্গে খেলা করিতেছে; কোথাও বা তীরের উপর ভগ্নাবশেষ কুটিরসমূহ—যেন কাতরপ্রাণে দর্শকবৃন্দকে আপন আপন অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছে। এইরূপে প্রকৃতি সতীর অপরূপ রূপরাশি সন্দর্শন করিতে করিতে ত্রিবেণীতে আসিয়া উপনীত হইলাম।

ষ্টিমারে গোপেশ্বর নামক এক আসানসোলযাত্রীর সহিত আলাপ করিয়া লইয়াছিলাম। সে ভদ্রলোক ত্রিবেণীতে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন। সুবিধা হইবে ভাবিয়া আমিও তাঁহার সহিত নামিলাম। ঘাটের উপর হইতে কয়েক হস্ত দূরেই ষ্টেশন। আমরা ষ্টেশনে গেলাম। ষ্টেশনটি সামান্য। দুইটী মাত্র গৃহ আছে; একটি অফিস-গৃহ, অপরটি আরোহীদিগের বিশ্রামস্থান। বিশ্রাম-গৃহ প্রাঙ্গন কঙ্কর-বিনির্ম্মিত, তদুপরি দুইখানি কাষ্ঠাসন (Bench) বিস্তীর্ণ; একখানি পুরুষদিগের, একখানি স্ত্রীলোকদিগের জন্য। রমণীগণের বিশেষ কোন বন্দোবস্ত নাই। তবে তাহাদিগকে পুরুষগণ হইতে পৃথক্ রাখিবার নিমিত্ত গৃহমধ্যে বিতস্তিমাত্র ব্যবধান পর্য্যবসিত দ্বিহস্ত উচ্চ কাষ্ঠ দণ্ড বিরচিত এক ক্ষুদ্র প্রাচীর বিরাজিত। উক্ত কাষ্ঠাসনে উপবেশন আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না, কারণ, পূর্ব্ব হইতেই উহা কয়েক ব্যক্তি কর্তৃক অধিকৃত ছিল। সেজন্য নিজ নিজ পোর্টম্যান্টোর উপর ক্লান্ত দেহভার স্থাপন করিয়া কোনরূপে আমরা কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া পরে টিকেট করিতে গেলাম। এখানে কানপুরের টিকেট মিলিল না; অগত্যা সঙ্গীর সহিত আসানসোলের টিকেট করিলাম।

দেখিতে দেখিতে বাষ্পীয় শকট ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল, আমরাও শকটারোহণ করিলাম। বহুক্ষণ ব্যাপিয়া ছারপোকাদিগের উদর পূর্ণ করার পর "খটং খটং খটাটং খটাটং" করিতে করিতে পুষ্পকরথ আমাদিগকে মগরা ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিল। এইখানে গাড়ী বদলাইতে হইবে, এজন্য আমরা উচ্চ কাষ্ঠসেতু অতিক্রম করিয়া এক প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে অপর প্ল্যাটফর্মে গমন করিলাম। অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। অনতিবিলম্বেই বাষ্পীয় শকট উপস্থিত হইল এবং আমরা আমাদের স্থান ঠিক করিয়া লইতে না লইতে পুনর্ব্বার কুণ্ডলায়মান অনর্গল ধূসর ধূমরাশি উদ্গীরণ করিতে করিতে উহা আমাদিগকে পশ্চিমাভিমুখে লইয়া চলিল। আমি তখন নির্নিমেষ-নয়নে পথের অদৃষ্ট-

পূর্ব্ব দৃশ্য বিলোকন করিয়া প্রাণে বড় ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলাম। দেখিলাম—কোথাও বিশাল প্রান্তর জলাভাবে বিদীর্ণবক্ষা, কোথাও অগণ্য মহীরুহ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া দর্শকহৃদয়ে শোকের উৎস উচ্ছলিত করিতেছে; কোথাও বা সরোবরসমূহ পঙ্কশেষ অবস্থায় বরুণদেবের নিকট নীরবে সকাতর প্রার্থনা জানাইতেছে।

এইরূপে অগ্রসর হইতে হইতে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অভিনব দৃশ্য নেত্রপথের অন্তর্ভূত হইল। দুর্গাপুর হইতে দেখিলাম, দূরে একখণ্ড প্রকাণ্ড নীলবর্ণ অচঞ্চল মেঘ মেদিনীপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া গম্ভীর ভাবে বিরাজ করিতেছে। এই ঘন নীলাম্বুদ আমার অধিকতর মনোরম বোধ হইতে লাগিল। কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঐটী কি?" উত্তরে চমৎকৃত হইলাম। শুনিলাম—উহা মেঘ নহে, 'শুশুনা' শৈল। ঐস্থলে এক শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতিবৎসর চৈত্র বারুণী দিবসে ঐ স্থানে মহাসমারোহে এক মেলার সমাবেশ হইয়া থাকে। বহু লোকের সমাগম হয়। 'পাহাড়' নাম শুনিয়া আমি অধিকতর ঔৎসুক্যের সহিত 'শুশুনা' শৈল দর্শন করিতে লাগিলাম; কারণ, এই আমার প্রথম পর্ব্বত দর্শন। বল্মীক দেখিয়াছি, শৈল-বিবরণ পাঠ করিয়াছি, মানচিত্র ও দৃশ্যপটাঙ্কিত গিরিরাজি অবলোকন করিয়াছি, তাহা হইতেই ভূধরাকৃতি মনোমধ্যে গঠিত করিয়াছিলাম; কিন্তু বাস্তবিক ভূধর যে কল্পনাগঠিত ভূধর হইতে এত বিভিন্ন হইবে এবং এই ভাবে নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিবে, ইহা কখনও পূর্ব্বে ভাবি নাই।

অনন্তর বিহারীনাথ শৈল আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। শুনিলাম—এখানেও একটী শিবলিঙ্গ বিরাজিত আছে, তাহার নাম বিহারীনাথ; উক্ত দেবমূর্ত্তির নামানুসারেই পর্ব্বতের নামকরণ হইয়াছে। প্রতিবৎসর শ্রীপঞ্চমীর দিন এই স্থলেও একটি মহতী মেলা হইয়া থাকে। লোকে তাহাকে 'ধারা' মেলা কহে। ধারা মেলায় তীর্থযাত্রীরা উক্ত শৈলস্থ পুণ্যতোয়া ধারা বা প্রস্রবণের নির্ম্মল সলিল স্পর্শ করিয়া শরীর মন পবিত্র বোধ করে।

দেখিতে দেখিতে বাষ্পীয় শকট এইবার রাণীগঞ্জের সমীপবর্ত্তী হইল। দেখিলাম—অদূরে অঙ্গার-পরিব্যাপ্ত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। কোথাও পাথুরিয়া কয়লা স্তূপাকারে বিরাজ করিতেছে; কোথাও পর্ব্বতাকার ভস্মরাশি পতিত রহিয়াছে; কোথাও মসীকৃষ্ণ লৌহনলসমূহ 'নীগার' মুখোৎক্ষিপ্ত সিগারধূমবৎ অজস্র

ধূম্রোদ্গীরণ করিতেছে; কোথাও বা প্রান্তরবক্ষ বিদারণ পূর্ব্বক আভ্যন্তরিক অনলের ধূম্রপুঞ্জ কিয়দ্দূর উত্থিত হইয়া গগনের অনন্ত কোলে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। এখন সন্ধ্যা সমাগত। প্রতীচীদিক্ সুবর্ণভূষায় বিভূষিত করিয়া, অংশুমালী দিনপতি ধীরে ধীরে অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিতেছেন। বিহঙ্গমনিচয় নানাদিগ্দেশ হইতে আপন আপন-নীড়াভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে। ষ্টেশনের দীপসমূহ প্রজ্বালিত হইতেছে। এই সময়ে আমরা আসানসোলে উপনীত হইলাম।

আসানসোলে আমাদিগকে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। ইতিমধ্যে আমি এখানকার বাজারটী পরিদর্শন করিয়া আসিলাম। ষ্টেশনের অতি সন্নিকটেই বাজার—নাতিক্ষুদ্র, নাতিদীর্ঘ। পথগুলি কঙ্কর-প্রস্তর-বিরচিত; বেশ প্রশস্ত; পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। আমি অতঃপর আহারাদি করিয়া কানপুরের একখানি টিকেট ক্রয় করিলাম; এবং সলিলধারাপানেপ্সু সতৃষ্ণ চাতকের ন্যায় বাষ্পীয় শকটের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। রাত্রি প্রায় ১১৷৷০টা হইল, শকটও নিয়মিত গতিতে নিয়মিত সময়ে ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু জনতাবশতঃ বহু চেষ্টা করিয়াও, আমি গাড়ীতে স্থানলাভ করিতে পারিলাম না। গাড়ী ছাড়িল; আমাদের প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহিল না। অগত্যা পরবর্ত্তী হাওড়া আম্বালা এক্সপ্রেস ট্রেনের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে উক্ত ট্রেন ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু এ গাড়িতেও "ন স্থানং তিলধারণে।" যাহা হউক, জনৈক ভদ্রলোকের অনুগ্রহে আমার অদৃষ্টস্রোত ফিরিল, একটী কামরায় স্থান মিলিল—বসিবার নহে, দাঁড়াইবার। দেখিলাম, মদশাপন্ন আর একটী লোক উক্ত কামরায় বর্ত্তমান। "নাই মামার চেয়ে কানা মামাই ভাল"—আমরা দাঁড়াইয়াই চলিলাম। ঈশ্বরের কৃপায় আমাদিগকে অধিকক্ষণ এ সুখভোগ করিতে হয় নাই। ঘণ্টাত্রয় পরে কয়জন লোক আমাদের কামরা হইতে অবতরণ করিলেন। আমরাও এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে নিরস্ত হইলাম না; উপবেশনোপযোগী একটু স্থান করিয়া লইলাম। দুঃখের ঘন অন্ধকারের পর একটু সুখের আলোক মিলিল; অবিরত একভাবে দণ্ডায়মান জনিত ঘোর ক্লেশের পর বসিয়া আরাম পাইলাম। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ"—সুতরাং আমাদেরই বা দুঃখের অবসান না হইবে কেন?

নিমেষে শকট লক্ষ্মীসরাই সমীপবর্ত্তী হইল। দেখিলাম, অদূরে এক বিশাল সমতল ক্ষেত্র। মাঝে মাঝে কুঞ্জাকারে অবস্থিত আম্রতরুবাজি বর্ষাকালীন আবিল

নদীগর্ভস্থ শস্যশ্যামল দ্বীপপুঞ্জবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। দেখিতে দেখিতে, নাইনির কারা, ভূধরশিখরবিরাজিত চুনার দুর্গ, শোনের বিপুল সেতু, প্রয়াগের যমুনা সেতু প্রভৃতি কত অভিনব দৃশ্য নয়ন সমক্ষে মুহূর্ত্তে আনীত ও মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। এইরূপে বুধবার সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পরে কানপুরে উপনীত হইলাম। স্বগ্রামবাসী জনৈক পরিচিত টিকেট কলেক্টরের বাসায় রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন পূর্ব্বাহ্নে আহারাদি সমাপনান্তে রেলওয়ে মেল সার্ভিসের (R. M. S.) কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে হামিরপুর যাত্রা করিবার গোডাকযান সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অবগত হইয়া একখানি একা ভাড়া করিয়া ঠাণ্ডি সড়কাভিমুখে যাত্রা করিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পর শকটচালক আমাকে উক্ত সড়কের যে স্থানে ঐ ডাক গাড়ির আড্ডা ছিল, তথায় আনয়ন করিল। বহু অনুসন্ধানের পর গোডাকযানের কণ্ট্রাক্টর ও টিকেট বিক্রেতা মুন্নালালজীর দোকানে আসিলাম। দেখিলাম, মুন্নালালজী অপরিস্রুত মলিন মাদুরাবৃত এক তক্তাপোষে উপবেশন করিয়া পীতবর্ণ দেশীয় কাগজে খতিয়ান্ লিখিতেছেন। আমি তাঁহার নিকট হামিরপুরের টিকেট প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন, "আমার নিকট সাড়ে আঠার আনা জমা দিলেই আপনি ডাক গাড়ীতে স্থান পাইবেন, রেলওয়ে মেল সার্ভিস ঘরের নিকট হইতে রাত্রি ১১॥০টার সময় গাড়ী ছাড়িবে; আপনি ইহার অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে উক্তস্থানে উপস্থিত থাকিবেন; আমাদের টিকেট দেওয়া পদ্ধতি নাই।" আমি অন্ততঃ একখানি রসিদ প্রার্থনা করিলে তিনি একটুক্‌রা কাগজে আমার নাম, গন্তব্য স্থানের নাম, ও জমার পরিমাণ উর্দ্দু ভাষায় লিখিয়া দিলেন। আমি রসিদ লইয়া এবার পদব্রজে বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া রাত্রির অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অনন্তর আহারাদি সমাপনান্তর বন্ধুবর্গের নিকট বিদায় লইয়া রাত্রি ১১টার সময় রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিলাম এবং প্রায় ১২টার সময় গোশকটারোহণ করিলাম।

কানপুর হইতে হামিরপুর ৪০ মাইল দূর। এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে রজনী প্রভাত হইল। সারা নিশি বিনিদ্র-শয়নে যাপন করিতে হইল। আবার গোডাক-যান (Mail cart) আরোহণের অপূর্ব্ব সুখও অনুভব করিতে হইল।

গাড়িখানি দ্বিতল, নীচের তলাটী অস্মদ্দেশীয় অশ্বযানানুরূপ। উপরতলা, সাধারণ গোযানের ন্যায়। নীচের তল, উপরতল হইতে প্রশস্ত থাকায় ঐ তলে বসাই অপেক্ষাকৃত সুখদ। কিন্তু কি করিব, ষ্টেশনে আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব

হওয়ায় আমাকে উপর তলেই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, বহু কষ্ট সহ্য করিয়া প্রত্যুষে প্রায় ৭টার সময় যমুনাতীরে উপস্থিত হইলাম। যমুনা দর্শন করিয়া কত ভাবলহরী মনোমধ্যে উছলিয়া উঠিতে লাগিল। অতীত দ্বাপরের কথা মনে পড়িয়া ভাবিলাম—এই কি সেই যমুনা—যাহার পবিত্র সলিলে বৃন্দাবন-বিলাসিনী সরলপ্রাণা কৃষ্ণগতমতি গোপিকাগণ কেলি করিতেন? এ কি সেই যমুনা, যাহার শীতল সলিল পান করিয়া শ্রীদাম সুদাম বসুদামাদি কৃষ্ণসহচরগণ ক্লান্তি অপনোদন করিতেন? এ যমুনা কি সেই, যাহা মদনমোহন বংশীধারীর সুমধুর বাঁশরী রব শ্রবণ করিয়া আনন্দে বীচিভঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া উজান বহিত? হায়, সে সুখের দিন চলিয়া গিয়াছে, সে সকলই একে একে অতীতের নিঃশব্দ গভীর গর্ভে স্থান লাভ করিয়াছে; শুধু স্মৃতি উদ্দীপনকারী যমুনার শীর্ণ কঙ্কাল পড়িয়া আছে!

অতঃপর সুখের ডাক-গাড়ী হইতে বহুকষ্টে নামিয়া নৌকাযোগে যমুনার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পরপারে উপনীত হইলাম এবং অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে পদব্রজে গন্তব্য স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম।

হামিরপুর, হামিরপুর জেলার কেন্দ্রস্থল। জেলান্তর্ভূক্ত যাবতীয় গ্রামের বিচার আচার সমুদয় এই স্থানেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি বহুলোকাধ্যুষিত নহে, এবং যাহারা আছে, তাহাদের কয়েকজন ব্যতীত অপর সমস্তই নিম্নশ্রেণীর হিন্দুস্থানী—বাঙ্গালীর সংখ্যা এখানে অতি অল্প। যে ছয় সাত জন আছেন, তাঁহাদের কেহই স্থায়ী নহেন।

এখানে হিন্দু দেব দেবীর বহুমূর্ত্তি আছে। আমাদের বাসার সন্নিকটেই বলদেবজীর মন্দির। ইহা অধুনা হামিরপুরের খাজাঞ্চীর অধিকার ভুক্ত। একদিন আমি মন্দির দর্শনার্থ গমন করিলাম। দেখিলাম—এই দেবালয় প্রবেশমার্গের দুই পার্শ্বে অযত্নরক্ষিত কুসুমবাটিকা। অনন্তর মন্দির পাদদেশে উপনীত হইয়া দ্বারের উভয় পার্শ্বে ও শিরোদেশে বহু দেব দেবীর চিত্র অঙ্কিত দেখিলাম। পরে উপানৎ মোচন করিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গন অতিক্রম করতঃ শ্রীশ্রীবলদেবজীর সুন্দর বিগ্রহ দর্শন করিয়া প্রণাম করিলাম।

একদিন পাতালেশ্বরজীর মন্দির দর্শনে অভিলাষ হইল। মন্দিরে যাইবার "ঘুটিং" নির্ম্মিত অসমতল পথটি কোথাও উচ্চে উঠিয়াছে আবার নীচে নামিয়াছে এইরূপে কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া মন্দির সমীপে উপনীত হইলাম। মন্দির-

পুরোভাগে নাতি উচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত এক প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনটী মৃত্তিকা-বিলেপিত, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং নিবিড় পল্লব বল্লরী বিশোভিত চতুষ্পার্শ্বস্থ অশ্বত্থ তরুকুলের ছায়ায় সুশীতল। মার্তণ্ডদেবের প্রখর কিরণজাল এস্থানে প্রবেশ করে না, পত্রাবলীর অভ্যন্তর হইতে উঁকি মারিয়াই ক্ষান্ত হয়। উক্ত প্রাঙ্গনের চারিদিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার চারিটী মন্দির। এই ক্ষুদ্রতর মন্দিরগুলির অভ্যন্তরে সিন্দূর-চন্দন-বিল্বপত্র-বিশোভিত-তনু কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড বিরাজিত। বঙ্গদেশের ষষ্ঠী পঞ্চানন্দের ন্যায় ইঁহারাও ভক্তগণের পূজালাভে বঞ্চিত হয়েন না। প্রাঙ্গনমধ্যস্থ প্রধান মন্দিরে ৺পাতালেশ্বরজীর দর্শন হয়। এই মন্দির-গৃহতল চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমিখণ্ড হইতে তিন চারি হাত নিম্নে অবস্থিত। দেখিলে মনে হয়, ঠিক যেন প্রাঙ্গন মধ্যস্থলে একটি গোলাকার গহ্বর রহিয়াছে। উহারই ভিতর অসিত পাষাণের এক শিবলিঙ্গমূর্ত্তি অচল অটলভাবে দণ্ডায়মান! মূর্ত্তিটির সর্ব্বাঙ্গ ভক্তবৃন্দপ্রদত্ত বিল্বপত্রাবলী সমাচ্ছন্ন সুতরাং উপরিস্থ বিতস্তি-প্রমাণ অংশ ব্যতীত আর কিছুই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। লোকে বলে, ইনি স্বয়ং পাতাল হইতে উত্থিত হইয়াছেন, এজন্যই ইঁহার নাম পাতালেশ্বর হইয়াছে। ইঁহার নিয়মিত পূজার নিমিত্ত কোন পুরোহিত নিযুক্ত নাই; যে কেহ ইচ্ছা করিলেই ইঁহার অর্চ্চনা করিতে পারে। এখানকার লোকেরা মন্দির-সমীপবর্ত্তী যমুনায় স্নান করিয়া গৃহ প্রতিগমন কালে যমুনাজল ও বিল্বদলে ইঁহার অর্চ্চনা করে।

৺পাতালেশ্বরজীকে দর্শন ও প্রণামাদি করিবার পর যে পথ দিয়া মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলাম, পুনরায় সেই ইষ্টকবিরচিত সমতল অথচ ক্রমোন্নত সঙ্কীর্ণ পথ বাহিয়া প্রায় পঞ্চবিংশতি হস্ত যাইয়া পূর্ব্বোক্ত মন্দিরপ্রাঙ্গন পাইলাম। ঐ সঙ্কীর্ণ পথ পার্শ্বস্থ এক মৃত্তিকাগৃহে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাষাণ-পুত্তলীও দর্শন করিলাম; কিন্তু ঐ গুলি কোন্ দেবতা, তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না।

অতঃপর কিঞ্চিৎদূর অগ্রসর হইয়া অপর একটী মন্দির সমীপে উপনীত হইলাম। মন্দিরদ্বারের উপরিভাগে এক চতুষ্কোণ শ্বেত প্রস্তরখণ্ডে "রাধা-কিষণজীকা মন্দির" এই কয়টী কথা অস্পষ্ট দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত দেখিলাম। অতঃপর উপানৎ উন্মোচন করিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মধ্যস্থলে অমল ধবল নাতিদীর্ঘ নাতিপ্রশস্ত প্রাঙ্গন। চতুষ্পার্শ্বে স্তম্ভরাজি পরিশোভিত সুদৃশ্য দালান। দালানতল প্রাঙ্গনতল হইতে কিঞ্চিদুন্নত এবং দালানের প্রত্যেক

স্তম্ভ-সমীপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'টবে' নানাবিধ সুন্দর ছোট ছোট পুষ্পিত গাছ সকল থাকায় প্রাঙ্গনের রমণীয়তা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। দালানের দেয়াল বিবিধ বিচিত্র চিত্রপটে বিভূষিত হইয়া দর্শকের নয়ন মন আকর্ষণ করিতেছে। কোথাও বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত লীলা, কোথাও পার্ব্বতীসুত গজাননের গম্ভীর ভাব, কোথাও উমাপতি মহেশ্বরের সৌম্য ভীষণ দর্শন, কোথাও বা রাম রাবণের লোমহর্ষণ যুদ্ধ ব্যাপার ইত্যাদি বহুবিধ পৌরাণিক বিষয় সকল চিত্রপটে প্রকটিত রহিয়াছে। কড়িকাষ্ঠসংলগ্ন বস্ত্রাবৃত ঝাড়লণ্ঠনসমূহ দর্শকহৃদয়ে বিহঙ্গপিঞ্জর-ভ্রম জন্মাইতেছে। এতদ্ব্যতীত দেবগৃহদ্বারের উভয় পার্শ্বেও কয়েকখানি চিত্রপট বস্ত্রাবৃত দেখিলাম। এবং অভ্যন্তরীণ গৃহপাত্রে আয়তাকার দুই খণ্ড কার্পেটের উপর পশম বিরচিত দুইটী শুকপক্ষীও আমার নেত্র আকর্ষণ করিল। পাখী দুইটী অতি সুন্দর, বোধ হইতেছে, যেন জীবন্ত বিহগ নীরবে আসীন রহিয়াছে। গৃহমধ্যে বেদিকার উপর প্রকৃতিপুরুষরূপা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি বঙ্কিম ত্রিভঙ্গিমঠামে বিরাজমান—নিরাকার হইয়াও ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ হরি ভক্ত হৃদয়ের বাসনা পূরণার্থ ত্রিসহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে যে সাকাররূপে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরং॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ং॥

"বুদ্ধিভ্রংশকারী হিংসাপ্রচুরা তামসী ও কামদর্পাদিবহুলা রাজসী প্রকৃতিদ্বয় আশ্রয় করিয়া নিষ্ফলাশ নিষ্ফলকর্ম্মা নানাকুতর্কাশ্রিত বৃথা-শাস্ত্র-জ্ঞান-বিশিষ্ট বিপরীতবুদ্ধিরা, আমিই যে মহেশ্বর এই পরমতত্ত্ব না বুঝিয়া, ভক্তেচ্ছাবশতঃ মানুষ-দেহাশ্রিত আমাকে অবজ্ঞা করে; কিন্তু দৈবপ্রকৃতিযুক্ত মহাত্মারা অনন্যমনা হইয়া আমাকে জগৎকারণ ও নিত্য জ্ঞান করতঃ উপাসনা করে।"

ভগবানের সেই সকল অমৃতময়ী বাণী স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষ মোচন কার্য্য।

বিগত ১৫ই নবেম্বর বিতরণ হইয়া মুর্শিদাবাদ জেলার মহুলা ও সোমপাড়া কেন্দ্র এবং বিগত ১৮ই ও ২১শে নবেম্বর তারিখে বিতরণ হইয়া পুরীজেলার ফতেপুর ও তিতিপ কেন্দ্র বন্ধ করা হইয়াছে। সেবকগণ সকলেই বেলুড়মঠে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়া রামকৃষ্ণ মিশনকে এতদিন পর্য্যন্ত দরিদ্রসেবারূপ মহৎ কর্ম্ম করিতে সক্ষম করিলেন, মিশনের প্রেসিডেণ্ট তাঁহাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন। এখন আর দুর্ভিক্ষ ফণ্ডের জন্য টাকা কড়ি পাঠাইবার প্রযোজন নাই। সমুদয় কার্য্যের রিপোর্ট ও আয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত হইতেছে। উহা শীঘ্রই মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। কার্ত্তিক মাসের উদ্বোধনে প্রাপ্তিস্বীকারের পর আরও যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি সাহায্য পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও সাহায্য পরিমাণ প্রকাশিত হইল। আশ্বিন মাসের উদ্বোধনে ভুলক্রমে স্বামী ত্রিগুণাতীতের নামে দুর্ভিক্ষ ফণ্ডের ৯২্ টাকা জমা হইয়াছে। সুতরাং ঐ টাকা বাদ দিলে প্রকৃত পক্ষে পূর্ব্বস্বীকৃত জমা সর্ব্বশুদ্ধ ১৪০৬২ ৮৵৬পাই হইবে।

পূর্ব্বে স্বীকৃত (সংশোধিত)	১৪০৬২৸৵৬	শ্রীকোটীশ্বর গুহ	২্
লিয়াকৎ হোসেন পার্টি, কলিকাতা	৫্	বেলুড় মঠের দুর্ভিক্ষ বাক্স	২্
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনী, লাহোর	৪২৷৷৵	শ্রীশিশির কুমার পাল	১/০
শ্রীব্রজ নাথ দত্ত, কলিকাতা	৬্	শ্রীচেক কৃপালি বেঙ্কট রাও	৫্
শ্রীরজনী কান্ত বসু	২্	বি. বসু	৫্
শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবী	৫০০্	মেম্বার, ফ্রেণ্ডস ক্লব, শান্তিপুর	১।৵০
সি অকম খাঁ	১২৷৷০	জি, কে, বসু, শিলং	৭্
শ্রীরাধানাথ সিংহ	৫্	শ্রীসারদা প্রসাদ সিংহ, যশোহর	২্
শ্রীশ্রীশ চন্দ্র মিত্র	৫্	শ্রীশ্রীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাতক্ষীরা	৫্
শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গুপ্ত	৪৸০	পুরীর কলেক্টর, সাহেব	২৫০্
জনৈক হিন্দু মহিলা	৫্		
শ্রীটিকন দাস রাওজী	৫্	মোট	১৪১৩২।০

সংবাদ।

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ ৺পুরীধামে কয়েকমাস নির্জ্জন বাস করিয়া অল্প দিন হইল মান্দ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে গমন করিয়াছেন. ইহা সংবাদ পত্র পাঠকগণ অবগত আছেন। বিগত ২২শে নবেম্বর মান্দ্রাজের চুলাই নামক পল্লীতে অবস্থিত 'স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু বালিকা পাঠশালার' কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি উক্ত বিদ্যালয়ে

পদার্পণ করেন। এই বিদ্যালয় স্বামীজির কতক গুলি উৎসাহী ভক্ত কর্তৃক প্রায় এক বৎসরের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৯৫টী বালিকা লইয়া এই বিদ্যালয় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতাগণের উদ্যোগে এক্ষণে ছাত্রী-সংখ্যা ২৬৫টীতে দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ ও প্রধান প্রধান শিক্ষকগণ এবং একটী দেশীয় সঙ্গীত দল বিদ্যালয় গৃহ হইতে কিছুদূর অগ্রে আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। তথায় তাঁহার সম্মানার্থ একটী অভিনন্দন পত্র পঠিত হইল। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ অভিনন্দনে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহার সতীর্থগণের দ্বারা সমগ্র জগৎ কতদূর উপকৃত হইয়াছে জানাইয়া বলিলেন, অদ্য রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্টের শুভাগমনে আমরা কৃতার্থ হইলাম এবং বিদ্যালয়গৃহও পবিত্র হইল। পরে বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্তৃক সেদিনকার অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহ হইলে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বক্তৃতান্তে স্বামিগণকে মাল্য প্রদান ও তাঁহাদের শুভাগমনের জন্য পুনরায় উৎসাহ-সহকারে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভাভঙ্গ হইল। মঠে ফিরিবার সময় পথে হিন্দু বালক বিদ্যালয়ের সভ্যগণ তাঁহাদের গাড়ী থামাইয়া ফুল ফল উপহার প্রদান করিলেন এবং প্রেসিডেন্টের গাড়ীর সম্মুখে আরাত্রিক করিলেন।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, বোম্বাই নিবাসী জনৈক সহৃদয় ভদ্র মহোদয় কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ৫০০৲ টাকা মূল্যের এলো-প্যাথিক ঔষধ ও ২২৫৲ মূল্যের চাউল ও গম প্রদান করিয়াছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি মহাশয় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ উক্ত সভায় স্বামী বিবেকানন্দের একখানি মনোহর তৈলচিত্র উপহার প্রদান করিয়াছেন। পরিষদের নূতন গৃহে ঐ চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আগামী ৪ঠা মাঘ, ১৭ই জানুয়ারি বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মমহোৎসব উপলক্ষে শাস্ত্রাদি পাঠ, সঙ্গীতাদি ও দরিদ্র 'নারায়ণ' গণের সেবা হইবে।

ভাষ্য। স্বকর্ম্মণা ভগবতোঽভ্যর্চ্চনভক্তিযোগস্য সিদ্ধিপ্রাপ্তিঃ ফলং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা। যন্নিমিত্তা জ্ঞাননিষ্ঠা মোক্ষফলাবসানা স ভগবদ্‌ভক্তিযোগোঽধুনা স্তূয়তে শাস্ত্রার্থোপসংহারপ্রকরণে শাস্ত্রার্থনিশ্চয়দার্ঢ্যায়। সর্ব্বকর্ম্মাণি প্রতিষিদ্ধান্যপি সদা কুর্ব্বাণোঽনুতিষ্ঠন্ মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ অহং বাসুদেব ঈশ্বরঃ ব্যপাশ্রয়ো যস্য স মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ ময্যর্পিতসর্ব্বাত্মভাব ইত্যর্থঃ। সোঽপি মৎপ্রসাদাৎ মমেশ্বরস্য প্রসাদাৎ অবাপ্নোতি শাশ্বতং নিত্যং বৈষ্ণবং পদমব্যয়ম্। ৫৬।

ভাষ্যানুবাদ। স্বকর্ম্মের দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনারূপ ভক্তিযোগের ফল সিদ্ধিপ্রাপ্তি (অর্থাৎ) জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যতা, সেই ভক্তিযোগ লাভ হইলে জ্ঞাননিষ্ঠা হয় এবং সেই জ্ঞাননিষ্ঠার ফল মোক্ষলাভ সেই ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগের, এই শাস্ত্রার্থের উপসংহার প্রসঙ্গে স্তুতি করা হইতেছে, এই প্রকার স্তুতির দ্বারা (অধিকারী সাধকের) শাস্ত্রার্থে নিশ্চয় দৃঢ় হইয়া থাকে। সর্ব্বকর্ম্মের—(উহা) প্রতিষিদ্ধ হইলেও—সর্ব্বদা যদি কেহ অনুষ্ঠান করে কিন্তু সে যদি "মদ্ব্যপাশ্রয়" হয়, অর্থাৎ আমি বাসুদেব ঈশ্বর, আমাকেই যে সর্ব্বাত্মভাবে আশ্রয় করিয়া থাকে অর্থাৎ আমাতেই সর্ব্বপ্রকার আত্মভাবকে যে অর্পণ করে, সেই মদ্ব্যপাশ্রয়, সেই সর্ব্বকর্ম্মকারী মদ্‌ব্যপাশ্রয় (সাধক) আমার অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রসাদে "শাশ্বত" নিত্য "অব্যয়" অবিনাশি বৈষ্ণব পদকে প্রাপ্ত হয়। ৫৬।

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥ ৫৭॥

অন্বয়। মৎপরঃ চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য সততং মচ্চিত্তোভব। ৫৭।

মূলানুবাদ। মৎপর হইয়া সকল কর্ম্ম আমাতে (মনে মনে) সন্ন্যাস কর, এবং বুদ্ধিযোগকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা আমার চিন্তা করিতে থাক। ৫৭।

ভাষ্য। যস্মাদেবং তস্মাৎ চেতসা বিবেকবুদ্ধ্যা সর্ব্বকর্ম্মাণি দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি ময়ীশ্বরে সন্ন্যস্য যৎ করোষি যদশ্নাসি ইত্যুক্তন্যায়েন মৎপরঃ অহং বাসুদেবঃ পরোযস্য তব স ত্বং মৎপরঃ সন্ বুদ্ধিযোগং ময়ি সমাহিতবুদ্ধিত্বং বুদ্ধিযোগঃ তং বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য আশ্রয়ঃ অনন্যশরণত্বং মচ্চিত্তঃ ময্যেব চিত্তং যস্য তব স ত্বং মচ্চিত্তঃ সততং সর্ব্বদা ভব। ৫৭।

ভাষ্যানুবাদ। যেহেতু এইরূপ. সেই জন্য, "চেতঃ" বিবেকবুদ্ধি, তাহার সাহায্যে সর্ব্বকর্ম্ম অর্থাৎ যে কর্ম্মের ফল ঐহিক এবং যে কর্ম্মের ফল পারত্রিক এইরূপ সকল কর্ম্মই, আমাতে ঈশ্বরে, সন্ন্যাস করিয়া (কিরূপভাবে?) "যাহা করিতেছ, যাহা ভোজন করিতেছ" (তাহা সকলই আমাতে অর্পণ কর) এই পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে (আমাতে অর্পণ করিয়া) "মৎপর" আমি বাসুদেবই যাহার প্রধান (আশ্রয়) সেই মৎপর (এইরূপে) তুমি মৎপর হইয়া এবং বুদ্ধিযোগকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ আমাতে বুদ্ধিকে সমাহিত করাই বুদ্ধিযোগ, সেই বুদ্ধিযোগকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা "মচ্চিত্ত" হও; আমাতেই যাহার চিত্ত সংলগ্ন থাকে, সেই মচ্চিত্ত। এই শ্লোকে যে আশ্রয় করিবার কথা বলা হইয়াছে, সেই আশ্রয় শব্দের অর্থ অনন্যশরণত্ব। ৫৭।

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়। মচ্চিত্তঃ মৎপ্রসাদাৎ সর্ব্বদুর্গাণি তরিষ্যসি অথ চেৎ ত্বম্ অহঙ্কারাৎ ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি। ৫৮।

মূলানুবাদ। আমাতে (সর্ব্বদা) চিত্ত অর্পণ করিয়া থাক, তাহা হইলে আমার প্রসাদে সকল প্রকার বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। আর যদি অহঙ্কার বশতঃ আমার কথা না শুন, তাহা হইলে, বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ৫৮।

ভাষ্য। মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি সর্ব্বাণি দুস্তরাণি সংসারহেতুজাতানি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি অতিক্রমিষ্যসি। অথ চেৎ যদি ত্বং মদুক্তং অহঙ্কারাৎ পণ্ডিতোঽহমিতি ন শ্রোষ্যসি ন গ্রহীষ্যসি ততস্ত্বং বিনঙ্ক্ষ্যসি বিনাশং গমিষ্যসি। ৫৮।

ভাষ্যানুবাদ। মচ্চিত্ত হইলে "সর্ব্বদুর্গ" সকল প্রকার দুস্তর সংসারহেতুকে তুমি তরণ করিবে অর্থাৎ অতিক্রমণ করিবে আমার অনুগ্রহে। আর যদি আমি পণ্ডিত এই প্রকার অহঙ্কার বশতঃ আমার কথা না শুন অর্থাৎ গ্রহণ না কর, তাহা হইলে, বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ৫৮।

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়। অহঙ্কারং আশ্রিত্য ন যোৎস্যে ইতি যৎ মন্যসে এষ তে ব্যবসায়ঃ মিথ্যা তে প্রকৃতিত্বাং নিযোক্ষ্যতি। ৫৯।

মূলানুবাদ। অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া তুমি ভাবিতেছ যে, আমি যুদ্ধ করিব না; ইহা তোমার মিথ্যা নিশ্চয়, তোমার প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধ করাইবে। ৫৯।

ভাষ্য। ইদং চ ত্বয়া ন মন্তব্যং স্বতন্ত্রোঽহং কিমর্থং পরোক্তং করিষ্যামীতি। যচ্চৈতং ত্বমহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্যে ইতি যুদ্ধং ন করিষ্যামীতি মন্যসে চিন্তয়সি নিশ্চয়ং করোষি, মিথ্যৈষ ব্যবসায়ো নিশ্চয়স্তে তব যস্মাৎ প্রকৃতিঃ ক্ষত্র-স্বভাবত্বাং নিযোক্ষ্যতি। ৫৯।

ভাষ্যানুবাদ। আমি স্বাধীন, সুতরাং কেন আমি পরের কথানুসারে কার্য্য করিব? এই প্রকার অভিমান তুমি করিও না (ইহাই বলিতেছেন) অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া আমি যুদ্ধ করিব না, এই প্রকার তুমি যে চিন্তা করিতেছ অর্থাৎ নিশ্চয় করিতেছ, তোমার এই "ব্যবসায়" নিশ্চয় মিথ্যা (কারণ) তোমার "প্রকৃতি" ক্ষত্রিয় স্বভাবই তোমাকে (যুদ্ধে) নিযুক্ত করিবে। ৫৯।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়। হে কৌন্তেয়! যৎ মোহাৎ কর্ত্তুং ন ইচ্ছসি তৎ স্বভাবজেন স্বেন কর্ম্মণা নিবদ্ধঃ সন্ অবশোঽপি করিষ্যসি। ৬০।

মূলানুবাদ। হে কৌন্তেয়, মোহবশতঃ যাহা করিতে চাহিতেছ না, নিজ স্বভাবজ কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হইয়া অবশভাবেই তোমাকে সেই কার্য্য করিতে হইবে। ৬০।

ভাষ্য। যস্মাচ্চ স্বভাবজেন শৌর্য্যাদিনা যথোক্তেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ নিশ্চয়েন বদ্ধঃ স্বেন আত্মীয়েন কর্ম্মণা, কর্ত্তুং নেচ্ছসি যৎ কর্ম্ম মোহাদবিবেকতঃ করিষ্যসি অবশোঽপি পরবশ এব তৎ কর্ম্ম। ৬০।

ভাষ্যানুবাদ। যেহেতু তুমি নিজ "স্বভাবজ" শৌর্য্যাদি (নিবন্ধন) যুদ্ধাদি কর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছ, এই জন্য তুমি "মোহ" অবিবেক বশতঃ যে কর্ম্ম করিতে চাহিতেছ না, তাহা তোমাকে পরবশ হইয়াই করিতে হইবে। ৬০।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥

অন্বয়। হে অর্জ্জুন। যন্ত্রারূঢানি সর্ব্বভূতানি মায়য়া ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে ঈশ্বরস্তিষ্ঠতি। ৬১।

মূলানুবাদ। হে অর্জ্জুন, যন্ত্রারূঢ় সকল জীবকে মায়ার দ্বারা ভ্রান্ত করিয়া তাহাদের হৃদয়দেশে ঈশ্বর (বিরাজমান) রহিয়াছেন। ৬১।

ভাষ্য। যস্মাৎ ঈশ্বরঃ ঈশনশীলোনারায়ণঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং হৃদ্দেশে হৃদয়দেশে অর্জ্জুন শুক্লান্তরাত্মস্বভাবঃ বিশুদ্ধান্তঃকরণ ইতি "অহশ্চ কৃষ্ণমহরর্জ্জুনঞ্চ" ইতি দর্শনাৎ। তিষ্ঠতি স্থিতিং লভতে। স কথং তিষ্ঠতি ইত্যাহ ভ্রাময়ন্ ভ্রমণং কারয়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি যন্ত্রাণি আরূঢানি অধিষ্ঠিতানীব ইতি ইব শব্দোঽত্র দ্রষ্টব্যঃ। যথা দারুকৃতপুরুষাদীনি যন্ত্রারূঢানি মায়য়াচ্ছদ্মনা ভ্রাময়ংস্তিষ্ঠতি ইতি সম্বন্ধঃ। ৬১।

ভাষানুবাদ। যে কারণে—"ঈশ্বর" ঈশনস্বভাব নারায়ণ, "সর্ব্বভূতের" সকল-প্রাণিগণের "হৃদ্দেশে" হৃদয়দেশে স্থিতি করিতেছেন। হে অর্জ্জুন! অর্জ্জুন শব্দের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাঁহার অন্তরাত্মার স্বভাব শুক্ল অর্থাৎ বিশুদ্ধ (অর্জ্জুন শব্দ যে শুক্ল অর্থে প্রযুক্ত হয়, তাহার প্রমাণ এই) "তিথি কৃষ্ণ এবং তিথি অর্জ্জুন" অর্থাৎ শুক্ল এইরূপ শাস্ত্রীয় বচন দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ঈশ্বর কি ভাবে হৃদয়ে আছেন? যন্ত্রারূঢ় অর্থাৎ যন্ত্রেতে আরূঢ় কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত পুত্তলিকাদির ন্যায় সকল ভূতকে ভ্রামিত করিয়া তিনি হৃদয়দেশে বিদ্যমান আছেন, এই প্রকার অন্বয় করিতে হইবে। যন্ত্রারূঢানি এই শব্দের পর একটী ইব শব্দের অধ্যাহার করিতে হইবে, ইহা দেখিতে হইবে। ৬১।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিম্ স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ ৬২॥

অন্বয়। হে ভারত। তমেব সর্ব্বভাবেন শরণং গচ্ছ তৎপ্রসাদাৎ অচিরেণ পরাং শান্তিং শাশ্বতং স্থানং চ প্রাপ্স্যসি।

মূলানুবাদ। হে ভারত! সর্ব্বভাবের সহিত সেই ঈশ্বরকেই আশ্রয় কর, তাঁহার অনুগ্রহে পরম শান্তি ও শাশ্বত পদকে প্রাপ্ত হইবে। ৬২।

ভাষ্য। তমেবেশ্বরং শরণমাশ্রয়ং সংসারার্ত্তিহরণার্থং গচ্ছ আশ্রয় সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মনা হে ভারত ততস্তৎপ্রসাদাদীশ্বরানুগ্রহাৎ পরাং প্রকৃষ্টাং শান্তিং পরা-মুপরতিং স্থানং চ মম বিষ্ণোঃ পরমং পদমবাপ্স্যসি শাশ্বতং নিত্যম্। ৬২।

ভাষ্যানুবাদ। সেই ঈশ্বরকেই, সংসারের ক্লেশ শান্তির জন্য আশ্রয় কর সর্ব্বভাবের সহিত অর্থাৎ সর্ব্বস্বরূপে, হে ভারত। সেই ঈশ্বরের অনুগ্রহে "পরা" প্রকৃষ্টা "শান্তি" উপরতি এবং আমার অর্থাৎ বিষ্ণুর নিত্য ও পরম পদকে প্রাপ্ত হইবে। ৬২।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়। ময়া গুহ্যাৎ গুহ্যতরং ইতি জ্ঞানং তে আখ্যাতং এতৎ অশেষেণ বিমৃশ্য যথা ইচ্ছসি তথা কুরু। ৬৩।

মূলানুবাদ। আমি তোমার নিকটে এই গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞানের পরিচয় দিলাম, ইহা ভাল করিয়া বিচার করিয়া যাহা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা কর। ৬৩।

ভাষ্য। ইত্যেতৎ তে তুভ্যং জ্ঞানমাখ্যাতং কথিতং গুহ্যাৎ গোপ্যাৎ গুহ্যতরং অতিশয়েন গুহ্যং রহস্যমিত্যর্থঃ। ময়া সর্ব্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ বিমৃশ্য বিমর্শনমালোচনং কৃত্বা এতদ্ যথোক্তং শাস্ত্রং অশেষেণ সমস্তং যথোক্তং চার্থজাতং যথেচ্ছসি তথা কুরু। ৬৩।

ভাষ্যানুবাদ। এই তোমাকে "গুহ্য' গোপ্য হইতেও "গুহ্যতর" অতিশয় গুহ্য অর্থাৎ রহস্য, আমি—সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তোমাকে এই জ্ঞানের উপদেশ করিলাম, ইহা "বিমর্শন" ভাল করিয়া বিচার পূর্ব্বক যাহা ইচ্ছা তাহা করিবে। ৬৩।

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়। সর্ব্বগুহ্যতমং পরমং মে বচঃ ভূয়ঃ শৃণু মে দৃঢ়ং ইষ্টোঽসি ইতি ততঃ তে হিতং বক্ষ্যামি। ৬৪।

মূলানুবাদ। সর্ব্বপ্রকার গোপ্য হইতেও অতিশয় গোপ্য আমার পরম বাক্য পুনরায় শ্রবণ কর। তুমি আমার অতিশয় ইষ্ট, এই কারণে তোমার হিত (আবার) বলিতেছি। ৬৪।

ভাষ্য। ভূয়োঽপি ময়া উচ্যমানং শৃণু—সর্ব্বগুহ্যতমং সর্ব্বগুহ্যেভ্যোঽত্যন্তরহস্যং উক্তমপি অসকৃৎ ভূয়ঃ পুনঃ শৃণু। মে মম পরমং প্রকৃষ্টং বচঃ বাক্যং

ন ভয়াৎ নাপ্যর্থকারণাদ্বা বক্ষ্যামি কিং তর্হি ইষ্টঃ প্রিয়োঽসীতি মে মম দৃঢ়মব্যভিচারেণ ইতি কৃত্বা ততস্তেন কারণেন বক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি তে হিতং পরং জ্ঞানপ্রাপ্তিসাধনং। তদ্ধি সর্ব্বহিতানাং হিততমং। ৬৪।

ভাষ্যানুবাদ। আবার আমি বলিতেছি শ্রবণ কর, 'সর্ব্বগুহ্যতম' সকল গুহ্য হইতে অত্যন্ত গুহ্য অর্থাৎ রহস্য, অনেকবার ইহা কথিত হইলেও আমার এই "পরম" প্রকৃষ্ট বাক্য পুনর্ব্বার বলি শ্রবণ কর। ভয়ে বা অন্য কোন স্বার্থের বশে, যে আমি বলিতেছি, তাহা নহে, কি তবে? তুমি আমার একান্ত "ইষ্ট" প্রিয়, এই জন্যই আমি তোমার "হিত" পরম জ্ঞান প্রাপ্তির উপায়, যাহা সকল প্রকার হিত হইতে হিততম, তাহাই বলিতেছি। ৬৪।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৬৫॥

অন্বয়। মন্মনা মদ্ভক্তঃ (তথা) মদ্যাজী ভব মাং নমস্কুরু, (এবং সতি) মামেব এষ্যসি তে সত্যং প্রতিজানে মে প্রিয়োঽসি। ৬৫।

মূলানুবাদ। আমাতে হৃদয় অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার প্রীতির জন্য যজ্ঞ কর, এবং আমাকেই নমস্কার কর, এইরূপ করিলে আমাকেই পাইবে, ইহা আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি আমার প্রিয়। ৬৫।

ভাষ্য। কিং তদিত্যাহ মন্মনা ভব মচ্চিত্তোভব মদ্ভক্তো ভব মদ্ভজনো ভব মদ্যাজী মদ্যজনশীলঃ ভব মাং নমস্কুরু নমস্কারমপি ময্যেব কুরু। তত্রৈবং বর্ত্তমানঃ বাসুদেবে এব সর্ব্বসমর্পিতসাধ্যসাধনপ্রয়োজনঃ মামেব এষ্যসি আগমিষ্যসি। সত্যং তে প্রতিজানে সত্যাং প্রতিজ্ঞাং করোমি এতস্মিন্ বস্তুনি ইত্যর্থঃ। যতঃ প্রিয়োঽসি মে এবং ভগবতঃ সত্যপ্রতিজ্ঞত্বং বুদ্ধা ভগবদ্ভক্তেরবশ্যং ভাবিমোক্ষফলমবধার্য্য ভগবচ্ছরণৈকপরায়ণেভবেদিতি বাক্যার্থঃ। ৬৫।

ভাষ্যানুবাদ। কি তাহা? তাহাই বলিতেছেন। মন্মনাঃ হও অর্থাৎ আমাতে চিত্ত অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার জন্যই যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হও, আমাকেই নমস্কার কর, এইভাবে যদি আমাতে অর্থাৎ বাসুদেবে সর্ব্ব প্রকারে সাধ্য সাধন ও প্রয়োজনের সমর্পণ করিতে পার, তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। এই তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। যেহেতু তুমি আমার প্রিয়। এই প্রকার উক্তির দ্বারা ভগবানের সত্য প্রতিজ্ঞা বুঝিয়া, ভগবানের উপর

সর্ব্বপ্রকারে আত্মসমর্পণরূপ ভক্তি করিলে তাহার দ্বারা মোক্ষরূপ ফল অবশ্যই লাভ করিতে পারা যায়, ইহা নিশ্চয় করিয়া, ভগবান্‌কেই আশ্রয় করিবে, এবং তিনিই পরম সহায়, ইহা অবধারণ করিবে। ৬৫।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মাং একং শরণং ব্রজ ত্বং মা শুচঃ অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি। ৬৬।

মূলানুবাদ। তুমি সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর, তুমি শোক করিও না, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। ৬৬।

ভাষ্য। কর্ম্মযোগনিষ্ঠায়াঃ পরমরহস্যমীশ্বরশরণতামুপসংহৃত্য অথেদানীং কর্ম্মযোগনিষ্ঠাফলং সম্যগ্‌দর্শনং সর্ব্ববেদান্তবিহিতং বক্তব্যমিত্যাহ সর্ব্বধর্ম্মান সর্ব্বে চ তে ধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বধর্ম্মাস্তান্ ধর্ম্মশব্দেনাত্র অধর্ম্মোঽপি গৃহ্যতে নৈষ্কর্ম্ম্যস্য বিবক্ষিতত্বাৎ "নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ" "ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য সন্ন্যস্য সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যেতৎ। মামেকং সর্ব্বাত্মানং সমং সর্ব্বভূতস্থং ঈশ্বরমচ্যুতং গর্ভজন্মজরামরণবিবর্জ্জিতমহমেবেত্যেবমেকং শরণং ব্রজ ন মত্তোঽন্যদস্তীতি অবধারয় ইত্যর্থঃ। অহং ত্বামেবং নিশ্চিতবুদ্ধিং সর্ব্বপাপেভ্যঃ সর্ব্বধর্ম্মাধর্ম্মবন্ধনরূপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি স্বাত্মভাবপ্রকাশীকরণেন। উক্তং চ ন শয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ইতি। অতো মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ। কর্ম্মযোগনিষ্ঠার পরম রহস্য ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ রূপ বিষয় শেষ করিয়া কর্ম্মযোগনিষ্ঠার ফল যে সম্যগ্‌দর্শন, যাহা সকল বেদান্তে বিহিত হইয়াছে, তাহাই বলিতে হইবে—এই জন্য বলিতেছেন, যত প্রকার ধর্ম্ম আছে তাহা সকলই সর্ব্বধর্ম্ম এই শব্দটার দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে, এই শব্দটী অধর্ম্মেরও উপলক্ষণ। কারণ, শ্রুতি ও স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, "দুশ্চরিত হইতে যে অবিরত" (সে আত্মজ্ঞানে অধিকারী হয় না) "ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুইকেই পরিত্যাগ কর" ইত্যাদি অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্ম শব্দের অর্থ সকল প্রকার কর্ম্ম। সেই সকল প্রকার কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ (পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে) সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়া একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর। আমি সর্ব্বভূতস্থ, সকলেরই আত্মা,

সর্ব্বত্র সম, ঈশ্বর, অচ্যুত ও গর্ভ জন্ম জরা ও মরণ বর্জ্জিত, আমা হইতে অতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই। এই, প্রকার ভাবিয়া আমাকে আশ্রয় কর, ইহাই অর্থ। তাহা হইলে আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত করিব অর্থাৎ আমার নিজ স্বভাবকে প্রকটিত করিয়া তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব। এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, "দীপ্তিমান জ্ঞানরূপপ্রদীপ দ্বারা আত্মভ.বস্থ হইয়া আমি (অজ্ঞানকে) বিনষ্ট করিয়া থাকি।" এই জন্য (বলিতেছি) তুমি শোক করিও না, ইহাই অর্থ।

ভাষ্য। অস্মিন্ হি গীতাশাস্ত্রে পরং নিঃশ্রেয়সসাধনং নিশ্চিতং, কিং জ্ঞানং কিং কর্ম্ম বা আহোস্বিদুভয়ং ইতি। কুতঃ সন্দেহঃ "যজ্‌জ্ঞাত্বা অমৃতমশ্নুতে", "ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং" ইত্যাদীনি বাক্যানি কেবলাৎ জ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিং দর্শয়ন্তি। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" 'কুরু কর্ম্মৈব' ইত্যেবমাদীনি কর্ম্মণামবশ্যকর্ত্তব্যতাং দর্শয়ন্তি। এবং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ কর্ত্তব্যতোপদেশাৎ সমুচ্চিতয়োরপি নিঃশ্রেয়সহেতুত্বং স্যাদিতি ভবেৎ সংশয়ঃ। কিং পুনরত্র মীমাংসাফলং। ননু এতদেব এষামন্যতমস্য পরমনিঃশ্রেয়সসাধনত্বাবধারণং। অতো বিস্তীর্ণতরং মীমাংস্যমেতৎ। আত্মজ্ঞানস্য তু কেবলস্য নিঃশ্রেয়সহেতুত্বং ভেদপ্রত্যয়নিবর্ত্তকত্বেন কৈবল্যফলাবসানত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ। এই গীতাশাস্ত্রে মোক্ষলাভের যাহা চরম উপায় তাহা নিশ্চিত হইয়াছে, সেই উপায় কি? জ্ঞান? বা কর্ম্ম? অথবা জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়? এই প্রকার সন্দেহ হইতেছে কেন? "যাহাকে জানিয়া অমৃত লাভ করে" "তাহার পর মাং তত্ত্বতঃ জানিয়া তাহার অনন্তর পদে প্রবেশ করে" এইরূপ অনেক বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ বাক্য সকল প্রতিপাদন করিতেছে যে, কেবল জ্ঞানই মোক্ষলাভের উপায়। 'তোমার কর্ম্মেতেই অধিকার আছে' "তুমি কর্ম্মই কর" ইত্যাদি বচন কর্ম্মসমূহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিতেছে। এইরূপ জ্ঞান এবং কর্ম্ম এই উভয়ের যখন কর্ত্তব্যতার উপদেশ রহিয়াছে, তখন উভয় মিলিত হইয়াও মোক্ষের কারণ হইতে পারে, এই সকলকারণে সংশয় হইতে পারে। এই বিষয়ে মীমাংসার প্রয়োজন কি? ইহাই প্রয়োজন যে, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী মোক্ষলাভের যথার্থ উপায় তাহার নিরূপণ। এই কারণে এই বিষয়টীকে বিস্তৃতভাবে মীমাংসা করিতে হইবে। (সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে) সকল প্রকার ভেদজ্ঞানের নিবর্ত্তন করিয়া আত্মার কৈবল্যলাভের উপায় হয় বলিয়া কেবল আত্মজ্ঞানই মোক্ষ লাভের উপায়।

ভাষ্য। ক্রিয়াকারকফলভেদবুদ্ধিঃ অবিদ্যয়া আত্মনি নিত্যপ্রবৃত্তা মম কর্ম্ম অহং কর্ত্তা অমুষ্মৈ ফলায় ইদং কর্ম্ম করিষ্যামি ইতীয়মবিদ্যা অনাদিকালপ্রবৃত্তা। অস্যা অবিদ্যায়া নিবর্ত্তকং অয়মহমস্মি কেবলোঽকর্ত্তা অক্রিয়ঃ অফলঃ ন মত্তোঽন্যোঽস্তি কশ্চিদিত্যেবং রূপমাত্মবিষয়ং জ্ঞানমুৎপদ্যমানং কর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুভূতায়া ভেদবুদ্ধের্নিবর্ত্তকত্বাৎ। তু শব্দঃ পক্ষদ্বয়ব্যাবৃত্ত্যর্থো ন কেবলেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ ন চ জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং সমুচ্চিতাভ্যাং নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিরিতি পক্ষদ্বয়ং নিবর্ত্তয়তি। অকার্য্যত্বাচ্চ নিঃশ্রেয়সস্য কর্ম্মসাধনত্বানুপপত্তিঃ। ন হি নিত্যং বস্তু কর্ম্মণা জ্ঞানেন বা ক্রিয়তে। কেবলজ্ঞানমপি অনর্থকং তর্হি। ন, অবিদ্যানিবর্ত্তকত্বে সতি দৃষ্টকৈবল্যফলাবসানত্বাৎ অবিদ্যাতমোনিবর্ত্তকস্য জ্ঞানস্য দৃষ্টং কৈবল্যফলাবসানত্বং।

ভাষ্যানুবাদ। ক্রিয়া, কারক এবং ফলের মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে, এইরূপ বুদ্ধি, অবিদ্যা দ্বারা সর্ব্বদাই আত্মাতে উৎপাদিত হইয়া থাকে। আমার কর্ম্ম, আমি কর্ত্তা, এই ফলের জন্য এই কর্ম্ম আমি করিব, এই প্রকার অবিদ্যা (বিপরীত জ্ঞান) অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আমিই এক, কেবল, আমি কর্ত্তা নহি, আমার ক্রিয়া নাই, আমার কোন ফলও নাই, আমা হইতে পৃথক্ এ জগতে কোন বস্তুই নাই, এই প্রকার জ্ঞানই এই অবিদ্যার নিবর্ত্তক। এই প্রকারের আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে, কর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণ যে ভেদবুদ্ধি, তাহাকে নিবর্ত্তিত করে, এই যে তু শব্দ (আত্মজ্ঞানস্য তু কেবলস্য) ইহা দুইটী পক্ষান্তরকে ব্যাবর্ত্তন করিতেছে অর্থাৎ কেবল কর্ম্ম হইতে মোক্ষ হয় না, এবং মিলিত জ্ঞান ও কর্ম্ম মোক্ষের সাধন হইতে পারে না, ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য এই তু শব্দটীর প্রয়োগ করা হইয়াছে। মোক্ষ যে কারণে কার্য্য নহে, এই কারণে, তাহা যে কর্ম্মের দ্বারা নিষ্পাদিত হইবে, তাহা হইতেই পারে না। কারণ, যাহা নিত্য বস্তু, তাহা কর্ম্মের দ্বারা বা জ্ঞানের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। তবে ত কেবল জ্ঞানও অনর্থক হইয়া উঠিতেছে? না, তাহা হইতে পারে না, কারণ, অবিদ্যাকে নিবৃত্ত করিয়া জ্ঞান কৈবল্যরূপ ফলের প্রয়োজক হয়, ইহা লোকেই দেখিতে পাওয়া যায়। অবিদ্যারূপ অন্ধকারের নিবর্ত্তক যে জ্ঞান, তাহার কৈবল্যরূপ ফলই অবসানে হইয়া থাকে।

ভাষ্য। রজ্জ্বাদিবিষয়ে সর্পাদ্যজ্ঞানতমোনিবর্ত্তকপ্রদীপপ্রকাশফলবৎ। বিনিবৃত্তসর্পবিকল্পরজ্জুকৈবল্যাবসানং হি প্রকাশ ফলং তথা জ্ঞানম্। দৃষ্টার্থানাং চ ছিদিক্রিয়াগ্নিমন্থনাদীনাং ব্যাপৃতকর্ত্ত্রাদিকারকাণাং দ্বৈধীভাবাগ্নি-

দর্শনাদিফলাদন্যফলে কর্ম্মান্তরে ব্যাপারানুপপত্তির্যথা তথা জ্ঞাননিষ্ঠাক্রিয়ায়াং দৃষ্টার্থায়াং ব্যাপৃতস্য জ্ঞাত্রাদিকারকস্য আত্মকৈবল্যফলাদন্যফলে কর্ম্মান্তরে প্রবৃত্তিরনুপপন্নেতি ন জ্ঞাননিষ্ঠা কর্ম্মসহিতা উপপদ্যতে। ভূজ্যগ্নিহোত্রাদিক্রিয়াবৎ স্যাৎ ইতি চেৎ। ন, কৈবল্যফলে জ্ঞানে ক্রিয়াফলার্থিত্বানুপপত্তেঃ। কৈবল্যফলে হি জ্ঞানে প্রাপ্তে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে ফলে কূপতড়াগাদিক্রিয়াফলার্থিত্বাভাববৎ ফলান্তরে তৎসাধনভূতায়াং বা ক্রিয়ায়ামর্থিত্বানুপপত্তিঃ। ন হি রাজ্যপ্রাপ্তিফলে কর্ম্মণি ব্যাপৃতস্য ক্ষেত্রপ্রাপ্তিফলে ব্যাপারোপপত্তিঃ তদ্বিষয়ার্থিত্বং। তস্মান্ন কর্ম্মণোঽস্তি নিঃশ্রেয়সসাধনত্বম্।

ভাষ্যানুবাদ। রজ্জুপ্রভৃতিতে সর্পভ্রম রূপ অন্ধকারের নিবৃত্তি করিতে হইলে প্রদীপ প্রকাশ তুল্য যে জ্ঞান আবশ্যক, তাহার অন্য কোন ফল দেখা যায় না অর্থাৎ ঐ জ্ঞান সর্পভ্রান্তির নিবৃত্তি করিয়া রজ্জুর কৈবল্যরূপ ফল ব্যতিরিক্ত অন্য কোন ফলের জনক হয় না সেই কেবলাত্মস্বরূপপ্রকাশই জ্ঞানের ফল। ছেদক্রিয়া বা অগ্নি মন্থন ক্রিয়ার ফল প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সেই প্রত্যক্ষসিদ্ধ ফল কি? দ্বৈধীভাব বা অগ্নি, এই দ্বৈধীভাব বা অগ্নি উৎপাদন করিবার জন্য যখন কর্ত্তৃপ্রভৃতি কতকগুলি কারক ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইয়া কার্য্যোন্মুখ হয়, তখন যেমন ঐ দ্বৈধীভাব বা অগ্নিরূপ ফলই হইয়া থাকে, অন্য ফলের জন্য ঐ সকল কর্ত্তৃপ্রভৃতির ব্যাপার হইতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞাতা বা অন্যান্য কারক, যখন জ্ঞানরূপ ফলকে উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহারা কৈবল্যস্বরূপ প্রকাশ রূপ জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন প্রকার ফলকে উৎপাদনই করিতে পারে না। ভোজন বা অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার যেমন অন্যফল হয়, আত্মজ্ঞানেরও সেইরূপ ফলান্তর কেন হইবে না? এই প্রকার শঙ্কাও হইতে পারে না, কারণ, আত্মজ্ঞানের ফল কৈবল্য ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না (ইহা পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে) সুতরাং জ্ঞান হইলে যে অন্য ফল বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা হইবে, তাহা সম্ভবপর নহে। যেমন অপার অসীম জলাশয়কে প্রাপ্ত হইলে লোক আর ক্ষুদ্র কূপাদির জন্য অভিলাষ করে না, কারণ, কূপাদিতে যাহা কিছু প্রয়োজন সাধিত হয়, তাহা সকলই সেই অপার অনন্ত জলাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত প্রয়োজনের মধ্যেই নিবিষ্ট হইয়া থাকে। কিংবা যে ব্যক্তি রাজ্য লাভ করিতে উদ্যত হয়, তাহার যেমন পৃথক্‌ভাবে একখানি ক্ষুদ্র ক্ষেত্র লাভের জন্য প্রবৃত্তি হয় না, সেইরূপ কৈবল্যফলপ্রদ জ্ঞানকে যে প্রাপ্ত হয়, তাহার অন্য কোন ফল বিষয়ে অর্থিত্ব সম্ভবপর নহে, কারণ, তাহার যত কিছু প্রয়োজন তাহা সকলই সেই জ্ঞানের ফল স্বরূপ

(নিত্যানন্দরূপ) মোক্ষের মধ্যেই নিবিষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণে কর্ম্ম কিছুতেই মোক্ষের সাধন হইতে পারে না।

ভাষ্য। ন চ জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চিতয়োঃ। নাপি জ্ঞানস্য কৈবল্যফলস্য কর্ম্মসাহায্যাপেক্ষা অবিদ্যানিবর্ত্তকত্বেন বিরোধাৎ। ন হি তমস্তমসোনিবর্ত্তকং অতঃ কেবলমেব জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সসাধনমিতি। ন নিত্যাকরণে প্রত্যবায়প্রাপ্তেঃ কৈবল্যস্য চ নিত্যত্বাৎ যত্তাবৎ কেবলজ্ঞানাৎ কৈবল্যপ্রাপ্তিরত্যেদসৎ, যতো নিত্যানাং কর্ম্মণাং শ্রুত্যুক্তানামকরণে প্রত্যবায়োনরকাদিপ্রাপ্তিলক্ষণঃ স্যাৎ। নন্বেবং তর্হি কর্ম্মভ্যো মোক্ষঃ নাস্তীত্যনির্ম্মোক্ষ এব। নৈষ দোষঃ নিত্যত্বান্মোক্ষস্য। নিত্যানাং কর্ম্মণাং অনুষ্ঠানাৎ প্রত্যবায়স্যাপ্রাপ্তিঃ প্রতিষিদ্ধস্য চাকরণাৎ অনিষ্টশরীরানুপপত্তিঃ। কাম্যানাং চ বর্জ্জনাৎ ইষ্টশরীরানুপপত্তিঃ।

ভাষ্যানুবাদ। জ্ঞান এবং কর্ম্ম উভয়ে মিলিত হইয়া যে মোক্ষের কারণ হইবে, তাহাও নহে, কারণ, যে জ্ঞানের ফল কৈবল্য, তাহা যে নিজ ফলকে উৎপাদন করিতে যাইয়া কোন কর্ম্মের সাহায্যকে অপেক্ষা করিবে, তাহা সম্ভবপর নহে। জ্ঞান অবিদ্যার নিবর্ত্তক, অবিদ্যাত্মক কর্ম্মের সহিত তাহার বিরোধই প্রমাণ সিদ্ধ, সুতরাং সে তাহার অপেক্ষা করিতে পারে না। অন্ধকার অন্ধকারের নিবর্ত্তক হইতে পারে না, এই কারণে কেবল জ্ঞানই মোক্ষের সাধন (ইহাই গীতার সিদ্ধান্ত)। (এই সিদ্ধান্তের উপর দোষারোপ করিবার জন্য কর্ম্মও মোক্ষেই কারণ, ইহা যাহাদের মত, তাহারা শঙ্কা করিতেছে যে) জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের বিরোধ হইতে পারে না, কারণ, নিত্য কর্ম্ম যদি না করা যায়, তাহা হইলে পাপ হইবেই হইবে (পাপ হইলে তাহার ফল দুঃখভোগ অপরিহার্য্য, সুতরাং একেবারে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ কিরূপে হইতে পারে?) কৈবল্য ত নিত্যই। কেবল জ্ঞান হইলেই যে কৈবল্য প্রাপ্তি হইবে, এই প্রকার মত সঙ্গত নহে, কারণ, বেদবিহিত নিত্যকর্ম্মগুলিকে পরিত্যাগ করিলে পাপ হইবে এবং পাপের ফল যে নরক তাহা অবশ্যই ভুগিতে হইবে। তবে যদি বল, এইরূপ সিদ্ধান্তে দোষ এই যে, কর্ম্মসমূহও যে মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় তাহাও ত সম্ভবপর হইতেছে না। এইরূপ শঙ্কাও ঠিক নহে, কারণ, মোক্ষ নিত্য (ইহা ত অঙ্গীকৃত আছে) নিত্য কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া চলিলে আর পাপ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে

অনিষ্ট শরীরের উৎপত্তিও হইবে না, এবং কাম্য কর্ম্মগুলিকে পরিত্যাগ করা প্রযুক্ত ইষ্ট শরীরেরও উৎপত্তি হইবে না।

ভাষ্য। বর্ত্তমানশরীরারম্ভকস্য চ কর্ম্মণঃ ফলোপভোগক্ষয়ে পতিতেঽস্মিন্ শরীরে দেহান্তরোৎপত্তৌ চ কারণাভাবাৎ আত্মনোরাগাদীনাং চাকরণাৎ স্বরূপাবস্থানমেব কৈবল্যমিত্যযত্নসিদ্ধং কৈবল্যং ইতি। অতিক্রান্তানেকজন্মান্তর-কৃতস্য স্বর্গনরকাদিপ্রাপ্তিফলস্য অনারব্ধকার্য্যস্য উপভোগানুপপত্তেঃ ক্ষয়াভাব ইতি চেৎ। ন, নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখোপভোগস্য তৎফলভোগত্বোপপত্তেঃ প্রায়শ্চিত্তবদ্বা পূর্ব্বোপাত্তদুরিতক্ষয়ার্থত্বান্নিত্যকর্ম্মণাং আরব্ধানাঞ্চ উপভোগেনৈব কর্ম্মণাং ক্ষীণত্বাদপূর্ব্বাণাং চ কর্ম্মণাং অনারম্ভে অযত্নসিদ্ধং কৈবল্যমিতি। "ন তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" ইতি বিদ্যায়া অন্যঃ পন্থা মোক্ষায় ন বিদ্যতে ইতি শ্রুতেশ্চর্ম্মবদাকাশবেষ্টনাসম্ভববাদ্ অবিদুষো মোক্ষাসম্ভবশ্রুতেঃ জ্ঞানাৎ কৈবল্যমাপ্নোতীতি চ পুরাণস্মৃতেঃ অনারব্ধফলানাং পুণ্যানাং কর্ম্মণাং ক্ষয়ানুপপত্তেশ্চ।

ভাষ্যানুবাদ। বর্ত্তমান শরীরের আরম্ভক কর্ম্মের ফলোপভোগ শেষ হইলে, এই শরীর পতিত হইলে, অন্য নূতন দেহের উৎপত্তি হইবার কারণ না থাকায়, এবং রাগদ্বেষ প্রভৃতির অকরণ নিবন্ধন আত্মার স্বরূপে অবস্থিতিরূপ কৈবল্য আপনা হইতেই সিদ্ধ হইতেছে, সুতরাং, কৈবল্য যে অযত্নসিদ্ধ ইহাই স্থির হইল। এক্ষণে একটী শঙ্কা এই হইতে পারে যে, অতীত অনেক জন্মের অর্জ্জিত যে সকল কর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া আছে, স্বর্গ কিম্বা নরক প্রাপ্তিরূপ ফল ভোগ যে পর্য্যন্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ঐ সকল কর্ম্মের ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা নাই, (সুতরাং এই দেহ পতিত হইলেই যে কর্ম্মীর মোক্ষ হইবে, ইহা অসম্ভব হইয়া পড়িল।) এই প্রকার শঙ্কাও ঠিক নহে, কারণ, নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কালে যে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা দ্বারাই পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত অশুভ কর্ম্ম সকলের ক্ষয় হইয়া যাইবে। অথবা প্রায়শ্চিত্ত করিলে যেমন পূর্ব্বকৃত পাপের ক্ষয় হয়, সেইরূপ নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও সঞ্চিত পাপসমূহের ক্ষয় হইয়া যাইবে (ইহাও বলা যাইতে পারে) তাহা ছাড়া যে সকল কর্ম্ম এই দেহের আরম্ভক, তাহাদের ফলোপভোগ এই দেহেই হইয়া যায়, এবং নূতন কোন কর্ম্মের (ফল যে পাপ বা পুণ্য তাহার) উৎপত্তি হয় না বলিয়া মোক্ষ অনায়াসেই ত সিদ্ধ হইতে পারে। (ইহাই হইল কর্ম্মবাদিগণের মোক্ষ বিষয়ে সিদ্ধান্ত, এক্ষণে এই সিদ্ধান্তের উপর দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে)

এই সিদ্ধান্ত ঠিক্ নহে, কারণ, শ্রুতিতে আছে যে "তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রমণ করিতে পারা যায়, তাঁহাকে জানা ছাড়া মুক্তি লাভের অন্য কোন উপায় নাই।" ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইতেছে যে (আত্মতত্ত্ব) জ্ঞান ছাড়া মোক্ষ লাভের উপায়ান্তর নাই। "যেমন চর্ম্মকে বেষ্টন করার ন্যায় আকাশকে বেষ্টন করা যায় না, সেইরূপ আত্মাকে না জানিয়া কিছুতেই মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায় না" এইরূপ পুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটী বিষয় দ্রষ্টব্য যে (তোমাদের মতে) যে সকল পুণ্য কর্ম্ম পূর্ব্ব জন্ম হইতে সঞ্চিত আছে, তাহাদের ফলোপভোগ হইবার সম্ভাবনা না থাকায় ঐ সকল কর্ম্মের ক্ষয় অনুপপন্ন হইয়া উঠিতেছে।

ভাষ্য। যথা পূর্ব্বোপাত্তানাং দুরিতানাং অনারব্ধফলানাং সম্ভবঃ তথা পুণ্যানামপি অনারব্ধফলানাং স্যাৎ সম্ভবঃ। তেষাং চ দেহান্তরমকৃত্বা ক্ষয়ানুপপত্তৌ মোক্ষানুপপত্তিঃ। ধর্ম্মাধর্ম্মহেতূনাং চ রাগদ্বেষমোহানামন্যত্রাত্মজ্ঞানাৎ উচ্ছেদানুপপত্তেঃ ধর্ম্মাধর্ম্মোচ্ছেদানুপপত্তিঃ। নিত্যানাঞ্চ কর্ম্মণাং পুণ্যলোকফলশ্রুতেঃ বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠা ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ কর্ম্মক্ষয়ানুপপত্তেঃ। যে ত্বাহুঃ নিত্যানি কর্ম্মাণি দুঃখরূপত্বাৎ পূর্ব্বকৃতদুরিতকর্ম্মণাং ফলমেব ন তু তেষাং স্বরূপব্যতিরেকেণ অন্যৎ ফলমস্তি অশ্রুতত্বাৎ জীবনাদিনিমিত্তে চ বিধানাৎ ইতি। ন, অপ্রবৃত্তানাং ফলদানাসম্ভবাৎ দুঃখফলবিশেষানুপপত্তিঃ স্যাৎ। যদুক্তং পূর্ব্বজন্মকৃতদুরিতানাং কর্ম্মণাং ফলং নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখং ভুজ্যতে ইতি তদসৎ। ন হি মরণকালে ফলদানায় অনঙ্কুরীভূতস্য কর্ম্মণঃ ফলমন্যকর্ম্মারব্ধে জন্মনি উপভুজ্যতে ইত্যুপপত্তিঃ। অন্যথা স্বর্গফলোপভোগায় অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মারব্ধে জন্মনি নরককর্ম্মফলভোগানুপপত্তির্ন স্যাৎ। তস্য দুরিতদুঃখবিশেষফলত্বানুপপত্তেশ্চ। অনেকেষু হি দুরিতেষু সম্ভবৎসু ভিন্নদুঃখসাধনফলেষু নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখমাত্রফলেষু কল্প্যমানেষু দ্বন্দ্ব্রোগাদিবাধানিমিত্তং ন হি শক্যতে কল্পয়িতুং নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখমেব পূর্ব্বকৃতদুরিতফলং ন শিরসা পাষাণবহনাদিদুঃখমিতি।

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত অথচ ফল প্রদান করিতে প্রবৃত্ত নহে এইরূপ দুঃখহেতু কর্ম্মসমূহের অবস্থান যেমন সম্ভবপর, সেই রূপ পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত ফল প্রদানে অপ্রবৃত্ত সুখের হেতু কর্ম্মসমূহেরও অবস্থিতি সম্ভবপর। (নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে দুঃখ ভোগ হয়, তাহাতে দুঃখ হেতু কর্ম্মসকলের ক্ষয় হইলেও) সুখভোগের হেতু সেই সকল পুণ্য কর্ম্ম কোন নূতন দেহের

উৎপাদন না করিয়া আর সুখভোগরূপ ফল প্রদান (তোমাদের মতে) করিতে পারিতেছে না, সুতরাং, সেই সকল পুণ্য কর্ম্মের ক্ষয় হইতে পারে না বলিয়া মোক্ষ লাভ অসম্ভব হইয়া পড়িল। (আরও দ্রষ্টব্য এই যে) আত্ম-জ্ঞান না হইলে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের হেতু রাগ, দ্বেষ ও মোহের উচ্ছেদ হইতে পারে না, রাগ, দ্বেষ ও মোহের উচ্ছেদ না হইলে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের উচ্ছেদও অসম্ভব। শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, নিত্য কর্ম্মসমূহের ফল—পুণ্য লোক প্রাপ্তি, এবং স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, বর্ণ এবং আশ্রমী যদি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে (তাহারা স্বর্গলোকে নিজ নিজ কর্ম্মফলের অনুভব করিয়া সেই ভুক্তাবশিষ্ট পুণ্যের বলে পবিত্রকুলে উৎকৃষ্ট জন্ম লাভ করিয়া থাকে) ইত্যাদি। এই সকল কারণে (স্বীকার করিতে হয় যে জ্ঞান ব্যতিরেকে) পাপ ও পুণ্যরূপ যাবতীয় কর্ম্মের ক্ষয় হইতেই পারে না। যাহারা বলে—নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানই দুঃখ স্বরূপ (সুতরাং তাহার অনুষ্ঠান করিলে পূর্ব্বসঞ্চিত দুরদৃষ্টরূপ কর্ম্মের ক্ষয় হয়, কাযে কাযে তাহাদের মানিয়া লইতে হইবে যে) নিত্য কর্ম্মসমূহ পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ কর্ম্মেরই ফল, কারণ, নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান রূপ স্বরূপ ব্যতিরেকে তাহার আর কোন ফলই নাই, বেদে তাহার কোন ফলই শ্রুত হয় নাই, যেহেতু বেদে উক্ত হইয়াছে, যতদিন বাঁচিবে ততদিন অগ্নিহোত্র করিবে (অগ্নিহোত্র করিলে যে কোন ফল হইতে পারে, তাহা বেদে উল্লিখিত হয় নাই সুতরাং দুঃখময় অগ্নিহোত্রানুষ্ঠান ফলতঃ পূর্ব্বজন্মকৃত অশুভ কর্ম্মের ফল দুঃখভোগ ছাড়া আর কি হইতে পারে?) তাহাদের কথনও নিতান্ত অসঙ্গত, কারণ, যে সকল কর্ম্ম সঞ্চিত অর্থাৎ আরব্ধ বা ফলদানে প্রবৃত্ত নহে, তাহারা এই জন্মে কিছুতেই ফল প্রদানে সমর্থ হইতে পারে না, এই সাধারণ নিয়মানুসারে, সঞ্চিত কতকগুলি কর্ম্মফলবিশেষকে যে উৎপাদন করিবে, তাহা কিছুতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। আরও বলা হইয়াছে যে পূর্ব্ব জন্মে কৃত পাপ রূপ কর্ম্মসমূহেরই ফল নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানরূপ দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, মরণ সময়ে যে সকল কর্ম্ম আগামি জন্মের ফলভোগের জন্য অঙ্কুরিত না হয়, তাহারা অন্য কর্ম্মের ফল স্বরূপ আগামি জন্মে ফল প্রদান করিবে, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। এই প্রকার নিয়ম যদি অঙ্গীকার না করা হয়, তাহা হইলে, অগ্নিহোত্রের ফল স্বরূপ স্বর্গভোগের সময়ও নরকরূপ যে কর্ম্মান্তরের ফল, তাহারও ভোগের আপত্তি হইতে পারে। নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান যে পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত দুরিত কর্ম্মেরই

ফল, তাহাও কল্পনা করিতে পারা যায় না। অনেক প্রকার অসংখ্য পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত পাপ থাকিতে পারে, সেই সকল পাপের ফল যে এক প্রকার দুঃখ ভোগই হইবে, তাহা বলা যায় না। সঞ্চিত অনেকগুলি পাপ রহিয়াছে, তাহাদের ফল নানাপ্রকার দুঃখ। অথচ ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন দুঃখজনক পাপগুলি সঞ্চিতই রহিয়া গেল অর্থাৎ তাহাদের কোন ফল এজন্মে হইল না, কেবল অগ্নিহোত্রানুষ্ঠানরূপ দুঃখের হেতুভূত যে সঞ্চিত পাপগুলি আছে তাহাদের ফল ভোগ হইল আর, শীতাতপপ্রভৃতি জন্য দুঃখ রূপ ফলের হেতু পাপগুলির কোন ফলেরই ভোগ হইবে না অর্থাৎ সঞ্চিত কর্ম্মের অগ্নিহোত্রানুষ্ঠান দুঃখ ভোগ রূপ ফল হইবে, কিন্তু সঞ্চিত কর্ম্মের মাথায় পাথর বহনরূপ যে দুঃখ ভোগ ফল, তাহা হইবে না, এইরূপ বিশেষ কল্পনা করিবার কোন যুক্তিই দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভাষ্য। অপ্রকৃতং চেদমুচ্যতে নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানয়াসদুঃখং পূর্ব্বকৃতদুরিতকর্ম্মফলমিতি। কথং অপ্রসূতফলস্য পূর্ব্বকৃতদুরিতস্য ক্ষয়ো নোপপদ্যতে ইতি প্রকৃতং। তত্র প্রসূতফলস্য কর্ম্মণঃ ফলং নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখমাহ ভবান নাপ্রসূতফলস্য ইতি। অথ সর্ব্বমেব পূর্ব্বকৃতং দুরিতং প্রসূতফলমেবেতি মন্যতে ভবান, ততো নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখমেবফলমিতি বিশেষণমযুক্তং। নিত্যকর্ম্মবিধ্যানর্থক্যপ্রসঙ্গশ্চ উপভোগেনৈব প্রসূতফলস্য দুরিতকর্ম্মণঃ ক্ষয়োপপত্তেঃ। কিঞ্চ শ্রুতস্য নিত্যস্য দুঃখং কর্ম্মণশ্চেৎ ফলং নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসাদেব তদ্দৃশ্যতে ব্যায়ামাদিবৎ তদন্যস্যেতি কল্পনানুপপত্তিঃ। জীবনাদিনিমিত্তে চ বিধানাৎ নিত্যানাং কর্ম্মণাম্। প্রায়শ্চিত্তবৎ পূর্ব্বকৃতদুরিতফলত্বানুপপত্তি। যস্মিন পাপকর্ম্মনিমিত্তে যদ্বিহিতং প্রায়শ্চিত্তং ন তু তস্য পাপস্য তৎ ফলং। অথ তস্যৈব পাপস্য নিমিত্তস্য প্রায়শ্চিত্তদুঃখং ফলং জীবনাদিনিমিত্তমপি নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াস দুঃখং জীবনাদিনিমিত্তস্যৈব তৎ ফলং প্রসজ্যেত নিত্যপ্রায়শ্চিত্তয়োর্নৈমিত্তিকত্বাবিশেষাৎ।

ভাষ্যানুবাদ। নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে আয়াস, তাহা হইতে যে দুঃখ হয় তাহা পূর্ব্ব জন্মে সঞ্চিত পাপের ফল, এই প্রকার কথনও নিতান্ত অপ্রকৃত। কেন অপ্রকৃত? (তাহা বলিতেছি) যে প্রাক্তন কর্ম্ম ফলদান করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই (অর্থাৎ যাহাকে প্রারব্ধ কর্ম্ম বলা যায় না) তাহার ক্ষয় হইতে পারে না, ইহাই প্রকৃত। ইহা প্রকৃত হইলে নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য যে আয়াস হয়, সেই আয়াসের ফল যে দুঃখ, তাহা প্রারব্ধ কর্ম্মেরই ফল, ইহাই তোমার বলা উচিত, ঐ দুঃখ প্রারব্ধ

কর্ম্মের ফল নহে (কিন্তু সঞ্চিত পাপের ফল) ইহা কিছুতেই তোমার বলা উচিত নহে। আর যদি এই কথাই তুমি বলিতে চাহ যে, পূর্ব্ব জন্মের যত পাপ আছে তাহা সকলই বর্ত্তমান জন্মে দুঃখরূপ ফলকে প্রসব করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানের আয়াসে যে দুঃখ হয়, তাহাই পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের ফল (অন্য প্রকারের দুঃখ গুলি পূর্ব্ব কৃত পাপের ফল নহে) এই ভাবে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। আর একটী কথা এই যে, বেদবিহিত নিত্য-কর্ম্মের দুঃখই ফল, যদি ইহা অঙ্গীকার কর (তাহাও ঠিক নহে, কারণ) তাহা হইলে (ইহাই বলা উচিত যে) নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইলে যে আয়াস হয়, তাহা হইতেই দুঃখ হয় সুতরাং ঐ দুঃখ ঐ আয়াসেরই ফল, পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতের ফল হইতে পারে না। যেমন ব্যায়াম করিলে যে দুঃখ হয়, তাহা ব্যায়ামেরই ফল। ব্যায়াম ভিন্ন যে পূর্ব্বসঞ্চিত দুরিত তাহার ফল নহে। (প্রকৃতস্থলেও সেইরূপ নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানের যে আয়াস তাহা হইতে যে দুঃখ হয়, তাহা ঐ আয়াসেরই ফল হওয়া উচিত, পূর্ব্ব জন্ম সঞ্চিত পাপের ফল হইবে কেন ?) ("যাবজ্জীবং অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" যতদিন বাঁচিবে অগ্নিহোত্র যাগ করিবে। এই বাক্যের দ্বারা) জীবনরূপনিমিত্ত বিদ্যমান থাকিলে অগ্নিহোত্ররূপ নিত্য কর্ম্ম করিতে হইবে, ইহা বিহিত হইয়াছে। এই কারণে প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় নিত্যকর্ম্ম-গুলিরও নিমিত্ত যে পূর্ব্ব জন্ম কৃত পাপ, তাহা কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। যে পাপ কর্ম্মরূপ নিমিত্ত বিদ্যমান থাকিলে যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান শাস্ত্রে কথিত হয়, সেই প্রায়শ্চিত্ত যে সেই পাপেরই ফল, তাহাও কেহ স্বীকার করিতে পারে না। আর যদি বল, সেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে যে দুঃখ হয়, সেই দুঃখই ঐ পাপের ফল, তাহা হইলে ইহাই স্বীকার করা উচিত যে, নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে আয়াস হয়, তাহার ফল স্বরূপ যে দুঃখ, তাহার কারণ জীবনই হউক (কারণ, জীবনরূপ নিমিত্ত বিদ্যমান থাকিলেই নিত্যকর্ম্ম করিতে হইবে এই প্রকার বিধান আছে বলিয়া) জীবনরূপ নিমিত্তেরই ফল ঐ নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠান জনিত দুঃখ এই-রূপ আপত্তি উপস্থিত হয়। কারণ, প্রায়শ্চিত্ত এবং নিত্য কর্ম্ম এই দ্বিবিধ কর্ম্মই নৈমিত্তিক কর্ম্ম ইহাদের মধ্যে একরূপতাই থাকা উচিত। (বৈষম্য থাকিবে কেন)।

ভাষ্য। কিঞ্চান্যৎ—নিত্যস্য কাম্যস্য চাগ্নিহোত্রাদেরনুষ্ঠানায়াসদুঃখস্য তুল্যত্বাৎ নিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখমেব পূর্ব্বকৃতদুরিতস্য ফলং ন তু কাম্যানুষ্ঠানায়াস-দুঃখমিতি বিশেষো নাস্তি ইতি তদপি পূর্ব্বকৃতদুরিতফলং প্রসজ্যেত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত।

শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

শ্রীযুত নবীন চৌধুরী মহাশয় যোগীনের পিতা, দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত সাবর্ণ চৌধুরী বংশোদ্ভব। এককালে ইঁহারা বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন জমিদার ছিলেন, এখন কিন্তু আর সে অবস্থা নাই। ব্রাহ্মণ বড় নিষ্ঠাবান্, বরাবর প্রত্যহ ফুল বিল্বপত্র দূর্ব্বা তুলসী চন্দনাদি দ্বারা ইষ্টদেবতার পূজা করেন আর ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করেন। এই দুই কর্ম্ম ব্যতীত আর কোন কর্ম্মেই তাদৃশ আস্থা নাই। বিষয়কর্ম্মের তত্ত্বাবধান যথাসাধ্য করিতে বাধ্য হইলেও ঐরূপ 'দুই নৌকায়-পা দিয়া' 'আপদ্ বালাই' বোধে বিষয়কর্ম্ম করিয়া কে কবে বিষয়-সম্পত্তির উন্নতি করিতে পারিয়াছেন? চৌধুরী মহাশয়ের দিন দিন ভগবদ্ভক্তি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব অবস্থার অবনতি হইতে লাগিল। ক্রমে সুখের সংসারে দারিদ্র্যের ছায়া নিবিড়ভাব ধারণ করিতে চলিল। আগতপ্রায় অন্ধকারের ভিতর একটী মাত্র ক্ষীণালোক তাঁহার অবলম্বনস্বরূপ হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উদ্যমী ধীর বুদ্ধিমান্ ও চরিত্রবান্—সেই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সংসারের ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার দুঃখ দূর করিবে—এই আশায় বুক বাঁধিয়া চৌধুরী মহাশয় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

রাসমণির দেবালয়ের ঘাটে তিনি প্রায়ই যাইয়া স্নান করেন এবং ইষ্টপূজার জন্য তথাকার উদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগীনও ঐ উদ্যানে কখন বা স্নান করিতে, কখন বা বেড়াইতে প্রত্যহ গমন করেন। এই যাতায়াতের ফলেই যোগীনের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত পরিচয়ের সুবিধা হয়। যোগীনের বয়স এখন আন্দাজ ১৬।১৭ হইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তিনি প্রস্তুত হইতেছিলেন। ঐ সময়ে একদিন রাসমণির বাগানে বেড়াইতে যাইয়া দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরের ভিতরে বাহিরে লোকে লোকারণ্য। সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ কি শুনিতেছে। ইতিপূর্ব্বে গ্রামস্থ লোকের নিকট হইতে যোগীন শুনিয়াছিলেন, ঐ ঘরে এক পাগ্‌লা বামুন বাস করে— সে পূর্ব্বে ঐ দেবালয়ের পূজারী ভট্টাচার্য্য ছিল। জনতার কারণ জানিতে যোগীনের ঔৎসুক্য হইল। তিনি ধীরে ধীরে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া কাণ

পাণ্ডিত্য শুনিতে লাগিলেন। দুই একটী কথাতেই বুঝিলেন—যাহাকে লোকে পাগ্‌লা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তিনি কথা কহিতেছেন—আগন্তুক জনগণকে ভগবদ্ভক্তির তত্ত্বসমূহ এবং তল্লাভের উপায় সকল অতি সরল হৃদয়গ্রাহী কথায় সামান্য সামান্য দৃষ্টান্তসহায়ে বুঝাইতেছেন। কথা শুনিতে শুনিতে যোগীনও উপস্থিত সকলের ন্যায় মোহিত! যতক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিল, যোগীন দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে রাত্র্যাগমে যখন কথার বিরাম হইল এবং সকলে যে যার বাটী প্রত্যাগমন করিতে লাগিল, তখন যোগীনও অন্যমনস্ক ভাবে বাটীর দিকে ফিরিলেন। তাঁহার মনে পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিল—"তবে কি 'পাগ্‌লা' একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ—লোকে না বুঝিয়া পাগল বলে! নতুবা এমন ভক্তির কথা, এমন ঈশ্বরপ্রেম, এমন ভাবসমাধি ইঁহার ভিতর হইতে কেমনে প্রকাশ হয়? যাহা হউক একথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে হইবে।"

পরদিন যোগীন আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত। পরিচয় জিজ্ঞাসায় তাঁহাকে নবীন বাবুর পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "তবে তুমি ত আমাদের চেনা ঘর গো। তোমাদের বাড়ীতে আমি তখন তখন কত যাইতাম—ভাগবত পুরাণ প্রভৃতি শুনিতাম—তোমাদের বাড়ীর কর্ত্তাদের ভিতর অমুক অমুক আমাকে বড় যত্ন করিতেন।" যাঁহারা সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন, যোগীনকে তাঁহাদের দেখাইয়া বলিলেন—"এঁরা দক্ষিণেশ্বরের সাবর্ণ চৌধুরী—এঁদের প্রতাপে সেকালে বাঘে গরুতে একসঙ্গে জল খেতো—এঁরা লোকের জাত দিতে নিতে পার্‌তেন। ভক্তিমানও সব খুব ছিলেন—বাড়ীতে কত ভাগবত পুরাণাদি হোতো" ইত্যাদি। আবার যোগীনকে বলিলেন,—"জানাশোনা হোলো, বেশ হোলো—এখানে যাওয়া আসা কোরো। মহদ্বংশে জন্ম, তোমার লক্ষণ বেশ সব আছে, বেশ আধার, খুব (ভগবদ্ভক্তি) হবে।" এইরূপ প্রথম সম্ভাষণাদির পর ভগবদ্বিষয়িণী নানা কথার আলোচনা হইতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই অপূর্ব্ব অমায়িক ব্যবহারে যোগীনের মন খুবই ভিজিল এবং তদবধি তিনি তাঁহার নিকট দুইবেলা নিত্য যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত পরিচয় ও কথাবার্ত্তার বিষয় বাটীর কাহারও নিকট ভাঙ্গিলেন না। রাসমণির বাগানে প্রত্যহ যাইতেছে জানিলে পিতা পাছে কৈফিয়ৎ চাহেন বা যাইতে নিষেধ করেন, এজন্য যোগীন ঐ স্থান হইতে প্রত্যহ ভাল ভাল ফুল সংগ্রহ করিয়া পিতার ইষ্টপূজার জন্য উহা বাটীতে লইয়া আসিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দক্ষিণেশ্বর গ্রামের সক-

সেই ত এক প্রকার পাগল মনে করিত, তাহার উপর আবার তিনি কৈবর্ত্তের পূজারী ও শূদ্রপ্রতিষ্ঠিত দেবপ্রসাদভোজী, কাযেই তাহাদের চক্ষে তিনি ব্রাহ্মণ-মর্য্যাদাভ্রষ্ট আচারহীন বলিয়া গণ্য। মহাসম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব নবীনচন্দ্র শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের নিকট আপন পুত্রের যাতায়াত এজন্য না পছন্দ করিতে পারেন। এই কারণে যোগীন তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াতের বিষয় বাটীর কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না।

জ্ঞানের উন্মেষ হওয়া অবধি যোগীন ঈশ্বরপিপাসু। আমরা তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি—বাল্যকালে সময়ে সময়ে এক আশ্চর্য্য ভাবনা আসিয়া তাঁহাকে কিছুক্ষণের জন্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। এমন কি, যখন তিনি মোটে পাঁচ বৎসরের, তখনও পল্লীর সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে হঠাৎ ঐ ভাবনা আসিয়া তাঁহাকে মাঝে মাঝে ঘিরিয়া ফেলিত—তখন তাঁহার মুখমণ্ডল প্রৌঢ়ের বিষাদভাব ধারণ করিত। হঠাৎ ঐ ভাবনা আসিলেই আর তাঁহার খেলাধূলা ভাল লাগিত না। নিভৃতে বসিয়া আকাশপানে তাকাইয়া থাকিতেন ও ভাবিতেন—"এ কোথায় আসিয়াছি—আমি ত এখানকার লোক নই।" মনে হইত—এ সকল খেলুড়ে তাঁহার খেলুড়ে নহে, তাঁহার অন্য সব খেলুড়ে আছে, এ দেশ তাঁর নয়; তিনি ঐ নীল আকাশের নক্ষত্র সকলের ভিতর কোন একটী নক্ষত্রের লোক—সেখান হইতে এখানে আসিয়াছেন। আবার মনে হইত—তিনি যদি ভিন্ন জগতের লোক, তবে এখানে কেন? এ সমস্ত কি স্বপ্ন? এইরূপ অকুলপাথার ভাবনায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেন—অথচ তিনি যে কোন্ নক্ষত্রটী হইতে আসিয়াছেন, তাহার কিছুই ঠিকানা হইত না। কেবল সেই পূর্ব্বপরিচিত দেশে যাইবার জন্য প্রাণে কেমন একটা হাঁকুপাঁকু আসিয়া উপস্থিত হইয়া কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত। ছেলেবেলার ঐ সব কথা বলিবার পর যোগীন বলিতেন,—"যত বড় হইতে লাগিলাম, তত‌ই ঐ সমস্ত ছেলেমানুষী ভাবগুলা কমিয়া যাইতে লাগিল।"

এইরূপে আরও কয়েক বর্ষ অতীত হইলে পর যোগীনের উপনয়ন হয়। ঐ সময় হইতে তাঁহার পূজাধ্যান ইত্যাদি এত ভাল লাগিত যে, নারায়ণ পূজা করিতে করিতে ধ্যানে মগ্ন হইয়া কখন কখন দুই তিন ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। ইহার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা তাঁহাকে আগড়পাড়ার মিশনরি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠেই

অধিককাল ক্ষেপণ করিতেন, অন্য সকল পাঠে বিশেষ আস্থা কখন হয় নাই। আমরা শুনিয়াছি—একটু বেশী বয়সেই তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয় এবং এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ পর্য্যন্ত পড়িয়াই তাঁহার স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা সাঙ্গ হয়। ঐ সময়েই যোগীন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শন লাভ করেন এবং তদবধি ঈশ্বরলাভেই মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা বুঝিয়া সেই দিকেই সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করেন। এইরূপে চোক ফুটিবার পর হইতেই কিন্তু যোগীনের জীবনে নানা পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হয়।

সংসারে পিতার অর্থাভাবের আভাস যোগীন বহুপূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যাভ্যাসও যে কেবল অর্থোপার্জ্জনের সহায় হইবে বলিয়া, তাহাও সুস্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু মন কিছুতেই আর সংসারের ভিতর যাইতে চায় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট হইতে কামকাঞ্চনত্যাগেই ঈশ্বর লাভ হয়, নতুবা উহা সুদূরপরাহত—এই কথা শুনিয়া ও হৃদয়ে ধারণা করিয়া কেমন করিয়াই বা তাঁহার ন্যায় ঈশ্বরপিপাসু অন্য সকলের ন্যায় সংসারে লিপ্ত হইতে পারেন? যোগীন দেখিলেন—এ ঠিক "হয় শ্যাম রাখ, নয় কুল রাখ" গোছ ব্যাপার। প্রথম প্রথম "শ্যাম ও কুল দুইই রাখিব" বলিয়া তাঁহার মন নানা চেষ্টা করিলেও পরিশেষে শ্যামের টানই প্রবল হইয়া কুলকে ভাসাইয়া দিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত দর্শন ঘটিবার কিছু পূর্ব্ব হইতে যোগীনের ভিতর ব্রাহ্মসমাজের ভাব কিছু কিছু প্রবেশ করিয়াছিল। শুনিয়াছি—তাহারই ফলে নিরাকার ভগবানের উপাসনা, বিবাহ করিয়া সংসারের উন্নতি সাধন, ভারত উদ্ধারে প্রযত্ন ইত্যাদি ভাব সকল তাঁহার হৃদয়ে বেশ একটু স্থান লাভ করিয়াছিল। এখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আকর্ষণফলে ঈশ্বরলাভরূপ একমাত্র উদ্দেশ্যাভিমুখে জীবন পরিচালনার সংকল্প কাযেই মনের ভিতর গোটাল আনিয়া গোলযোগ উপস্থিত করিল। যাহা হউক, যোগীন স্থির করিলেন, বিবাহ কখনই করিবেন না, বাটী হইতে দূরে থাকিয়া, চাকরি করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিবেন, তাহা পিতার সাহায্যার্থ পাঠাইবেন এবং যতদূর সাধ্য ধ্যানভজনে অবশিষ্ট কাল কাটাইবেন। যোগীনের ন্যায় ভজন যখনি কেউ করে, তখনি সেটা হাতে পরিণত করে—আজ কোর্‌বো, কাল কোর্‌বো করে বৃথা সময় কাটায় না। একদিন পিতাকে বলিলেন—"আমি দেখ্‌ছি, আর বেশী লেখা পড়া আমার হবে না। মিছে স্কুলে গিয়ে সময় নষ্ট করি কেন? আমার মনে হয়, [illegible] জেনে কোন এটর্ণী আপিসে দিয়ে একটা কাজকর্ম্ম শিখ্‌তে কিছু রোজগার

করবার উপায় হতে পারে। ইচ্ছা হয়, কালপুরে মেসোর কাছে গিয়ে একটা চাকরি বাকরি দেখিয়া লই।" পিতা তাহাই বুঝিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে তাঁহাকে কালপুরে পাঠাইয়া দিলেন।

যোগীন কালপুরে তাঁহার মেসো মহাশয়ের নিকট যাইয়া রহিলেন বটে কিন্তু চাকরি জুটিল না। কাজেই সাধন ভজনেই কাল কাটাইতে লাগিলেন। সর্বদাই শ্রীভগবানের স্মরণ মনন ধ্যানজপ করেন, কাহারও সহিত মিশেন না, নির্জ্জনেই কাল কাটান। চক্ষু সর্বদা আরক্তিম, আর মুখেও তার যেন অন্যমনস্ক। দেখিলে বোধ হয়—যেন বাহ্য জগৎ ছাড়িয়া তিনি কোন এক ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। এইরূপে কয়েক মাস গত হইলে যোগীনের ভাব দেখিয়া মেসো মহাশয় তাঁহার ঐ অবস্থা উন্মাদের পূর্ব্বলক্ষণ স্থির করিয়া তাঁহার পিতাকে উহা জানাইলেন এবং লিখিলেন—"ছেলে বড় হইয়াছে, এখন বিবাহ না দিয়া এইরূপ ভাবে কাল কাটাইতে দিলে একেবারে বয়ে যাবে" ইত্যাদি।

এই পত্র পাইয়া যোগীনের পিতা পুত্রের বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ ভিতরে ভিতরে স্থির করিলেন, কিন্তু সে কথা যোগীনকে কিছুই জানিতে দিলেন না—কারণ, ইতিপূর্ব্বে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া দেখিয়াছিলেন, যোগীনকে তৎপ্রস্তাবে সম্মত করা সহজসাধ্য নহে। গাত্রহরিদ্রা ও বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির করিয়া আপনার শ্যালীপতিকে লিখিলেন—"যোগীনকে বাটী পাঠাইয়া দাও—বাটীতে অসুখ" ইত্যাদি।

বাল্যকাল হইতে যোগীন বড় মাতৃভক্ত ছিলেন। পিতার ঐ চিঠির ভাবে বুঝিলেন—তাঁহার জননী পীড়িতা। কাজেই সত্বর উদ্বিগ্নচিত্তে বাটী ফিরিলেন। বাটী পৌঁছিয়াই কিন্তু দেখিলেন—সকলে আনন্দোৎসবে গা ঢালিয়াছে। তাঁহার বিবাহের সমস্তই স্থির হইয়াছে, আগামী কল্যই তাঁহার গাত্রহরিদ্রা এবং পরদিন বিবাহ। যোগীনের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তিনি পিতাকে জানাইলেন; ঐরূপ হঠাৎ বিবাহপ্রস্তাবে তিনি কোনমতে সম্মত নন। নবীনচন্দ্র পুত্রকে নানারূপে বুঝাইয়াও যখন দেখিলেন, যোগীন্দ্রের বিবাহ না করিবার প্রতিজ্ঞা সমান অটলভাবে রহিয়াছে, তখন আপনাকে বিপদ্গ্রস্ত মনে করিলেন। পুত্রকে সহজেই বিবাহে সম্মত করিতে পারিবেন ভাবিয়া অপরকে বাক্যদান করিয়াছিলেন। এখন ঘটনা অন্যরূপ হওয়াতে পুত্রের জন্যই তিনি অপমানিত

হইতে বসিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন এবং রাগে ক্ষোভে অধীর হইয়া বলিতে লাগিলেন—ইহার পর আর তিনি গ্রামের লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিবেন না, কাশী বা অন্য কোন তীর্থে যাইয়া বাস করিবেন, কিন্তু ও কুলাঙ্গার পুত্রের তিনি আর মুখদর্শন করিবেন না ইত্যাদি। যোগীনের পূজ্যপাদ গর্ভধারিণী আসিয়া যোগীনের দুখানি হাত ধরিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—"বাবা, আমার মাথা খাও, অমত কোরোনা, কর্ত্তার মুখ রক্ষা কর; তিনি কন্যাকর্ত্তাকে কথা দিয়া ফেলেছেন। তুমি অমত কোর্‌লে ব্রাহ্মণের অপমানের শেষ থাক্‌বে না। তোমার ইচ্ছা না থাক্‌লেও তুমি আমার জন্য বিবাহ কর।" ইত্যাকার নানাবিধ কথা কহিয়া যোগীনের মাতা যোগীনের করযুগলে অবিরল অশ্রুবরিষণ করিতে লাগিলেন। বিবাহের নামে যোগীন এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, কাহারও কোন কথা তাঁহার কানে স্থান পাইতেছিল না, কিন্তু মাতার সকরুণ নির্ব্বন্ধ 'তুমি আমার জন্য বিবাহ কর' এবং চক্ষের তপ্ত জল তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল। মাতৃভক্তের প্রতিজ্ঞা মাতার অশ্রুধারায় ধুইয়া গেল—যোগীনের বিবাহ হইল।

যোগীন জননীকে সুখী করিবেন বলিয়া বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু মাতাকে ঐরূপে সুখী করিতে যাইয়া তাঁহার এতকালের আশা ভরসা সব ছাড়িতে হইতেছে, ইহা বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি মনে ঠিক বুঝিলেন--জীবনের সমস্ত উচ্চ আশা উদ্দেশ্যে আজ জলাঞ্জলি দিলেন এবং তাঁহার মহা ঈপ্সিত শ্রীরামকৃষ্ণ-সহবাস সুখও একেবারে হারাইলেন। ভাবিলেন—"যে প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে পারে না, তার মত হীন আর কে আছে? আমাকে তিনি কি আর ভাল বাস্‌বেন? তিনি কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, আর আমাকে এখন হইতে সেই কামিনী কাঞ্চন লইয়াই জীবনযাপন করিতে হইবে। এখন আমার আর তাঁহার নিকট যাইয়া কি হইবে? তিনি ত ঈশ্বরলাভের পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন, আমি সে পথে চলিতে পারিলাম কৈ? ইতিপূর্ব্বে আমি তাঁহাকে বিবাহ করিব না বলায় তিনি কত আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন—এখন আমি তাঁর কাছে মুখ দেখাব কেমন কোরে? যিনি বে'র কথা পর্য্যন্ত কইতে পারেন না, সে কোরে তাঁর কাছে এমুখ দেখাব কেমন কোরে?" নির্জ্জনে বসিয়া যোগীন ইত্যাকার নানা চিন্তা করিয়া হতাশ হইয়া স্থির করিলেন—আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইবেন না। কিন্তু অপরে কেহ যোগীনের এই প্রকার মনোভাব জানিতে পারিল না।

অতঃপর যোগীন বিষয়কর্ম্মাদিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন।

এদিকে যোগীনের বিবাহের সংবাদ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিল। এই সংবাদ শুনিয়া যোগীনকে একবার দেখিবার জন্য তাঁহার মন সমধিক ব্যস্ত হইয়া পড়িল; তিনি লোকদ্বারা যোগীনকে আসিতে বলিয়া পাঠান, কিন্তু সকলেই বলে, বিবাহ করিয়া পর্য্যন্ত যোগীন আর এক রকম হইয়া গিয়াছে—সে আর তাঁহার নামও করে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুনঃ পুনঃ লোক দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু যোগীন কিছুতেই আসিলেন না। তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব যোগীনের পরিচিত একটী লোককে ডাকিয়া একদিন বলিলেন, "অমুকের ছেলে কি রকম লোক? কানপুরে যাবার আগে তার নিকট এখানকার পয়সা কড়ি কিছু ছিল, তার হিসাবও দেয় না, ডাকিয়া পাঠাইলেও আসে না। বোলো তো তাকে।" যোগীনের মনে ছিল, কতকগুলি দ্রব্য ক্রয় করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট ৪।৫টী টাকা দেওয়া হইয়াছিল। ঐ দ্রব্যগুলি তিনি ইতিপূর্ব্বেই কিনিয়া পাঠাইয়াছিলেন—উহারই বাকি কয় আনা পয়সা তাঁহার নিকট ছিল। নানা হাঙ্গামায় এতদিন পাঠান হয় নাই। প্রথমে যোগীন ভাবিয়াছিলেন, নিজেই তাঁহাকে ঐ পয়সা ফিরাইয়া দিয়া আসিবেন। পরে বিবাহের পর যখন স্থির করিলেন—আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইবেন না, তখন অপর কাহাকেও দিয়া উহা পাঠাইয়া দিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। এখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐরূপ অনুযোগ শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিলেন—"আমার সকল আশা ভরসা গিয়াছে বটে, কিন্তু তা বলে এখনও এত হীন হই নাই যে, চুরি করিব। তিনি কি আমাকে এখন এতদূর খারাপ ঠাওরান নাকি? যাই হউক, আজই তাঁহার পয়সা ফেলিয়া দিয়া আসিব।"

এই ভাবিয়া যোগীন সেইদিনই অপরাহ্ণে রাসমণির বাগানে গমন করিলেন এবং বিষণ্ণচিত্তে আপনার অদৃষ্টের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরের পূর্ব্বদিকের দালানে আসিয়া দেখিলেন, তিনি ছোট চৌকিখানির উপর বিবস্ত্র হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন—কাপড়খানি কোলের উপর জড়সড় করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছেন মাত্র। তাঁহাকে দেখিবামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেব বালকের ন্যায় কাপড়খানি বগলে করিয়া বেগে তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন—কি এক অপূর্ব্বভাবে তাঁহার মুখমণ্ডল তখন প্রদীপ্ত হইয়াছে—কি এক অনৈসর্গিক শক্তিতে তিনি যেন পূর্ণ হইয়াছেন! হাত ধরিয়াই বলিলেন—"যে-

কোরেছিস্—তা কি হয়েছে? এই যে আমি যে কোরেছি। যে কোরেছিস্—তা ভয় কি? (নিজ বক্ষে হস্ত রাখিয়া) এখানকার কৃপা থাকলে একটা কি, লাখটা যেতেও কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। তোর যদি সংসারে থাকতে ইচ্ছা হয় তো তোর স্ত্রীকে একদিন এখানে নিয়ে আসিস্। তাকে এমন কোরে দেব যে, সে তোর ধর্ম্মপথের সহায় ছাড়া কখন বিঘ্ন হবে না। আর যদি সংসার কর্ত্তে না ইচ্ছা হয় ত বলিস্, তোর মায়া মমতা সব খেয়ে ফেল্‌বো।"

যোগীন নির্ব্বাক্। এ সব কি কথা—এ কথা কি সম্ভব? কিন্তু নিরাশার অন্ধকারময় গহ্বর হতে তাঁর মন যেন সহসা সূর্য্যালোকে আনীত—ইনি কে—আর এ কি অহেতুকী কৃপা—এই কৃপা কর্‌বার জন্যই কি প্রভু মিথ্যা অভিযোগ প্রভৃতি নানা ছল কোরে তাঁকে এখানে তোমার আন্‌বার উদ্যোগ! হতাশ-প্রাণে আশাতরু ফুলফলে পল্লবিত হইয়া উঠিল—মরুভূমি আবার 'সুখময় সায়রে' পরিণত হইল।

আর সে পয়সাকড়ির কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না—যোগীন বলিলেও শুনিলেন না—বলিলেন—"ঐ ভাঙ্গা টিনের বাক্সটার ভিতর রেখে দে।"

হামিরপুর যাত্রা।

শ্রীহরিতোষ দত্ত।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণমূর্ত্তির সম্মুখে সচন্দন বিল্বদল পরিশোভিত কয়েকটি শিলাখণ্ডও দেখিলাম। বাণলিঙ্গোপরি সবজ্র বিল্বপত্র দর্শন করিয়া মনে হইল, এখানকার অধিবাসীদের পক্ষে ঐরূপে শিবপূজা শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে। বিষ্ণুক্রান্তাবাসী বঙ্গদেশীয় অনেকে বিল্বপত্রের বৃন্তচ্ছেদ করিয়া শিবাদির অর্চ্চনা করিয়া থাকে; ইহা কিন্তু অশাস্ত্রীয়;—যে হেতু তন্ত্রে আছে, "বিষ্ণুক্রান্তাসু দেবেশি বজ্রমোক্ষং ন কারয়েৎ।" রথক্রান্তা দেশসমূহ সম্বন্ধে ঐরূপ কোনও নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায় না। হামিরপুর রথক্রান্তার অন্তর্গত; সুতরাং অত্রত্য লোকের সবজ্র বিল্বপত্রার্পণ একেবারে বিধিবিরুদ্ধ নহে।

অনন্তর পথে গমনকালে আমাদের বামভাগে একটী শিবমন্দির দর্শন করিলাম। মন্দিরশিরোদেশে অনেকগুলি বৃহল্লাঙ্গুল হনুমান রহিয়াছে, দেখিলাম। অভ্যন্তরে দেবাদিদেব মহাদেবের অসিত-পাষাণ-বিনির্ম্মিত লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত; তাঁহার সম্মুখে শ্বেত-প্রস্তরের একটী ষণ্ড ঊর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান। এইরূপ শিবমন্দির এখানে অনেক আছে। তন্মধ্যে একটী মন্দিরে আমরা উপনীত হইবামাত্র রুক্ষকেশ বৃহৎ-সিন্দূর-বিন্দু-পরিরঞ্জিত-ললাট এক দীর্ঘকায় পুরোহিত যত্নসহকারে আমাদিগকে ঠাকুর দর্শন করাইলেন, এবং মহাদেবের মহাপ্রসাদ স্বরূপ কয়েকখানি বাতাসা ও কতকগুলি লবঙ্গ আমাদিগের হস্তে প্রদান করিলেন। আমরা ভক্তিসহকারে তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।

একদা দুর্গাদেবীর মন্দিরে গমন করিলাম। দেখিলাম, পর্ব্বতসদৃশ অত্যুচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর বেদী-বিশোভিত-পুরোদেশ শ্বেত-সর্ব্বাঙ্গ একটী মন্দির। ঐ মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গন-প্রান্তে সিন্দূরহরিদ্রানুলিপ্তদেহ ভগ্নশীর্ষ এক শিবলিঙ্গ বিরাজিত। মন্দিরমধ্যেও হরিদ্রা-সিন্দূর-বিশোভিত, তুলসীপত্রাক্ষতপরিব্যাপ্ত কতকগুলি প্রস্তরখোদিত অস্পষ্ট মূর্ত্তি। ইহারই মধ্যে একটী দুর্গাদেবীর মূর্ত্তি হইবে; কিন্তু অস্পষ্টতাব জন্য চিনিয়া লওয়া আমার সাধ্যায়ত্ত হইল না। আমরা যখন মন্দিরে প্রবেশ করিলাম, তখন বেদীমধ্যস্থ গহ্বর হইতে সুরভিত ধূমরাশি বিনির্গত হইতেছিল। শুনিলাম, পূর্ব্বদিবস অত্রত্য এক পণ্ডিত হোম করিয়া গিয়াছেন; সেই হুতাবশেষ এখনও প্রধূমিত হইতেছে।

একদিন 'গোরাইয়া' দেবীর দর্শনে চলিলাম। বঙ্গদেশে 'গোরাইয়া' দেবীর নাম কখনও শুনি নাই। সুতরাং নূতন দেবী দেখিব বলিয়া অন্তরে অতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিল। হৃদয়পটে কল্পনাতুলিকায় নানাবর্ণের বিচিত্র চিত্রমালা অঙ্কিত করিতে করিতে শৈলরাজিসন্নিভমৃত্তিকাস্তূপপরিশোভিতপার্শ্ব কঙ্করময় পথ অতিক্রম করিয়া মন্দিরপাদমূলে উপনীত হইলাম। দেখিলাম, পথ হইতে ৩৭।৩৮ হাত উচ্চে দেবীর মন্দির। মন্দিরে উঠিবার জন্য প্রস্তরসোপানাবলি বিদ্যমান। ঐ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া দেখিলাম—হরিদ্বল্লরী-বিশোভিত নিম্বতরুতলে ক্ষুদ্র মন্দিরমধ্যে কতকগুলি সিন্দূর-পরিরঞ্জিত প্রস্তরখণ্ড। ইহারাই 'গোরাইয়া' নামে অভিহিত; দেখিয়া কিছুই বোধগম্য হইল না। কল্পনাপ্রসূত সৌন্দর্য্যরাশি, "ইয়ারো" (Yarrow) দর্শনে হতাশময় ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ-হৃদয়ের ন্যায় আমারও অন্তঃকরণ হইতে চিরাবকাশ গ্রহণ করিল। তবে মন্দির হইতে যে

মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়নপথে পতিত হইল, তাহাতেই ততদূর আসিবার শ্রম সফল বলিয়া বোধ হইল। দেখিলাম—দূরে কলপ্রবাহিনী রজতসূত্রসদৃশী স্রোতস্বিনী বেতোয়া ধীরে ধীরে প্রিয়সখী হিমাচলনন্দিনী পুণ্যতোয়া যমুনার সহিত মিলিতে চলিয়াছে। নদীর উভয় প্রান্তে তৃণগুল্মপরিবৃত ভূধরসন্নিভ-অত্যুচ্চভূখণ্ডবহুল সুবিস্তৃত বিশাল প্রান্তর মুক্তবক্ষে পড়িয়া আছে। পথ, ঘর, বাড়ী বা উচ্চচূড় মহীরুহ, কিছুই দৃষ্টিপথান্তর্ভূত হইতেছে না। বোধ হয়, মাদৃশ সামান্য জনের এতাদৃশী উন্নতি দর্শনে লজ্জাবনতবদন ... উক্ত ভূখণ্ড-ব্যবহিত স্থানাভ্যন্তরে আপন আপন অবয়ব লুক্কায়িত ...ছে।

হামিরপুরে দুইটী সমাধিপ্রাঙ্গন আছে, একটী মুসলমানদিগের, অপরটী খৃষ্টান-দিগের। প্রথমোক্ত সমাধিপ্রাঙ্গনস্থ একটী সমাধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা মহাত্মা নুরসৈয়দের কবর। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার প্রিয় অশ্বের কবরও বিদ্যমান। এই সমাধিদ্বয় প্রায় পঞ্চহস্ত পরিমিত উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। বহির্দ্দেশে পাদুকা রক্ষা করতঃ ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, নুরসৈয়দের কবরের উচ্চতা ভূমি হইতে ২॥০ হাত, কবরপৃষ্ঠে একখানি সাদা নূতন চাদর এবং সম্মুখের কোলঙ্গায় একটী ঘৃতের প্রদীপ। অশ্বসমাধির উচ্চতা এক হাত মাত্র। সমাধির উপরিভাগে একটী শায়িত অশ্বমূর্ত্তি বিরাজিত। তাহার মুখের নিকট কতকগুলি ছোলা রক্ষিত, কিন্তু "মরা ঘোড়ায় ত ছোলা খায় না," সুতরাং পরমকারুণিক মুসলমান পুরোহিত ঠাকুরই তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। ছোলা ও প্রদীপ প্রত্যহ প্রদান করা হয়। চাদর সর্বদিন পড়ে না। মাঝে মাঝে বৃহস্পতিবারে মহম্মদীয়গণ কামনাসিদ্ধ্যর্থ পূজা দিতে আসিয়া উহা রাখিয়া যান। উহাও মুসলমান পুরোহিতের প্রাপ্য।

নুরসৈয়দেরা সাত ভ্রাতা ছিলেন। তন্মধ্যে নুরসৈয়দই জ্যেষ্ঠ। কথিত আছে, তিনি বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন; তিনি যাহা বলিতেন তাহাই ঘটিত। জন-শ্রুতি এই যে, তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বলিতে পারিতেন। লোকে তাঁহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া জানিত এবং ভক্তিশ্রদ্ধাসহকারে পূজা করিত। মহাত্মা নুর-সৈয়দ তাঁহার ভ্রাতৃগণের সহিত একত্রে বাস করিতেন, এতদ্ভিন্ন তাঁহার অনেকগুলি শিষ্য ছিল; তাহারা সর্ব্বদা তাঁহার অনুসরণ করিত। সমস্তদিন তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন না। কিন্তু রাত্রিকালে আপনার প্রিয়শিষ্য ও ভ্রাতৃগণকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সমবেত করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ মশালহস্তে প্রহরীর ন্যায় নগরমধ্যে তিনি সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এইরূপ

প্রত্যহ চলিত। তিনি কোথা হইতে কবে এইস্থানে পদার্পণ করেন, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়রূপে কিছু জানা যায় না; তবে যে, তিনি হামিরপুরে প্রভূত প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এইরূপে জীবন অতিবাহিত করিতে করিতে একদিন মহাত্মা সৈয়দ তাঁহার শিষ্যগণকে বলিলেন, "তোমরা আমার ও আমার অশ্বের সমাধি প্রস্তুত কর, সময় হইয়াছে।" শিষ্যগণ তখনই তাঁহার আদেশ পালনে প্রবৃত্ত হইল এবং ক্ষণকালমধ্যে খননকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। কবর প্রস্তুত হইয়াছে—এই সংবাদ পাইবামাত্র মহাত্মা সৈয়দ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে অশ্বটীও গতাসু হইল। শিষ্যগণ হঠাৎ গুরুকে ঐরূপ নিশ্চল, নিস্পন্দ ভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া প্রথমে ভাবিল, তিনি বুঝি সহসা ধ্যানস্থ হইয়াছেন। কিন্তু অনেকক্ষণবাদেও যখন তাঁহার চেতনা হইল না দেখিল, তখন বুঝিল, তিনি জন্মের মত তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া সমাধিস্থ হইয়া অক্ষয় অমরপুরে প্রস্থান করিয়াছেন। অগত্যা অশ্রুনীরে ভূমিতল অভিষিক্ত করিতে করিতে অতিকষ্টে তাহারা তাঁহার পবিত্র দেহ প্রোথিত করিল, পার্শ্বেই অশ্বদেহও সমাহিত করা হইল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, যে দিন যে মুহূর্ত্তে দেহপিঞ্জর হইতে নূরসৈয়দের প্রাণপাখী উড়িয়া গেল, ঠিক সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার অপর ছয় সহোদরও মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহাদের সমাধিও হামিরপুরে ছয়টি বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান। লোকে এখনও ঐ সকল সমাধিস্থলে গমন করিয়া ইঁহাদের নিকট আপন আপন প্রাণের কামনা জানায়, ও সফলকাম হইয়া ভক্তিসহকারে পূজা দেয়।

নূর সৈয়দের সমাধির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একটী অতি প্রাচীন জীর্ণ মন্দির। মন্দির-শিরোদেশে অনেক [illegible] সগর্ব্বে বিরাজ করতঃ নিম্নস্থ ভূতলজাত তরুলতা-দিগকে অবজ্ঞার [illegible] দর্শন [illegible] রিতেছে। জগতের ধারাই এইরূপ। উপরে উঠিলেই আমরা নিজের কথা ভুলিয়া যাই। শুনিলাম—এই মন্দির মহারাটাদিগের প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে ইহার যথেষ্ট সম্মান ছিল, কিন্তু এখন ইহা কতিপয় গর্দ্দভ-পালক হিন্দুস্থানীর আবাস গেহে পরিণত হইয়াছে। প্রাঙ্গনের স্থানে স্থানে গর্দ্দভসমূহ কীলবদ্ধ রহিয়াছে। সুগন্ধি ধূপ, ধুনা, গুগ্গুলের পরিবর্ত্তে এখন উহা গর্দ্দভপালকদিগের মলিন বসন, মলিন বাসন ও গর্দ্দভপুরীষের দুর্গন্ধে কলুষিত! বসনাবরণে নাসিকাকে গন্ধলাভহেতু বঞ্চিত করিয়া কোনক্রমে আমাদিগকে এ স্থান অতিক্রম করিতে হইল।

একদা প্রাতে সুমন্দ সুশীতল মারুতহিল্লোল অনুভব করিতে করিতে খৃষ্টান-দিগের সমাধিপ্রাঙ্গনদ্বারদেশে উপনীত হইলাম। দেখিলাম—তোরণশীর্ষদেশ নয়নপ্রীতিকর হরিৎলতাপ্রতানসমাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে গোলাপী কুসুমপুঞ্জ সুন্দরলতিকাবলীকে সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছে। পুঞ্জে পুঞ্জে মধুলোভী মধুব্রত কুসুমকুলসকাশে গুঞ্জন করিতেছে। পত্রস্থ শিশিরবিন্দুসমূহ নবীন তপনের বিমল কিরণে ঝলমল করিতেছে। আমি প্রবেশ করিলাম। ভিতরের দৃশ্য আরও মনোহর। স্থানে স্থানে কুসুমিত তরুকুঞ্জসমূহ বিরাজ করিয়া ঘৃণা ও ভীষণতার ভাবকে একেবারে তিরোহিত করিয়াছে; সমাধিপ্রাঙ্গনকে বিলাসীর প্রমোদ-ভবনকল্প করিয়া তুলিয়াছে। তাহারই মধ্যে সমাধিসমূহ পুষ্পিত তরুগুল্মপরি-বৃত হইয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কেহ প্রাণপ্রিয়া অর্দ্ধাঙ্গিনীর জন্য শোকবিহ্বল হইয়া প্রাণের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন; কেহ বা প্রাণের প্রাণ কুসুমো-পম অপত্যরত্নবিয়োগবিধুরা হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন; সকলি সমাধিপ্রস্তরগাত্রে বিষাদকালিমা মাখা অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। চার্লস্ গ্রাণ্ট্ সাহেবের কবর দেখিলাম। ইনি ১৮২৭ খৃঃ অব্দে জন্ম পরিগ্রহ করেন, এবং ১৮৭৬ অব্দে মানবলীলা সাঙ্গ করেন। তিনি মহাত্মা ও সদাশয় ছিলেন। পরের দুঃখে তাঁহার হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইত; এবং তদ্দূরী-করণে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। তাঁহার কৃত যমুনাঘাট এখনও বর্ত্তমান; লোকে তাহাকে গ্রাণ্ট ঘাট বলে। এই প্রাঙ্গনে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৭টী কবর আছে এবং প্রায় সকলগুলিরই উপর এক একটী মর্ম্মস্পর্শী বিষাদগাথা সংক্ষেপে লিখিত। নিদর্শন-স্বরূপ নিম্নে একটী উদ্ধৃত করিলাম—

পাপের মালিন্য, আর বিষাদ আঁধার,
না পশিতে হৃদে তার, সুহৃদ্ শমন।
ল'যে গেল ফুলকলি ত্রিদিব মাঝার,
প্রফুল্ল হইতে সেথা, চারুদরশন।

হামিরপুর বাজারে সকলদিন সকল দ্রব্য মিলে না। হাটবারে যে ঋতুতে যাহা জন্মে, তাহা এবং অপরাপর আবশ্যকীয় দ্রব্য মন্দ পাওয়া যায় না। শনি ও মঙ্গল হাটবার। গৃহরাজি-পরিবেষ্টিত-চতুর্দ্দিক্ ত্রিফটক-বিশিষ্ট বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে উক্ত দুইদিনে হাট বসিয়া থাকে। প্রাঙ্গনমধ্যস্থলে একটী মণ্ডপ। মণ্ডপবহির্দ্দেশে বিক্রেতৃগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রগৃহ নির্ম্মাণ করতঃ বিবিধ পণ্য পরিপূর্ণ নিজ নিজ আপণ

রক্ষা করে। বৃষ্টি হইলে মণ্ডপমধ্যে বিপণি সাজান হয়। এই হট্টের নাম স্পেন্সারগঞ্জ; কারণ, ইহা ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এখানকার কলেক্টর স্পেন্সার সাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বে উন্মুক্ত প্রান্তরেই বাজার বসিত; কিন্তু এরূপ সুবন্দোবস্ত ছিল না। জলাভাব নিবারণের জন্ত বাজারের মধ্যে একটী ইঁদারাও আছে।

অত্রত্য কোম্পানির বাগানে একদিন যাইয়া দেখিলাম, সুসংন্যস্ত বিবিধ কুসুমিত তরুলতার বিমল হাস্যে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত এবং মাঝে মাঝে তির্য্যক্-ন্যস্ত-ইষ্টক-শোভিত-প্রান্ত পথ। কাননের সর্ব্বত্র জল সঞ্চালন সুবিধার্থ নির্ম্মিত পয়ঃপ্রণালীগুলি উদ্যানটীকে বহু বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত করিয়াছে এবং প্রত্যেক বর্গ-ক্ষেত্র মধ্যে এক একটী কুসুমবাটিকা। কাননের প্রান্তভাগে একটী বৃহৎ ইঁদারা। কপিযন্ত্র সাহায্যে যুগ্ম বলদ দ্বারা উহা হইতে মশকে করিয়া জল উত্তোলন করা হয়। একেবারে অধিক জল তুলিতে হইলে লোকে মশকই ব্যবহার করিয়া থাকে। এদেশের ইঁদারা সকলের অত্যধিক গভীরত্ব নিবন্ধন এবম্বিধ উপায়েই জল তোলা হয়। ইহার নিকটেই একটী ৯।১০ হাত গভীর বৃহৎ চৌবাচ্চা; উহা বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হইয়া পুষ্করিণীর আকার ধারণ করে। উদ্যান-মধ্যস্থলে একটী সুদৃশ্য পুস্তকালয় (Library)। অত্রত্য ভূতপূর্ব্ব কলেক্টর মহানুভব স্পেন্সার সাহেবের যত্নে ও সাহায্যে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম স্পেন্সার লাইব্রেরী হইয়াছে। সম্মুখে চূর্ণকঠিনীচিহ্নিত টেনিস গ্রাউণ্ড। লাইব্রেরীর মেম্বরেরা বিকালে এখানে 'টেনিস' খেলিয়া থাকেন।

হমিরপুর হাঁসপাতাল দেখিতে মন্দ নহে। প্রাঙ্গনে কতকগুলি সুশীতলচ্ছায় নিম্বতরু বিদ্যমান। গৃহগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমরা যখন দেখিতে যাই, তখন রোগীর সংখ্যা দ্বাদশের অধিক ছিল না। উহাদের কাহারও মুখে কোন ত্রুটি বা অভাবের কথা শুনিতে পাইলাম না—বুঝিলাম, সেবাশুশ্রূষার বন্দোবস্ত মন্দ নহে। আর এক কথা, রোগিসংখ্যার অল্পতা হইতে বুঝিলাম—দেশ বেশ স্বাস্থ্যকর; বস্তুতঃ তাহাই।

হামিরপুর জেলে বিশেষত্ব কিছুই নাই। সাধারণতঃ অন্যান্য ডিষ্ট্রিক্ট জেল যেরূপ হইয়া থাকে, ইহাও সেইরূপ। এতদিন ফাঁসির কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না; পার্শ্বস্থ বিস্তীর্ণ অনাবৃত প্রান্তরেই উদ্বন্ধন-কার্য্য সমাধা হইত। সাধারণের দেখিবার কোন বাধা ছিল না। অল্পদিন হইল, কারাগৃহপার্শ্বস্থ কিঞ্চিৎ স্থান

সুদৃঢ় উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে উদ্বন্ধন-মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে। কারাভবনের দক্ষিণপশ্চিম কোণে 'পোষ্টমর্টেম' গৃহ; সম্মুখে কয়েদীদিগের নিমিত্ত ফলমূল শাকসবজির উদ্যান। শুনিলাম—এই কারাগৃহ হামিরদেও নামক জনৈক মহারাষ্ট্র নরপতির "তোপখানার" ভগ্নাবশেষ। ইংরাজেরা ইহাকে সংস্কৃত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া বর্ত্তমান কারাগৃহে পরিণত করিয়াছেন। উক্ত নৃপতি পরিত্যক্ত কতকগুলি লৌহনির্ম্মিত 'গোলা' এখনও নিদর্শন স্বরূপ কারাভবন সম্মুখে স্তূপাকারে বিরাজ করিতেছে। হামিরদেওর দুর্গ যমুনাগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কেবল একস্থানে পর্ব্বতসদৃশ এক প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড সলিলাভ্যন্তর হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া ভূতপূর্ব্ব দুর্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া দিতেছে। উক্ত নৃপতির নামানুসারেই নগরের বর্ত্তমান নাম হামিরপুর হইয়াছে।

বেতোয়া-যমুনা-সঙ্গম সহর হইতে তিন ক্রোশ দূরে। পথের উভয় পার্শ্বে ধরিত্রীর কনকাঞ্চল-সদৃশ পুষ্পিত "বাজরা" শস্যসমূহ নিরীক্ষণ করিয়া নয়নানন্দ বিধান করিতে করিতে সঙ্গমসমীপে একদিন উপনীত হইলাম। তখন বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে। দেখিতে দেখিতে তপনদেব পশ্চিম গগন সিন্দূররঞ্জিত করিয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। তরঙ্গিনীদ্বয়ের ছোট ছোট ঢেউগুলি পরস্পরের গায়ে ঐ রূপে ছড়াইতে ছড়াইতে মনের সুখে পরস্পরের সহিত মিশিতে লাগিল আবার নাচিতে নাচিতে দলবদ্ধ হইয়া কুলুকুলু রবে কতই প্রাণের কথা কহিতে লাগিল, তাহাই শুনিবার জন্য যেন পরপারে একদল রাজহংস কমলমালার আকার ধারণ করতঃ উৎকর্ণ হইয়া নীরবে সলিলে ভাসিতে লাগিল। দেখিলাম—আরোহিপূর্ণ একখানি ক্ষুদ্র তরণী তর্‌তর্‌ করিয়া পরপারাভিমুখে চলিয়াছে। বীচিমালা তরণীগাত্রে আহ্লাদে আটখান হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। মাঠে এখনও দুই একটী সারস কট্‌কট্‌ শব্দ করিতেছে, এখনি বোধ হয় উড়িয়া যাইবে। অপরূপ দৃশ্যে প্রাণ শান্তিতে ভরিয়া গেল।

অত্রত্য উৎসবের মধ্যে রামলীলা ও যবস্নানোৎসবই উল্লেখযোগ্য। যবস্নানোৎসব চৈত্র, শ্রাবণ ও আশ্বিনমাসে সম্পন্ন হইয়া থাকে। উক্ত উৎসবে দীর্ঘাবগুণ্ঠনবতী ভদ্রবংশীয়া স্ত্রীলোকেরা যবাঙ্কুরপরিপূর্ণ মৃৎপাত্রসমূহ মস্তকে ধারণ করতঃ মহাসমারোহে গজেন্দ্রগমনে নদীতীরে গমন করেন, তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে নর্ত্তকী ও বাদ্যকরগণ আপন আপন নৃত্যগীতের পরিচয় দিতে দিতে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রবাহিনীনীরে মৃৎপাত্রগুলি নিক্ষেপ করা হয়, কিন্তু

যবতকগুলি বিসর্জ্জন করা হয় না। সে গুলি ধৌত করিয়া আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লওয়া হয়—উপস্থিত দর্শকবৃন্দকেও তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদান করা হয়। অতঃপর সকলে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় নৃত্যগীত করিতে করিতে গৃহ প্রতিগমন করেন।

রামলীলা বিজয়া দশমীর দিনে হইয়া থাকে। এই উৎসবে সীতাহরণ, শূর্পনখার নাসাচ্ছেদন, রাবণ নিধন, ভরত মিলন প্রভৃতি রামায়ণোক্ত ঘটনাগুলি সমারোহের সহিত অভিনীত হইয়া থাকে। কাগজনির্ম্মিত বৃহদ্বপুঃ রাবণকে অগ্নিদগ্ধ করা হয়। রাবণকলেবর অগ্নিসাৎ হইবার সময়ে অনেক বাজী পোড়ানও হইয়া থাকে।

দেশহিতৈষণা।*

দ্বিতীয় প্রস্তাব—উপায় ও উদ্দেশ্য।

[শ্রীবিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়।]

আমেরিকায় পৌঁছিবার কিছুদিন পরেই স্বামীজি অর্থের অনাটন প্রভৃতি নানা-কারণে যেরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়েন ও ঐ সকল প্রতিকূল অবস্থার সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া যেরূপে পরিশেষে জয়ী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় সাধারণে সকলে অবগত নহেন। কোনদিন অর্দ্ধাশন, কোন দিন অনশন, কোনদিন শুদ্ধ জল রুটি খাইয়া জীবন বাঁচিয়াছে। দারুণ শীতে আশ্রয়-স্থল নাই, দয়া করিয়া কেহ কোন দিন আশ্রয় প্রদান করিল তো করিল, নতুবা দুইচারি পয়সা ব্যয়ে দরিদ্রাবাসে রাত্রিযাপন। এ কষ্টের অবস্থা কে বর্ণনা করিতে পারে। সন্ন্যাসিবেশধারী হিন্দুভিক্ষুকে আমেরিকাবাসী কে তখন চিনে—কে তাঁহার আদর করিবে? কিন্তু যে দিন ধর্ম্মমহাসভায় (Parliament of religions) তাঁহার বক্তৃতায় সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়াছিল, তাঁহার কথায় তাঁহাকে পাণ্ডিত্যের আকর বলিয়া সকলের বিশ্বাস হইয়াছিল, প্রাচ্যভূমি হইতে

* বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর (১৯০৮) কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির অধিবেশনে পঠিত।

সমাগত সেই অদ্ভুত সন্ন্যাসীর নিকট প্রাচ্য ধর্ম্ম, প্রাচ্য সভ্যতা ও সর্ব্ব বিষয়ে প্রাচ্য আদর্শের বিষয় শিক্ষা করিবার ইচ্ছা যখন তাহাদের মধ্যে জাগরূক হইয়াছিল, সে দিন স্বামীজির আর এক অবস্থা। স্বামীজি আর তখন কাহারও নিকট দীনভাবে আশ্রয় বা অন্নের ভিখারী নন, চিকাগোর অনেক সুরম্য অট্টালিকার দ্বার তখন তাঁহার জন্য উন্মুক্ত; আমেরিকার পণ্ডিত, ধনী, মানী ব্যক্তি অনেকেই তাঁহাকে আপন আপন আলয়ে অতিথি হইবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। স্বামীজি যাহার আলয়ে পদার্পণ করিতেছেন, সেই নিজেকেই ধন্য মনে করিতেছে। কিন্তু যেদিন তিনি প্রথম সেই অমরালাঞ্ছিত নগরীর সুরম্য অট্টালিকায় এইরূপে নিজ গুণগৌরবে স্থান অধিকার করেন, সেই দিন তদ্দেশবাসীদের অপূর্ব্ব বিলাস, বৈভব, সুখ, ঐশ্বর্য্যের অবস্থা দেখিয়া অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এত দুঃখভোগের পর তিনি একটু আরামে থাকিবার আবাসস্থল প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু সে আরাম বৃশ্চিকদংশন অপেক্ষা ক্লেশকর হইয়াছিল, সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারেন নাই—ভারতবাসীর দারিদ্র্যদুঃখের ছবি তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইয়া অন্তরকে অভিভূত করিয়াছিল। ক্রন্দন করিয়া সে রাত্রি কাটিয়াছিল। জগজ্জননীকে স্মরণ করিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন, 'মা জগদম্বা, তোমার কৃপায় আজ ইহারা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, ইহাদের ভোগ-বিলাসের সীমা নাই, মাগো, আমার দেশের লোক তোমার কাছে কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহাদের ভাগ্যে কিছুমাত্র সুখ লিখ নাই? সুখভোগ তো দূরের কথা, কি অপরাধে মা, তাহারা একমুষ্টি অন্নের কাঙ্গাল হইয়া বেড়াইতেছে'?" এইরূপে বর্ত্তমান ভারতের দুঃখ দারিদ্র্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার অন্তর অস্থির হইয়া উঠে, দুগ্ধফেনসন্নিভ শয্যা কণ্টকময় বোধ হয়। দুঃখে অভিমানে তিনি সে রাত্রি শয্যা ত্যাগ করিয়া ভূমিতলে শয়ন করিয়া থাকেন এবং তাঁহার মস্তকের উপাধান নয়নজলে ভিজিয়া গিয়াছিল। তাঁহার আমেরিকান শিষ্যের নিকট এ কথা আমরা অবাক্ হইয়া বহুকালপরে শুনিয়াছিলাম।

কলিকাতায় যে বৎসর প্রথম প্লেগ দেখা দিল, সেই বৎসর প্লেগ আইনের জন্য সর্ব্ব সাধারণে ভীত ও ত্রস্ত হইয়াছিল। বোম্বাই হইতে প্লেগনিবারণ-কর্ম্মচারিগণের কার্য্যকলাপের সংবাদ কলিকাতায় যতই আসিতে লাগিল, সকলের মন ততই উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল; প্লেগ আইন ভয়ে বহুলোক কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া পলাইলেন। সেদিন এক বিষম বিভীষিকায় আমরা সকলেই কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছিলাম। প্রাণের দায়ে, বিশেষ মানের দায়ে সকলেই কাতর হইয়া

পড়িয়াছিলাম। শরীর বিশেষ অসুস্থ হওয়ায় স্বামীজি সেই সময় কারসিয়ংএ অবস্থান করিতেছিলেন। চিকিৎসকের উপদেশ—কিছুদিন তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। কিন্তু কলিকাতায় এই বিভীষিকার সংবাদ সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন, তখনই কলিকাতায় চলিযা আসিবার প্রস্তাব করিলেন। বন্ধুবর্গ নিষেধ করিতে লাগিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমার দেশের লোকের এই বিপদ্, স্ত্রীলোকের মানরক্ষা, সতীর সতীত্ব রক্ষা কিরূপে হইবে এই চিন্তায় আজ দেশের লোক দারুণ মনঃকষ্টে দিন কাটাইতেছে, আমি সে কথা শুনিয়া কেমন করিয়া এখানে নিশ্চিন্ত হইযা সময় কাটাই? এই বলিযা কাল-বিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কলিকাতার ত্রস্তজনগণকে এই বিপদের সময় যথাসাধ্য সাহায্য করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শ্যামপুকুরে একটি বিস্তৃত ময়দান ভাড়া লইয়া সেইস্থানে গভর্ণমেণ্ট আইন অনুযায়ী Segregat on camp করিযা যত দূর সম্ভব প্লেগগ্রস্ত রোগীকে আশ্রয় দিয়া সেবা করা হইবে, ইহাই স্থির হইল। ইতিমধ্যে জনসাধারণেব মনশ্চাঞ্চল্য বুঝিযা শুভক্ষণে ছোটলাট বাহাদুর কলিকাতায় প্লেগ আইন প্রত্যাহার করেন। কাযেই স্বামীজির ঐ সংকল্প আর কার্য্যে পরিণত কবিবার প্রয়োজন হইল না। কিন্তু সেই দুর্দ্দিনে তাঁহার দেশের প্রতি ভালবাসা বা সহানুভূতি যে কথার কথা নহে, তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলাম। ধনী, সম্ভ্রান্ত, এবং অবস্থাপন্ন সকলে যাহাদের কলিকাতা নগরীর বাহিরে থাকিবার আশ্রয়স্থল ছিল—তাঁহাদের অনেকেই সেদিন পলাইযাছিলেন বা পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু গরিব গৃহস্থ যাহারা, তাহারা কোথায় দাঁড়ায়? তাহাদের মুখপানে কে তাকায? সেই দিন দেখিয়াছিলাম, একজন কৌপীনধারী সন্ন্যাসী কেবল তাহাদের মঙ্গলচিন্তায় নিরন্তর ভাবিতেছেন। সেই দিন একটু বুঝিতে চেষ্টা করিযাছিলাম, স্বামীজি আমাদের কে।

হিতবাদীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, একদিন তিনি দুইটি বন্ধু সমভিব্যাহারে স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের একজন পঞ্জাবদেশবাসী পরিচয়ে জানিয়া স্বামীজি তাঁহার সহিত ঐ প্রদেশের বিশেষ অভাব এবং তদ্দূর করিবার উপায়, বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা ও সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি নানা কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত রহিলেন। ক্রমে বাটী ফিরিবার সময় উপস্থিত দেখিযা সখারাম বাবুর অন্য বন্ধুটি বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করিযা বলিলেন মহাশয়, কত আশা করিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ

করিতে আসিয়াছিলাম, কত ধর্ম্মতত্ত্ব শুনিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল, তা না হইয়া কেবল বাজে কথাবার্ত্তাই হইল। দিন বৃথায় কাটিল। তদুত্তরে স্বামীজি গম্ভীরভাবে বলেন, "আমার দেশে যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটা কুকুর অভুক্ত থাকিবে, তাহার খবর লওয়া আমার ধর্ম্ম, এ ছাড়া অন্য কিছু অধর্ম্ম বা বিধর্ম্ম।" তিনজনেই স্বামীজির কথা শুনিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। এইরূপে, স্বামীজির দেশের প্রতি ভালবাসা, স্বদেশী লোকের প্রতি সহানুভূতি যাহা দেখা ও শুনা গিয়াছে, সে সকল কথা বলিতে গেলে প্রকাণ্ড পুঁথি হইয়া যায়। দুর্ভিক্ষপীড়িতের ভীষণ আর্ত্তনাদের কথা যখন তাঁহার কর্ণে পৌঁছিত, তখন মনে হইত, যেন লক্ষ লক্ষ অন্নহীনের দারুণ যন্ত্রণা তাঁহার হৃদয়কে এককালে বিদ্ধ করিতেছে। আমি ভাষায় অনভিজ্ঞ—এ অবস্থা বর্ণনা করিতে অক্ষম। কিন্তু যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি যে, কবি তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তিসহায়ে ঐরূপ স্বদেশানুরাগ বুঝাইতে অথবা চিত্রকর তাঁহার স্বর্ণতুলিকাবলম্বনে ঐ ছবি অঙ্কিত করিতে সহসা সাহসী হইবেন না। ইহাও নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে, ভারতের দুর্দ্দশায় ভারতের অন্নকষ্টে একজন সর্ব্বত্যাগী—সত্য সত্যই নীরবে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেন, আমাদের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া একজন সন্ন্যাসী বাস্তবিকই একদিনের জন্যেও স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন নাই। আর বুঝিয়াছি যে, যে মহাপুরুষ সমগ্র জগৎকে হিন্দুধর্ম্মের মহিমা বুঝাইয়া ধর্ম্মজগতে শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় মহাকার্য্যের সূচনা করিয়াছিলেন, যে মহাপুরুষের দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া শুধু ভারতের নহে, পৃথিবীর নানা সভ্য প্রদেশের অনেকে তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া তাঁহার কাছে শিক্ষার্থীর ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়াছিল, উন্নত জাপান ধর্ম্মবিষয়ে তাহার অভাবপূরণের জন্য যাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া ধর্ম্মমহাসভা (Parliament of Religions) বসাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, * ভারতবাসীর দুঃখ, ভারতবাসীর শোচনীয় অবস্থার নিদারুণ তীব্র ভাবনা সেই মহাপুরুষের দেহ বেশী দিন সহ্য করিতে পারিল না। আমাদের জন্যই তাঁহার দেহ ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু ক্ষতি হইল সমস্ত জগতের। এই বিষয় ভাবিলে স্বতঃই মনে হয়, যিনি সংসারের মায়া কাটাইয়াছেন, আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া নিত্যধনের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহার এ আবার কি প্রকার ব্যবহার? সংসার মায়াময় বুঝিয়াও মায়াত্যাগী সন্ন্যাসী মায়ার অন্তর্গত মানবের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া এত কাতর কেন? কে ইহার মীমাংসা করিয়া দিবে? কিন্তু ঐ প্রশ্নের মীমাংসা

* ঐ সময়েই স্বামীজির দেহত্যাগ হওয়াতে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

হউক বা নাই হউক, মনে হয়, স্বামীজি ভারতের জন্মজন্মান্তরের আপনার হইতেও আপনার লোক। মনে হয়, হায় হতভাগ্য, আমাদের জন্য তিনি দেহ পর্য্যন্ত পাত করিলেন!

স্বামীজির জীবনের আর একটি ঘটনা এইস্থানে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বিলাত হইতে ফিরিবার সময় জাহাজ যখন এডেনে লাগিল, তখন তিনি তাঁহার তিনটি ইংরাজ শিষ্যের সহিত এডেন সহর দেখিতে গেলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে দেখেন, একজন হিন্দুস্থানী পানওয়ালা তাহার দোকানে বসিয়া তামাক খাইতেছে। বহুকাল পরে ভারতবাসীর মুখ দেখিয়া তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সেই পানওয়ালার কাছে যাইয়া বসিলেন এবং তাহার নিকট হইতে কলিকা লইয়া তামাক খাইতে খাইতে হিন্দি ভাষায় তাহার সহিত কতই কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহার ইংরাজ শিষ্যেরা তাঁহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। না বুঝিবারই ত কথা—পাশ্চাত্য প্রদেশে যাঁহার বক্তৃতায় সহস্র সহস্র ব্যক্তি মুগ্ধ হইয়াছে, যাঁহার পাণ্ডিত্যশক্তির নিকট পাশ্চাত্য প্রদেশের মহা মহা পণ্ডিতকে মস্তক নত করিতে হইয়াছে, যাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, ঈশ্বরানুরাগ দেখিয়া বহু ইংরাজ তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, সেই সম্মানের অধীশ্বর স্বামীজি কি না একজন অসভ্য ছোটলোকের সহিত এত প্রীতির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। কাযেই তাহাদের নাসিকা কুঞ্চিত হওয়া স্বাভাবিক। স্বামীজি তাহাদের মুখভাব দেখিয়া বলিলেন, "আনন্দ করিয়া তোমরা আমার সহিত ভারতবর্ষে আসিতেছ—কিন্তু ওই যে লোকের সহিত আমি কথা কহিতেছিলাম, ও কে জান? একজন ভারতবাসী। ঐরূপ লোকের মধ্যে আমার বাস; উহাদের দ্বারা, উহাদেরই মধ্যে আমি প্রতিপালিত হইয়াছি। উহারাই আমার প্রতিবাসী, আত্মীয়, ভাই। উহাদের দেখিলে তোমরা যদি নাসিকা কুঞ্চিত কর, তবে আমার সহিত আসিয়া তোমাদের প্রয়োজন নাই। স্বামীজির এই ভর্ৎসনাবাক্যে গুরুভক্তিপরায়ণ সাহেব শিষ্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়া বলিল, "স্বামীজি, আমাদের মার্জ্জনা করুন। আপনার দেশের লোকের সহিত কিরূপ করিয়া ব্যবহার করিব, তাহা আমাদের শিখাইয়া দিবেন—নচেৎ পদে পদে অপরাধ হইবার সম্ভাবনা।" তাঁহার সাহেব শিষ্যগণের সহিত যাঁহাদের আলাপ হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই তাঁহাদিগকে কত আপনার জন বলিয়া অনুভব করেন। মহামায়ার কৃপায় স্বামীজির শক্তিতে এই অঘটন সংঘটন সকলে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

স্বামীজির ঐরূপ অদ্ভুত শক্তি ও কার্য্যকলাপ দেখিয়া সকলেই তখন মনে করিয়াছিলাম, সুদিন আসিতেছে। সে তেজঃপুঞ্জ মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া, সে প্রাণস্পর্শী বাক্য শুনিয়া কাহার মনে না হইবে যে, সহস্র বৎসরের ঘন অন্ধকার কাটিয়া এইবার বুঝি ভারত-অঙ্ক উজ্জ্বল করিতে দিনমণি প্রকাশ হইবেন? সকলেরই মনে আশা, ভরসা ও আনন্দের উদয় হইয়াছিল। কিরূপ কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করিলে আমরা সর্ব্ববিষয়ে উন্নত হইতে পারিব, তদ্বিষয়ে তাঁহার মতামত জানিবার জন্য তখন সকলেই উদ্‌গ্রীব।

স্বামীজির জীবনে দেশহিতৈষণা দৈনন্দিন ঘটনাবলির ভিতর দিয়া কিরূপ অদৃষ্টপূর্ব্বভাবে প্রকাশ পাইত, অদ্য আমরা তাহারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত লইয়া প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। এখন পুস্তকাদিতে প্রকাশিত তাঁহার গভীর গবেষণা, অপূর্ব্ব ভূয়োদর্শন এবং অদ্ভুত সূক্ষ্মদৃষ্টিপ্রসূত উক্তবিষয়ক মতামত-কেই অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্যের অনুসরণ করিব। পাশ্চাত্য প্রদেশে অবস্থানকালীন তিনি তাঁহার কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন—

"তোমরা কি বলিতে চাও, আমি জাতিগত বিদ্বেষবুদ্ধিবিশিষ্ট কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নিষ্ঠুর, কপট, নাস্তিক, কাপুরুষ হইয়া আজীবন কাটাইবার জন্য জন্মিয়াছি—শিক্ষিত হিন্দুদিগের ভিতর তোমরা যেমন দেখিতে পাও! আমি কাপুরুষতাকে ঘৃণা করি। কাপুরুষদের সঙ্গে অথবা ভুয়া রাজনীতির সঙ্গে আমি কোন সংস্রব রাখিতে চাহি না। আমি রাজনীতিতে বিশ্বাসী নহি। ঈশ্বর ও সত্যই জগতে একমাত্র পলিটিক্‌স (নীতি) আর সবই ভুয়া।"

এই পত্রে স্বামীজি যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা ইহাই বুঝি যে, কেবলমাত্র ইংরাজী অনুকরণে রাজনীতি আন্দোলন করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিবার চেষ্টা করা বৃথা। সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে দৃষ্টি-পাত না করিয়া কেবল রাজনীতি আন্দোলন করাই যথেষ্ট, এই মতের যাঁহারা পোষকতা করেন, তাঁহাদের প্রতি তিনি এই পত্রে একটু বিশেষ কটাক্ষপাত করিয়াছেন। বিশেষতঃ অন্যান্য জাতির সহিত ভারতবাসীর সকল বিষয়েই বিশেষ পার্থক্য। আমরা ধর্ম্মপ্রাণ জাতি, ধর্ম্মই আমাদের ইহকাল পরকালের একমাত্র অবলম্বন। এই অবলম্বন ত্যাগ করিলে দুর্গতির সীমা থাকিবে না।

তাই পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিতে তিনি আমাদের বার বার নিষেধ করিয়া-ছেন। শুধু নিষেধ করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, চিরকাল যত্নে পোষিত ধর্ম্ম উদ্দেশ্য

* প্রবুদ্ধভারত পত্রে প্রকাশিত স্বামীজির এক পত্রের অনুবাদ।

ছাড়িয়া যদি এখন আমরা অন্য কোন উদ্দেশ্যে আমাদের জীবন উৎসর্গ করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে তাহার ভীষণ পরিণামও তিনি জলন্ত ভাষায় ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন—

"আমাদের জাতির মর্ম্মস্থানে ঘা না লাগিলে তাহার বিনাশের কোন আশঙ্কা নাই। কিন্তু এইটী বেশ স্মরণ রাখিবে, তোমরা যদি ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্যজাতির জড়বাদসর্ব্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। ধর্ম্ম ছাড়িলে হিন্দুর জাতীয় মেরুদণ্ডই ভগ্ন হইযা গেল—যে ভিত্তির উপর জাতীয় সুবিশাল সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাই ভাঙ্গিয়া গেল—সুতরাং ফল দাঁড়াইল—সম্পূর্ণ ধ্বংস।"

—ভারতে বিবেকানন্দ, ৫৮পৃঃ।

বড়ই কঠিন কথা—এ বিপদে আমরা করিব কি? একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার সহাযে শিক্ষিত সম্প্রদায় বলিতেছেন, রাজনৈতিক আন্দোলনেই আমাদের সকল বিষয়ে উন্নতি—রাজনীতির চর্চ্চা না করিয়াই আমাদের এই অধঃপতিত অবস্থা, সেই জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে রাজনীতি চর্চ্চাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য, উহাতে কৃতকার্য্য হইলেই আমাদের সকল প্রকার কল্যাণ সাধিত হইবে। অপরদিকে স্বামীজির আদেশ—আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য ছাড়িয়া যদি বিজাতীয়ের উদ্দেশ্য অবলম্বন করিতে যাই, কৃতকার্য্য কখন হইব না, কেবল অনুকরণ করাই সার হইবে এবং তাহার ফলে আমাদের জাতির ভীষণ অবনতি, এমন কি, আমূল ধ্বংস পর্য্যন্ত হইযা যাইবে। পূর্ব্বপুরুষানুগত ভাবপরম্পরা ছাড়িয়া কেবলমাত্র পাশ্চাত্যের অনুকরণকারীর অবস্থা তিনি আরও পরিষ্কার করিয়া অন্যত্র প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, উহা উন্নতির লক্ষণ নহে—

"সাহেবীভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদণ্ডহীন—সে চারিদিক্ হইতে কতকগুলি এলোমেলো ভাব লইযাছে—সেগুলিকে সে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই—কতকগুলি ভাবের বদহজম হইয়া খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছে। সে নিজের পাযের উপর দাঁড়াইতে পারে না—তাহার মাথা দিনরাত বোঁ বোঁ করিয়া এদিক্ ওদিক্ ঘুরিতেছে। সে যে সকল কার্য্য করে, তাহার গূঢ় কারণ কি শুনিবে?—আমাদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ইংরাজ লোকে কিসে তাহার পিট চাপড়াইয়া দুটা বাহবা দিবে, ইহাই তাহার সকল কার্য্যের অভিসন্ধির মূল। সে যে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হয়, সে যে আমাদের কতকগুলি সামাজিক প্রথার

বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে, তাহার কারণ—ঐ সকল আচার সাহেবদের মত-বিরুদ্ধ।"

—ভারতে বিবেকানন্দ, ৫৫পৃঃ।

এই ত উভয় পক্ষের মতামত। কিন্তু আমরা সমস্যায় পতিত। আমরা কোন্ পথে যাই? আমরা এখন কি করি? কাহার কথায় আমরা জীবন গঠন করিতে প্রয়াস পাইব? যে রাজনৈতিক আদর্শ অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্য জাতিসমূহ আজ সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া বসিয়াছে, যদবলম্বনে তাহাদের প্রবল প্রতাপ পৃথিবীকে আজ কম্পমান করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহাদের অঙ্গুলিহেলনে অন্যান্য জাতিসমূহ ত্রস্ত হইয়া তাহাদের আদেশ মানিতে অধুনা সর্ব্বদা প্রস্তুত—সেই প্রবল শক্তিশালী জাতিসমূহের আদর্শ আমরা কেননা অবলম্বন করিব, ইহা স্বতঃই সকলের মনে উদয় হয়। আবার মনে হয়, যাহা আপাতরম্য তাহা সকলেই চায়, পরিণাম কজন দেখে? সে দূরদর্শিতা কোথায় যাহা ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ করিতে পারে? কয়েক শতাব্দীপরে রাজনৈতিক আদর্শে চালিত পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিণাম কি হইবে, কে বলিতে পারে?—পাশ্চাত্যের আপাতঃ চমকপ্রদ রাজনৈতিক কার্য্যপ্রণালীর আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতার কথা কেহ কি অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছেন? কৈ, কাহার কাছে ত আমরা ঐ বিষয় কিছু শুনি নাই। পার্লিয়ামেণ্ট, ভোট, ব্যালটের মহিমাই ত আমরা শুনিয়া আসিতেছি। পাশ্চাত্য উদার, তদাদর্শের অপার মহিমা এবং উহাই আমাদের একান্ত অবলম্বনীয়, ইহাই ত অদ্যাবধি বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মোট উপদেশ। স্বামীজিই কেবল নূতন চক্ষে পাশ্চাত্যভূমি দর্শন করিয়াছিলেন; সেই মহাযোগীর উজ্জ্বল নয়নের সমক্ষে পাশ্চাত্য স্বীয় দুর্ব্বলতা অভাব ও অপূর্ণতা, অভেদ্য আবরণে আবৃত রাখিতে পারে নাই। সেই ভারতীয় তপস্বীর গভীর দূরদর্শিতা রাষ্ট্রনীতি-সহায় পাশ্চাত্য জগতের উন্নতি ও উদারভাব তলপর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া সকল রহস্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছে। সন্দেহ-সম্পর্করহিত তেজোময়ী ভাষায় আমাদের সাবধান করিয়া ইউরোপের বর্ত্তমান রাজনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে তিনি কি বলিয়াছেন, দেখা যাউক—

"আমরা ভারতে যে সকল রাজনৈতিক অধিকারলাভের চেষ্টা করিতেছি, সে সকল ইউরোপে যুগ যুগ ধরিয়া রহিয়াছে—শতশত শতাব্দী ধরিয়া ঐগুলি পরীক্ষিত হইতেছে আর সেগুলি যে সামাজিক প্রয়োজন পরিপূরণে অসমর্থ, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইউরোপের রাজনৈতিক শাসন সংশ্লিষ্ট সর্ব্বপ্রকার প্রণালী এক

এক করিয়া অনুপযোগী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে আর এক্ষণে ইউরোপ অশান্তি-সাগরে ভাসিতেছে। কি করিবে, কোথায় যাইবে, বুঝিতে পারিতেছে না। ঐশ্বর্য্যসম্পদের অত্যাচার অসহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের সব ধন, সব ক্ষমতা—অল্পসংখ্যক কয়েকজন ব্যক্তির হস্তে। তাহারা নিজেরা কোন কার্য্য করে না। কিন্তু তাহারা লক্ষ লক্ষ নরনারী দ্বারা কায করাইয়া লইবার ক্ষমতা রাখে। এই ক্ষমতাবলে তাহারা সমগ্র জগৎ রক্তে প্লাবিত করিতে পারে। ধর্ম্ম ও আর আর যাহা কিছু সবই তাহাদের পদতলে। তাহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা শাসনকর্ত্তা হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগৎ মুষ্টিমেয় 'শাইলকে'র শাসনে পরিচালিত হইতেছে। তোমরা যে প্রণালীবদ্ধ শাসন, স্বাধীনতা, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা প্রভৃতির কথা শুন, সেগুলি বাজে কথা মাত্র। পাশ্চাত্য দেশ সকল 'শাইলক'গণের অত্যাচারে জর্জ্জরীভূত।"

—ভারতে বিবেকানন্দ, ৬৩,৬৪পৃঃ।

রাষ্ট্রনীতিসহায় বর্ত্তমান ইউরোপের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি আবার অন্যত্র বলিতেছেন—

"জড়শক্তির লীলাক্ষেত্র ইউরোপ যদি নিজের ভিত্তি সরাইয়া আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে তাহার সমাজ প্রতিষ্ঠা না করে, তবে ৫০ বৎসরের মধ্যেই ইউরোপীয় সমাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। উপনিষদের ধর্ম্মই ইউরোপকে রক্ষা করিবে।"

— ভারতে বিবেকানন্দ, ৬৪পৃঃ।

এই ত স্বামীজির কথা। পাশ্চাত্যের ঐ আদর্শ অনুকরণে যে আমাদের সর্ব্বনাশ, ইহা তিনি অসঙ্কুচিতভাবে বলিয়াছেন এবং ঐ আদর্শও যে উচ্চ আদর্শ নহে, তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। এখন আমরা করি কি? আমরা যে ভীষণ পীড়াগ্রস্ত এ বিষয়ে সন্দেহ নাই—কিন্তু রোগমুক্ত হইবার উপায় কি? এবং কোনটাই বা প্রধান রোগ, তাহার নির্ণয় বা কে করে? যেমন কোন ব্যক্তির যকৃতের কার্য্যকারিতা-শক্তি মন্দ হওয়ায় রক্ত দূষিত হইয়াছে ও তাহার ফলে নানা উপসর্গ আসিয়া যন্ত্রণা দিতেছে। কখন মাথা ধরা, কখন পা কন্‌কন্ করা প্রভৃতি নানা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। অদূর-দর্শী চিকিৎসক মাথাধরার ঔষধ দিল এবং সেই উপসর্গ কিছু পরেই প্রশমিত হইল—রোগীর আনন্দের সীমা নাই। কোন চিকিৎসকের মালিসের দ্বারা পায়ের যন্ত্রণা কমিল—রোগী মনে করিল, যন্ত্রণার হাত এড়াইলাম। কিন্তু ইহা ভাবিল না যে, যে কারণে ঐ সকল উপসর্গ হইয়াছিল, সেই কারণ

তখনও যোল আনা বর্ত্তমান, রক্ত দূষিত পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে; যদিও উপসর্গের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া উপস্থিত শান্তি বোধ হইতেছে। কিছুকাল পরে ঐ দূষিত রক্ত যে অন্য একটি ভীষণ উপসর্গের সৃষ্টি করিয়া পরিশেষে তাহাকে চিকিৎসার অতীত অবস্থায় ফেলিবে, অজ্ঞান রোগীর মনে ইহা কখন উদয় হয় না। ভাগ্যগুণে যদি বহুদর্শী চিকিৎসকের হস্তে চিকিৎসার ভার পড়ে, তিনি তখনই বলেন, দুই একটা উপসর্গ কমিয়াছে বলিয়া আনন্দ করিও না। দূষিত রক্ত পরিষ্কার না হইলে পরিত্রাণের উপায় নাই। যেমন যকৃতের অবস্থা ভাল হইলে পুনরায় উক্ত রোগীর রক্ত পরিষ্কার হয় এবং তাহারই ফলে যে সুস্থতা আসে তাহাই স্থায়ী হয় এবং ঐরূপে রোগের কারণ পর্য্যন্ত দূর করিতে কিছু সময় লাগে—আমাদের রোগেরও ঠিক ঐরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে; উৎকণ্ঠিত হইলে চলিবে না।

এক্ষণে দেখা যাক, আমরা যে অবস্থায় পড়িয়াছি, তাহাতে আমাদের কার্য্য-প্রণালী ঠিক হইতেছে কি না। স্বামীজির ন্যায় বহুদর্শী প্রতিভাশালী মহা-পুরুষের এবং পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তির বাদানুবাদ তো শুনিলাম। এক্ষণে নিজ নিজ বুদ্ধি সহায়ে কারণ অনুসন্ধান করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হওয়া যাউক। সকলেই বুঝিয়াছেন যে, আমাদের অবস্থা শোচনীয়, এবং এ অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে আমাদের কল্যাণ নাই। দিন দিন হীন হইতে হীনতর অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি। পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তি এই দুরবস্থা অপনোদন করিবার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত—কতক-গুলি রাষ্ট্রীয় শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইলেই কিম্বা আমরা যদি রাজ্যশাসন-যন্ত্র পরিচালনের ভার প্রাপ্ত হই, তাহা হইলেই দেশে যে অভাবসমূহ উপস্থিত দেখিতেছি, তাহা দূর করিতে সমর্থ হইব। সেই জন্য তিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া রাজনীতিচর্চ্চায় আমাদিগকে মনোযোগ দিতে বলিতেছেন। কিন্তু ঐরূপ সিদ্ধান্তে একটি বিশেষ দোষ দেখা যাইতেছে—সমস্ত দোষ পরের ঘাড়ে চাপান। দেশে যত কিছু দোষ, অভাব, অপূর্ণতা রহিয়াছে, তাহা রাজ-কৃত—রাজাই ঐ সকলের জন্য দায়ী, আমরা বিন্দুমাত্র নহি। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তবাদীরা সেজন্য ক্রমাগত বলিতেছেন—রাজা কেন ইহা না করেন, রাজা ইহা না করিলে দেশের কত ভাল হইত, রাজার এইরূপে চলা কর্ত্তব্য ইত্যাদি। সকল দোষ রাজার ঘাড়ে চাপাইয়া তাঁহারা বেশ নিশ্চিন্ত থাকেন। আমাদের কোন দোষ নাই, কেননা রাজকার্য্যে আমাদের হাত নাই। আমাদের কোন

কার্য্য নাই, কেননা রাষ্ট্র পরিচালনার ভার আমাদের উপর থাকিলে তবে ত দেশের মঙ্গল করিতাম। কাযেই যতদিন না রাজকার্য্যে আমাদের ঐ অধিকার হয়, ততদিন তদধিকার লাভের জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর। এইরূপ যুক্তিতে বেশ প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের বা আমাদের দেশের লোকের কোন অপরাধ নাই, আমরা কোন দোষে দোষী নহি। আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার জন্য আমরা দায়ী নহি—দায়ী রাজা। ইহাই অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষিতের মত।

স্বামীজি কিন্তু ইহার ঠিক বিপরীত বলিতেছেন। তিনি বলেন, আমাদের কর্ম্মের জন্য আমরাই দায়ী, অপর কেহ নহে। আমার কর্ম্মের ফল আমি ভোগ করিতেছি—

"আমরা যাহা কিছু ভোগ করি, তাহার জন্য আমরাই দায়ী, অপর কেহ নহে। আমরাই কার্য্য ও আমরাই কারণ স্বরূপ। সুতরাং আমরা স্বাধীন। যদি আমি অসুখী হই, তবে বুঝিতে হইবে, আমিই আমাকে অসুখী করিয়াছি। ইহা হইতে ইহাও প্রতীয়মান হইবে যে, আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে সুখীও হইতে পারি। যদি আমি অপবিত্র হই, তবে তাহাও আমার নিজকৃত। তাহা হইলে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, আমি ইচ্ছা করিলে আবার পবিত্র হইতে পারি। এইরূপ সমুদয় বিষয়েই বুঝিতে হইবে। মানবের ইচ্ছা কোন ঘটনাধীন নহে।"

—ভারতে বিবেকানন্দ, ২৯ পৃঃ।

পাশ্চাত্য রাজনীতিবিশারদ ব্যক্তিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, যদি কোন কালে আমাদের কোনও দোষ ছিল না, তবে আমরা এরূপ কুরাষ্ট্রতন্ত্রের অধীনে কেন পতিত হইলাম, এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবার কারণ কি? কারণ না জানিয়া শুধু পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া কার্য্য করিয়া গেলে তো কোন ফললাভ হইবে না। এবং যদ্যপি কারণ বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলে কার্য্যপ্রণালীও স্থির করা কষ্টসাধ্য হইবে না। কিন্তু ঐ প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর আজ বিংশতিবর্ষব্যাপী রাজনীতি চর্চ্চাতেও আমরা বুঝিতে পারি নাই। রাজা আমাদের মনোমত নিয়ম করিতেছেন না, ইহাই যত অনিষ্টের মূল, এইটুকু মাত্র জানিয়া আসিতেছি। স্বামীজি কিন্তু এই স্থলে নিরুত্তর নহেন, আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত দিয়া বলিতেছেন—

"আমরা যখন বৈদান্তিক, তখন আমাদিগকে সর্ব্বদাই সব বিষয় ভিতরের দিক্ হইতে, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা যখন বৈদান্তিক, তখন নিশ্চয় করিয়া জানি, যদি আমরা নিজেদের অনিষ্ট নিজেরা না করি, তবে জগতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে। ভারতের এক-পঞ্চমাংশ অধিবাসী মুসলমান হইয়াছে। * * * এখন খ্রীষ্টিয়ান প্রায় দশ লক্ষের অধিক হইয়া গিয়াছে। ইহা কাহার দোষ? আমাদের একজন ঐতিহাসিক চিরস্মরণীয় ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন, 'যখন অনন্ত জীবননির্ঝরিণী নিকটেই বহিয়া যাইতেছে, তখন এই দরিদ্র হতভাগ্যগণ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরিবে কেন?' প্রশ্ন এই, ইহাদের জন্য আমরা কি করিয়াছি? কেন তাহারা মুসলমান হইবে? * * * আমরা এখন তাহাদের জন্য কাঁদিতেছি, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে তাহাদের জন্য কি করিয়াছি? আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আপন আপন হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, আমরা নিজেরা কি শিখিয়াছি আর নিজেদের হাতে জ্ঞানের মশাল লইয়া কতদূর উহার আলোক বিস্তারে সহায়তা করিয়াছি? আমরা যে উহা করি নাই, তাহা আমাদেরই দোষ, আমাদেরই কর্ম্ম। কাহারও দোষ দিও না। দোষ দাও আমাদের নিজেদের কর্ম্মকে। যদি তোমরা উহা আসিতে না দিতে, তবে কি জড়বাদ, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম অথবা জগতের কোন বাদই এখানে স্বীয় প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হইত না। যদি কেহ পাপ, কুৎসিৎ খাদ্য ও নানাবিধ অনিয়মের দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই হীনবীর্য্য না হইয়া থাকে, তবে কোন প্রকার জীবাণু নরদেহ আক্রমণ করিতে পারে না, সুস্থ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার বিষাক্ত জীবাণুর মধ্যে বাস করিয়াও নিরাপদ থাকিবে।"

—ভারতে বিবেকানন্দ, ৭০, ৭১ পৃঃ।

অতি যুক্তিপূর্ণ কথা—ইহাতে কে সংশয় করিবে? রোগের কীটাণু সেই দেহেই প্রবিষ্ট হইতে পারে, যাহা পূর্ব্ব হইতে অবসন্ন হইয়া সেই কীটাণুর উপযুক্ত বাসস্থলরূপে পরিণত হইয়াছে। এইস্থলে নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে, আমি যে রোগযন্ত্রণায় ভুগিতেছি, তাহার কারণ আমি। আমিই আমার শরীরে অসুস্থতা আনয়নের কার্য্য করিয়াছি। ইহা যদি আমাদের বিশ্বাস হয় যে, আমরাই আমাদের কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি, আমরাই মনুষ্যোচিত কার্য্যে বিমুখ ছিলাম, তাই আমাদের দেশব্যাপী দুর্দ্দশা, তবেই আমাদের সংশোধিত হইবার

ইচ্ছা প্রবল হইবে। আর পরের উপর দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না। বাস্তবিক আমরা এতদিন কি করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম? কেন আমরা আমাদের দুঃখের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই নাই? ইহার জন্য দায়ী কে?

এক্ষণে দেখা যাউক, আমাদের অবনতির কারণ স্বামীজি কি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে হিন্দুজাতি একদিন ত্যাগে, জ্ঞানে, পাণ্ডিত্যে, শৌর্য্যে বীর্য্যে মনুষ্য-জাতির আদর্শ স্থল ছিল, কি মতিভ্রমে তাহার আজ এই অবস্থা? এত বড় জাতির এরূপ সর্ব্বনাশ কিরূপে সম্ভবপর হইল? কারণ বুঝিতে পারিলে প্রতি-কারের ব্যবস্থা হইতে পারে। অন্যান্য অবান্তর কারণ থাকিলেও ঐরূপ দুরবস্থার প্রধান কারণ স্বামীজি এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"শক্তিসঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকীরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। হৃৎপিণ্ডে রুধিরসঞ্চয় অত্যাবশ্যক, কিন্তু তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এককালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্ব্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীকৃত। যদি তাহা না হইতে পারে, সে সমাজ-শরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"

—বর্ত্তমান-ভারত, ২৭পৃঃ।

পূর্ব্বকালে বিদ্যা ধর্ম্ম প্রভৃতি কেন্দ্রীভূত শক্তিসমূহের সমাজের সর্ব্বতঃ সঞ্চারের পথ আমরা খুলিয়া না দেওয়াতেই ত্যাগের আদর্শ স্থল স্বার্থপরতার ক্রীড়াস্থল হইল। যে ধর্ম্ম "উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে," আমরা সেই ধর্ম্মকে আমাদের স্বার্থসিদ্ধির উপায় করিয়া লইলাম। যে দেশ রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতি অবতারগণের লীলাস্থল, আমরা কি সেই দেশের লোক? আমরা মুখে বলি দেবতা, ও পূজার আড়ম্বর করি, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের ভাব স্বতন্ত্র; নিজেদের প্রতিষ্ঠা, মান, এই সমস্ত সামলাইবার জন্য ব্যস্ত। স্বার্থপরতা-সাহায্যে ব্রাহ্মণত্ব রাখিতে যত্নবান্—দাসত্ব ভিন্ন ইহার আর কি ফল হইতে পারে? যাহারা আপনার দেশের মানুষকে পশু অপেক্ষা অধম বলিয়া গণ্য করে, তাহারা কেমন করিয়া অপর জাতির নিকট মনুষ্যোচিত সম্মান লাভে অগ্রসর হয়? এখনও কি আমাদের চৈতন্য হইবার সময় আসে নাই? ভারতের কোটি কোটি লোককে অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখিয়া এতদিন নির্ব্বিঘ্নে তাহাদের পূজা খাইয়া আসিতেছিলাম; যে রাস্তায় ব্রাহ্মণ চলিবে, শূদ্রের সে রাস্তা মাড়াইবার

ক্ষমতা নাই, শূদ্রজাতি মানুষ নহে, জন্তু নহে, মনুষ্যদেহে অতি অস্পৃশ্য বস্তু—এই নিষ্ঠুরতার শাস্তি কি আমাদের যথেষ্ট হইয়াছে? শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়া, আমরা নিম্নজাতির উপর এতদিন যে অবাধে অত্যাচার করিয়া আসিয়াছি, তাহার ফল ভোগ করিতে আজ কেনই বা আমাদের আতঙ্ক? স্বামীজি বলিয়াছেন—

"হিন্দু ধর্ম্ম ত শিখাইতেছেন, জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মারই বহুরূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ, কেবল এই তত্ত্বকে কার্য্যে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব। প্রভু তোমাদের নিকট বুদ্ধরূপে আসিয়া শিখাইলেন—তোমাদিগকে গরিবের জন্য পাপীর জন্য প্রাণ কাঁদাইতে, তাহাদের সহিত সহানুভূতি করিতে। কিন্তু তোমাদের পুরোহিতগণ, ভগবান্ ভ্রান্তমত প্রচার দ্বারা অসুরদিগকে মোহিত করিতে আসিয়াছিলেন, এই ভয়ানক গল্প বানাইলেন। সত্য বটে, কিন্তু অসুর আমরা; যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা নহে। অত্যাচারিগণ, তোমরা কি জান না, অত্যাচার ও দাসত্ব এক জিনিষেরই এপিট ওপিট?"

—পত্রাবলি, ১৯ পৃঃ।

এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি, আমাদের অবস্থা কি। যে দিন হইতে নিম্ন জাতিকে আমরা মনুষ্যত্বলাভে বঞ্চিত করিয়াছি, সেই দিন হইতে আমরাও মনুষ্যত্ব হারাইয়াছি, যেদিন হইতে আপামরকে বিদ্যাদানে বিমুখ হইয়াছি, সেই দিন হইতে আমরাও অবিদ্যার হস্তে পড়িয়াছি; যে দিন হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব জনসাধারণে বিলাইতে কুণ্ঠিত হইয়াছি, সেই দিন হইতে আমাদেরও ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হইয়াছেন। রাজকীয় শাসনে ও সামাজিক বিধানের দ্বারা যে সময় হইতে নিম্নজাতিকে নাগপাশে বন্ধন করিয়া সকল প্রকার উচ্চগতি লাভের উপায় বন্ধ করিয়া দিয়াছি, সেইদিন হইতে আমরাও উচ্চস্থানভ্রষ্ট হইয়া জড়পিণ্ডবৎ হইয়া পড়িতেছি। ফলে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। ভোগ যথেষ্ট হইতেছে। কিন্তু কৈ, আমাদের চৈতন্যোদয় হইতেছে কৈ? এখনও ত আমরা নিম্নশ্রেণীদের প্রতি চাহিয়া দেখিতেছি না! তাহাদের কল্যাণের জন্য আমরা কে চিন্তিত? দেশ দেশ বলিয়া আমরা যে আন্দোলন করিয়া থাকি, তাহা কাহাদের জন্য? ঐ যে অজ্ঞ, মূর্খ, অত্যাচারপীড়িত, কটিতটমাত্র-আচ্ছাদিত, অনাহারক্লিষ্ট কোটি কোটি জীব, তাহাদের জন্য কে চিন্তিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে

দণ্ডায়মান ? তাহাদিগকে মানুষ করিবার জন্য আমরা কি কোন উপায় অবলম্বন করিয়াছি ? এই যে বিংশতিবর্ষব্যাপী রাজনীতি আন্দোলনের তুমুল ঝড় আমাদের দেশে বহিতেছে, এ আন্দোলন কাহার কল্যাণ কামনায় ? আমরা (শিক্ষিতেরা) কেন উচ্চপদে অভিষিক্ত না হই, এই না দুঃখ! আমরা কেননা ইংরাজের ন্যায় সমান চালে চলিব, এই না আপসোস! আমাদের কেন ইংরাজ ছোট বলিয়া তাচ্ছিল্য করে, এই না অভিমান! আমাদের কথায় ইংরাজ কেন কর্ণপাত না করে, এই না আক্ষেপ! তাই না আমাদের আন্দোলন! যাহাতে যথার্থ দেশের কল্যাণ, তাহা আমরা করিতেছি কৈ ? স্বামীজি বলিতেছেন—

"প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটি, দেশীয় সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে, রাজশাসনও দম্ভবলে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া। আজ অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া সমাজসংস্কারের ধুম উঠিয়াছে, ১০ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা স্থল বিচরণ করিয়া দেখিলাম, সমাজসংস্কারক সভায় দেশ পূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধিরশোষণের দ্বারা 'ভদ্রলোক' নামে প্রথিত ব্যক্তিরা 'ভদ্রলোক' হইয়াছেন এবং রহিতেছেন, তাহাদের জন্য একটীও সভা দেখিলাম না।"

—পত্রাবলি ৭৭, ৭৮ পৃঃ।

কোথায় সহানুভূতি ? গরীবের জন্য আমাদের প্রাণ কাঁদিয়াছে কৈ ? একমাত্র স্বামীজিকে দেখিয়াছিলাম, যিনি এই দুঃখভার মস্তকে লইয়া উন্মাদের ন্যায় বেড়াইয়াছিলেন, জনসাধারণের কিসে উন্নতি হয়, এই ভাবনায় অস্থির হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় ও পত্রাদিতে কেবল এই কথাই বার বার বলিয়াছেন। ভাগ্যবান্ যাঁহারা তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন, তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন, কাহাদের জন্য তাঁহার হৃদয় কাতর ছিল। বক্তৃতাদি দিবার অনুরোধ করিলে বিরক্ত হইতেন; বলিতেন, ঢের বক্তৃতা হইয়াছে, একটু কায কর, কিছু কর, যতটুকু সামর্থ্য ততটুকু কার্য্য করিয়া ধন্য হও। কিন্তু তাঁহার কার্য্য' অর্থে আমরা যাহা বুঝি, তাহা নহে—তাঁহার

কার্য্য—মূর্খকে বিদ্যাদান, অন্নহীনকে অন্নদান, পাপীকে আশ্রয় দান, অন্ধকে স্বর্গীয় আলোক প্রদান। কিন্তু কে স্বামীজির কথা শুনিবে? ভারতবাসীর দুঃখ কে বুঝিয়াছে? স্বামীজিকে পাগল বলিয়া উপহাস করিতেও আমরা কুণ্ঠিত হই নাই। বাস্তবিক তিনি পাগল বৈ আর কি? যে পরের জন্য ভাবে, সেই ত পাগল। যে আপনার গণ্ডা যোল আনা বোঝে, সেই তো বুদ্ধিমান্! যে আপনার স্বার্থে জলাঞ্জলি দেয়, সেই ত পাগল!

স্বামীজি বলিয়াছেন,—

"দেশের জনসাধারণের দুর্দ্দশা প্রতীকারের জন্য আমার ঘাড়ে যেন একটা ভূত চাপিয়াছিল। আমি অনেক বর্ষ ধরিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরিয়াছি, কিন্তু কার্য্য করিবার কোন সুযোগ পাই নাই, সেই জন্যই আমি আমেরিকায় গিয়াছিলাম। তখন তোমাদের মধ্যে যাহারা আমাকে জানিতে, তাহারা অবশ্য একথা জান। ধর্ম্মমহাসভা-ফভা হল না হল, কে তা নিয়ে মাথা ঘামায়? এখানে আমার নিজের রক্তমাংস স্বরূপ জনসাধারণ দিন দিন ডুবিতেছে—তাহাদের খবর নেয় কে?"

—ভারতে বিবেকানন্দ, ১৭৭ পৃঃ।

এই উন্মাদ স্বামীজিকে এখনও কি আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি? তিনি আমাদের কি করিতে বলিয়াছেন, তাহা আলোচনার জন্য এখনই বা আমরা কতটুকু সময় অতিবাহিত করিতে প্রস্তুত আছি? স্বামীজি ভারতের শিক্ষিত বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে এই কার্য্যে উদাসীন দেখিয়া যুবকগণের উপরই সমস্ত কার্য্যের আশা রাখিতেন। আমেরিকায় অবস্থান কালে তিনি মান্দ্রাজের যুবকগণকে অগ্নিময় অক্ষরে হৃদয়ের ব্যথা জানাইয়াছিলেন—

"আমি এই দেশে অনাহারে বা শীতে মরিতে পারি, কিন্তু হে মান্দ্রাজ-বাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরীব অজ্ঞ অত্যাচারপীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা, দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও, এই মুহূর্ত্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও এবং তাঁহার নিকট একমহাবলি প্রদান কর, বলি—জীবনবলি

—তাহাদের জন্য, যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীনদরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য। তোমাদের সারা জীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রতগ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।

—পত্রাবলি, ২৩ পৃঃ।

এই কার্য্য এক্ষণে আমাদের সম্মুখে—স্বামীজি বড় ব্যথায় বলিয়াছেন—"ভারতের দীনহীনের জন্য সহানুভূতি দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি।" হায়, এ দায় কে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত? আমাদের হৃদয় সেভাবে গঠিত কই, যাহাতে এই দায় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে? তাই স্বামীজির মর্ম্মবেদনা কথার কথা হইয়া রহিল, আমরা কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম না। কিন্তু এই ভাবেই কি জীবন কাটিবে? যে পাপে কলঙ্কিত হইয়া এই ঘৃণিত বদন জগতে দেখাইতে আমরা আজ লজ্জাবোধ করিতেছি, যে জন্য অন্যান্য সভ্যজাতির উপহাস আজ আমাদের হাড়ে হাড়ে লাগিতেছে, সেই পাপ অপনোদন করিবার জন্য আমরা কি প্রাণপণে অগ্রসর হইব না? যদি এখনও আমাদের মতি না ফেরে, যদি এখনও আমাদের হৃদয়ের বিকাশ না হয়, যদি এখনও পূজ্যপাদ সন্ন্যাসী আচার্য্যের বাক্য অবহেলা করিয়া চলিয়া যাই, পরিণাম ভীষণ হইতে ভীষণতর হইবে।

আর কেন? কতদিন বৃথা কার্য্যে সময় কাটিবে? ঈশ্বরেচ্ছায় সকলেরই মনে আজ সদ্বৃত্তি স্ফুরিত হইতেছে, হীনস্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া পরকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার তীব্র ইচ্ছা সর্ব্বত্রই নয়নগোচর হইতেছে। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় আবার বুঝি ভারত ব্যাপিয়া ত্যাগী, সাধু মহা মহা ঋষির অভ্যুদয় হইবে। আবার ভারত আপন মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া জগতের উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত হইবে। ভারত জগতের গুরু—এই মহাসত্য, আবার সকলে বুঝিবে। কে আমাদের হৃদয়ে বলিতেছে—সত্য। নতুবা ক্ষুদ্র বালকও আজ কেন বলে—আমি হিন্দু, আমা অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠ? সত্য সত্য। মহা বিশ্বাস আসিয়াছে—এ বিশ্বাসহারা আমরা যেন না হই। গভীর রজনী প্রভাতপ্রায়। তাই গৈরিকসমাবৃত স্বামীজি বালার্কের ন্যায় ভারত আকাশে উদয় হইয়া আশার আলোকে দিক্‌গুল আলোকিত করিয়াছেন। যতই দিন যাইতেছে, স্বামীজির কথা, স্বামীজির উপদেশ, স্বামীজির আশাবাণী যেন স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া আমাদের মনোমধ্যে উদয় হইতেছে।

যতই দিন যাইতেছে, আমরা স্বামীজির উপদেশানুযায়ী জীবন গঠনের জন্য ব্যাকুল হইতেছি। যতই দিন যাইতেছে, স্বামীজির আদেশ যেন ঝঙ্কার দিয়া হৃদয়তন্ত্রীতে বাজিতেছে—মনে হইতেছে, যেন তিনি বলিতেছেন—

"লক্ষ লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস-রূপ বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া, দরিদ্র, পতিত, ও পদদলিতের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক। মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করুক।"

—পত্রাবলি, ২০ পৃঃ।

এই কার্য্যভার আমাদের উপর। দেশ দেশ করিয়া বেড়াইলে দেশের উন্নতি হয় না; অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইলেই দেশের দুর্গতি দূর হয় না; ক্ষণিক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে স্থায়ী সুফল লাভ হয় না; রোষবশতঃ মহৎ উদ্দেশ্যে ধাবমান হইলেও কালের স্রোতে তাহার অস্তিত্ব থাকে না। আমাদের প্রয়োজন কি বুঝিতে হইবে, অভাব কি তাহা দেখিতে হইবে, উদ্দেশ্য কি তাহা ঠিক করিতে হইবে, উপায় কি তাহা অবলম্বন করিতে হইবে। তবেই আমরা দেশে নবশ্রী আনয়নের চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইব।

যদি স্বামীজির বাক্যে আমাদের বিশ্বাস হয়, যদি তাঁহার কথার উপর আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা হয়, তাহা হইলে আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য—তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করা। কিন্তু ইহাতেও ভয় আছে, পাছে আমরা শিক্ষার অভাবে হঠকারিতার পরিচয় দিই। কারণ, 'আমরা জনসাধারণকে শিক্ষিত করিবার জন্য প্রাণপণ করিব,' এ কথা বলিলেই চলিবে না, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ জনসাধারণ, ভারতের জনসাধারণ। ঋষিপ্রদর্শিত পথে ইহাদের জীবন বহুপূর্ব্ব হইতে চালিত। দেবতার আদর্শ পূজা করিতে ইহারা বাল্যাবধি শিখিয়াছে, অনাহারে মৃত্যুমুখে যাইতেছে, তবু ঈশ্বরের নাম করিয়া মরিতেছে, অবিশ্বাসী হইতে চাহিতেছে না। অন্নাভাবে পুত্র পরিবার মরিয়া যাইতেছে, প্রত্যক্ষ করিয়াও অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছে, পিশাচভাব অন্তরে আসিতে দিতেছে না। ইহারা বহু ঝঞ্ঝাবাত নীরবে সহ্য করিয়া অশ্রুপাত করে, তবু সমাজ-দ্রোহী হইয়া অপরের যন্ত্রণার কারণ হয় না। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, এই পুণ্যভূমির সন্তানগণকে শিক্ষাপ্রদান করিয়া উন্নত করিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য আর নাই। তাই ভয় হয়, পাছে আমরা কার্য্যক্ষেত্রে

অগ্রসর হইয়া বাল্যচপলতার প্রকাশ করি, সংস্কারকের কার্য্য করিতে গিয়া সংহারক হইয়া বসি। কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ বিস্তীর্ণ, কার্য্যভার ততোধিক গুরুতর। অতি গুরুভার, অতি দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য। একজনের কার্য্য নয়, একদিনের কার্য্য নয়। তাই স্বামীজি বলিয়াছেন—পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে ও ঈশ্বরে বিশ্বাসরূপ দৃঢ়বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইতে।

এ বিষয় যিনি যতই আলোচনা করিবেন, তিনি ততই বুঝিতে পারিবেন। দেশের কার্য্য যিনি করিতে যাইবেন, জনসাধারণের মঙ্গলকামনায় যিনি কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন, তাঁহার পক্ষে তাঁহার নিজ জীবন গঠন অগ্রে প্রয়োজন। নিজ জীবন গঠনে উদাসীন থাকিয়া পরের মঙ্গল সাধনে অগ্রসর হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। জনসাধারণের শিক্ষাবিধানে অগ্রসর হই বা সমাজের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত থাকি, যাহাই করি না কেন, নিজ জীবন গঠন না হইলে কোন কার্য্যেই কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব নয়। হিন্দুর আদর্শ বুঝিতে হইবে, এবং সেই আদর্শ অনুযায়ী আমাদের প্রত্যেকের জীবন চালিত করিতে হইবে, তবেই আমরা প্রকৃত হিন্দু হইব। প্রকৃত হিন্দুভাবাপন্ন হইলে তবে হিন্দুস্থানের কার্য্যে আমাদের অধিকার আসিবে, নচেৎ গোলমালেই জীবন কাটিবে। পুণ্যাত্মা হইলে তবে পুণ্যভূমির সেবা করিয়া মনুষ্যজন্ম সার্থক করিতে পারিব, নচেৎ বৃথা জীবন-ভার বহন করা হইবে। ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইলে তবেই ঋষিসন্তানগণের সেবকরূপে পরিণত হইব, নচেৎ নেতৃত্বের "পাশব অভিমানে" মুগ্ধ থাকিয়া কার্য্য পণ্ডের কারণ হইব। সেজন্য সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক—আমাদের নিজ নিজ জীবন গঠন করা, চরিত্রবান্ হওয়া এবং যাহাতে আমাদের প্রত্যেকের ও দেশের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী, সেই বিষয়ে চেষ্টিত হওয়া। স্নেহময় বাক্যে স্বামীজি তাই বলিয়াছেন—

"নিজেরা দেবতা হইয়া অপরকে দেবতা কর। 'নিজে সিদ্ধ হইয়া অপরকে সিদ্ধ কর,' ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র হউক।"

—মান্দ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর।

সন্ন্যাসীর আদর্শ ও তৎপ্রাপ্তির সাধন।

(স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন তারিখে দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাত্রা করেন। তাহার পূর্ব্বদিন ১৯শে জুন সন্ধ্যাকালে বেলুড় মঠে গুরুভাই ও শিষ্যগণকে লইয়া একটী সভা হয়। এই সভায় স্বামীজি ইংরাজীতে একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মঠের ডায়েরিতে তাহার সারাংশ সঙ্কলিত হইয়া রক্ষিত হইয়াছিল। তাহা হইতে বঙ্গানুবাদ করিয়া দেওয়া হইল।)

ভ্রাতৃগণ ও সন্তানগণ,

এখন দীর্ঘ বক্তৃতা করিবার অথবা বক্তৃতাশক্তি প্রকাশ করিবার সময় নহে। আমি তোমাদিগকে কয়েকটী বিষয় বলিতে ইচ্ছা করি। আশা—তোমরা এইগুলি কার্য্যে পরিণত করিবে। প্রথমতঃ, আমাদের আদর্শ কি, তাহা বুঝিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ, উহা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায়গুলি কি, তাহাও বুঝিতে হইবে। তোমাদের মধ্যে যাহারা সন্ন্যাসী, তাহাদিগকে পরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিতেই হইবে—কারণ, সন্ন্যাসী বলিতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। 'ত্যাগ' সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিবার এখন সময় নাই—আমি সংক্ষেপে উহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে চাই—মৃত্যুকে ভালবাসা। সাংসারিক ব্যক্তিগণ বাঁচিতে ভাল বাসে, সন্ন্যাসীকে মৃত্যু ভালবাসিতে হইবে। তবে কি আমাদিগকে আত্মহত্যা করিতে হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। কারণ, আত্মহত্যাকারিগণ প্রকৃত পক্ষে মৃত্যুকে ভালবাসে না। দেখাও যায়—আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিয়া যদি কেহ তাহাতে অকৃতকার্য্য হয়, সে পুনরায় ঐ চেষ্টা প্রায় করে না। তবে মৃত্যুকে ভালবাসার অর্থ কি? তাৎপর্য্য এই—আমাদিগকে মরিতেই হইবে—ইহা অপেক্ষা ধ্রুব সত্য কিছুই নাই। তবে আমরা কোন মহান্ সৎ উদ্দেশ্যের জন্য দেহপাত করি না কেন? আমাদের সকল কার্য্য—আহার, বিহার, অধ্যয়ন প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা করি—সকলগুলিই যেন আমাদিগকে আত্মত্যাগের অভিমুখ করিয়া দেয়। তোমরা আহারের দ্বারা শরীর পুষ্টি করিতেছ—কিন্তু শরীর পুষ্টি করিয়া কি হইবে, যদি উহাকে আমরা অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পারি? তোমরা অধ্যয়নাদি দ্বারা মনের পুষ্টি বা বিকাশ সাধন করিতেছ—ইহাতেই বা কি হইবে, যদি ইহাকেও অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পারি? কারণ, সমগ্র জগৎ এক অখণ্ড সত্তাস্বরূপ—তুমি ত ইহার নগণ্য ক্ষুদ্র অংশমাত্র—সুতরাং এই ক্ষুদ্র আমিত্বটাকে না বাড়াইয়া তোমার কোটি

কোটি ভাইয়ের সেবা করাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক কার্য্য—না করাই অস্বাভাবিক। উপনিষদের সেই মহতী বাণী কি স্মরণ নাই ?—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

এইরূপে তোমাদিগকে আস্তে আস্তে মরিতে হইবে। মৃত্যুতেই স্বর্গ—মৃত্যুতেই সকল কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত আর ইহার বিপরীত বস্তুতে সমুদয় অকল্যাণ ও আসুরিক ভাব প্রতিষ্ঠিত।

তারপর এই আদর্শটীকে কার্য্যে পরিণত করিবার উপায়গুলি কি, তাহা বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ এইটী বুঝিতে হইবে যে, অসম্ভব আদর্শ রাখিলে চলিবে না। অতিমাত্রায় উচ্চ আদর্শে জাতিকে দুর্ব্বল ও হীন করিয়া ফেলে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মসংস্কারের পর এইটী ঘটিয়াছিল। অপরদিকে আবার অতিমাত্রায় 'কাযের লোক' হওয়াও ভুল। যদি এতটুকুও কল্পনা তোমার না থাকে, যদি তোমাকে নিয়মিত করিবার একটা আদর্শ না থাকে, তবে তুমি ত একটা পশুমাত্র। অতএব আমাদিগকে আদর্শকেও খাট করিলে চলিবে না, আবার যেন আমরা কর্ম্মকেও অবহেলা না করি। এই দুইটা 'অত্যন্তকে' ছাড়িতে হইবে। আমাদের দেশের প্রাচীন ভাব এই—কোন গুহায় বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে মরিয়া যাওয়া। কিন্তু এখন এই বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে, আমি অন্যকে চেয়ে শীঘ্র শীঘ্র মুক্তিলাভ করিব—এ ভাবটাও ভুল। মানুষ শীঘ্র বা বিলম্বে বুঝিতে পারে যে, যদি সে তাহার নিজ ভাইএর মুক্তির চেষ্টা না করে, তবে সে কখনই মুক্ত হইতে পারে না। তোমাদের জীবনে যাহাতে প্রবল ভাবপরায়ণতার সহিত প্রবল কার্য্যকারিতা সংযুক্ত থাকে, তাহা করিতে হইবে। তোমাদিগকে গভীর ধ্যানধারণার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে আবার পরমুহূর্ত্তেই যাইয়া এই মঠের জমিতে চাষ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তোমাদিগকে শাস্ত্রীয় কঠিন সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে আবার পরমুহূর্ত্তেই এই জমিতে যে-ফসল হইবে, তাহা বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তোমাদিগকে খুব সামান্য কায—যেমন পাইখানা সাফ—পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে—শুধু এখানে নহে, অন্যত্রও।

তারপর তোমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে—এই মঠের উদ্দেশ্য—মানুষ প্রস্তুত করা। অমুক ঋষি এই কথা বলিতেছেন—শুধু এইটী শিখিলেই চলিবে

ক। সেই ঋষিগণ এখন আর নাই—তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের মতামতও চলিয়া গিয়াছে। তোমাদিগকে ঋষি হইতে হইবে। তোমরাও ত মানুষ—মহাপুরুষ, এমন কি অবতার পর্য্যন্ত যেমন মানুষ, তোমরাও ত সেই মানুষ। তোমাদিগকে নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াইতে হইবে। কেবল শাস্ত্রপাঠে কি হয়? এমন কি, ধ্যান ধারণায়ই বা কতদূর হইবে? মন্ত্র তন্ত্রেই বা কি করিতে পারে? তোমাদিগকে এই নূতন প্রণালী—মানুষ প্রস্তুত করণরূপ নূতন প্রণালী—অবলম্বন করিতে হইবে। মানুষ তাহাকেই বলা যায়, যে এত বলীয়ান্ যে তাহাকে বলের অবতার বলা যাইতে পারে আবার যাহার হৃদয়ে রমণীসুলভ কোমলতা আছে—তাহাদের দুর্ব্বলতা নহে। তোমাদের চারিদিকে যে কোটী কোটী প্রাণী রহিয়াছে, তাহাদের জন্য যেন তোমাদের হৃদয় কাঁদে অথচ তোমাদিগকে দৃঢ়চিত্ত হইতে হইবে। কিন্তু আবার এইটী বুঝিতে হইবে যে, স্বাধীনচিত্ততা যেমন আবশ্যক, তদ্রূপ আজ্ঞাবহতাও অবশ্যই চাই। আপাততঃ এই দুইটী পরস্পর বিরোধী বোধ হইতে পারে, কিন্তু তোমাদিগকে এই দুইটী আপাতবিরুদ্ধ ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে হইবে। যদি অধ্যক্ষগণ নদীতে ঝাঁপ দিয়া কুমীর ধরিতে বলেন, তবে প্রথমে তোমাদিগকে তাঁহাদের কথামত কায করিতে হইবে, তারপর তাঁহাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পার। যদি সেই আদেশ অন্যায়ও হয়, তথাপি প্রথমে তাঁহাদের কথানুসারে কার্য্য কর, তারপর প্রতিবাদ করিও। আমাদের সম্প্রদায়সমূহের—বিশেষতঃ, বঙ্গীয় সম্প্রদায় সকলের—এই এক বিশেষ দোষ যে, যদি তাহাদের মধ্যে কাহারও একটু ভিন্নমত হয়, সে অমনি একটী সম্প্রদায় করিয়া বসে—তাহার আর অপেক্ষা করিবার সহিষ্ণুতা থাকে না। অতএব তোমাদিগকে তোমাদের সম্প্রদায়ের উপর গভীর শ্রদ্ধা রাখিতে হইবে। এখানে অবাধ্যগণের স্থান নাই। যদি কেহ অবাধ্য হয়, তাহাকে মমতারহিত হইয়া দূর করিয়া দাও—বিশ্বাসঘাতক যেন কেহ না থাকে। বায়ুর ন্যায় মুক্ত ও অবাধগতি হও অথচ এই লতা ও কুকুরের ন্যায় নম্র ও আজ্ঞাবহ হও।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষমোচনফণ্ডে প্রাপ্তি স্বীকার।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রাপ্তিস্বীকার মুদ্রিত হইবার পরও দুর্ভিক্ষমোচনফণ্ডে যে টাকা আসিয়াছে, তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করা গেল। রামকৃষ্ণমিশনের দুর্ভিক্ষ-মোচনকার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এইকার্য্যের জন্য আর টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। দুর্ভিক্ষকার্য্যের আয়ব্যয় ও অন্যান্য বিবরণসম্বলিত রিপোর্ট এখন যন্ত্রস্থ। আমরা যথাকালে উহার সমালোচনা করিব।

অগ্রহায়ণের উদ্বোধনে স্বীকৃত	১৪১০২।০
কালিদাস, পোর্টব্লেয়ার	৩৶০
রামপদ পাঠক	৫৲
কে, ভস্ স্নাব, দৌলতপুর	৩।৵০
বি, ভি, ভারেসকর, রত্নগিরি	৩৸/০
ইউ, জি, দেশাই, থাইরা	১০৲
মিঃ সি, কৃষ্ণ	৯৲
একজন সন্ন্যাসী	১৲
বি, আপ্পাজি পার্থিভ	২৲
পি, এন, দেশপাণ্ডে	১০৲
শ্রীযুক্ত মতিভাই গোপালভাই, পাটেল	১০৲
ই, এ, মুদালিয়র	৫৲
মিস, আর, ফক্স, আমেরিকা	১৫।০
শ্রীযুক্ত বি, এন, নরসিংহ রাও	২৲
বিবেকানন্দ পাঠাগারের একজন সভ্য, কুমারী রামপুর	৫৲
রামকৃষ্ণ দুর্ভিক্ষ বাক্স, দানাপুর	৪।৵০
শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৲
হরেন্দ্রকৃষ্ণ ধীর	১৲
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৲
" প্রকাশচন্দ্র সেন	১৲
" কামিনীকান্ত দাস	২৲
" মতিলাল মুখোপাধ্যায়	১৲
" কানাইলাল আগরওয়ালা	১৲
" রেবতীমোহন দাস	২৲
" শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫৲
" কোটিশ্বর গুহ	২৲
" রামকৃষ্ণ ত্রিপাঠি, পুরি	১০৲
" রাধানাথ সিংহ	৩৲
" চারুচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা	৩৲
কাপড় বিক্রয়ের দরুন	২।০
শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত গুপ্ত	৩৲
" রামদাস সেন, দার্জ্জিলিং	১৲
মিস আর, ফক্স, আমেরিকা	১৫।০
খুচরা আদায়	১।/০
	১৫০৭৸৲

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মায়াবাদ—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্ত্তৃক বিবৃত। মূল্য আট আনা। শ্রীরামচন্দ্র কাব্য-স্মৃতিতীর্থের নিকট ৩৯।১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

অধ্যাপক মহাশয় ১৯০৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কার্য্যকারণতত্ত্ব' সম্বন্ধে যে তিনটি বক্তৃতা করেন, তাহাই অধুনা এই আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তিকা-খানির কাগজ সুন্দর, ছাপা সুন্দর, ভাষাও বেশ সরল। দর্শনের জটিলতত্ত্ব সাধারণ পাঠককে বুঝাইতে হইলে যে প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, পণ্ডিতজী তাহাই করিয়াছেন।

কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে যাইয়া পুরাকালে ভারতে যে সকল বিভিন্ন মতের উদয় হইয়াছিল, তৎসকলকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা—আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও মায়াবাদ। প্রথম মতে কারণ হইতে উৎপন্ন কার্য্য সম্পূর্ণ পৃথক্—দ্বিতীয়ে, কারণই কার্য্যরূপে পরিণত বা প্রকাশিত অতএব তদুভয় অপৃথক্—এবং তৃতীয়ে, কার্য্য ঠিক যে কারণ তাহাও নহে, আবার কারণ হইতে যে অত্যন্ত পৃথক্, তাহাও বলা যায় না। অর্থাৎ কারণ ও কার্য্য এক প্রকার অনির্ব্বাচ্য সম্বন্ধে গ্রথিত। ঐ অনির্ব্বাচ্যভাবই মায়া বলিয়া উক্ত মতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কণাদ ও গৌতম কৃত দর্শনে প্রথম মতটী —সাংখ্য ও পাতঞ্জলে, দ্বিতীয় মতটি—এবং উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তে, তৃতীয় মতটি অবলম্বিত হইয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় নানা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত সহায়ে তিনটী মতই বেশ বিশদ ভাবে বুঝাইয়াছেন। যে তিনটি মত লইয়া ভারতে রাশি রাশি দার্শনিক গ্রন্থের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহাদের মোট কথাগুলি এত অল্পের ভিতর এত বিশদভাবে বুঝাইতে পারা অল্প গুণপনার কথা নহে। এরূপ পুস্তকের যতই প্রচার হয়, ততই ভাল। ইহাতে প্রাচ্য দর্শনের অমূল্য রত্নগুলি ক্রমশঃ সাধারণ পাঠকের জ্ঞানরাজ্যের অধিকারভুক্ত হইবে। আমাদের দেশের যুবকেরা ইংরাজী সহায়ে পাশ্চাত্য দর্শনের তত্ত্বসমূহের সহিতই অদ্যাবধি পরিচিত হইয়া আসিতেছে। সংস্কৃত ভাষার জটিলতা, এ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ভারতীয় দার্শনিক তত্ত্বসমূহের রাজ্য হইতে দূরেই রাখিয়াছে। এই পুস্তিকাখানি তাহাদিগকে তৎসমুদায়ের কথঞ্চিৎ রসাস্বাদন দানে এবং ভারতীয়

দর্শনের সরল পরিভাষার সহিত পরিচিত করিয়া তাহাদিগের ভিতর ভারতীয় দর্শন চর্চ্চার ইচ্ছা বলবতী করিবার নিঃসংশয় সহায়ক হইবে।

পরিশেষে মায়াবাদের অবতারণায় কয়েক স্থলে পণ্ডিতজীর সহিত আমাদের একটু আধটু মতভেদ আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া আমরা সমালোচনা শেষ করিব। পণ্ডিতজী বলিতেছেন—"মায়াবাদ কোন একটি নূতন সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার জন্য প্রচারিত হয় নাই, ইহার উদ্দেশ্য খণ্ডন।"—৭৪ পৃঃ—১১ পংক্তি।

আমাদের মতে উহা আমাদের অবান্তর উদ্দেশ্য মাত্র। ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সহায় জীবকে তৎসমুদয়লব্ধ জ্ঞানের অসারতা পদে পদে বুঝাইয়া, উহাদের পরপারে সর্ব্বপূর্ণ সমাধিরাজ্যে ভূমাজ্ঞানের অধিকারী করিতে আকর্ষণ করাই, উক্তমতের মুখ্য-উদ্দেশ্য। মন বুদ্ধির পারেই প্রকৃত ভাববস্তুর অধিষ্ঠান এবং তল্লাভের উপায়ই সমাধি—মায়াবাদ-প্রচারিত একথা যদি আপ্ত পুরুষকুলের জীবনালোচনায় সত্য বলিয়া না প্রমাণিত হইত, তাহা হইলে উহার ন্যায় ভ্রমবাদ (গাঁজাখুরি) জগতে আর একটিও অদ্যাবধি প্রচারিত হইয়াছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহের উদয় হইত। সেজন্য একদিকে মায়াবাদ যেমন মনুষ্যবুদ্ধিপ্রসূত সমস্ত বাদের খণ্ডনে নিযুক্ত—অন্যদিকে আবার তেমনি আত্মার পূর্ণত্ব একত্ব অভেদত্বাদি স্থাপনে তদপেক্ষা অধিক প্রয়াসী। মায়াবাদ যে এতদিনেও সমাধির পারের বস্তুর যথার্থ বিবরণ আমাদের সম্মুখে স্থাপন করে নাই—উহা তাহার দোষ নহে। মানবের বুদ্ধি এবং ভাষাই উক্ত দোষে দোষী, কারণ, তদুভয় সসীম। জনৈক পাশ্চাত্য দার্শনিক তৎকৃত দর্শনের শেষ ভাগে ঐ বিষয়ে লিখিয়াছেন—"ইহাই দর্শনশাস্ত্রের শেষভূমি এবং এই স্থান হইতেই আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রারম্ভ"—"Here philosophy ends and here Religion begins." Hamilton.

মায়াবাদ যথার্থই তাহা! সেজন্য মায়াবাদ বিবৃত করিতে যাইয়া পরিশেষে সমাধিলব্ধ বস্তুর কিঞ্চিৎ মাত্রও আভাস না দিলে উক্ত বিবরণ অঙ্গহানি দোষে দুষ্ট হয়—উক্ত মতের অনেক বিবরণ মাত্র দেওয়া হয়। পণ্ডিতজী বলিতে পারেন,—যুক্তিসহায়ে যতদূর অগ্রসর হওয়া যায়, ততদূর যাওয়াই দার্শনিকের রাজ্য। তদুত্তরে আমরা বলি 'না', উহা ভারতের দার্শনিকের কথা নহে—পাশ্চাত্য দার্শনিকের কথা। ভারতের ঋষিকুল বলেন—যে দর্শন কেবল খণ্ডন করিয়াই নিরস্ত, কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত স্থাপন করে না, তাহা তন্নামের যোগ্য নহে। মায়াবাদের তর্কজালে সমাচ্ছাদিত হইয়া পাঠক যখন স্বীয় মন বুদ্ধি ও প্রমাজ্ঞানের অসারত্ব প্রাণে প্রাণে অনুভূতি করিয়া হাঁপাইয়া বলিয়া উঠে,

'এখন বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা'—তখন তাহার আবাসের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত সমাধিলব্ধ যথার্থ জ্ঞানের কথা তাহার সম্মুখে না ধরিলে তাহার ভীষণ পরিণাম হয়। আশা করি, পুস্তিকাখানির দ্বিতীয় সংস্করণে পণ্ডিতজী ঐ বিষয়ের কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া উহার এই অঙ্গহানিত্ব দূর করিবেন।

আর একটি কথা—৮৬ পৃষ্ঠা ৬ পংক্তিতে পণ্ডিতজী লিখিয়াছেন—"বাস্তব কথা বলিতে গেলে ইহাও বলিতে হয় যে,—এই সংসারে কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ বিচার করিবার শক্তিও মানুষের নাই।" বাস্তবিক কি তাহাই এবং মায়াবাদ কি তাহাই প্রচার করে? কার্য্যকারণের সূত্রানুসন্ধানে বর্ত্তমানকালের জড়-বিজ্ঞান, নিত্য যে সকল নূতন নূতন ব্যাবহারিক সত্য আবিষ্কার করিয়া জগতের শ্রী ফিরাইয়া দিতেছে, তাহাই ওকথার যথেষ্ট প্রতিবাদ। মায়াবাদ বলে, মানুষের কার্য্যকারণের সম্বন্ধ বিচারের শক্তি আছে, সত্য। তৎসহায়ে মানব নানাপ্রকার সুখসম্পৎসম্পন্ন হইয়াছে ও পরে হইবে—ইহাও সত্য। কিন্তু যে সত্য পদার্থ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বাবস্থায় সমান ভাবে অপরিবর্ত্তিত থাকে, যাহার নির্ণয় করিতে মানবের প্রাণ সর্ব্বকালে সমান লালায়িত, যাহার নির্ণয় না হইলে তাহার জন্ম কর্ম্ম বিদ্যা সম্পদ্ গৌরব সমুদায় মৃত্যুমাত্রেই পর্য্যবসিত, ও বৃথা হইয়া যায়—তাহার নির্ণয় কার্য্য-কারণ-সূত্রাবলম্বনে হইবার নহে। দেশ কালাদির ভিতরেই যাবতীয় কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ, সত্য বলিয়া নির্ণীত হয়—সুতরাং ঐ দেশ কালাদির পরিবর্ত্তনে আবার তাহা অসত্য হইয়া উঠে। অতএব নিত্য সত্যের নির্ণয় বা উপলব্ধি দেশকালের গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়া কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-বিচার-রূপ যন্ত্রসহায়ে কখনই সম্ভবপর নহে; সুতরাং ঐ অকিঞ্চিৎকর শক্তিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দেশকালাতীত অবস্থায় অগ্রসর হও। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ'—মায়াবাদ এই কথাই জীবকে বলিতেছে। এবং দেশকালাতীত সেই আত্মার দর্শনের উপায় স্বরূপ বলিতেছে—'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।'

তান্তিয়ার বাহাদুরী—একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা—কাগজ সুন্দর, ছাপা সুন্দর, ভাষাও সরল, গল্পের ভাষা—ইহাতে ভারতের বিখ্যাত দস্যু, তান্তিয়া নামক ভিল সর্দারের অদ্ভুত সাহস, অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা এবং অসীম ক্ষিপ্র-কারিতার পরিচায়ক কয়েকটি ঘটনা সন্নিবেশিত আছে। ডিটেক্টিভ্ (টিকটিকি) উপন্যাসাদির ন্যায় সম্মুখে অঘটনঘটনার চিত্র ধরিয়া সাময়িক উত্তেজনা ও আনন্দ-দানে ইহা পাঠকের বাজে সময় কাটাইবার সহায়ক হইতে পারে।

তথা চ সতি নিত্যানাং ফলাশ্রবণাৎ তদ্বিধানান্যথানুপপত্তেশ্চ নিত্যানুষ্ঠানায়াস-দুঃখং, পূর্ব্বকৃতদুরিতফলমিত্যর্থাপত্তিকল্পনা অনুপপন্না। এবংবিধানান্যথানুপপত্তেঃ অনুষ্ঠানায়াসদুঃখব্যতিরিক্তফলত্বানুমানাচ্চ নিত্যানাং। বিরোধাচ্চ। বিরুদ্ধঞ্চেদ-মুচ্যতে নিত্যকর্ম্মণি অনুষ্ঠীয়মানে অন্যস্য কর্ম্মণঃ ফলং ভুজ্যতে ইত্যভ্যুপগম্য-মানে স এবোপভোগঃ নিত্যস্য কর্ম্মণঃ ফলমিতি নিত্যস্য কর্ম্মণঃ ফলাভাব ইতি চ বিরুদ্ধমুচ্যতে। কিঞ্চ কাম্যাগ্নিহোত্রাদাবনুষ্ঠীয়মানে নিত্যমপ্যগ্নিহোত্রাদি তন্ত্রে-ণৈব অনুষ্ঠিতং ভবতীতি তদায়াসদুঃখেনৈব কাম্যাগ্নিহোত্রাদিফলমুপক্ষীণং স্যাৎ তন্ত্রত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—আরও বক্তব্য এই যে, নিত্য অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিতে যে দুঃখ হয়, কাম্য অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানেও সেইরূপ দুঃখ হইয়া থাকে। (তাহাই যদি হইল তবে) নিত্য অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানে যে দুঃখ হয়, তাহাই পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত পাপের ফল, কিন্তু কাম্য অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানে যে দুঃখ হয়, তাহা পূর্ব্ব জন্মে সঞ্চিত পাপের ফল নহে, এইরূপ কোন বিশেষ না থাকায়, ঐ কাম্য অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানে যে দুঃখ হয়, তাহাও পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত পাপের ফল হউক। তাহাই যদি হইল, তবে নিত্য কর্ম্মের কোন প্রকার ফল আছে—এইরূপ কথা বেদে না থাকায়, তাহার বিধান অন্যথা উপপত্তিযুক্ত হইতে পারেনা বলিয়া পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত পাপের ফলই নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান জনিত দুঃখ, এই প্রকার অর্থাপত্তি কল্পনাও অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। আরও এক কথা—কেবল দুঃখের জন্য কোন কার্য্যই বেদে বিহিত হইতে পারেনা, সুতরাং বেদে যখন নিত্য কর্ম্মের বিধান রহিয়াছে, তখন অনুষ্ঠান দুঃখই যে তাহার ফল, তাহা কিছুতেই সম্ভব নহে; উহার দুঃখ ব্যতিরিক্ত অন্য কোন ফল নিশ্চয়ই আছে, এই প্রকার অনুমানের দ্বারা অনুষ্ঠানায়াস দুঃখ ছাড়া অন্য কোন প্রকারও নিত্য কর্ম্মের ফল আছে, ইহা সিদ্ধ করা যাইতে পারে। আর এক কথা এই যে, এইরূপ কল্পনা নিতান্ত বিরুদ্ধ হইয়া পড়িতেছে (কিরূপে বিরুদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, তাহাও বলি) নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অন্য কর্ম্মের (অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মের) ফল ভোগ করিতে হয়, এইপ্রকার যদি অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে সেই দুঃখোপভোগই নিত্য কর্ম্মের ফল হইয়া থাকে অথচ (তুমি বলিতেছ) নিত্য কর্ম্মের কোন ফল নাই, এই প্রকার উক্তিই পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। আরও (দ্রষ্টব্য এই যে) এক কাম্য

অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিলেই সঙ্গে সঙ্গে নিত্য অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান সিদ্ধ হইয়া থাকে। (ফলে এই দাঁড়াইতেছে যে) নিত্যাগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান-জনিত দুঃখভোগের সহিত কাম্যাগ্নিহোত্রেরও ফল ভোগ হইয়া গেল সুতরাং তাহার আর কোন অতিরিক্ত ফল—ভোগের জন্য অবশিষ্ট রহিল না, এই প্রকার আপত্তি উপস্থিত হইল।

ভাষ্য।—অথ কাম্যাগ্নিহোত্রাদিফলমেব স্বর্গাদি, তদনুষ্ঠানায়াসদুঃখমপি ভিন্নং প্রসজ্যেত। ন চ তদস্তি দৃষ্টবিরোধাৎ। ন হি কাম্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখাৎ কেবলনিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখং ভিদ্যতে। কিঞ্চান্যং অবিহিতং অপ্রতিষিদ্ধং কর্ম্ম তৎকালফলং ন তু শাস্ত্রচোদিতং তৎপ্রতিষিদ্ধং বা তৎকালফলং ভবেদ্ যদি তদা স্বর্গাদিষু অদৃষ্টফলশাসনে চোদ্যমো ন স্যাৎ। অগ্নিহোত্রাদীনাং এব কর্ম্মস্বরূপাবিশেষে অনুষ্ঠানায়াসদুঃখমাত্রেণ উপক্ষয়ঃ কাম্যানাঞ্চ স্বর্গাদিমহাফলত্ব-মঙ্গেতিকর্ত্তব্যতাদ্যাধিক্যে সত্যপি ফলকামিত্বমাত্রেণ ইতি ন শক্যং কল্পয়িতুং।

ভাষ্যানুবাদ।—আর যদি বল যে, কাম্য অগ্নিহোত্রের ফল স্বর্গাদি, এবং উহা নিত্য অগ্নিহোত্রের ফল হইতেও ভিন্ন, তাহা হইলে (তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে) কাম্য অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিতে যে দুঃখ হয়, তাহা নিত্যাগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান দুঃখ হইতে ভিন্ন, বাস্তবিক কিন্তু, তাহা হইতে পারে না, তাহা হইলে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ কল্পনা করিতে হয়। কাম্যাগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিতে হইলে যে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা হইতে নিত্যাগ্নি-হোত্রের অনুষ্ঠানজনিত দুঃখভোগ যে ভিন্ন, তাহা ত দেখিতে পাওয়া যায় না। আরও একটী বক্তব্য এই যে, যে কর্ম্ম শাস্ত্রে বিহিত নহে বা যে কার্য্য শাস্ত্রে প্রতিষিদ্ধ নহে, তাহার ফল অবিলম্বেই হইয়া থাকে। শাস্ত্রে যাহা বিহিত বা প্রতিষিদ্ধ, তাহার অনুষ্ঠান করিলে যে সেই সময়েই শাস্ত্রকথিত ফল হইবে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। তাহা যদি সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে স্বর্গ প্রভৃতি অদৃষ্ট ফলের জন্য বিহিত যে কর্ম্মসমূহ, তাহাতে লোকসমূহের প্রবৃত্তি অনুপপন্ন হইয়া পড়িত। নিত্য অগ্নিহোত্র হইতে কাম্য অগ্নিহোত্রের স্বরূপগত কোন বিশেষই দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ অনুষ্ঠানজনিত দুঃখ-ফল হইলেই নিত্যাগ্নিহোত্রের ক্ষয় হইবে, আর কেবল স্বর্গভোগ করিবার ইচ্ছা যজমানের আছে বলিয়াই কাম্য অগ্নিহোত্রের ফল স্বর্গাদির ভোগ হইবার পর ঐ কাম্য অগ্নিহোত্রের ক্ষয় হইবে, এই প্রকার কল্পনা কোন প্রকারেই সঙ্গত হইতে পারে না।

ভাষ্য।—তস্মান্ন নিত্যানাং কর্ম্মণামদৃষ্টফলাভাবঃ কদাচিদপ্যুপপদ্যতে অতশ্চাবিদ্যাপূর্ব্বকস্য কর্ম্মণো বিদ্যৈব শুভস্যাশুভস্য বা ক্ষয়কারণমশেষতো ন নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানং। অবিদ্যাকামবীজং হি সর্ব্বমেব কর্ম্ম। তথা চোপপাদিতং। অবিদ্বদ্বিষয়ং কর্ম্ম বিদ্বদ্বিষয়া চ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বিকা জ্ঞাননিষ্ঠা "উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ।" "বেদাবিনাশিনং নিত্যং।" "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাং।" "অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং।" "তত্ত্ববিত্তু" "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে।" "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে।" "নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।" অর্থাৎ অজ্ঞঃ করোমীতি। আরুরুক্ষোঃ কর্ম্ম কারণং আরূঢ়স্য যোগস্থস্য শম এব কারণং। উদারাস্ত্রয়োঽপ্যজ্ঞা "জ্ঞানী তু আত্মৈব মে মতং।" অজ্ঞাঃ কর্ম্মিণো "গতাগতং কামকামা লভন্তে" "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং নিত্যযুক্তা" যথোক্তমাত্মানমাকাশকল্পং অকল্মষমুপাসতে "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" অর্থাৎ ন কর্ম্মিণোঽজ্ঞা উপযান্তি।

ভাষ্যানুবাদ।—সেই কারণে (সিদ্ধ হইল যে) নিত্য কর্ম্ম করিলে যে একেবারে কোন অদৃষ্ট হইবে না, ইহা যুক্তিহীন। ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, কর্ম্মের মূল অবিদ্যা। বিদ্যার উদয় হইলে শুভই হউক বা অশুভই হউক, সকল কর্ম্মেরই ক্ষয় হইয়া থাকে। অবিদ্যা এবং কাম এই দুইটীই সকল কর্ম্মের মূল কারণ। এইরূপই ভগবদ্গীতাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, কর্ম্মের অধিকারী অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তিই হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্ব-কর্ম্মসন্ন্যাস এবং তৎপূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠাই বিহিত। (ইহার প্রতিপাদক বহুতর বাক্যই এই গীতাশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন) "তাহারা উভয়েই জানে না।" "আত্মাকে অবিনাশী নিত্য বলিয়া জানিবে।" "সাংখ্য-গণের জ্ঞানযোগের দ্বারা এবং কর্ম্মযোগের দ্বারা যোগিগণের (সিদ্ধি-লাভ হয়)" "অজ্ঞগণের (অর্থাৎ) কর্ম্মসঙ্গিগণের।" "তত্ত্ববিৎ" কিন্তু "গুণ-সমূহ গুণেতেই প্রবৃত্ত হইতেছে এই বুদ্ধি থাকায় বিচলিত হয় না।" "সকল কর্ম্মকেই মনে মনে সন্ন্যাস করিয়া অবস্থান করে" "সমাহিতচেতা বিবেচনা করে যে, আমি কিছুই করি না।" অর্থাৎ অজ্ঞই বোধ করে যে, আমি করিতেছি। সমাধিতে আরোহণ করিতে যে চাহে, তাহার পক্ষে কর্ম্মই সিদ্ধি লাভের উপায়, কিন্তু যে সমাধি লাভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে নিবৃত্তিই সিদ্ধি লাভের উপায়। "তিন প্রকার ভক্তই উদার হইলেও অজ্ঞ, কিন্তু জ্ঞানী ভক্তই আমার আত্মা, ইহাই আমার মত।" যাহারা অজ্ঞ সুতরাং কর্ম্মী "তাহারা ভোগ-

কামনায় এই সংসারে যাতায়াতই করিয়া থাকে। "যাহারা অনন্যপর হইয়া সর্ব্বদা আমার ধ্যান করে" সেই নিত্যযুক্ত ব্যক্তিগণ যথোক্ত আকাশকল্প নিষ্পাপ আত্মারই উপাসনা করে। "তাহাদিগকেই আমি বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যে বুদ্ধিযোগ দ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়।" (অর্থাৎ যাহারা জ্ঞানী, তাহারাই আমাকে প্রাপ্ত হয়) কিন্তু যাহারা কর্ম্মী অর্থাৎ অজ্ঞ, তাহারা আমাকে পায় না।

ভাষ্য।—ভগবৎকর্ম্মকারিণো যে যুক্ততমা অপি কর্ম্মিণোঽজ্ঞাস্তে উত্তরোত্তর-হীনফলত্যাগাবসানসাধনাঃ। অনির্দ্দেশ্যাক্ষরোপাসকাস্ত্বদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যা-দ্যাধ্যায়পরিসমাপ্ত্যুক্তসাধনাঃ ক্ষেত্রাধ্যায়াদ্যধ্যায়প্রোক্তজ্ঞানসাধনাশ্চ। অধিষ্ঠানা-দিপঞ্চহেতুকসর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসিনাং আত্মৈকত্বাকর্তৃত্বজ্ঞানবতাং পরস্যাং জ্ঞাননিষ্ঠায়াং বর্ত্তমানানাং ভগবত্তত্ত্ববিদাং অনিষ্টাদিকর্ম্মফলত্রয়ং পরমহংসপরিব্রাজকানামেব লব্ধভগবৎস্বরূপাত্মৈকত্বশরণানাং ন ভবতি। ভবত্যেব অন্যেষাং অজ্ঞানাং কর্ম্মিণামসন্ন্যাসিনামিত্যেষ গীতাশাস্ত্রোক্তস্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যার্থস্য বিভাগঃ। অবিদ্যা-পূর্ব্বকত্বং সর্ব্বস্য কর্ম্মণোঽসিদ্ধিমিতি চেৎ। ন ব্রহ্মহত্যাদিবৎ। যদ্যপি শাস্ত্রা-বগতং নিত্যং কর্ম্ম তথাপি অবিদ্যাবত এব ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।— যাহারা ভগবানের প্রীতির জন্যই বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সুতরাং যাহারা যুক্ততম, কর্ম্মী তাহারাও অজ্ঞ, তাহারা ক্রমে ক্রমে হীন ফল-সমূহকে ত্যাগ করিতে করিতে অবসানে প্রকৃত মোক্ষসাধনকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যাহারা সেই অনির্দ্দেশ্য অক্ষরের উপাসক, যাহাদের সাধন বিষয়ে "সকল ভূতের অদ্বেষ্টা" ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশাধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত বিশদ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাদের এক মাত্র সাধন যে জ্ঞান, তাহা "ক্ষেত্রাধ্যায়" (ত্রয়োদশাধ্যায়) প্রভৃতিতে উক্ত হইয়াছে। অধিষ্ঠান প্রভৃতি পাঁচটী কারণ হইতে যত প্রকার কর্ম্ম হইতে পারে, সেই সকল কর্ম্মের সন্ন্যাস যাহারা করিয়াছে, আত্মা এক এবং কর্ত্তা নহে এই প্রকার জ্ঞান যাহাদের আছে, যাহারা পরম জ্ঞাননিষ্ঠাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং যাহারা ভগবানের তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছে, সেই সকল পরমহংস পরিব্রাজক ভগবৎস্বরূপ যে আত্ম-তত্ত্ব তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে এবং তাহাদের ত্রিবিধ কর্ম্মফলের ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু যাহারা অজ্ঞ কর্ম্মী সুতরাং অসন্ন্যাসী, তাহারাই ত্রিবিধ কর্ম্মফলের ভোগ করিয়া থাকে। ইহাই হইল গীতাশাস্ত্রে উক্ত কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য অর্থের বিভাগ। সকল কর্ম্মই যে অবিদ্যাপূর্ব্বক তাহা মানিতে পারা যায় না, এইরূপ আশঙ্কা করাও ঠিক নহে। কারণ, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি কর্ম্ম

যেমন রাগ বা দ্বেষ বশতঃ অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া অবিদ্যামূলক, সেইরূপ রাগ বা দ্বেষ বশতঃ অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া সকল কর্ম্মই অবিদ্যামূলক। যদিও নিত্য কর্ম্ম শাস্ত্রবিহিত, তাহা হইলেও উহা অবিদ্বানের জন্যই বিহিত, সুতরাং উহা অবিদ্বানের পক্ষেই কর্ত্তব্য।

ভাষ্য।—যথা প্রতিষেধশাস্ত্রাবগতমপি ব্রহ্মহত্যাদিলক্ষণং কর্ম্ম অনর্থ-কারণমবিদ্যাকামাদিদোষবতো ভবতি অন্যথা প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ তথা নিত্য-নৈমিত্তিককাম্যান্যপি ইতি। ব্যতিরিক্তাত্মনি অজ্ঞাতে প্রবৃত্তির্নিত্যাদিকর্ম্মসু অনুপপন্নেতি চেৎ। ন চলনাত্মকস্য কর্ম্মণোঽনাত্মকর্তৃকস্য অহং করোমীতি প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। দেহাদিসংঘাতেঽহংপ্রত্যয়ঃ গৌণঃ ন মিথ্যা ইতি চেৎ। ন তৎকার্য্যেষু অপি গৌণত্বোপপত্তেঃ আত্মীয়ে দেহাদিসংঘাতে অহংপ্রত্যয়ো গৌণো যথা আত্মীয়ে পুত্রে আত্মা বৈ পুত্র নামাসীতি লোকে চাপি মম প্রাণ এবায়ং গৌঃ ইতি দর্শনাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—যেমন প্রতিষেধ শাস্ত্রের দ্বারা অবগত ব্রহ্মহত্যাদি কার্য্য অনর্থের কারণ হইলেও অবিদ্যা ও কাম প্রভৃতি দোষ যাহার আছে, সেই ব্যক্তিই ঐ ব্রহ্মহত্যাদি কর্ম্ম করিয়া থাকে; কারণ অজ্ঞান এবং কাম প্রভৃতি দোষ না থাকিলে কেহই অনর্থকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না; সেইরূপ নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য কর্ম্ম সমূহে যে প্রবৃত্তি, তাহাও অবিদ্যা ও কাম প্রভৃতি দোষ বশতঃই হইয়া থাকে। যদি বল, দেহ হইতে আত্মা পৃথক্ এই প্রকার জ্ঞান না থাকিলে কেহই পরলোকে ভোগ্য স্বর্গাদির হেতু যে বিহিত কর্ম্ম তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না (সুতরাং ইহা দ্বারা প্রতি-পন্ন হইতেছে যে, যাহার আত্মার স্বরূপ জ্ঞান আছে, তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে কর্ম্মসমূহ বিহিত হইয়াছে) তাহাও ঠিক নহে। কারণ (ঐ প্রকার জ্ঞান হইলেই যে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানা হইল, তাহা নহে) ক্রিয়া চলন-স্বভাব সুতরাং তাহা আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারে না; সেই ক্রিয়াকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া যে বুঝিয়া থাকে, সেই 'আমি' করিতেছি এই প্রকার বিবেচনা করে, আমি করিতেছি এইরূপ জ্ঞান না থাকিলে কেহই বিহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, ইহাই যদি স্থির হইল, তবে কি প্রকারে বলা যাইতে পারে যে, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ যে জানিয়াছে, সেই বিহিত কর্ম্মের অধিকারী হইয়া থাকে? যদি বল, দেহাদি সংঘাতে আমাদের যে আত্মপ্রত্যয় হয়, তাহা গৌণ প্রত্যয় হইতে পারে কিন্তু তাহা মিথ্যা প্রত্যয় নহে। এই

প্রকার মতও সঙ্গত নহে, কারণ, দেহাদিতে যে আত্মপ্রত্যয় তাহা যদি গৌণ প্রত্যয় হইত, তাহা হইলে সেই দেহাদিতে আত্মপ্রত্যয়ের যে কার্য্যসমূহ তাহাও গৌণ হইত। ইহার পরও যদি এইরূপ বল যে, আত্মার সহিত মিলিত দেহাদিতে যে আত্মপ্রত্যয় হইয়া থাকে, তাহাকে গৌণ আত্ম প্রত্যয়ই বলিব, যেমন আত্মীয় পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া "আত্মারই নাম পুত্র" এই প্রকার শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে দেখিতে পাওয়া যায়, লোকসমাজেও ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই গোরুটী আমার প্রাণই, সেইরূপ দেহাদিতে যে আত্মপ্রত্যয় তাহাও গৌণ প্রত্যয় হইবে।

ভাষ্য।—নৈবাগং মিথ্যাপ্রত্যয়ঃ মিথ্যাপ্রত্যয়স্তু স্থাণুপুরুষয়োরগৃহ্যমাণ-বিশেষয়োঃ ন গৌণপ্রত্যয়স্ত মুখ্যকার্য্যার্থত্বং অধিকরণভূত্যর্থত্বাৎ লুপ্তোপমা-শব্দেন, যথা সিংহো দেবদত্তঃ অগ্নির্মাণবকঃ ইতি সিংহইব অগ্নিরিব চ ক্রৌর্য্য-পৈঙ্গল্যাদিসামান্যবত্ত্বাৎ দেবদত্তমাণবকাধিকরণস্তুত্যর্থমেব, ন তু সিংহকার্য্য-মগ্নিকার্য্যং বা গৌণশব্দপ্রত্যয়নিমিত্তং কিঞ্চিৎ সাধ্যতে মিথ্যাপ্রত্যয়কার্য্যং তু অনর্থমনুভবতি। গৌণপ্রত্যয়বিষয়ং জানাতি নৈব সিংহোহয়ং দেবদত্তঃ স্যাৎ নায়মগ্নির্মাণবকইতি। তথা গৌণেন দেহাদিসংঘাতেন আত্মনা কৃতং কর্ম্ম ন মুখ্যেন অহংপ্রত্যয়বিষয়েণ কৃতং স্যাৎ। ন হি গৌণসিংহাগ্নিভ্যাং কৃতং কর্ম্ম মুখ্যাগ্নিসিংহাভ্যাং কৃতং স্যাৎ। ন চ ক্রৌর্য্যেণ পৈঙ্গল্যেন মুখ্যসিংহাগ্ন্যোঃ কার্য্যং কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে স্তুত্যর্থত্বেন উপক্ষীণত্বাৎ। স্তূয়মানৌ চ জানীতঃ নাহং সিংহো নাহমগ্নিরিতি। ন সিংহস্য কর্ম্ম মম অগ্নেশ্চ ইতি। তথা ন সঙ্ঘাতস্য কর্ম্ম মম মুখ্যস্য আত্মনঃ ইতি প্রত্যয়ঃ যুক্ততরঃ স্যাৎ ন পুনরহং কর্ত্তা মম কর্ম্মেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—সুতরাং এই যে দেহাদিতে আত্মপ্রত্যয় ইহা মিথ্যা প্রত্যয় নহে, ইহা গৌণ প্রত্যয়। স্থাণু এবং পুরুষের যদি পরস্পরগত বিশেষ না জানা থাকে, তবেই সেই স্থাণুতে পুরুষ বুদ্ধিরূপ মিথ্যা প্রত্যয় উৎপন্ন হয়। এই ভাবে দেহাদিতে যে আত্মবুদ্ধি হয়, তাহা গৌণ প্রত্যয় কিন্তু মিথ্যাপ্রত্যয় নহে, এইরূপ যে মত স্থাপিত হইল, তাহা ঠিক নহে : কেন ঠিক নহে, এক্ষণে তাহাই বিশদ ভাবে বুঝান যাই-তেছে। গৌণ প্রত্যয় কখনই মুখ্য প্রত্যয়ের কার্য্য করিতে পারে না, কেবল বিশে-ষ্যের স্তুতি করিবার জন্যই লুপ্তোপমা দ্বারা গৌণ শব্দের প্রয়োগ করা হয়। যেমন যদি কেহ বলে "দেবদত্ত সিংহ" বা "মাণবক অগ্নি," তাহা হইলে আমরা বুঝিয়া থাকি যে, দেবদত্ত সিংহ সদৃশ বা মাণবক (উপনীত ব্রাহ্মণ বালক) অগ্নি সদৃশ। অর্থাৎ সিংহের ধর্ম্ম যে ক্রূরতা, তাহা দেবদত্তেরও আছে অথবা

অগ্নির ধর্ম্ম যে পিঙ্গলপ্রভা তাহা মাণবকেরও আছে। এই প্রকার গৌণ প্রয়োগের ফল হইতেছে—দেবদত্ত বা মাণবক রূপ যে বিশেষ্য তাহার প্রশংসা। ইহা দ্বারা এমন বুঝান যায় না যে, দেবদত্ত সিংহের কার্য্য করে বা মাণবক অগ্নির কার্য্য করে। সুতরাং ইহা সকলেই জানে যে, সিংহের বা অগ্নির কার্য্য করে বলিয়া দেবদত্ত বা মাণবককে সিংহ বা অগ্নি বলিয়া গৌণভাবে নির্দেশ করা হয় তাহা নহে, ইহা দ্বারা কেবল দেবদত্ত বা মাণবকের প্রশংসামাত্রই করা হয়। কিন্তু মিথ্যা প্রত্যয় এইরূপ নহে, কারণ, মিথ্যা প্রত্যয়ের যে কার্য্য তাহা দ্বারা অনর্থ অনুভূত হইয়া থাকে। যেখানে গৌণ প্রত্যয় হয়, সেখানে লোকে স্পষ্ট জানিয়া থাকে যে, এই দেবদত্ত সিংহ নহে অথবা এই মাণবক অগ্নি নহে; সেইরূপ গৌণ প্রত্যয়ের বিষয় যদি দেহাদি হইত, তাহা হইলে দেহাদি দ্বারা কৃত যে কর্ম্ম তাহা অহং প্রত্যয়ের মুখ্য বিষয় যে আত্মা সে কখনই আমার কর্ম্ম বলিয়া বোধ করিত না। গৌণ সিংহ বা গৌণ অগ্নি যে কার্য্য করে, তাহা কখন মুখ্য সিংহ বা মুখ্য অগ্নির কার্য্য হইতে পারে না। আরও দেখিতে হইবে যে, ক্রূরতা বা পিঙ্গলপ্রভা আছে বলিয়া দেবদত্ত বা মাণবক যে সিংহ বা অগ্নির কার্য্য করিবে, তাহাও সম্ভবপর নহে। এই প্রকার গৌণপ্রয়োগ—স্তুতিরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াই আমাদের নিকট ক্ষীণশক্তি হইয়া পড়ে, (অর্থাৎ অন্য কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না) ঐ প্রকার গৌণ শব্দ প্রয়োগের দ্বারা যাহাদের স্তুতি করা হয়, তাহারাও জানিয়া থাকে যে, আমি সিংহ নহি অথবা অগ্নি নহি, এবং ইহাও জানে যে, সিংহের কার্য্য আমি করি না অথবা অগ্নির কার্য্যও আমি করি না। কিন্তু দেহাদিতে যে আমাদের আত্মপ্রত্যয়, তাহা গৌণ প্রত্যয় হইতে পারে না; কারণ, সে স্থানে আমরা এইরূপ বুঝি না যে, ইহা দেহের কর্ম্ম, আমার কর্ম্ম নহে; সেই স্থানে বরং আমাদের বোধ হয় যে, আমি কর্ত্তা এবং ইহা আমার কর্ম্ম (দেহাদিতে যে আত্মপ্রত্যয তাহা যদি গৌণ প্রত্যয় হইত, তাহা হইলে আমাদের "আমি কর্ত্তা নহি আমার ইহা কর্ম্ম নহে ইহা দেহাদি সঙ্ঘাতেরই কর্ম্ম" এই প্রকার বোধ হওয়াই যোগ্যতর হইত, বাস্তবিক কিন্তু এরূপ বোধ কোন সংসারী ব্যক্তির হয় না)।

ভাষ্য।—যচ্চাত্তঃ আত্মীয়ৈঃ স্মৃতীচ্ছাপ্রযত্নৈঃ কর্ম্মহেতুভিরাত্মা করোতীতি ন তেষাং মিথ্যাপ্রত্যয়পূর্ব্বকত্বাং মিথ্যাপ্রত্যয়নিমিত্তেষ্টানিষ্টানুভূতক্রিয়াফলজনিতসংস্কারপূর্ব্বকা হি স্মৃতীচ্ছাপ্রযত্নাদয়ঃ। যথা অস্মিন্ জন্মনি

দেহাদিসংঘাতাভিমানরাগদ্বেষাদিকৃতৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তৎফলানুভবশ্চ। তথা অতীতে অতীততরেঽপি জন্মনি ইতি অনাদিরবিদ্যাকৃতঃ সংসারঃ অতীতঃ অনাগতশ্চানুমেয়ঃ। ততশ্চ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসাজ্ জ্ঞাননিষ্ঠায়ামাত্যন্তিকসংসারোপরম ইতি সিদ্ধম্।

ভাষ্যানুবাদ।—(নৈয়ায়িকগণ) যে বলিয়া থাকেন, আত্মা নিজেরই জ্ঞান ইচ্ছা এবং প্রযত্ন এই তিনটী গুণের দ্বারা বাস্তবিককর্ত্তা হইয়া থাকে; এই মতটীও সঙ্গত নহে। আত্মার যে গুণ কয়টীর উল্লেখ তাঁহারা করিয়া থাকেন, ঐ তিনটী গুণও মিথ্যা প্রত্যয়ের ফল। কারণ, মিথ্যাপ্রত্যয় বশতঃ কোন একটী বস্তুকে ইষ্ট বলিয়া বোধ করা অথবা কোন একটী বস্তুকে অনিষ্ট বলিয়া বোধ করাই আমাদের যাবতীয় জ্ঞানপূর্ব্বক কার্য্যের হেতু হইয়া থাকে এবং সেই কার্য্যের ফল স্বরূপ যে সংস্কার প্রসূত হয়, তাহাই হইল আমাদের জ্ঞান ইচ্ছা এবং প্রযত্নের কারণ (মিথ্যা জ্ঞান জন্য সংস্কার না থাকিলে আমাদের সাংসারিক কোন জ্ঞান ইচ্ছা বা প্রযত্ন হইতেই পারে না) যেমন এই জন্মে দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে অভিমান বশতঃ রাগ বা দ্বেষ হয় এবং রাগ দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে যথাসম্ভব ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম উৎপন্ন হয় এবং তাহার ফলও অনুভব করিতে হয়; সেইরূপ অতীত ও অতীততর জন্মেও এইরূপ অবিদ্যানিবন্ধনই সংসার ভোগ করিতে হয়, ভবিষ্যৎ জন্মেও এই প্রকারই হইবে, তাহা অনুমান দ্বারা বুঝা যায়। তাহাই যদি হইল, তবে ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে, সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস পূর্ব্বক যে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা তাহা হইলেই সংসারের উপরতি হয় এবং ঐ উপরতি বা নিবৃত্তি যে আত্যন্তিক, তাহাও সিদ্ধ হইল।

ভাষ্য।—অবিদ্যাত্মকত্বাচ্চ দেহাভিমানস্য তন্নিবৃত্তৌ দেহানুপপত্তেঃ সংসারানুপপত্তিঃ। দেহাদিসংঘাতে আত্মাভিমানঃ অবিদ্যাত্মকঃ। ন হি লোকে গবাদিভ্যোঽন্যোঽহং মত্তশ্চান্যে গবাদয়ইতি জানন্ তেষু অহমিতি প্রত্যয়ং করোতি কশ্চিৎ। অজানন্ তু স্থাণৌ পুরুষবিজ্ঞানবদ্ অবিবেকতো দেহাদিসংঘাতে কুর্য্যাদহমিতি প্রত্যয়ং ন বিবেকতো জানন্। যস্তু আত্মা বৈ পুত্রনামাসীতি পুত্রেঽহংপ্রত্যয়ঃ স তু জন্যজনকসম্বন্ধনিমিত্তো গৌণঃ গৌণেন চাত্মনা ভোজনাদিবৎ পরমার্থকার্য্যং ন শক্যতে কর্ত্তুং গৌণসিংহাগ্নিভ্যাং মুখ্যসিংহাগ্নিকার্য্যবৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—দেহাভিমানই অবিদ্যা, সেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে দেহও অনুপপন্ন হয়, দেহ অনুপপন্ন হইলে তন্মূলক সংসারও অনুপপন্ন হইয়া থাকে। দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে যে আত্মাভিমান তাহাই অবিদ্যা। লোকসমাজে যাহার এইরূপ জ্ঞান আছে, আমি গোপ্রভৃতি হইতে ভিন্ন এবং গোপ্রভৃতিও আমা হইতে ভিন্ন, সে কখনও গোপ্রভৃতিতে আমি এই প্রকার জ্ঞান করিতে পারে না। যাহার ঐরূপ ভেদজ্ঞান নাই, তাহারই অবিবেকবশতঃ স্থাণুতে পুরুষবুদ্ধির ন্যায় দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আমি এই প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে। যাহার বিবেকজ্ঞান আছে, তাহার এই প্রকার অভিমান কখনও হয় না। শাস্ত্রে যে প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় যে, আত্মাই পুত্রনামা হইয়াছে এবং এই প্রয়োগানুসারে পুত্রাদিতে যে আত্মপ্রত্যয় হয়, তাহাও গৌণ পুত্রের সহিত পিতার জন্যজনকভাবরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই (এই প্রকার গৌণ প্রত্যয়) হইয়া থাকে। গৌণ আত্মা প্রকৃত আত্মার হইয়া পরমার্থতঃ ভোজনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে না, গৌণ সিংহ বা গৌণ অগ্নি যেমন প্রকৃত সিংহ ও প্রকৃত অগ্নির কার্য্য করিতে পারে না।

ভাষ্য।—অদৃষ্টবিষয়চোদনাপ্রামাণ্যাৎ আত্মকর্ত্তব্যং গৌণৈর্দেহেন্দ্রিয়াত্মভিঃ ক্রিয়তে ইতি চেন্ন অবিদ্যাকৃতাত্মকত্বাৎ তেষাং ন গৌণা আত্মানো দেহেন্দ্রিয়াদয়ঃ। কথং তর্হি মিথ্যাপ্রত্যয়েনৈব অসঙ্গস্যাত্মনঃ সংগত্যা আত্মত্বমাপদ্যতে? তদ্ভাবে ভাবাৎ তদভাবে চাভাবাৎ অবিবেকিনাং হি অজ্ঞানকালে বালানাং দৃশ্যতে দীর্ঘোঽহং গৌরোঽহং ইতি দেহাদিসংঘাতেঽহংপ্রত্যয়ঃ। ন তু বিবেকিনাং অন্যোঽহং দেহাদিসংঘাতাৎ ইতি বিজ্ঞানবতাং তৎকালে দেহাদিসংঘাতে অহং-প্রত্যয়ো ভবতি। তস্মান্মিথ্যাপ্রত্যয়াভাবেঽভাবাৎ তৎকৃত এব ন গৌণঃ। পৃথগ্‌গৃহ্যমাণবিশেষসামান্যয়োর্হি সিংহদেবদত্তয়োঃ অগ্নিমাণবকয়োর্বা গৌণ-প্রত্যয়ঃ শব্দপ্রয়োগো বা নাগৃহ্যমাণসামান্যবিশেষয়োঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি বল "যাগ করিলে অদৃষ্ট হয়," এইরূপ শাস্ত্রই ত প্রমাণ এবং এই প্রমাণের দ্বারা পরম্পরায় ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি গৌণ আত্মার দ্বারা যথার্থ আত্মার কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, এই প্রকার বলাও সঙ্গত নহে, কারণ, ঐ দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে যে আত্ম-প্রত্যয় হয়, তাহা ভ্রান্তিমাত্র এবং দেহ প্রভৃতিও সেই ভ্রান্তির কার্য্য (ছাড়া আর কিছুই নহে) দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি গৌণ আত্মা নহে। কি তবে?

আত্মা বাস্তবিক অসঙ্গ হইলেও মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ তাহার সহিত দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির যে সঙ্গতি হয়, সেই সঙ্গতিই দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মভাবের আরোপ করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যে পর্য্যন্ত অবিদ্যা বা ভ্রান্তি বিদ্যমান থাকে, সেই পর্য্যন্তই দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মত্ব আরোপিত হয়। আবার যখন সেই অবিদ্যা বা ভ্রান্তি বিনাশ পায়, তখনই দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মভাবের আরোপও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। যাহারা জ্ঞান-হীন অর্থাৎ অবিবেকী, তাহাদের অজ্ঞানাবস্থায় আমি দীর্ঘ আমি গৌর এইরূপে দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মভাবের আরোপ হইয়া থাকে। আমি দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে ভিন্ন এই প্রকার বিবেকজ্ঞান যাহাদের আছে, তাহাদের এই প্রকার জ্ঞানকালে কখনই দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে "আমি" এইরূপ প্রত্যয় হইতেই পারে না। সেই কারণে (ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে) মিথ্যা প্রত্যয়ের অভাব হইলে থাকেনা বলিয়া দেহাদিতে অহংপ্রত্যয় মিথ্যা প্রত্যয়েরই কার্য্য, ইহা গৌণ আত্মপ্রত্যয় হইতে পারে না। সিংহ ও দেবদত্ত অথবা অগ্নি ও মাণবক ইহারা পরস্পর পরস্পর হইতে পৃথক্, সামান্য ভাবে বা বিশেষ ভাবে ইহারা কেহই কাহা হইতে অভিন্ন নহে, এই প্রকার জ্ঞানকালেই সিংহ ও দেবদত্তের অথবা অগ্নি ও মাণবকের মধ্যে গৌণ প্রত্যয় বা গৌণ শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যখন সামান্য ও বিশেষ ভাবে ভেদপ্রত্যয় বিদ্যমান থাকে না, তখন সিংহই দেবদত্ত অগ্নিই মাণবক, এইরূপ গৌণ প্রত্যয় হইতেই পারে না।

ভাষ্য।—যদুক্তং শ্রুতিপ্রামাণ্যাদিতি ন তৎপ্রামাণ্যস্য অদৃষ্টবিষয়ত্বাৎ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণানুপলব্ধে হি বিষয়ে অগ্নিহোত্রাদিসাধ্যসাধনসম্বন্ধে শ্রুতেঃ প্রামাণ্যং ন প্রত্যক্ষাদিবিষয়ে অদৃষ্টদর্শনার্থত্বাৎ প্রামাণ্যস্য। তস্মান্ন দৃষ্টমিথ্যা-জ্ঞাননিমিত্তস্য অহংপ্রত্যয়স্য দেহাদিসংঘাতে গৌণত্বং কল্পয়িতুং শক্যং। ন হি শ্রুতিশতমপি শীতোঽগ্নিরপ্রকাশো বা ব্রুবৎ প্রামাণ্যমুপৈতি। যদি ব্রূয়াৎ শীতোঽগ্নিরপ্রকাশো বেতি তথাপ্যর্থান্তরং শ্রুতের্বিবক্ষিতং কল্প্যং, প্রামাণ্যান্যথানুপপত্তেঃ ন তু প্রমাণবিরুদ্ধং স্ববচনবিরুদ্ধং বা। কর্ম্মণো মিথ্যা-প্রত্যয়বৎকর্ত্তৃকত্বাৎ কর্ত্তৃত্বাভাবে শ্রুতেরপ্রামাণ্যমিতি চেৎ। ন ব্রহ্মবিদ্যায়া-মর্থবত্ত্বোপপত্তেঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে যে বলিয়াছিলে, শ্রুতির প্রামাণ্য বশতঃ (দেহাদিতে যে আত্মপ্রত্যয় তাহা গৌণ ইহা) সিদ্ধ হইতেছে, তাহাও হইতে পারেনা,

কারণ, শ্রুতির প্রামাণ্য অদৃষ্ট বিষয়েই অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। যাহা প্রত্যক্ষাদি (লৌকিক) প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহাই শ্রুতিরূপ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। অগ্নিহোত্র যাগ কারণ, স্বর্গ কার্য্য; এই-প্রকার কার্য্য কারণ ভাবরূপ সম্বন্ধকে কোন প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণ সিদ্ধ করিতে পারে না, সুতরাং ইহাকে শ্রুতিরূপ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ করা যায়। যাহা আমাদের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইযা থাকে, তাহা ছাড়া অন্য কোন বিষয়কে সিদ্ধ করিতে পারিলেই শ্রুতির প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। সেই কারণে (ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে যে) প্রত্যক্ষতঃ যখন দেখিতেছি যে, দেহাদিতে যে অহংপ্রত্যয় তাহা মিথ্যাজ্ঞানমূলক, তখন (তাহার সহিত বিরোধ করিয়া) শ্রুতি কিছুতেই প্রতিপাদন করিতে পারে না যে, এই দেহাদিতে অহংপ্রত্যয় মিথ্যা নহে কিন্তু ইহা গৌণ। কারণ, একশত শ্রুতি মিলিয়া যদি বলে, অগ্নি শীতল বা অপ্রকাশ, তাহা হইলে কেহই এ শ্রুতিশতের প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিবে না। যদি কোন স্থলে "অগ্নি শীতল বা অপ্রকাশ" এই প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিরুদ্ধ অর্থ শ্রুতিতে উল্লিখিত থাকে, তাহা হইলে ঐ শ্রুতির অন্য কোন লাক্ষণিক অর্থ বিবক্ষিত আছে, ইহা মানিতেই হইবে; কারণ, এই প্রকার না মানিলে ঐ শ্রুতির প্রামাণ্যই অনুপপন্ন হয। প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ বা স্ববচনবিরুদ্ধ অর্থ কথনই শ্রুতি দ্বারা প্রতিপাদিত হইতে পারে না। মিথ্যাপ্রত্যয়যুক্ত ব্যক্তিই যদি কর্ম্মের কর্ত্তা হয, তাহা হইলে বাস্তবিক কর্ত্তা কেহই রহিল না সুতরাং কর্ত্তৃপ্রভৃতির প্রতিপাদক যে বেদভাগ তাহা ত অপ্রমাণ হইয়া পড়িল, এই প্রকার যদি কেহ শঙ্কা করে (তাহার উত্তর এই যে) এইরূপ শঙ্কাও টিকিতে পারে না। কারণ, ব্রহ্মবিদ্যারূপ বিষয়কে ধরিয়াই শ্রুতির প্রামাণ্য উপপন্ন হইতে পারে।

ভাষ্য।—কর্ম্মবিধিশ্রুতিবদ্ ব্রহ্মবিদ্যাবিধিশ্রুতেরপ্রামাণ্যমিতি চেৎ ন বাধকপ্রত্যয়ানুপপত্তেঃ। যথা ব্রহ্মবিদ্যাবিধিশ্রুত্যা আত্মনি অবগতে দেহাদিসঙ্ঘাতে অহংপ্রত্যয়ো বাধ্যতে, তথা আত্মনি এব আত্মাবগতির্ন কদাচিৎ কেনচিৎ কথঞ্চিদপি বাধিতুং শক্যা। ফলাব্যতিরেকাবগতেঃ যথা অগ্নিরুষ্ণঃ প্রকাশশ্চেতি। ন চ কর্ম্মবিধিশ্রুতেরপ্রামাণ্যং পূর্ব্বপূর্ব্বপ্রবৃত্তিনিরোধেন উত্তরোত্তরাপূর্ব্বপ্রবৃত্তিজননস্য প্রত্যগাত্মাভিমুখ্যপ্রবৃত্ত্যুৎপাদনার্থত্বাৎ। মিথ্যাত্বেঽপি উপায়স্য উপেয়সত্যতয়া সত্যত্বমেব স্যাৎ যথা অর্থবাদানাং বিধিশেষাণাং। লোকেঽপি বালোন্মত্তাদীনাং পয় আদৌ পায়য়িতব্যে চূড়াবর্দ্ধনাদিবচনং। প্রকারান্তর-

স্থানাং চ সাক্ষাদেব প্রামাণ্যসিদ্ধিঃ প্রাগাত্মজ্ঞানাৎ দেহাভিমাননিমিত্ত-প্রত্যক্ষাদিপ্রামাণ্যবৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—কর্ম্মবিদ্যাবিধায়ক বেদভাগের ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যাবিধায়ক বেদভাগেরও অপ্রামাণ্য প্রসক্ত হইতেছে, এই প্রকার শঙ্কাও হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্মবিদ্যার বিধায়ক বেদভাগের বাধক কোন প্রকার জ্ঞান দৃষ্ট হয় না। ব্রহ্মবিদ্যার বিধায়ক শ্রুতির সাহায্যে আত্মার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইলে, যেমন দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে অহংপ্রত্যয় (আমি এই প্রকার জ্ঞান) বাধিত হয়, সেইরূপ উপনিষদ্‌বাক্যসমূহের দ্বারা যথার্থ আত্মাকে আত্মা বলিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন, সেই জ্ঞানকে কেহ কোন কালে কোন রূপে বাধিত করিতে পারে, এইরূপ হইতেই পারে না। কারণ প্রকৃত আত্মাকে আত্মা বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহার ফল কখনই ব্যভিচারি হয় না, যেমন অগ্নি উষ্ণ ও প্রকাশ এই প্রকার যথার্থ অগ্নির অনুভব। (আরও দেখিতে হইবে যে) কর্ম্মবিদ্যার বিধায়ক বেদভাগ যে একেবারেই প্রমাণ নহে, তাহা নহে। কারণ, ঐ কর্ম্মবিদ্যার প্রতিপাদক বেদভাগ (মানবের স্বভাবজাত বাহ্যবিষয়ক) পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবৃত্তিকে নিরোধ করে এবং সেই সঙ্গে উত্তরোত্তর অপূর্ব্ব অর্থে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া (এইরূপ ক্রমে) বাহ্য বিষয় হইতে আন্তর বিষয়ে প্রবৃত্তির উৎপাদন দ্বারা সেই প্রত্যক্ (অর্থাৎ পরম) আত্মা বিষয়ে আমাদের প্রবৃত্তি যাহাতে অভিমুখ হয়, তাহাই করিয়া দেয়। এই প্রকার উপায় শেষে মিথ্যা হইলেও ইহার ফল যেহেতু মিথ্যা নহে, সেই কারণে ইহাকেও সত্য বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। কর্ম্মকাণ্ডের প্রামাণ্য যাঁহারা অঙ্গীকার করেন, তাঁহারাও ইহা মানিয়া থাকেন যে, অর্থবাদবাক্যসমূহ স্বয়ং প্রমাণ না হইলেও কোন প্রকারে বিধিবোধিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানের অনুকূল অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে বলিয়া প্রমাণের মধ্যেই পরিগণিত হইয়া থাকে। লোকমধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বালক বা উন্মত্তকে দুগ্ধ প্রভৃতি পান করাইতে হইলে বলিতে হয় যে, ইহা খাইলে তোমার চূড়াটী বড় হইবে। আত্মজ্ঞানের উদয় যে পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ সকল কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদভাগের ('ব্যাবহারিক বিষয়ে) প্রামাণ্য ত সিদ্ধই আছে। যেমন আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবার পূর্ব্বে দেহপ্রভৃতিতে আত্মাভিমানের ফলস্বরূপ যে প্রত্যক্ষ অনুমান

প্রভৃতি, তাহা সকলের নিকটই প্রমাণ বলিয়াই অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে (সেইরূপ প্রকৃত আত্মজ্ঞানের পূর্ব্বে কর্ম্মকাণ্ডেরও প্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে।)

ভাষ্য।—যত্তু মন্যসে স্বয়মব্যাপ্রিয়মাণোঽপ্যাত্মা সন্নিধিমাত্রেণ করোতি তদেব চ মুখ্যং কর্তৃত্বমাত্মনঃ। যথা রাজা যুধ্যমানেষু যোধেষু যুধ্যতে ইতি প্রসিদ্ধং স্বয়মযুধ্যমানোঽপি সন্নিধানাদেব জিতঃ পরাজিতশ্চেতি চ। তথা সেনাপতির্বাচৈব করোতি ক্রিয়াফলসম্বন্ধশ্চ রাজ্ঞঃ সেনাপতেশ্চ দৃষ্টঃ। যথা ঋত্বিক্‌কর্ম্ম যজমানস্য। তথা দেহাদীনাং কর্ম্ম আত্মকৃতং স্যাৎ তৎফলস্যাত্মগামিত্বাৎ। যথা ভ্রামকস্য লোহভ্রাময়িতৃত্বাৎ অব্যাপৃতস্যৈব মুখ্যমেব কর্তৃত্বং তথা চাত্মন ইতি। তদসৎ, অকুর্ব্বতঃ কারকত্বপ্রসঙ্গাৎ। কারকমনেকপ্রকারমিতি চেৎ। ন রাজপ্রভৃতীনাং মুখ্যস্যাপি কর্তৃত্বস্য দর্শনাৎ। রাজা তাবৎ স্বব্যাপারেণ যুধ্যতে যোধয়িতৃত্বেন ধনদানেন চ মুখ্যমেব কর্তৃত্বং, তথা জয়পরাজয়ফলোপভোগে। তথা যজমানস্যাপি প্রধানত্যাগেন দক্ষিণাদানেন মুখ্যমেব কর্তৃত্বং। তস্মাৎ অব্যাপৃতস্য কর্তৃত্বোপচারো যঃ স গৌণ ইত্যবগম্যতে। যদি মুখ্যং কর্তৃত্বং স্বব্যাপারলক্ষণং নোপলভ্যতে রাজযজমানপ্রভৃতীনাং তদা সন্নিধিমাত্রেণাপি কর্তৃত্বং মুখ্যং পরিকল্প্যেত। যথা ভ্রামকস্য লোহভ্রামণেন ন তথা রাজযজমানাদীনাং স্বব্যাপারো নোপলভ্যতে। তস্মাৎ সন্নিধিমাত্রেণাপি কর্তৃত্বং গৌণমেব। তথা চ সতি তৎফলসম্বন্ধোঽপি গৌণ এব স্যাৎ। ন গৌণেন মুখ্যং কার্য্যং নির্ব্বর্ত্ত্যতে। তস্মাদসদেব এতদ্‌গীয়তে দেহাদীনাং ব্যাপারেণ অব্যাপৃত আত্মা কর্ত্তা ভোক্তা চ স্যাদিতি। ভ্রান্তি-নিমিত্তং তু সর্ব্বমুপপদ্যতে। যথা স্বপ্নে মায়ায়াং চৈবং। ন চ দেহাদ্যর্থ-প্রত্যয়ভ্রান্তিসন্তানবিচ্ছেদেষু সুষুপ্তিসমাধ্যাদিষু কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যনর্থ উপলভ্যতে তস্মাদ্ ভ্রান্তিপ্রত্যয়নিমিত্ত এবায়ং সংসারভ্রমঃ ন তু পরমার্থ ইতি সম্যগ্‌দর্শনা-দত্যন্তোপরম ইতি সিদ্ধম্। ৬৬।

ভাষ্যানুবাদ।—আরও তুমি মানিয়া থাক যে, আত্মা নিজে সর্ব্ব প্রকার ব্যাপাররহিত হইলেও সন্নিধানে আছে বলিয়া উঁহাকে কর্ত্তা বলা যায়, এই সন্নিধানে অবস্থিতিই তাহার মুখ্য কর্তৃত্ব; যেমন সেনাগণই যুদ্ধ করিয়া থাকে, কিন্তু সন্নিধানবশতঃ লোকে বলিয়া থাকে যে, রাজা যুদ্ধ করিতেছেন, তিনি নিজে যুদ্ধ না করিলেও সন্নিধানবশতঃ জয়ী হইলেন বা পরাজিত হইলেন এই প্রকারও লোকে বলিয়া থাকে। এইরূপ সেনাপতি কেবল যুদ্ধ করিতে আদেশ মাত্র দিয়া থাকেন, তথাপি যুদ্ধক্রিয়ার যে ফল জয় বা

পরাজয় তাহা রাজা বা সেনাপতিরই হয়, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ পুরোহিত যাগ প্রভৃতি করিলেও তাহার ফল যে অদৃষ্ট তাহা যজমানেরই হইয়া থাকে। সেইরূপ দেহাদির কর্ম্মও আত্মকৃত হইতে পারে, কারণ, ঐ কর্ম্মের যে ফল তাহা ত আত্মারই হইয়া থাকে। (নিজের কোন প্রকার ব্যাপার না থাকিলে সন্নিধানবশতঃ অপরের ব্যাপারকে উৎপাদন করে, এমন দৃষ্টান্তও দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন চুম্বক স্বয়ং কোন প্রকার ব্যাপারের আশ্রয় না হইয়াও নিজের সন্নিধানের দ্বারা লৌহের পরিভ্রামক হয় বলিয়া তাহার মুখ্য কর্ত্তৃত্ব অঙ্গীকার করা যায় (প্রকৃত স্থলেও সেইরূপ হইতে পারে অর্থাৎ) সেই আত্মার কোন প্রকার ব্যাপার না থাকিলেও সন্নিধান-বশতঃ তাহার মুখ্য কর্ত্তৃত্ব হইতে পারে। এই প্রকার সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে যে কিছুই করে না, তাহাকেও কারক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়। যদি বল কারক ত নানা প্রকার, তাহাও ঠিক নহে (যে করে সেই কর্ত্তৃকারক হইতে পারে, যে করে না, সে কারক হইতেই পারে না, সুতরাং কারক নানা প্রকার নহে, উহা এক প্রকারেরই হয় যেমন) রাজা বা সেনাপতির যে কর্ত্তৃত্ব, তাহা মুখ্যই হইয়া থাকে, ইহা সম্ভব। যুদ্ধে রাজার নিজেরও ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়, হয় তিনি যুদ্ধ করিবার জন্য স্বয়ং আদেশ করেন, কিম্বা ধন প্রদান করেন। সুতরাং যুদ্ধে তাঁহার মুখ্য কর্ত্তৃত্বই সম্ভবপর। সুতরাং জয় বা পরাজয় রূপ যুদ্ধের যে ফল, তাহা তিনি স্বয়ংই ভোগ করিয়া থাকেন। সেইরূপ যজমানও যাগের জন্য প্রধান যে দ্রব্য তাহা ত্যাগ করেন এবং পুরোহিতগণকে দক্ষিণাও দিয়া থাকেন সুতরাং তাঁহারও কর্ত্তৃত্ব মুখ্যই হইয়া থাকে। তবেই দাঁড়াইতেছে যে, নিজে যে ব্যাপৃত নহে, তাহার মুখ্য কর্ত্তৃত্ব সম্ভবপর নহে, তাহার কর্ত্তৃত্ব গৌণ। যদি রাজা ও যজমানের চুম্বকের ন্যায় একেবারে নিজের কোন ব্যাপার দেখিতে পাওয়া না যাইত, তাহা হইলে তাহাদের সন্নিধান বশতঃই মুখ্য কর্ত্তৃত্ব অঙ্গীকার করা যাইত। বাস্তবিক কিন্তু সেই রূপ কল্পনা করা যায় না; কারণ, রাজা বা যজমানাদির যে নিজের কোন প্রকার ব্যাপার হয়না, তাহা ত নহে। সেই কারণে (বলিতে হইবে) যে সন্নিধান মাত্রই যে কর্ত্তৃত্ব তাহা (মুখ্যকর্ত্তৃত্ব নহে) কিন্তু গৌণ কর্ত্তৃত্ব। গৌণ কর্ত্তার ফল সম্বন্ধও গৌণই হইয়া থাকে। গৌণ কখন মুখ্য কার্য্য করিতে পারেনা। সেই কারণে (বলিতে হইতেছে) সাংখ্যাচার্য্যগণ যে বলিয়া থাকেন যে, দেহাদির ব্যাপার বশতঃ আত্মা স্বয়ং ব্যাপাররহিত হইয়াও

কর্ত্তা এবং ভোক্তা হইতে পারে, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। এই রূপ ভ্রম হইয়া থাকে, এই প্রকার মানিয়া লইলে কিন্তু, সর্ব্বপ্রকারে উপপত্তি হইতে পারে। যেমন স্বপ্নাবস্থায় কিম্বা ঐন্দ্রজালিকের মায়ায় ভ্রান্তিমূলক সকল ব্যবহার হইয়া থাকে (প্রকৃত স্থলেও সেই রূপ হইয়া থাকে)। আরও দেখিতে হইবে যে, সুষুপ্তি বা সমাধির সময় আমাদের দেহাদিতে আত্মপ্রত্যয়রূপ ভ্রান্তিধারার বিচ্ছেদ হয় এবং সেই বিচ্ছেদদশায় আমাদের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি সংসার রূপ অনর্থও উপলব্ধ হয় না। সেই কারণে ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে, এই সংসারভ্রম ভ্রান্তি-প্রত্যয়মূলক; সম্যক্ জ্ঞানের উদয় হইলেই, ইহার আত্যন্তিক উচ্ছেদ হইয়া থাকে। ৬৬।

ইদং তে নাঽতপস্কায় নাঽভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়। অতপস্কায় ইদং তে কদাচন ন বাচ্যং তথা ন অভক্তায় (বাচ্যং) ন চ অশুশ্রূষবে (বাচ্যং) যঃ চ মাং অভ্যসূয়তি তস্মৈ অপি ন (বাচ্যং)। ৬৭।

মূলানুবাদ। যে তপস্বী নহে, যে ভক্ত নহে, ও যে আমার সেবক নহে, তাহাকে এই বিষয়ের উপদেশ তুমি দিওনা, যে ব্যক্তি আমার প্রতি অসূয়া করে, তাহাকেও কখনও তুমি এই বিষয়ে উপদেশ দিও না। ৬৭।

ভাষ্য। সর্ব্বং গীতাশাস্ত্রার্থমুপসংহৃত্য অস্মিন্ অধ্যায়ে বিশেষতশ্চান্তে ইহ-শাস্ত্রার্থদার্ঢ্যায় সংক্ষেপত উপসংহারং কৃত্বা অথেদানীং শাস্ত্রসম্প্রদায়বিধি-মাহ। ইদং শাস্ত্রং তে তব হিতায় ময়োক্তং সংসারবিচ্ছিত্তয়ে, অতপস্কায় তপোরহিতায়, ন বাচ্যং ইতি ব্যবহিতেন সম্বধ্যতে। তপস্বিনেঽপি অভক্তায় দেবভক্তিরহিতায় কদাচন কস্যাংচিদপ্যবস্থায়াং ন বাচ্যং। ভক্তঃ তপস্বী অপি সন্নশুশ্রূষুর্যোভবতি তস্মৈ অপি ন বাচ্যং। ন চ যো মাং বাসুদেবং প্রাকৃতং মনুষ্যং মত্বা অভ্যসূয়তি আত্মপ্রশংসাদিদোষাধ্যারোপনেন মমেশ্বরত্বমজানন্ ন সহতে, অসাবপি অযোগ্যস্তস্মৈ অপি ন বাচ্যং। ভগবতি ভক্তায় তপস্বিনে শুশ্রূষবে অনসূয়বে চ বাচ্যং শাস্ত্রং ইতি সামর্থ্যাদবগম্যতে। তত্র মেধা-বিনে তপস্বিনে বেত্যনয়োর্বিকল্পদর্শনাৎ শুশ্রূষাভক্তিযুক্তায় তপস্বিনে তদ্-যুক্তায় মেধাবিনে বা বাচ্যং। শুশ্রূষাভক্তিবিযুক্তায় ন তপস্বিনে নাপি মেধাবিনে বাচ্যং। ভগবতি অসূয়াযুক্তায় সমস্তগুণবতেঽপি ন বাচ্যং। গুরুশুশ্রূষা-ভক্তিমতে চ বাচ্যং, ইত্যেষ শাস্ত্রসম্প্রদায়বিধিঃ। ৬৭।

ভাষ্যানুবাদ। এই অধ্যায়ে সামান্যভাবে গীতাশাস্ত্রার্থের উপসংহার করিয়া, এইখানে অধ্যায়ের অন্তে শাস্ত্রার্থের দৃঢ়তা রক্ষা করিবার জন্য সংক্ষেপতঃ আবার বিশেষভাবে উপসংহার করিয়া, এইক্ষণে কি ভাবে শাস্ত্রসম্প্রদায় রক্ষিত হইবে, তাহারই বিধি বলিতেছেন। এই যে শাস্ত্র—তোমার সংসার বিচ্ছেদরূপ মঙ্গলের জন্য যাহা আমি বলিলাম, তাহা "অতপস্কায়" তপস্যারহিত ব্যক্তিকে বলিও না (এই দূরস্থিত পদের সহিত ইহার অন্বয় করিতে হইবে) তপস্বী অথচ যাহার ভক্তি নাই, তাহাকেও "কদাচন" কোনপ্রকার অবস্থায়ও বলিও না। ভক্ত এবং তপস্বী হইয়াও যে শুশ্রূষু নহে, তাহাকেও বলিও না। যে ব্যক্তি আমাকে বসুদেবের পুত্র ও প্রাকৃত মনুষ্য বিবেচনা করিয়া আমার প্রতি অসূয়া করে অর্থাৎ এই গীতাশাস্ত্রে আমার নিজ মুখ হইতে আমার নিজেরই প্রশংসা প্রভৃতিকে দোষ বলিয়া বিবেচনা করিয়া যে ব্যক্তি আমাকে অজ্ঞানবশতঃ ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহে না, তাহাকেও বলিও না ; কারণ, সে ব্যক্তি এই শাস্ত্রশ্রবণে যোগ্য নহে। ইহা দ্বারা অর্থতঃ ইহা বুঝান হইতেছে যে, যাহার ভগবানে ভক্তি আছে, যে তপস্বী এবং শুশ্রূষাপর এবং যে অসূয়ারহিত তাহাকেই বলিও। (শাস্ত্রান্তরে) মেধাবী ও তপস্বীর মধ্যে বিকল্প দেখিতে পাওয়া যায় (অর্থাৎ মেধাবিত্ব এবং তপস্বিত্ব এই দুইটী গুণই যে আবশ্যক, তাহা নহে ; এই দুইটীর মধ্যে একটী থাকিলেও এই শাস্ত্র শ্রবণে অধিকারী হইতে পারা যায়।) সুতরাং এই শ্লোকের এই প্রকার তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে হইবে যে, শুশ্রূষা ও ভক্তিযুক্ত তপস্বী কিম্বা শুশ্রূষা ও ভক্তিযুক্ত মেধাবীকে বলিবে। যাহার শুশ্রূষা এবং ভক্তি নাই, সে তপস্বীই হউক বা মেধাবীই হউক, তাহাকে বলিবে না। ভগবানের প্রতি যে ব্যক্তি অসূয়া করে, তাহার আর সকলগুণ থাকিলেও তাহাকে বলিবে না। যে গুরুশুশ্রূষু এবং গুরুভক্ত, তাহাকেও বলিবে, ইহাই হইল শাস্ত্রসম্প্রদায় বিধি। ৬৭।

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্‌ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়। যঃ ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বা মদ্‌ভক্তেষু ইমং পরমং গুহ্যং (শাস্ত্রার্থং) অভিধাস্যতি (সঃ) অসংশয়ঃ (সন্) মাং এব এষ্যতি। ৬৮।

মূলানুবাদ। আমার প্রতি ভক্তি করিয়া মদ্‌ভক্তগণের নিকট যে ব্যক্তি এই পরম গুহ্য বিষয়ের উপদেশ করিবে, তাহার সর্ব্বপ্রকার সংশয় মিটিয়া যাইবে এবং সে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। ৬৮।

ভাষ্য। সম্প্রদায়স্য কর্ত্তুঃ ফলমিদানীমাহ। য ইমং যথোক্তং পরমং নিঃশ্রেয়সার্থং কেশবার্জ্জুনয়োঃ সম্বাদরূপং গ্রন্থং গুহ্যং গোপ্যং মদ্ভক্তেষু মযি ভক্তিমৎসু অভিধাস্যতি বক্ষ্যতি গ্রন্থতঃ অর্থতশ্চ স্থাপয়িষ্যতি ইত্যর্থঃ। যথা ত্বয়ি ময়া। ভক্তেঃ পুনর্গ্রহণাৎ ভক্তিমাত্রেণ কেবলেন শাস্ত্রসম্প্রদানে পাত্রং ভবতি ইতি গম্যতে। কথমভিধাস্যতি ইত্যুচ্যতে ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা ভগবতঃ পরমগুরোঃ শুশ্রূষা ময়া ক্রিয়তে ইত্যেবং কৃত্বা ইত্যর্থঃ। তস্যেদং ফলং মাং এব এষ্যতি মুচ্যত এব অত্র ন সংশয়ঃ কর্ত্তব্যঃ। ৬৮।

ভাষ্যানুবাদ। এক্ষণে সম্প্রদায়কর্ত্তার কি ফল লাভ হইবে, তাহাই বলিতেছেন। আমি তোমাকে যাহা বলিলাম, সেই এই "পরম" নিঃশ্রেয়সকর "গুহ্য" গোপনীয় কেশব ও অর্জ্জুনের সংবাদরূপ গ্রন্থের উপদেশ আমার ভক্তগণের নিকটে করিবে অর্থাৎ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইবে অথবা ইহার ব্যাখ্যা করিয়া অর্থ শুনাইবে, যেমন আমি তোমার নিকটে করিলাম। এই খানে পুনর্ব্বার ভক্তির নাম করায় ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, অন্য কোন গুণ না থাকিলেও যাহার ভক্তি আছে, সেই এই গ্রন্থ শুনিতে অধিকারী হইয়া থাকে। কি প্রকারে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বা ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইবে? আমাতে ভক্তি করিয়া, অর্থাৎ এইরূপ কার্য্যের দ্বারা সেই পরম গুরু ভগবানেরই আমি শুশ্রূষা করিতেছি, এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া, ইহাই অর্থ। তাহার ইহাই ফল—সে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ (সংসার দুঃখ হইতে) মুক্তি লাভ করিবে, এই বিষয়ে কোন প্রকার সংশয় করা উচিত নহে। ৬৮।

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়। মনুষ্যেষু তস্মাৎ কশ্চিৎ মে প্রিয়কৃত্তমো ন অস্তি ন চ কশ্চিৎ তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরঃ ভুবি ভবিতা। ৬৯।

মূলানুবাদ। মনুষ্যগণের মধ্যে সেই মনুষ্য অপেক্ষা আমার প্রিয়কৃত্তম কেহই নাই এবং পৃথিবীতে সেই ব্যক্তি ভিন্ন কেহই আমার প্রিয়তরও হইবে না। ৬৯।

ভাষ্য। কিঞ্চ ন চ তস্মাৎ শাস্ত্রসম্প্রদায়কৃতঃ মনুষ্যেষু মনুষ্যাণাং মধ্যে কশ্চিন্মে মম প্রিয়কৃত্তমঃ অতিশয়েন প্রিয়কৃৎ ততোঽন্যঃ প্রিয়কৃত্তমো নাস্ত্যেব

ইষ্টঃ বর্ত্তমানেষু ন চ ভবিতা ভবিষ্যত্যপি কালে তস্মাদ্দ্বিতীয়োঽন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি লোকেঽস্মিন্। ৬৯।

ভাষ্যানুবাদ। আরও (বলি শুন) যে এই প্রকারে এই শাস্ত্রের সম্প্রদায় করিবে, সেই ব্যক্তি অপেক্ষা মনুষ্যগণের মধ্যে কোন ব্যক্তিই আমার 'প্রিয়কৃত্তম' (যে অতিশয় প্রিয় করে, তাহাকেই প্রিয়কৃত্তর কহা যায়) বিদ্যমান নাই অর্থাৎ মনুষ্যগণের মধ্যে কেহই সেই ব্যক্তি অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয় করিতে পারে না। এবং ভবিষ্যৎকালেও সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেহই আমার অতিশয় প্রিয় হইতে পারিবে না এই লোকে।

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥

অন্বয়। আবয়োঃ ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদং চ যঃ অধ্যেষ্যতে তেন জ্ঞানযজ্ঞেন অহং ইষ্টঃ স্যাং ইতি মে মতিঃ। ৭০।

মূলানুবাদ। আমাদের এই ধর্ম্মজনক সংবাদ যে ব্যক্তি অধ্যয়ন করিবে, সে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমাকে পরিতৃপ্ত করিবে, ইহাই আমার মত। ৭০।

ভাষ্য। যোঽপি অধ্যেষ্যতে চ পঠিষ্যতি চ য ইমং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং সংবাদরূপং গ্রন্থং আবয়োস্তেনেদং কৃতং স্যাৎ। জ্ঞানযজ্ঞেন বিধিজপোপাংশু-মানসানাং যজ্ঞানাং জ্ঞানযজ্ঞঃ মানসত্বাৎ বিশিষ্টতম ইত্যতস্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন গীতাশাস্ত্রস্যাধ্যয়নং স্তূয়তে। ফলবিধিরেব বা দেবতাদিবিষয়জ্ঞানযজ্ঞফল-তুল্যমস্য ফলং ভবতীতি তেন অধ্যয়নেন অহমিষ্টঃ স্যাং ভবেয়মিতি মে মতিঃ নিশ্চয়ঃ। ৭০।

ভাষ্যানুবাদ। যে ব্যক্তি অধ্যয়ন করিবে অর্থাৎ পাঠ করিবে (কি?) এই "ধর্ম্ম্য" ধর্ম্ম হইতে অনপেত (অর্থাৎ ধর্ম্মজনক) আমাদের কথোপকথনরূপ এই গ্রন্থ। সে ব্যক্তি ইহা করিবে। (কি করিবে?) সে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমার পূজা করিবে, বিধি, জপ, উপাংশু ও মানস এই কয়প্রকার যজ্ঞের মধ্যে জ্ঞানযজ্ঞ যে কারণে মানস, সেই হেতু শ্রেষ্ঠ, সুতরাং সেই জ্ঞানযজ্ঞের সমান বলিয়া গীতাশাস্ত্রের অধ্যয়নের স্তুতি করা হইতেছে। অথবা ইহা ফলবিধি, দেবতাদির উপাসনারূপ যে জ্ঞানযজ্ঞ তাহার যে ফল, এই গীতাশাস্ত্রের অধ্যয়নেরও ফল

তাহার তুল্যই হইয়া থাকে, সেই অধ্যয়নের দ্বারা আমি পুজিত হইয়া থাকি, ইহাই আমার "মতি" নিশ্চয়। ৭০।

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যোনরঃ।

সোঽপি মুক্তঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুযাৎ পুণ্যকর্ম্মণাং ॥ ৭১ ॥

অন্বয়। যো নরঃ শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়শ্চ (সন্) শৃণুয়াদপি সোঽপি মুক্তঃ পুণ্যকর্ম্মণাং শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ। ৭১।

মূলানুবাদ। যে মানব শ্রদ্ধালু এবং অসূয়ারহিত হইয়া ইহা শ্রবণ করিবে, সে পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মনিবত ব্যক্তিগণের (প্রাপ্য) মঙ্গলময় লোকসমূহকে (ভোগ করিবার জন্য) প্রাপ্ত হইবে। ৭১।

ভাষ্য। অথ শ্রোতুরিদং ফলং শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্দধান অনসূয়শ্চ অসূয়াবর্জ্জিতঃ সন্ ইমং গ্রন্থং শৃণুয়াদপি যোনরঃ অপিশব্দাৎ কিমুতার্থজ্ঞানবান্, সোঽপি পাপাৎ মুক্তঃ শুভান্ প্রশস্তান্ লোকান্ প্রাপ্নুযাৎ পুণ্যকর্ম্মণাং অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মবতাং। ৭১।

ভাষ্যানুবাদ। তাহার পর এক্ষণে শ্রোতার এই ফল হইবে—"শ্রদ্ধাবান" বিশ্বাসযুক্ত এবং 'অনসূয়' অসূয়াবর্জ্জিত হইয়া যে মনুষ্য শ্রবণও করিবে। এখানে অপি শব্দটী থাকায় এইরূপ সূচিত হইতেছে, যে ব্যক্তি শুনিয়া অর্থ বোধ করিতে পারিবে, তাহার পক্ষে আর অধিক করিয়া কি বলিব? (কি?) এই গ্রন্থ কেবল শ্রবণও করিবে, সেও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মা অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি) পুণ্যকর্ম্মনিরত ব্যক্তিগণের "শুভ" প্রশস্ত লোকসমূহকে প্রাপ্ত হইবে। ৭১।

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।

কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

অন্বয়। হে পার্থ ত্বয়া একাগ্রেণ চেতসা কচ্চিৎ এতৎ শ্রুতং? হে ধনঞ্জয়! তে অজ্ঞানসম্মোহঃ কচ্চিৎ প্রনষ্টঃ? ২৭।

মূলানুবাদ। হে পার্থ, তুমি কি একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ করিয়াছ? হে ধনঞ্জয়, তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ কি প্রনষ্ট হইয়াছে?। ৭২।

ভাষ্য। শিষ্যস্য শাস্ত্রার্থগ্রহণাগ্রহণ বিবেকবুভুৎসয়া পৃচ্ছতি। তদগ্রহণে জ্ঞাতে পুনঃ গ্রাহয়িষ্যামি উপায়ান্তরেণেতি প্রষ্টুরভিপ্রায়ঃ। যত্নান্তরমাস্থায় শিষ্যঃ কৃতার্থঃ

কর্ত্তব্য ইত্যাচার্য্যধর্ম্মঃ প্রদর্শিতো ভবতি। কচ্চিৎ কিং এতৎ যৎ ময়া উক্তং শ্রুতং শ্রবণেন অবধারিতং? পার্থ কিং ত্বয়া একাগ্রেণ চেতসা চিত্তেন কিং বা প্রমাদিতম্? কচ্চিদজ্ঞানসংমোহঃ অজ্ঞাননিমিত্তঃ সংমোহো বিচিত্তভাবঃ অবিবেকতা স্বাভাবিকঃ কিং প্রনষ্টঃ? যদর্থঃ অয়ং শাস্ত্রশ্রবণায়াসঃ তব, মম চ উপদেষ্টৃত্বায়াসঃ প্রনষ্টস্তে তব ধনঞ্জয়। ৭২।

ভাষ্যানুবাদ। শিষ্য শাস্ত্রার্থ গ্রহণ করিতে পারিলেন কিনা তাহা জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যদি না বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া আবার তাঁহাকে বুঝাইবেন, ইহাই প্রশ্নকর্ত্তার অভিপ্রায়। (একেবারে না বুঝিলে বারান্তরেও) অন্য প্রকারে প্রযত্ন করিয়া শিষ্যকে কৃতার্থ করাই আচার্য্যের ধর্ম্ম, ইহাও এই প্রশ্নের দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে। "কচ্চিৎ" এই শব্দটী কিং এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে (ইহা জিজ্ঞাসার সূচক অব্যয় শব্দ) হে পার্থ, আমি যাহা বলিলাম, তুমি একাগ্রচিত্তে তাহা শুনিয়াছ কি? অর্থাৎ শুনিয়া অবধারণ করিতে পারিয়াছ কি? তোমার "অজ্ঞানসংমোহ" অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন সংমোহ অর্থাৎ অবিবেক (কি প্রকার?) যাহা স্বাভাবিক তাহা নষ্ট হইয়াছে কি? যাহার জন্য তোমার এই শ্রবণায়াস এবং আমারও এই উপদেশায়াস তাহা সিদ্ধ হইয়াছে ত? হে ধনঞ্জয়! ৭২।

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥

অন্বয়। হে অচ্যুত ত্বৎপ্রসাদাৎ মোহঃ নষ্টঃ স্মৃতিঃ লব্ধা গতসন্দেহঃ স্থিতোঽস্মি তব বচনং করিষ্যে। ৭৩।

মূলানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত! তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে, আমি জ্ঞান লাভ করিয়াছি। আমার সন্দেহ গিয়াছে, এবং আমি স্থির হইয়াছি, আমি তোমারই কথানুসারে কার্য্য করিব। ৭৩।

ভাষ্য। নষ্টো মোহঃ অজ্ঞানজঃ সমস্তসংসারানর্থহেতুঃ সাগর ইব দুস্তরঃ। স্মৃতিশ্চ আত্মতত্ত্ববিষয়া লব্ধা। যস্যা লাভাৎ সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ। ত্বৎপ্রসাদাৎ তব প্রসাদাৎ ময়া ত্বৎপ্রসাদমাশ্রিতেন অচ্যুত। অনেন মোহনাশপ্রশ্নপ্রতিবচনেন সর্ব্বশাস্ত্রার্থজ্ঞানফলমেতাবদেবেতি নিশ্চিতং দর্শিতং ভবতি

যদুত্তাজ্ঞানসম্মোহনাশঃ, আত্মস্মৃতিলাভশ্চ ইতি। তথা চ শ্রুতৌ "অনাত্মবিচ্ছোচামী" ত্যুপক্রম্য আত্মজ্ঞানে সর্ব্বগ্রন্থিবিপ্রমোক্ষ উক্তঃ। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ 'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।" ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ। অথেদানীং ত্বচ্ছাসনে স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ মুক্তসংশয়ঃ করিষ্যে বচনং তবাহং ত্বৎপ্রসাদাৎ অহং কৃতার্থঃ ন মম কর্ত্তব্যমস্তীত্যভিপ্রায়ঃ। ৭৩।

ভাষ্যানুবাদ। মোহ নষ্ট হইয়াছে (সে মোহ কিরূপ ?) সমস্ত সংসারানর্থের হেতু এবং অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন। আত্মতত্ত্ববিষয়ের "স্মৃতি" জ্ঞানকেও পাইয়াছি। যে স্মৃতির লাভ হইলে সকল প্রকার গ্রন্থির মোচন হয়। তোমার অনুগ্রহে—তোমারই অনুগ্রহকে একমাত্র আশ্রয় করিয়া আমি (এই স্মৃতিকে লাভ করিয়াছি) হে অচ্যুত! এই মোহনাশ বিষয়ে প্রশ্নের যে উত্তর দেওয়া হইয়াছে, তাহাদ্বারা নিশ্চিতভাবে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, অজ্ঞানজ মোহের ধ্বংস এবং আত্মস্মৃতিলাভ এই দুইটীই সর্ব্বশাস্ত্রার্থজ্ঞানের পরিণাম। সেইরূপ শ্রুতিতেও দেখা যায় যে, "আমি আত্মাকে না জানিয়াই শোক করিতেছি" এই প্রকার আরম্ভ করিয়া উপসংহারেও বলা হইয়াছে যে, আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইলেই সকল প্রকার গ্রন্থির (শোকের) নাশ হয়। "হৃদয়ের গ্রন্থি ভিন্ন হয়" 'আত্মার একত্ব যে দেখিতে পায়, তাহার সেই জ্ঞানকালে শোক ও মোহ কি প্রবার?' এই প্রকার বেদমন্ত্রগুলি (ও দেখিতে পাওয়া যায়)। এইক্ষণে আমি তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য অবস্থিতি করিতেছি। আমার সন্দেহ গিয়াছে। আমি তোমার বচনই (প্রতিপালন) করিব। তোমার অনুগ্রহে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। আমার আর (অন্য) কোন কর্ত্তব্য নাই। ইহাই অভিপ্রায়। ৭৩।

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥

অন্বয়। মহাত্মনঃ বাসুদেবস্য পার্থস্য চ ইতীমং অদ্ভুতং রোমহর্ষণং সংবাদং অহং অশ্রৌষম্। ৭৪।

মূলানুবাদ। সঞ্জয় বলিলেন, মহাত্মা বাসুদেব এবং অর্জ্জুনের এই প্রকার রোমাঞ্চজনক ও বিস্ময়কর কথোপকথন আমি শ্রবণ করিয়াছি। ৭৪।

ভাষ্য। পরিসমাপ্তঃ শাস্ত্রার্থঃ। অথেদানীং কথাসম্বন্ধপ্রদর্শনার্থং ইত্যেবমহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ সংবাদং ইমং যথোক্তং অশ্রৌষং শ্রুতবান্ অস্মি। অদ্ভুতং অত্যন্তবিস্ময়করং রোমহর্ষণং রোমাঞ্চকরম্। ৭৪।

ভাষ্যানুবাদ। শাস্ত্রার্থ পরিসমাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে কথার সম্বন্ধ প্রদর্শন করাইবার জন্য (বলা হইতেছে) এই প্রকারে আমি মহাত্মা বাসুদেবের এবং অর্জ্জুনের যথোক্ত সংবাদ (কথোপকথন) শুনিয়াছি (উহা কিরূপ?) "অদ্ভুত" অত্যন্ত বিস্ময়কর, এবং "রোমহর্ষণ" রোমাঞ্চকর। ৭৪।

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবান্ এতদ্গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং ॥ ৭৫ ॥

অন্বয়। স্বয়ং কথয়তঃ যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ এতৎ পরং গুহ্যং যোগং অহং ব্যাসপ্রসাদাৎ সাক্ষাৎ শ্রুতবান্। ৭৫।

মূলানুবাদ। স্বয়ং এই প্রকার উপদেশ করিতেছিলেন যে যোগেশ্বর কৃষ্ণ তাঁহার মুখ হইতে আমি সাক্ষাৎ ব্যাসদেবের অনুগ্রহে এই পরম গোপনীয় যোগ শুনিয়াছি। ৭৫।

ভাষ্য। তং চেমং ব্যাসপ্রসাদাৎ ততো দিব্যচক্ষুর্লাভাৎ শ্রুতবান্ এতং সংবাদং যোগং যোগার্থত্বাৎ সংবাদমিমং যোগমেব বা যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং ন পরম্পরাতঃ। ৭৫।

ভাষ্যানুবাদ। সেই এই ব্যাসের অনুগ্রহে অর্থাৎ তাঁহার অনুগ্রহে দিব্য নেত্র লাভ করিয়াছি বলিয়া, এই "গুহ্য" গোপ্য "সংবাদ" কথোপকথন আমি শুনিয়াছি (এই সংবাদ কিরূপ?) "যোগ" ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় যোগ, এই কারণে ইহাকেই যোগ (বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে) অথবা ইহাই যোগ। (কাহার নিকট হইতে?) যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ বলিতেছিলেন, আমি ইহা নিজে শুনিয়াছি, পরম্পরায় শুনি নাই। ৭৫।

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥

অন্বয়। হে রাজন্ কেশবার্জ্জুনয়োঃ ইমং পুণ্যং অদ্ভুতং সংবাদং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য মুহুঃ মুহুঃ হৃষ্যামি। ৭৬।

মূলানুবাদ। হে রাজন্, কেশব ও অর্জ্জুনের এই পুণ্যজনক ও বিস্ময়কর সংবাদ বার বার স্মরণ করিয়া আমি মুহুর্মুহুঃ হর্ষপ্রাপ্ত হইতেছি। ৭৬।

ভাষ্য। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতং কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং শ্রবণাদপি পাপহরং শ্রুত্বা হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ প্রতিক্ষণং। ৭৬।

ভাষ্যানুবাদ। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! কেশব ও অর্জ্জুনের অদ্ভুত এবং পুণ্য অর্থাৎ শ্রুতিমাত্রেই পাপনাশন এই সংবাদ স্মরণ করিয়া করিয়া আমি প্রতিক্ষণ হর্ষ লাভ করিতেছি। ৭৬।

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥ ৭৭॥

অন্বয়। হে রাজন্! হরেঃ তৎ অত্যদ্ভুতং রূপং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য চ মে মহান্ বিস্ময়ো (ভবতি) (অহং) পুনঃ পুনঃ হৃষ্যামি চ। ৭৭।

মূলানুবাদ। হে রাজন্। শ্রীহরির সেই অত্যদ্ভুত রূপ স্মরণ করিতে করিতে আমার মহান্ বিস্ময় হইতেছে এবং আমি প্রতিক্ষণে হর্ষলাভ করিতেছি। ৭৭।

ভাষ্য। তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ বিশ্বরূপং বিস্ময়ো মহান্ হে রাজন্। হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ। ৭৭।

ভাষ্যানুবাদ। সেই শ্রীহরির অতিশয় বিস্ময়কর বিশ্বরূপ স্মরণ করিতে করিতে আমার মহান্ বিস্ময় হইতেছে। হে রাজন্! আমি পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হইতেছি। ৭৭।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥ ৭৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে মোক্ষসংন্যাসযোগোনাম
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ। ৮০।

অন্বয়। যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ তত্র শ্রীঃ বিজয়ঃ ভূতিঃ ধ্রুবা নীতিঃ (ইতি) মম মতিঃ। ৭৮।

মূলানুবাদ। যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যে পক্ষে ধনুর্দ্ধর পার্থ, সেই পক্ষে শ্রী বিজয় ভূতি এবং ধ্রুবনীতি, ইহাই আমার নিশ্চয়। ৭৮।

ইতি লক্ষশ্লোক সংহিতারূপ মহাভারতের মধ্যে ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত
উপনিষৎস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা নামক ভগবদগীতাতে মোক্ষ-
সংন্যাসযোগনামক অষ্টাদশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

ভাষ্য। যত্র যস্মিন্ পক্ষে যোগেশ্বরঃ সর্ব্বযোগানামীশ্বরস্তৎপ্রভবত্বাৎ সর্ব্বযোগবীজশ্চ কৃষ্ণঃ। যত্র পার্থো যস্মিন্ পক্ষে ধনুর্দ্ধরঃ গাণ্ডীবধন্বা। তত্র শ্রীঃ তস্মিন্ পাণ্ডবানাং পক্ষে বিজয়ঃ তত্রৈব ভূতিঃ শ্রিয়ো বিশেষো বিস্তারো ভূতিঃ ধ্রুবা অব্যভিচারিণী নীতির্নয় ইত্যেবং মতির্মমেতি। ৭৮।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-
শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাভাষ্যে মোক্ষ-
সন্ন্যাসযোগোনামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ভাষ্যানুবাদ। যে পক্ষে "যোগেশ্বর" সকল যোগের ঈশ্বর, তিনিই সকল প্রকার যোগের সৃষ্টিকর্ত্তা, এই কারণে সকল যোগের বীজস্বরূপ ও যে পক্ষে এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ (বর্ত্তমান আছেন) ও যে পক্ষে পার্থ "ধনুর্দ্ধর" গাণ্ডীব ধারণ করিয়া (বর্ত্তমান আছেন) সেই পক্ষে "শ্রী" সম্পৎ, সেই পক্ষে বিজয়, সেই পক্ষে "ভূতি" সম্পদের বিশেষরূপ বিস্তারই ভূতি শব্দের অর্থ ও সেই পক্ষে "ধ্রুব" অব্যভিচারিণী "নীতি" নয়, ইহাই আমার মতি। ৭৮।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদের শিষ্য
শ্রীভগবদবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য বিরচিত গীতাভাষ্যের মোক্ষ-
সন্ন্যাসযোগনামক অষ্টাদশ অধ্যায়
সমাপ্ত হইল।

শ্রীহরি
শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।